মনোজ বসুর

রচনাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক ঃ

দীপক চন্দ্র ● মনীষী বসু ● ময়ূখ বসু

ঃ তৃতীয় খণ্ডের সূচী ঃ

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৫৯

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৭৮
নতুন মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮০

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক : অজয় বর্মন
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

নিশিকুটুম্ব

(দ্বিতীয় পর্ব)

(উপন্যাস)

নিশি-২/রচনা-৩য়—১

এক

• কয়েকটা দিন পরে বলাধিকারী ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে পথের উপর পেলেন। কোন দিকে গিয়েছিল, এখন বাসায় ফিরছে। সঙ্গে মক্কেল দু-তিনজন। বিয়েথাওয়ার ব্যাপারে তারা কোষ্ঠি-বিচার করতে এসেছে, হলদে তুলট-কাগজের পাকানো কোষ্ঠি হাতে। সেইসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

জগবন্ধুকে দেখে ক্ষুদিরাম মুখ ফিরিয়ে হাঁটার জোর বাড়িয়ে দিল। দেখতে পায়নি, এমনিতরো ভাব। জগবন্ধু একরকম ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, চিনতে পারেন না বুঝি ভটচাজ মশায়? চিনবার কথাও নয়। থানা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তার উপরে আপনার আসল যে মক্কেল সে-ও চলে গেল।

থতমত খেয়ে ক্ষুদিরাম বলে, ক'দিন ছিলাম না বড়বাবু। আজকেই বাসায় গিয়ে দেখে আসতাম।

জগবন্ধু বললেন, বড়বাবু কেন বলছেন আমায়?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে, এ থানার না হলেও অন্য কোথাও বটে তো!

কোনখানে নয়। কাজে ইস্তফা দিয়েছি। একটা কথা বলব আপনাকে ভটচাজ মশায়। চলুন একটু ওদিকে—

চোখে-মুখে কি দেখতে পেল ক্ষুদিরাম—সঙ্গীদের বলে, বিকালে এসো তোমরা। এখন আমি পেরে উঠব না। বড়বাবুর সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা।

লোকগুলো সরে যেতে জগবন্ধু বলেন, বেচা মল্লিকের কাছে আমায় নিয়ে চলুন। আজ হয়ে ওঠে তো কাল অবধি দেরি করব না।

ক্ষুদিরাম হেন ব্যক্তিরও চমক লাগে। মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল। বলে, ইতর চোর-ডাকাত ওরা, পাপী, সমাজের শত্রু—

যেন মুখস্থ করে রেখেছে জগবন্ধুর নানান দিনের বলা বিশেষণগুলো। জো পেয়ে সবগুলো একত্র করে ছুঁড়ে মারল। জগবন্ধু গায়ে মাখেন না। এমন অনেক শোনার জন্য তৈরি তিনি এখন। বললেন, বেচারামকে আপনি একদিন আমার কাছে আনতে চেয়েছিলেন। থানার বড়বাবু ছিলাম বলে রাজি হইনি। আজ আমি শুধুই জগবন্ধু বলাধিকারী। আপনি নিয়ে চলুন, পায়ে হেঁটে তার কাছে চলে যাচ্ছি। বাধা ছিল সরকারি চাকরি—তার চেয়েও বড় বাধা আমার স্ত্রী। দুটো বাধাই সরে গেছে। মুক্তপুরুষ আজকে আমি।

জগবন্ধু কেমনভাবে হাসতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে রইল।

জগবন্ধু বলেন, চুপ করে রইলেন কেন ভটচাজ মশায়? কবে নিয়ে যাবেন? দুনিয়াসুদ্ধ শেয়ানা, একলা আমি বোকা হয়ে কেন থাকব? ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাই।

জগবন্ধুর মনের সেই অবস্থায় ক্ষুদিরাম বাদ-প্রতিবাদ করে না। বলল, মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু-চারদিনের মধ্যে আপনার বাসায় যাব।

গিয়েছিল তাই। জগবন্ধু তখন অনেক সামলে উঠেছেন। হাসছেন সহজভাবে।

ক্ষুদিরাম বলে, নিয়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু পেরে উঠবেন না। সকলে সব কাজ পারে না। আমার কী হল—নিজে আমি হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেছি, বাপ-মা-ভাই সবাই চেষ্টা করছে। পরিবারের কত কান্নাকাটি—আপনার কাছে মিথ্যে বলব না বলাধিকারী মশায়, টানও খুব পরিবারের উপর। এত করেও ভাল থাকতে পারলাম না। আপনারও তেমনি—চেষ্টা যত যা-ই করুন, মন্দ হতে পারবেন না। যার যেদিকে টান, যার যাতে জমে। আফিঙের ডেলা মুখে ফেলে কেউ ঝিম হয়ে থাকে, বড়-কলকে না টেনে কারও মউজ হয় না, আবার পানের মধ্যে সিকি টিপ জরদা দিয়ে বারদুয়েক পিক ফেলে কেউ এলিয়ে পড়ে। বুঝলেন না, নেশারই রকমফের সমস্ত।

জগবন্ধু হেসে বলেন, এইসব বলেছেন নাকি বেচা মল্লিকের কাছে?

তাকে কিছু বলতে হয় না। এত লোক চরিয়ে বেড়ায়, নিজেই সব জানে। তার কথাগুলো আমি বলছি।

জগবন্ধু হতাশভাবে বললেন, তবে আর সেখানে গিয়ে কি হবে?

ক্ষুদিরাম বলে, যেতে হত না, মল্লিকই এসে পড়ত। বলে, সাধুলোকেরই দরকার আমাদের কাছে। অমন সাধু একজন পাই তো মাথায় করে রাখব। ছুটে আসছিল, আমি ঠেকিয়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি চাউর হতে দিই কেন? এ-লাইনে আপনি যাবেন—আমি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করিনে বলাধিকারী মশায়। যে-কেউ আপনাকে জানে, বিশ্বাস করবে না।

ক্ষুদিরামের নিজের কথা সেইদিন বলাধিকারী শুনলেন। পরবর্তীকালে চোর-ডাকাত কতই তো দেখলেন—অনেকে প্রয়োজনে পড়ে হয়, পেটের দায়ে। নেশায় পড়েও হয় বিস্তর—আফিঙ-গাঁজার ঐ তুলনা দিল, কোথায় লাগে এ নেশার দুরন্ত দুঃসাহসিকতার কাছে! ক্ষুদিরামের তাই—

মানুষ যত কিছু বাসনা করে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের ছিল সমস্ত। এখনো আছে। উঁচু বংশগরিমা। পিতামহ ও প্রপিতামহ দিকপাল পণ্ডিত—তাঁরা চতুষ্পাঠী চালাতেন। চতুষ্পাঠী এখনো রয়েছে বাড়িতে। বাপ সংস্কৃত ছাড়া ইংরেজিতেও এম-এ পাশ করেছিলেন সেই আমলে। অঞ্চলের মধ্যে তিনিই বোধহয় প্রথম। এক বয়সে কালেক্টরিতে মোটা চাকরি করতেন। ভাইরাও সকলে নানাদিকে কৃতী। ক্ষুদিরাম সকলের ছোট। ঠিক হল, ভাল সংস্কৃত শিখে বাড়ি থেকে সে চতুষ্পাঠী চালাবে, পিতামহ ও প্রপিতামহের কীর্তি বজায় রাখবে।

পড়াশুনোয় ভালই, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কাজকর্ম আলাদা রকম। বাড়ির সঙ্গে তাই খাপ খাইয়ে থাকতে পারল না, ক্ষুদিরামের সমস্ত থেকেও নেই। ভাঁট-অঞ্চলে পড়ে রয়েছে। অনেকদূর পৈতৃক গাঁয়ে-ঘরে বাপ-মা ভাই-ভাজ এবং নিজের স্ত্রী জমিয়ে সংসারধর্ম করছে—ক্ষুদিরাম যায় না সেখানে, এমন নয়। যায়, খুব কম—রাত্রিবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে গ্রামের উপর ওঠে, গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। একদিন দু-দিন রইল তো সর্বক্ষণ সেই ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে। দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ির বড়রা ছাড়া সবাই জানে, শূন্য ঘর—মানুষ নেই সেখানে। ফেরারি আসামীর অবস্থা। ফিরবার সময়েও রাত্রিবেলা অতি সন্তর্পণে রওনা। চেনাজানা কারো নজরে পড়ে না যায়। অনেকদিনের অদর্শনে ক্ষুদিরাম মানুষটাকে ভুলে গেছে সকালে, মরার শামিল ধরে নিয়েছে।

সেই বয়সটায়—অল্পদিন বিয়ে হয়েছে তখন—ক্ষুদিরাম আর এক মানুষ। বাড়ির চতুষ্পাঠীতে কাব্য ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র পড়ে। বড় পরোপকারী ছেলে, কারো বিপদের কথা শুনলে ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলের আগে। গ্রামবাসীর চোখের মাণিক ক্ষুদিরাম।

একবার খুব চুরি হতে লাগল। তার বয়সের ছেলেদের নিয়ে ক্ষুদিরাম রক্ষি-বাহিনী গড়ল। দিনমানে লাঠি খেলে, কুস্তি ও দৌড়ঝাঁপ করে, রাত জেগে চোর পাহারা দেয়। বাহিনার কর্তা সে-ই। সারারাত্রি গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সে কী কাণ্ড! চোর তো চোর, বাঁশবনে পেঁচার ডাক—পহরে পহরে শিয়ালের ডাক অবধি বন্ধ হয়ে গেল তাদের গানের ঠেলায়। নটবর গুণীন বলত, শেওড়াগাছের ভূতপেত্নীরা অবধি গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে।

এইসব বলাবলির কারণেই হয়তো বা রক্ষীবাহিনী অকস্মাৎ চুপ হয়ে গেল। পথে বেরিয়েছে না বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বোঝা যায় না। ক্ষুদিরাম বলছে, চোর তাড়ানো নয়—ধরেই ফেলব চোরগুলো। বারোমাস তিরিশ দিন পথে

পথে গান গেয়ে বেড়ানো কিছু সম্ভব নয়। তার চেয়ে চোর ধরে ধরে চালান দিয়ে ফেললে উৎপাতের শেষ।

সেই বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝোপেঝোপে ঘাপটি মেরে থাকে সারা গ্রামে ছড়িয়ে। উঁচু ডালের উপরে কেউ কেউ দূরের পানে নজর ফেলে বসে থাকে।

একটা দল তারপরে সত্যি সত্যি ধরে ফেলল। জন আষ্টেকের মাঝারি দলটা। মূল-কারিগর থেকে মুটিয়া অবধি—গাঁয়ের উপর যারা উঠেছিল, একটাকেও আর ফিরতে দেয়নি। বাড়ির উঠানে হাতে-দড়ি দিয়ে সকলকে মেইকাঠের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সারা দিনমান অঞ্চল ভেঙে দেখতে আসে, আর রক্ষিবাহিনীর কাজের তারিফ করতে করতে চলে যায়।

সেই থেকে একেবারে সব চুপ হয়ে গেল। চোর বুঝি মুলুক ছেড়ে পালিয়েছে। গতিক এমন—শোবার সময় লোকে দরজার খিল আঁটতে ভুলে যায়। রক্ষিবাহিনী রাতের পর রাত শূন্য গ্রাম পাহারা দিয়ে বেড়ায়। লোক কমতে লাগল—দিনের বেলা কুস্তির আখড়াতেও লোক আসে না। উদাস ভাব সকলের : কি হবে এসে, গায়ের তাগত বাড়িয়ে প্রয়োগ হবে কার উপর? চোর কোথায়?

কেউ বলে, ক্ষুদিরাম-ভাই, রক্ষিবাহিনী ভেঙে দিয়ে দাবা-পাশার বন্দোবস্ত করো, একসঙ্গে বসে তবু খানিক আড্ডা জমানো যাবে।

ক্ষুদিরামও তাই দেখছে। বাহিনী আর টিকিয়ে রাখা যায় না। ভগবান এমনি সময় মুখ তুলে চাইলেন। চোর উঠেছে আবার গাঁয়ে। সিঁধেল নয়, ছিঁচকে। এক বাড়ির বৈঠকখানা থেকে পিতলের গাড়ু হেরিকেন-লণ্ঠন ও বাঁধানো হুঁকো নিয়ে গেছে। হোক ছিঁচকে, চোর তো বটে! মাছ বলতে রুই-কাতলা যেমন, মৌরা-পুঁটিও তেমনি। গ্রামখানা একেবারে বয়কট করেছিল—আবার যখন নজর ধরেছে, ছিঁচকে থেকেই ক্রমশ বড়রা দেখা দেবে।

মেতে উঠল ছেলেরা। রক্ষিবাহিনী আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চোরেও লাগল। রীতিমতো পাল্লাপাল্লি এবারে। চতুর চোর—বিশাল গ্রামখানা একেবারে যেন নখদর্পণে। নিত্যিদিনের ঘরগৃহস্থালীর মধ্যে তিলেক কেউ বেসামাল রয়েছে, এবং বাহিনীর লোক সেই সময়টা হয়তো ভিন্ন পাড়ায়—চোরে বুঝি অন্তরীক্ষে বসে খড়ি পেতে টের পায়, টুক করে তারই মধ্যে এসে কাজ সেরে চলে গেল।

এই চলছে। দলের মাথা ক্ষুদিরাম—তাকেই দেখিয়ে দেখিয়ে যেন কাজ। একদিন তাদেরই বাড়িতে। রান্নাঘরের তালা ভেঙে ঢুকে যাবতীয় এঁটো-বাসন নিয়ে গেছে। এমন অবস্থা করে গেল পরের দিন কলাপাতা কেটে ভাত খেয়ে হয়। ক্ষুদিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তারই অপমান সোজাসুজি। নিজেদের হাতে

সম্পূর্ণ না রেখে অতঃপর থানায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনটে কনস্টেবল মোতায়েন হল, রক্ষিবাহিনীর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে তারাও পাহারা দেয়।

কী হবে! সামনে আসে না চোর, সামনে পেলে তবেই তো বন্দুক। নাজেহাল করে মরছে। এক রাত্রে আবার ঐ ক্ষুদিরামের বাড়িতেই তুমুল চেঁচামেচি। চোর পড়েছে নাকি। মেজভাই দোর খুলে বাইরে বেরিয়েছিল— দেখে, রান্নাঘরের দাওয়ায় গুটিসুটি কী-এক বস্তু। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি একটা তিথি, তার উপর বাদামগাছ বড় বড় পাতা মেলে জায়গাটায় ঘুরঘুট্টি আঁধার জমিয়েছে। মেজভাই গোড়ায় চোর বলে ভাবেনি—চোর তো রান্নাঘরেই যা করবার করে গেছে আগে। ভেবেছে শিয়াল। রান্নাঘরে পাকা কাঁঠাল— গন্ধে গন্ধে শিয়াল দাওয়ায় উঠে পড়েছে। আধেলা-ইঁট একটা হাতের কাছে পেয়ে ছুঁড়ে মারল শিয়াল তাড়ানোর জন্য। নিরিখ করেও মারেনি—কিন্তু ইট গিয়ে লাগল ঠিক সেই ছায়াবস্তুর উপরে। নতুন থালাবাটি কেনা হয়েছে— ঝনঝন করে একগাদা দাওয়া থেকে গড়িয়ে উঠানে পড়ল। পিণ্ডাকার ছায়া-বস্তুও মুহূর্তে দুটো পা বের করে দৌড় দিয়ে পালাল।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। রক্ষিবাহিনার কয়েকজন কাছাকাছি ঘুরছিল, তারা ছুটে এসেছে। বমাল নিয়ে নিঃশব্দে আজও সরে পড়ত, স্বভাবের তাড়ায় মেজভাই বেরিয়ে পড়ায় রক্ষে হয়েছে। ইঁটের ঘায়ে জখম হয়েছে চোর। রক্ত-পাত হয়েছে—দাওয়া থেকে বাইরের অনেক দূর অবধি চাপ চাপ রক্তের দাগ।

দলপতি ক্ষুদিরাম-ভাইকে তো চাই। চোর খুঁজতে লাগো তোমরা, তাকে ডেকে নিয়ে আসি। পশ্চিমপাড়ায় আছে সেখানকার দলটার সঙ্গে।

একজনে ছুটল। পশ্চিমপাড়ার দল বলে, আমাদের সঙ্গে নয়। সে তো উত্তর পাড়ায় শুনেছি।

রক্ত-চিহ্ন ধরে ধরে কেয়াঝাড়ের মধ্যে ঢুকে চোর পাকড়াল। একখানা পা বিষম জখম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই অবধি এসে আর পারেনি। কেয়াপাতার কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে বসে পড়েছে। বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

অ্যাঁ ক্ষুদিরাম-ভাই, চোর তবে তুমি? নিজের বাড়ি চুরি করতে উঠেছিলে —কী সর্বনাশ।

তাজ্জব কাণ্ড! গ্রামময় সাড়া পড়েছে। পাড়া ভেঙে সব দেখতে আসছে। পুরুষলোক মেয়েলোক—এমন কি নিশিরাত্রি হলেও ছেলেপুলে অবধি ভিড় জমিয়েছে। মানী ঘরের ছেলে ক্ষুদিরাম, টোলে-পড়া বিদ্বান, গ্রামের সকল সৎকর্মে অগ্রণী—ভিতরে ভিতরে মানুষটা এই!

মেজভাই হাহাকার করে উঠল : আমার ভাই চোর !

রক্ষিবাহিনীর ছোকরা ভেবে ভেবে দেখল, ইদানীং যত এই রকম ছ্যাঁচড়া চুরি হয়েছে, ঠিক সময়টা দলপতির উদ্দেশ মেলে নি। চাপাচাপি করতে হল না—ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম স্বীকার করে নেয়, কাজগুলি তারই বটে।

কপালে করাঘাত করে বুড়ো বাপ আর্তনাদ করে ওঠেন : কিসের অভাবে তুই চোর হতে গেলি ?

অভাব কেন হতে যাবে ? একটা জিনিসও সে বিক্রি করে নি, পানাপুকুরে সমস্ত ফেলে দিয়েছে।

নিঃসঙ্কোচে এমন সহজভাবে বলে যে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। দলের ছোঁড়ারাই পানাপুকুরে নেমে পড়ল। ক্ষুদিরামের নির্দেশ মতো ডুব দিয়ে দিয়ে জিনিস তুলে আনে। বিস্তর পাওয়া গেল। ছোটখাটো দু-দশটা পাওয়া যায় নি—পাঁকের নিচে হয়তো পুঁতে আছে, কিংবা অন্য দিকে সরে গেছে ফেলবার সময়।

অতি প্রিয় দু-একটি সাগরেদ এসে বলে, চোর শাসনের জন্য কী খাটনি খেটেছে ক্ষুদিরাম-ভাই। চোর শেষটা তুমিই হয়ে গেলে। এ যেন সাপ হয়ে ছোবল দেওয়া, ওঝা হয়ে ঝাড়ানো—

ক্ষুদিরাম হাসিমুখে নিরুত্তরে উপভোগ করছে।

ব্যাপার যখন এই, থানায় ধন্না দিয়ে কনেস্টবল এনে বসাতে গেলে কেন ?

কাজ দেখে কনেস্টবলগুলো হাঁ হয়ে যাবে ভেবেছিলাম। থানায় বাবুদের গিয়ে বলবে, তারাও চলে আসবে। গাঁয়ের খাতির হবে পুলিশের কাছে।

ভেবেছিল একরকম, শেষ অবধি ঘটে গেল উল্টো। ফোঁস করে ক্ষুদিরাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মুখের উপর লজ্জার ক্ষীণ একটা হাসি। সে লজ্জা চোর হওয়ার জন্য নয়, ধরা পড়ার বেকুবির জন্য।

মায়ে-বাপে কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেল। মা বললেন, বউমা এখানে নেই কী ভাগ্যি ! তা বলে কানে যেতে কি বাকি থাকবে—কতজনে কত রকম রসান দিয়ে বলবে। বয়সটা খারাপ···ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে না বসে, আমার সেই ভয়।

কাপড় কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ঘরের আড়ায় ও নিজের গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়া, কলসি গলায় বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রণালী তখনকার কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে চালু। মায়ের মনে সেই ভয়ে ঢুকছে। ক্ষুদিরামও শিউরে ওঠে। বিয়ে এক বছরও হয় নি এখনো। বাপের বাড়ি আছে বউ, বছর পুরলে পাকাপাকি ঘর করতে আসবে। বার-তিনেক অল্পস্বল্প যা দেখা, তার মধ্যেই নতুন বউ বরের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সকলের এক প্রশ্ন : এমন কাজ কি জন্য করতে গেলে ? আরে, হিসাবপত্র করে বুঝেসমঝে করল নাকি কিছু ? না করে পারে না, এমনি তখন অবস্থা। চোর তাড়ানোর জন্য এত কষ্ট—সেই চোর সত্যি সত্যি গ্রামছাড়া হয়ে গেল। ভাল জিনিস পড়ে মরুক, একটা আধলাপয়সা তুলে নেবারও লোক নেই। গৃহস্থবাড়ি সন্ধ্যাবেলা সব শুয়ে পড়ে, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে ওঠে, রাত্রিগুলো একেবারে চুপচাপ, ঘুমের মধ্যে একবার পাশমোড়া দেবারও আবশ্যক হয় না কারো। রক্ষিবাহিনী নিয়ে মড়ার রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনি মনে হয় ক্ষুদিরামের। এত করে গড়েতোলা রক্ষিবাহিনীরও যায়-যায় অবস্থা —ছেলেরা ঘর থেকে বেরুতে চায় না, কী হবে মিছামিছি ঘুরে ক্ষুদিরাম-ভাই—

ক্ষুদিরাম ফাঁক বুঝে তখন নিজেই চুরি করে বসল। চোর এসেছে, চোর এসেছে—কলরব পড়ে গেল চতুর্দিকে। রক্ষিবাহিনী দেখতে দেখতে জেঁকে উঠল, মেঘ কেটে গেল সকলের মনের। গৃহস্থ-মানুষের চোখে ঘুম হরেছে, খুট করে কোন দিকে এতটুকু শব্দ হলেই আলো জেলে উঠে বসে। অমুক বলছে, তার দরজায় ঘা দিয়ে গেছে নাকি কাল। তমুক বলছে, সিঁধকাঠির কয়েকটা ঘা তার দেওয়ালে পড়তেই লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল, সেইজন্যে রক্ষে হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কার একটা ফুটো ঘটি নিয়ে বুঝি পানাপুকুরে ফেলেছে—মানুষটা থানায় গিয়ে মালের লিষ্টি জানিয়ে এলো। সেই সব মাল চোখেও দেখে নি তার চোদ্দপুরুষ। চোর নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা—সঠিক চিনতে পেরে নামও বলে দিচ্ছে কেউ কেউ : অমুক গাঁয়ের এই জন। বলছে আবার ক্ষুদি-রামের কাছে এসে। রক্ষিবাহিনী চালনা করতে দলের ছেলেদের ফাঁক কাটিয়ে বন্দুকধারী কনেস্টবলদের প্রায় চোখের উপরে টুক করে কাজ সেরে আসা—বুড়ো বাপ-মা ভালো-মানুষ ভাইরা অথবা অবোধ কিশোরী বউ কারো পক্ষে এ জিনিসের মজা বোঝবার কথা নয়। চোর ধরতে ধরতে নিজেই শেষটা চোর হয়ে পড়ল। হয় এমনি। থানার চৌহদ্দির মধ্যে এত চোর, সে বোধ হয় এই কারণেই।

চোরাই মাল সবই প্রায় ফেরত পাওয়া গেল, তা ছাড়া প্রাণপাত করে চির দিন দশের কাজ করে এসেছে—এইসব বিবেচনায় ক্ষুদিরামকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হল না, ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিল সকলে মিলে। কিন্তু এর পরে আর গাঁয়ে-ঘরে থাকা চলে না। বাপ অবসর নিয়েছেন, তা হলেও খাতির খুব। আদালতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরামকে সদরে পাঠালেন। চোখের আড়াল হয়ে থেকে লোকে ক্রমশ এই সমস্ত ভুলে যাবে, চাকরে-মানুষ হয়ে

আবার এক সময়ে সকলের সঙ্গে যথাপূর্ব মেলামেশা করবে—এই প্রত্যাশা। হল না, একখানা কুঠরির মধ্যে দশটা-পাঁচটা বসে বসে কলম-পেষা পোষায় না ক্ষুদিরামের। দুধের স্বাদ যে পেয়েছে, ঘোলে তার মন উঠবে কেন? কাপ্তেন বেচা মল্লিকের খুব নাম শোনা যায় আদালতে, ফৌজদারি নথিতে তার রকমারি কীর্তি-কাহিনী। বেচারাম সদরে এলে তার সঙ্গে ক্ষুদিরাম দেখা করল, চেনা-জানা নিবিড় হল। চাকরি ছেড়ে তারপরেই সে ভাঁটি অঞ্চলে আস্তানা নিল পুরোপুরি।

বলাধিকারী বলেন, বড়বউ আত্মঘাতী হল, রেলের কামরায় আমি সকলের কাছে বলেছিলাম। সাহেব, তোর মনে পড়বে। বলেছিলাম, গয়নার দুঃখে মারা গেল। গয়না গিয়েছিল সত্যিই—তদন্তের খরচা যোগাতে দু-হাতে দু-গাছা শাঁখা বই অন্য কিছু ছিল না। দুঃখে পড়ে মারা গেছে—অতি-বড় দুঃখ না হলে আমায় ঐ অবস্থায় একলা ফেলে চলে যেতে না। কিন্তু ক-টুকরো সোনা-দানা হারিয়ে প্রাণ দেবার মেয়েলোক সে নয়। সে যা হারাল, দুনিয়ার যাবতীয় সোনারূপো, হীরে-মাণিকের চেয়ে তার দাম বেশি। তার দুঃখ আমিই কেবল জানি। অভিশাপ লেগে দেব-দেবীর স্বর্গচ্যুতি হল, পুরাণে পড়ে থাকি। বড়বউয়ের জীবনে হঠাৎ একদিন তাই ঘটে গেল।

বলতে বলতে বলাধিকারী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হলেন। যারা শুনছে, তাদেরও কথা সরে না। নিশ্বাসটা অবধি সন্তর্পণে ফেলে।

ম্লান হেসে বলাধিকারী বললেন, আরও একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম রে। স্ত্রী মারা গিয়ে, সংসারধর্ম ছেড়ে সাধু-বিবাগী হয়েছি আমি। ঠিক উল্টো—সাধু নয়, চোর।

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলল, চোর কোথা, সাধুই তো আপনি।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে ওঠে: সাধু বই কি! সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন। চেষ্টা কি করেন নি চোর হতে? পেরে উঠলেন না। ইচ্ছেয় হয় না কিছু। আমারও দেখুন। নিজে হদ্দমুদ্দ দেখেছি, তার উপর বাড়িসুদ্ধ উঠে-পড়ে লেগেও সাধু বানাতে পারল না।

সাহেবকেই লক্ষ্য করে দরাজভাবে পরিচয় দিচ্ছে: মহাজন, অর্থাৎ মহৎ জন—ষোলআনা মানেটা বলাধিকারী মশায়ের উপরেই খেটে যায়। এমন খাঁটি-সাধু পাই-তক্কের ভিতর নেই। কারিগরে খেটেখুটে এসে বমাল ফেলে নিশ্চিন্ত—বখরার আধপয়সা অবধি হিসাব হয়ে ঠিক ঠিক ঘরে গিয়ে পৌঁছবে। মর-সুমের মুখে গাঁ-গ্রাম ছেড়ে প্রাণ হাতে করে সব বেরিয়ে পড়ে—জানে, নিজেরা

যদিই বা মারা পড়ে, বাড়ির বউ ছেলেপুলে মরবে না বলাধিকারী মশায় বর্তমান থাকতে। কতই মহাজন কত দিকে—

বাধা দিয়ে বংশী তিক্তস্বরে বলে ওঠে, মহাজন কে বলে তাদের? ও-নামে ঘেন্না দিও না। তারা খলেদার। এক খলেদার আছে নবনীধর ধাড়া—গুরুপদ ঢালির চেনা মানুষ। সেই যে গুরুপদ—আমার আজামশায়ের সাগরেদি করতে করতে নতুন গোঁফ উঠে সেই গোঁফ এখন পেকে সাদা হয়ে গেছে। ধারার কথা বলে গুরুপদ। মালপত্তরের দাম তার মুখস্থ—দেখতে হয় না, ভাবতে হয় না। রূপোর হাঁসুলি বারো-আনা, দা-কুড়াল-বটি-খন্তা দু আনা করে, কাঁসার বাটি গেলাস এক-এক সিকি, পিতলের গামলা ছ-আনা—

ক্ষুদিরাম বলাধিকারীকে বলে হতে পারবেন অমন? দেখেছেন তো চেষ্টা করে—আরও দেখুন—পারবেন না।

সাহেবের নিজের কথা মনে এসে যায়। সত্যি বটে, ইচ্ছেয় কিছু হয় না। মা-কালীকে কত করে ডেকেছে মন্দ করে দেবার জন্য কিছুদিন নিশ্চিন্ত—মন্দ হয়ে দিব্যি মন্দ-মন্দ কাজ করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ এক মোক্ষম সময়ে এমন কাজ করে বসল, বড় বড় পুণ্যবানেরই যা পোষায়।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে ওঠে, ফাঁকির কাজ করবেন বলাধিকারী মশায়! তবেই হয়েছে! ক্ষমতাই নেই।

বলাধিকারী দুঃখের ভান করে বলেন, কাজলীবালাও ঠিক এই বলেছিল।

তারপরে ক্ষুদিরাম একদিন বলাধিকারীকে কাপ্তেন বেচা মল্লিকের কাছে নিয়ে গেল। বেচারাম তটস্থ। কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাকা, বলাধিকারী এই ফুলহাটায় এসে আস্তানা নিলেন। ফলাও তেজারতি কারবার—টাকা কর্জ দেন খতে হ্যাণ্ডনোটে, ধান বাড়ি দেন, সোনা-রুপো ও জমাজমি বন্ধক রাখেন।

এ সমস্ত বাইরের আবরণ। কিন্তু ঘরের কাজলীবালা কেন সমস্ত কথা জানবে না? ডেকে নিয়ে একদিন বলাধিকারী বললেন, তুমি চলে যাও কাজলী-বালা, আমার কাছে থাকা চলবে না।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, কী দোষ-পাপ করলাম বাবাঠাকুর?

বলাধিকারী বলেন, বড় পবিত্র মেয়ে তুমি। ভাল থাকতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছ। দোষ-পাপ যাকে বলো, সে পথ আমিই বেছে নিলাম। তুমি সামনের উপর থাকলে মনে সর্বদা খচখচ করে বিঁধবে, সোয়াস্তি পাব না। তোমার কিছু নয়—আমার দোষ-পাপের জন্যেই তোমায় তাড়াচ্ছি।

তুমি করবে দোষ-পাপ, তবেই হয়েছে! কাজলীবালা উড়িয়ে দিল একেবারে।

জেদ ধরে বসল, জুতো মারো, ঝাঁটা মারো তোমার পায়েই পড়ে থাকব বাবা। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলে আবার ফিরে আসব। মা চলে গেছেন, আমি গেলে দেখাশুনো করবে কে ?

জগবন্ধু সদুঃখে তাই বলেন, এতকাল লাইনে আছি, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ দোষঘাট করছে—আমি নাকি অক্ষম অপদার্থ, ঐসব কখনো করতে পারিনে। বড়বউ সারাজীবন বলে গেছে, কাজলীবালা এসেও তাই বলে, তোমরাও বলো যখন-তখন। সাধু হওয়ার দুর্নাম সারা জন্মে ঘুচানো গেল না।

ক্ষুদিরাম বলে, আমি মোক্ষম কথা বলে দিয়েছি—যার যাতে নেশা ধরে যায়। নেশা জোর করে তাড়াতে গেলে আরও বেশি করে জড়িয়ে যায়। আমাদের গাঁয়ের একজন মদ ছাড়তে গিয়ে আফিং ধরল। এখন এমনি হয়েছে, চোখ বুজে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুলি ফেলে যেতে হয় মুখে। অনুপান হল আড়াই সের ঘন-আঁটা দুধ আর সেরখানেক রসগোল্লা। মদের পিতামহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারও তাই। সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন—আরও চেষ্টা করুন, চিমটে-কম্বল নিয়ে ষোলআনা সাধু হয়ে বনে চলে যেতে হবে।

তুষ্টুরাম নাছোড়বান্দা। গুরুপদ ঢালিকে ধরে এনেছে। সেই প্রথম বয়স থেকে যেমন পচা বাইটার সাগরেদি করে আসছে। আজামশায়ের সাগরেদ হিসাবে বংশীর সঙ্গে পরিচয়—বংশীর বাড়ি উঠেছে। বয়স হয়েছে গুরুপদর—বয়সের জন্যে পুরো মরসুমের দিনে সে বাড়ি বসে রয়েছে। তুষ্টুর টানাটানিতে চলে এলো দলের সঙ্গে একটানা মাসের পর মাস পেরে না উঠুক, ছুটো এক-আধখানা কাজে অসুবিধা হবে না। এবং কাজ যদি সত্যি-সত্যি নামানো সম্ভব হয়, গুরুপদ হেন প্রাচীন বহুদর্শী লোক উপস্থিত থাকতে সর্দার অন্য কে হতে যাবে ? বথরার উপরে এত বড় সম্মানের আশা পেয়েই তুষ্টুর ডাকে এক কথায় গুরুপদ চলে এসেছে।

কিন্তু কিছুই হবে না, যতক্ষণ না জগবন্ধু বলাধিকারী ঘাড় নেড়ে 'হাঁ' বলে দিচ্ছেন। মা-কালী হলেন ইষ্টদেবী। আর দেব-সেনাপতি কার্তিকঠাকুর চোরেরও সেনাপতি হয়ে অলক্ষ্যে আগে আগে চলেন। দেব-দেবীর নিচেই, ভাঁটি অঞ্চলের এরা মনে কর, বলাধিকারীর স্থান। কপালের উপর অদৃশ্য এক চোখ আছে বুঝি—তাই দিয়ে আগেভাগে বলাধিকারী দেখতে পান। তিনি যে কানেই নিতে চান না, তার কী উপায় ?

তুষ্টুরাম জনে জনের কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে গিয়ে ধরল : দিনক্ষণ দেখে তুমি একবার পাক দিয়ে এসো। ভটচাজ-বামুনের

চোখে দেখে এসে বলো, ডোবের বেটার চোখের উপর বলাধিকারী মশায়ের বোধহয় ভরসা হয় না। তুমি বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মত হয়ে যাবে।

আস্পধার কথা শোন একবার। ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে যায়। তুষ্টু যেখানে পয়লা খুঁজিয়াল, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সেই কাজের উপর চোখ দিতে যাবে! অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি হয়ে গাঁথনিটা তুষ্টু করে এলো, ক্ষুদিরামের তার উপর চুন টানার কাজ। যদি শোনা যায়, সে-বাড়ির মক্কেল ঘরের মেজেয় মাদুর পেতে সোনার মোহর শুকোতে দিয়েছে, তেমন ক্ষেত্রেও তো যাওয়া চলবে না। রুজি-রোজগারের লোভ থাকতে পারে, তা বলে ইজ্জত মেরে কদাপি নয়।

তবে অতিশয় অনুগত ও আজ্ঞাবহ এই তুষ্টুরাম। বিস্তর কাজকারবারের সাথী—সে-লোকের মুখের উপর এত সব বলা যায় না। তুষ্টু হাত-পা ধরাধরি করছে : খোল পাঁজি ভটচাজ মশায়, দিন বের করো একটা—

ক্ষুদিরাম বলে, দিন এখন কোথা রে? মলমাস চলেছে।

চলবে কদ্দিন?

নামের মধ্যেই তো মাস শুনলি—মলমাস, মলদিন নয়। সেটা দু-মাস না ছ-মাস পাঁজি দেখে হিসাবকিতাবের ব্যাপার। বলছিস যখন, তা-ই না-হয় করে দেখব এক সময়।

তুষ্টু বলে, মাসের হিসাব কি করবে তুমি? দিনের হিসাব করো। কিম্বা তার চেয়েও ছোট—ঘণ্টার হিসাব। লোহার সিন্দুকের টাকা কাঠের বাক্সে এসে নেমেছে। পরের টাকা মুফতের টাকা—এর পরেই তো পাখনা মেলে উড়বে। যা করতে হয় তড়িঘড়ি—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হল তুষ্টুরাম : তোমার ঐ মলমাসের হিসাব কষে বাক্স ভাঙতে গেলে দেখবে খোপে আর তখন পয়সা-টাকা কিছু নেই—একটা হত্তুকি।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ক্ষুদিরাম। না-ই বা গেল সেখানে, খবরটা নিতে বাধা কি? খোঁজদারি কাজ যাদের, দরকারে লাগুক বা না লাগুক, তল্লাটের সকল খবর নখদর্পণে রাখতে হয়। কোন্ গাইটার কি বাছুর হল, কোন্ ডালে ক'টা আম ফলল, সম্ভব হলে তা-ও।

বলে, সন্ন্যাসীপদ দত্তর বাড়ি মাহিন্দার তো তুই?

মরসুমের সময়টা জোয়ানপুরুষ দু-পাঁচ টাকার গোনা মাইনে নিয়ে গৃহস্থ-বাড়ি পড়ে আছে, এটা বড় লজ্জার কথা। অকর্মণ্যতার পরিচয়। তুষ্টুরামের কপালে তাই ঘটল এবার। সম্পূর্ণ নিজের দোষে—মনে পড়লে ঠাঁই-ঠাঁই করে নিজের গালে চড়াতে ইচ্ছে করে।

দশেরার রাত্রে লোক বাছাইয়ের তারিখটায় আকণ্ঠ তাড়ি গিলে পড়ে ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে ব্যাকুল হয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটা নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। কিন্তু গেরো খারাপ—

নেশার ঘোরে পথ গোলমাল হয়ে যায়। সকাল অবধি তামাম অঞ্চলে হেঁটে বেড়িয়েছে, আসল ঠাঁই খুঁজে পায় নি। শেষটা হাটের চালার মধ্যে শুয়ে নাক ডেকে মনের সাধে ঘুমোতে লাগল। কাপ্তেনের কাছে পরে কত কান্নাকাটি—তখন আর কোন্ লোকটাকে বাদ দিয়ে নেওয়া যায়? মানুষ আজকাল মশা-মাছির মতন—গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে—ভিড় ঠেলে কূল পাওয়া যায় না। তুষ্টুরাম নিজের দোষেই বাতিল এ বছর।

কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তুষ্টু: বাতিল করে দিয়ে তারা সব বেরিয়ে গেল। বলাধিকারী মশায়ের কাছে বুদ্ধি নিতে যাই—কি করি এখন? ধার-কর্জে ডুবু-ডুবু। বেরুতে পারলাম না—এখন আবার ধার চাইতে গেলে তো 'মার' 'মার করে তেড়ে আসবে। কিন্তু পেট তো বুঝবে না—পেটের পোড়ার কি উপায়? বলাধিকারী বলে দিলেন, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে মাহিন্দারি কর। তাঁর কথায় একটা কাজ ধরে নিলাম।

খাতিরের মানুষ বংশীকে সঙ্গে করে এনেছে সুপারিশ করতে। বংশী বলে, মন্দটা কি হচ্ছে? দুটো-তিনটে মাস দিব্যি রাজার হালে কাটালি। চারবেলা কষে খেয়েছিস, চিবোতে চিবোতে যতক্ষণ না চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। হাত পেতে মাস-মাস মাইনে নিয়েছিস। নিয়ে-থুয়ে ঝড়তি-পড়তি যা রইল, সেগুলো এইবার টেনে আনবার ফিকির।

ক্ষুদিরাম শশব্যস্তে বলে ওঠে, অ্যাঁ, ফসলের ক্ষেত বলছিলি—সে কি ওই সন্ন্যাসীপদর ফসল?

বংশী বলে, নয় তো কি তুষ্টুরাম বাবু গতর নেড়ে অন্য বাড়ি খোঁজদারি করতে গেছে? এতকাল দেখেও মানুষটাকে চেনোনি?

ক্ষুদিরাম হাত ঘুরিয়ে বলে, ও-ফসল ঘরে আসবে না। তুষ্টুরামের খোঁজ যখন—গোড়াতেই বুঝে নিয়েছি, সেইজন্যে গা করিনি। সাঁতালি পর্বতে লখিন্দরের লোহার বাসর—সন্ন্যাসীপদর বাড়ি তার চেয়েও শক্ত। বাড়ির সামনে মস্তবড় ফোকরওয়ালা কাঁঠালগাছ, সে ফোকরে মানুষ ঢুকে বসে থাকতে পারে। পিছনে পাঁচিলের গায়ে চইগাছ জড়িয়ে উঠেছে। বল্ তা হলে তুষ্টুরাম সে বাড়ির হদ্দমুদ্দ দেখা আছে কিনা। হেঁ-হেঁ বাপু অন্তর্যামী ভগবানের চোখ যেখানে পৌঁছয় না আমার চোখ সেখানেও।

তুষ্টু ডোম ঘাড় কাত করে সসম্ভ্রমে মেনে নেয়। ক্ষুদিরাম বলে, জামলার

তেপান্তর বিল পার হয়ে যেতে হয়—যেতে হবে ডোঙায় কিম্বা ছোট্ট ডিঙিতে। বিলের মধ্যে ডোঙার পই—পইয়ে প্রায়ই তো জল থাকে না। নেমে পড়ে তখন হাঁটু সমান কাদা ভেঙে ডোঙা টেনে ঘাটে নিয়ে চলো। সে-ও এক হিসাবে ডোঙায় যাওয়া—ভিতরে চড়ে নয়, মাথা ধরে টানতে টানতে। আমি বাপু বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, অত ধকল সামলাতে পারব না। দল হয়ে যারা সঙ্গে যেতে চায় তাদেরও হুঁশিয়ার করে দাও—ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সে একটা দ্বীপ! তাড়া খেয়ে সাগরে তবু ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, জামলার বিলের প্রেমকাদা পা দুটো আঠার মতন এঁটে ধরবে।

তুষ্টু ডোম বেজার হয়ে বলে, কথা না শুনেই তুমি রায় দিয়ে বসলে ভটচাজ মশায়। ফসলটা সন্ন্যাসীপদর, কিন্তু ক্ষেত আলাদা, সন্ন্যাসীর বাড়ির উপরে নেই। তা হলে কে বলতে যেত? ফালতু কথা তুষ্টুরামের মুখে বেরোয় না। ফসল চালান হয়ে গেছে তিলকপুর রাখাল রায়ের বাড়ি। লোহার সিন্দুকে বাঘা বাঘা তালা এঁটে রাখত, এখন রাখাল রায়ের ফঙ্গবেনে কাঠের ছাপবাক্সে গিয়ে পড়েছে। তিলকপুরের খটখটে রাস্তা—পা থেকে তোমার চটিও খুলতে হবে না। স্বর্ণসিন্দুর-পাজিপুঁথির ব্যাগটা নাও না একটিবার ঘাড়ে তুলে। এত করে বলছি—

বলাবলি সত্ত্বেও ক্ষুদিরামের পাশ-কাটানো কথা: আচ্ছা, দেখি তো—

গুরুপদ শুনে রাগে গরগর করে: এসে যখন পড়েছি যাবই তিলকপুর। ঢুঁ মেরে দেখে আসব। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না! বলি, ক্ষুদিরাম ভটচাজ ক'টা জায়গায় আর খোঁজদারি করে, তার বাইরে বুঝি চুরিচামারি বন্ধ? না যায় তো বয়েই গেল। আমরা চলে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, বংশী যাবে। নতুন মানুষ ঐ দু-জন ঘোরাফেরা করছে—বলে দেখো, তারা যদি যায়। মেলা লোকের কী গরজ—দল যত বাড়াবে বখরা তত কম।

তুষ্টু তবু ইতস্তত করে: ক্ষুদিরাম চুলোয় যাক, আসল হলেন বলাধিকারী। তাঁকে দিয়ে 'হাঁ' বলানো দরকার। তবে সবাই বল পাবে। তাঁর অমতে বড় কেউ যেতে চাইবে না। এত খাতিরের বংশী—সে মানুষও গাঁইগুঁই করবে দেখো। নতুন ঐ ফুটফুটে ছোকরা—বলাধিকারীর নেকনজর তার উপরে। দেখি সাহেবকে বলে. নিজেও সে কাজের জন্য ছটফট করছে। বলাধিকারীকে বলে সে যদি মতটা আদায় করতে পারে।

দুই

বলাধিকারীর বড় ভাল মেজাজ। বলেন, ওসব থাক এখন, পরে শোনা যাবে। পাঠ শুনবে তো বল। মুকুন্দ মাস্টার ইস্কুল-ঘরে আসর বসায়। আমার এখানেও আজ পুঁথি-পাঠের আসর।

পুঁথি বের করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে পরম যত্নে রাখা। সন্তর্পণে এক-একখানা পাতা খুলছেন। তালপাতার উপর গোটা গোটা প্রাচীন হরফে লেখা। বলছেন, এ-ও এক পুরাণ—বিস্তর পুরানো পুঁথি। এত পুরানো, বেসামাল হলে তালপাতা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে। এখনো বাংলা পুঁথি—সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতেও পুঁথি আছে এমনি।

বললেন, তবে কিন্তু বিষয় আলাদা। মুকুন্দর পুঁথিপত্রে পুণ্যবান মানুষদের ধর্মকর্মের কথা, আমার পুঁথিতে চোরের কথা। মুকুন্দ মাস্টারের বাপ যেমন, তেমনি এক মস্ত মানুষের উপাখ্যান।

সুর করে দুটো লাইন পড়ে গেলেন :

চোর-চক্রবর্তী কথা শুনতে মধুর।
যে কথা শুনলে লোকে হয় তো চতুর॥

হেসে বলেন, কাজের খবর এসেছে, বেরোবার জন্য তোমরা ছটফট করছ। খানিকটা চতুর হয়ে নাও চোর-চক্রবর্তীর কথা শুনে।

কথকতার মতো পাঠ হচ্ছে, ব্যাখ্যা হচ্ছে, অন্য বৃত্তান্তও এসে যাচ্ছে প্রসঙ্গ-ক্রমে। কখনো সুর, কখনো শুধুমাত্র কথা। সকলের সেরা যে রাজা তিনি হলেন রাজ-চক্রবর্তী। চোর-চক্রবর্তী তেমনি সকল চোরের মাথার উপর। রাজ-চক্রবর্তী যেমন একজন মাত্র নয়, শক্তি ও প্রতিভার গুণে কালে কালে অনেক জন হয়েছেন, চোর-চক্রবর্তীও তেমনি।

এই জনের নাম হল খরবর। মহাসম্ভ্রান্ত বাপ—বিজয়নগর রাজসভার পাত্র উগ্রসেন। এমনি হত তখন। সমাজের সর্বস্তর থেকে গুরুর কাছে চৌরশাস্ত্রের পাঠ নিতে যেত। চৌষট্টি কলার একটি, এই বিদ্যা বাদ রেখে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলা চলবে না। দেবাদিদেব মহাদেবের ছেলে স্কন্দ চৌরশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। রাজার ছেলে, দেখা যাচ্ছে, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও কায়মনে চৌরশাস্ত্র শিখেছেন। খরবরেরও তাই। কাব্য শিখেছেন, জ্যোতিষ শিখেছেন,

আরও বিবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম। অবশেষে 'উত্তম-অধম চৌরবিদ্যা' কৌতূকভরে শিখে ফেললেন। অদ্বিতীয় হলেন। দেশের চোর-সমাজ সসম্ভ্রমে তাঁকে চোর-চক্রবর্তী বলে মেনে নিল।

বংশী মাঝখানে ফোড়ন কেটে ওঠে : যে রকম কাপ্তেন কেনা মল্লিক।

বলাধিকারী হাসেন : এই কথা বলতে যেও দিকি তোমার আজামশায়কে। টের পাবে। মল্লিককে চোর বলেই স্বীকার করে না পণ্ডা বইটা। হ্যাক-থু করে। বেচারাম-কেনারাম ওদের জুটো ভাইকেই। বলে, ডাকাত হয়তো খানিকটা। তাই বা কিসে—ডাকাতের ডাক হাঁক নেই। দো-আঁশলা ওরা। দিনকাল খারাপ, ঝুটো জিনিসের জয়জয়কার।

বললেন, এ কালের চোর-চক্রবর্তী কেউ যদি থাকে, সে পচা বাইটা। কাজের কৌশলের দিক দিয়ে বলছি। এখন জবুথবু বুড়ো-মানুষ—কিন্তু দিন ছিল তার, গল্প শুনে তাজ্জব হতে হয়। গুরুপদ দেখে থাকবে কিছু কিছু। তাও ভরভরন্ত যৌবনকালের নয়—বয়স হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ছিল ছিটেফোঁটা। বংশী তো কেবল কানেই শুনেছে।

আবার জগবন্ধু পুঁথিতে চলে গেলেন। চম্পাবতী নগরের চোরেরা দল বেঁধে খরবরের কাছে এসে পড়ল। রাজার বড় অত্যাচার—চোর উৎখাত করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। বিচার-আচার নেই, যাকে পাচ্ছে ধরে নিয়ে শূলে-শালে দিচ্ছে।

চোর-চক্রবর্তী হয়েছেন খরবর, শুধু নিজ-হাতের বাহাদুরি দেখিয়েই হবে না। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন রাজধর্ম। চোর-চক্রবর্তীরও তেমনি কর্তব্য আছে—কিছু উল্টো রকমের : চোরের পালন, গৃহস্থের শাসন। যত চোর যেখানে আছে, দায়-বিদায়ে এসে পড়ে। তাদের কথা শোনেন তিনি, অসুবিধা দূর করে কাজকর্মের সুব্যবস্থা করেন। সেজন্য প্রাণ দিতেও পিছ-পা নন—

মাঝখানে ভিন্ন কথা এসে পড়ল। গুরুপদ বলে, গুরু নিন্দে করব না—চোর-চক্রবর্তী বাইটা মশায়ের ভিন্ন স্বভাব। বড় স্বার্থপর—নিজের খেলাটাই শুধু দেখিয়ে গেল, বুড়োপুথুড়ে মানুষ। কবে শুনব মরে গেছে। গুণজ্ঞান যত কিছু নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। দুনিয়ার উপরে একছিটে থাকবে না।

ক্ষুদিরাম গদ্‌গদ হয়ে বলে, সেদিক দিয়ে ইনি আছেন—এই বলাধিকারী মশায়। পুঁথি পড়ে চোর-চক্রবর্তীর গুণব্যাখ্যান করছেন—নিজে মানুষটা কী? সত্যি কথা মুখের উপর বলব। মরশুমে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে, এতগুলো সংসারের খবরদারি একটা মানুষের ঘাড়ে। কত রকমের দায়-দরকার নিয়ে নিত্যিদিন মানুষের আসা-যাওয়া। এর ছেলের অসুখ, ওর কলসির চাল

ফুরিয়েছে, ওর ঘরের চালের কুটো নেই, পুরুষের খবর না পেয়ে ও-বাড়ির বউটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—চতুর্ভুজ নারায়ণের এক গণ্ডা হাত নিয়ে রমারম পয়সা-টাকা ছড়িয়ে যাচ্ছেন, শিবের পঞ্চমুখ নিয়ে যাকে যা বলতে হয় বলে যাচ্ছেন। আর মজাটা হল, লেখাজোখার মধ্যে কিছু পাবে না, সমস্ত ঐ একটা মাথার ভিতরে ভাবতে গিয়েই আমাদের মাথা ঘুরে আসে।

জগবন্ধু ক্রোধের ভান করে বলেন, দেখ, পুঁথি-পাঠে বারম্বার বাগড়া দিচ্ছ। সব পাঠের ফলশ্রুতি থাকে, এ পুঁথিরও আছে। কিন্তু এমন হলে ফল ফলবে না। আমার পণ্ডশ্রম।

বংশী বলে, ছোটমামা ধর্মের পুঁথি-পুরাণ পড়ে—কানে শুনলে পুণ্যি ; মরার পরে স্বর্গবাস। চোরের পুঁথির ফলাফল আবার কি ?

নেই ? শোন তবে—। পাঠ করে জগবন্ধু একটু শুনিয়ে দেন :

চোরচক্রবর্তী নাম রহে যেই ঘরে।
চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার বাড়িরে॥

হেসে বলেন, মুকুন্দর পুঁথি-পুরাণ মহৎ বস্তু। ফলশ্রুতি বিরাট—অনন্ত পুণ্য আর অক্ষয় স্বর্গবাস। সবই কিন্তু ভবিষ্যতের পাওনা। মরে যাওয়ার পরে। আরও অসংখ্য সদাচারের মতো। যেমন ধরো বিধবার নির্জলা একাদশী —দেহের খোলে যতদিন প্রাণ আছে, কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে যাও ; পরজন্মে বৈধব্য ভুগতে হবে না। এ জন্মের কষ্ট সেই জন্মে উশূল হবে—আমৃত্যু মাছ-ভাত। কিন্তু চোরের পুঁথির ফল হাতে-হাতে যোলআনা নগদ—চোর আসতে পারবে না চোরচক্রবর্তীর নাম যেখানে। না পড়ে পুঁথিখানা শুধুমাত্র ঘরে থাকলেও ফল আছে—

এই পুঁথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে।
তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে॥

খুব হাসছেন বলাধিকারী। নড়ে-চড়ে আবার শুরু করলেন : চোরেরা হাহাকার করে পড়ে খরবরের কাছে। শরণাগত-রক্ষণ বীরের কর্তব্য। চম্পাবতীর রাজাকে অতএব সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। সর্বসমক্ষে চোর-চক্রবর্তী প্রতিজ্ঞা নিলেন :

চম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল।
তবে চোরচক্রবর্তী নাম হইবে সফল॥
নগরিয়া লোক সব করিমু ভিখারী।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী॥

আজেবাজে চোর নয়—চোরচক্রবর্তী নিজে যাচ্ছে তো রীতিমত জানান

দিয়ে কাজে নামবে। রাজাকে চিঠি দিল: তোমার পুরীতে গিয়ে তোলপাড় করব, ক্ষমতা থাকে ঠেকাও।

শাস্ত্রমতে চোরের দেবতা কার্তিকেয় হলেও, বাঙালী চোর মা-কালীকে মানে বেশি। ঠগ-ডাকাতের ইষ্টদেবী তিনি, সেখান থেকে চোরের রাজ্যে এসে পড়েছেন। মা-কালী করেনও খুব চোরের জন্য। চুরিবিদ্যার কায়দাকানুন হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন, পুঁথিপত্রে রয়েছে। কালী আগে আগে পথ দেখিয়ে মক্কেলের বাড়ি পৌঁছে দিলেন, তারও বিবরণ আছে।

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়লু মাতা আইস এই ধাম॥

কালী তখন স্বপ্নে দেখা দিলেন: আছি আমি সহায়, অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

কালীর বরে থরবর চম্পাবতীতে খুশি মতন পাকচক্কোর দিচ্ছে। সওদাগরের বেশ নিয়েছে। গোয়ালিনী ধাপ্পা দিয়ে ভরপেট দই খেয়ে উদগার তুলে সরে পড়ল। নাপিতকে ঠকিয়ে বিনি পয়সায় ক্ষৌরকর্ম করাল। তাঁতিকে ফাঁকি দিয়ে দামি দামি কাপড়-চাদর গাপ করল। পুরীর বাড়ি বাড়ি চুরি—

রাত্রে চুরি করে চোর, দিনে যায় নিদ।
প্রভাতে উঠিয়া দেখ সর্বঘরে সিঁধ॥

সিঁধ সকলের ঘরে, তিন রকমের বাড়ি শুধু বাদ। যাঁরা পণ্ডিত ও বিদ্বান, যাঁদের দানধ্যান আছে আর যাঁরা ভক্ত মানুষ—এমন লোকের বাড়ি চোর কখনো উৎপাত করবে না। চৌর নীতিশাস্ত্রের নিষেধ:

ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিনজন।
ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন॥

এমনি কয়েকটা বাড়ি বাদ দাও। সকালবেলা শয্যা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে পাবে—কি দেখবে? আজেবাজে চোর হলে উপমা দিয়ে বলতাম, দেখবে চম্পাবতী পুরীর সর্বাঙ্গ জুড়ে গলিত ক্ষত। কিন্তু চোর-চক্রবর্তী পাকা হাতের গুণে চম্পাবতীর ঘরে ঘরে রাত্রের মধ্যে যেন ফুল উঠেছে। সিঁধগুলোর বাহার এমনি।

গল্প ছেড়ে সিঁধের প্রসঙ্গ চলল কিছুক্ষণ। জানার গরজ সকলেরই—বলাধিকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেয়। ভাল সিঁধ হল রীতিমত শিল্পকর্ম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয়। বস্তুটা আজকের নয়। হাজার দুয়েক বছর আগেও সাত রকম উৎকৃষ্ট সিঁধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মব্যাকোষ অর্থাৎ

স্ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো সিঁধখানা। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যের মতো গোলাকার। বালচন্দ্র অর্থাৎ কাস্তের আকারের চাঁদের মতো। বাপী অর্থাৎ পুকুরের মতো চৌকোণা। বিস্তীর্ণ কিনা অনেকখানি চওড়া। স্বস্তিকের চেহারার সিঁধ পূর্ণকুম্ভের চেহারার সিঁধ। মোট এই সাত।

সিঁধ মানে সুড়ঙ্গ। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে সগরপুত্রেরা সিঁধ কেটে সরে পড়লেন। কাটতে কাটতে একেবারে পাতাল অবধি! সেই বিশাল সিঁধ সর্বকালের আদর্শ হয়ে আছে। সিঁধ কেটে বিদ্যার ঘরে সুন্দর ঢুকে পড়ল, সে-ও বেশ চমৎকার সিঁধ। এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একখানা উৎকৃষ্ট সিঁধের বিবরণ বেরিয়েছিল। পাঁচিলে গেঁথে তারের জালে ঘিরে লড়াইয়ের বন্দীদের আটক রেখেছে—শাস্ত্রীর দল দিনরাত পাহারায়। ঘরের ভিতর থেকে এরা মাসের পর মাস ইঁদুরের মতন সুড়ঙ্গ কেটে যাচ্ছে। সারা রাত ধরে কাটে, দিনমানে তার উপর বিছানা বিছিয়ে দেয়। শিবিরের ঘেরের মধ্যে চাষবাস হয়—সুড়ঙ্গের মাটি সেই চাষের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে আসে। মাস ছয়েক পরে বাইরে ফুটো বেরিয়ে পড়েছে। ইঁদুরেরই মতন গর্ত দিয়ে তখন ফুড়ফুড় করে পালিয়ে যায়।

জায়গা বিশেষে সিঁধ কাটার কায়দা আলাদা। কার্তিক ঠাকুর নিজেই তার হদিশ দিয়েছেন। ঝামা-ইটের গাঁথনি হলে একখানা করে ইট খসাবে। আমা-ইট হলে কাটবে। দেওয়াল যদি মাটির হয়, জলে ভিজিয়ে নরম করে নেবে। কাঠের দেয়াল হলে উপড়াবে। আজাগোজা সিঁধ হলে হবে না, কাটবার আগে দেয়ালের উপর রীতিমত মাপজোপ করে নেবে যে দেহখানা ঢুকবে তার অনুপাতে। সিঁধকাঠি যেমন, সঙ্গে একগাছি শক্ত সুতোও থাকবে অতি অবশ্য। সুতোর অনেক কাজ। সিঁধের মাপ নেওয়া ঐ তো হল। দরজায় ভিতর থেকে হয়তো খিল দেওয়া আছে—সুতোর মাথায় বড়শির মতো কিছু বেঁধে কোন-এক ফুটো দিয়ে দরজার গায়ে গায়ে দাও নামিয়ে। বড়শি খিলে আটকে আস্তে আস্তে উপর-মুখো টানো। খিল খুলে আসবে ছিপে মাছ গেঁথে ডাঙায় তোলার মতো। মেয়েমানুষের গয়নাও, কাছে না গিয়ে, খুলে আনা যায় এই কায়দায়। আরও আছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে আনাচেকানাচে বসে কাজ—সাপে কাটতে পারে হেন অবস্থায়। ঐ সুতোয় তাগা বেঁধে তখন ওঝার বাড়ি যেতে পারবে। তাই ঘটে গেল চতুর্বেদবিশারদ শর্বিলক যখন সিঁধ কাটতে বসেছে। আঙুলে সাপে না কিসে কামড় দিল। সুতো নিয়ে যায় নি, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান বলে গলায় পৈতে। পৈতে খুলে চট করে আঙুল বেঁধে ফেলল। নাস্তিক অনেকে আজকাল উপবীত ত্যাগ করেন—

কিন্তু উপবীতের শুধু মাত্র এদিক দিয়েও কত দরকার, ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা দেখুন একবার ভেবে।

সিঁধ হয়ে গেল আর অমনি তুমি ঢুকে পড়বে, হেন কর্ম কদাপি নয়। সেকাল একাল—সর্বকালের ওস্তাদের মানা। ভিতরের মানুষ জেগে না ঘুমিয়ে—সেই পরখ সকলের আগে। প্রতিপুরুষ অর্থাৎ নকল মানুষ সিঁধে ঢোকাবে, —চৌরশাস্ত্রের আচার্যেরা বলছেন। ঢুকিয়ে এদিক-সেদিক নাড়বে। চোর ধরবার জন্য কেউ তৈরি থাকে তো অন্ধকারে এঁটে ধরবে সেই বস্তু। বেকুব হবে।

গুরুপদ অবাক হয়ে বলে, আমাদেরও অবিকল সেই জিনিস। লাঠির মাথায় কেলে-হাঁড়ি বসিয়ে সিঁধের মুখে ঢুকিয়ে দিই। সে হাঁড়ি একটুখানি ঢুকে গিয়ে পিছিয়ে আসে, আবার এগোয়। মানুষই যেন মানুষের চুল-ভরা কাল মাথা। হাঁড়ি নির্গোলে বার-কয়েক ঘুরে-ফিরে এলে তারপরে মানুষের যাওয়া।

বলাধিকারী বলেন, শুধু এই একটা কেন, শর্বিলকের অনেক পদ্ধতি আজও হুবহু চলে। ঘরে ঢুকেই সে দরজা খুলে দিল—দরকার হলে স্বচ্ছন্দে পালাতে পারবে। পুরানো দরজা খুলতে গিয়ে আওয়াজ উঠতে পারে, তাই সাবধানে জল ঢেলে জোড়ের মুখ ভিজিয়ে দিল। তোমরা করো না? বলো সে কথা। ঘননীল পোশাক নিয়েছে শর্বিলক। চোরের পোযাক আজও সেই। চারুদত্ত নাটকে দেখা যাচ্ছে 'কাকলী' নামে একরকম মৃদুস্বর যন্ত্র চোরের হাতে। তাই বাজিয়ে সে ভিতরের মানুষের সাড়া নেয়। হাত-কাটা বোষ্টম নামে একজন কেনা মল্লিকের সঙ্গে ঘোরে, বেচারামের সঙ্গেও সে ছিল। একখানা হাতে, আহা-মরি একতারা বাজায়। ঢিল ফেলা, দুয়োর-জানলা নড়ানো এ-সব হল মোটা কাজ। মিষ্টি বাজনায় মক্কেল মানুষটার মন ভরে যায়, জেগে থাকলেও ছুটে বেরিয়ে তাড়া করতে ইচ্ছে করে না। এমনি কত! চোরের পুঁথি এমন একখানা-দুখানা নয়—পুঁথিপত্রে নিয়মও অগুণতি। মিলিয়ে মিলিয়ে আমি দেখাতে পারি, সেই হাজার হাজার বছরের কায়দা-কানুনই মোটামুটি এখনো চলে আসছে।

চোর-চক্রবর্তীর কথা। রাত্রে বাড়ি বাড়ি সিঁধ দিচ্ছে, সকালে উঠে মানুষ-জন অবাক। সকলেরই এক দশা, কে কার জন্য হা-হুতাশ করে!

কিন্তু খরবর তৃপ্ত নয়। আসল মক্কেলই বাকি এখনো—যার নাম করে চম্পাবতী এসেছে। রাজবাড়িতে ঢুকবে এবার। কালীরও কথা পেয়েছে—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি!' অমন জায়গায় চুরির বস্তুটাও নিশ্চয় সকলের বড় হবে—

চোর বলে ধন লইয়া আমি কি করিব।
রানী চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব॥

রাজবাড়ি নিশুতি। রাজা-রানী পাশাপাশি পালঙ্কে শুয়ে, খরবর নিপুণ হাতে রানীকে কাঁধে তুলে নিল। নিয়ে গেল পুরীর প্রান্তে গরিবের ঘরে—ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে দিন চলে তাদের। তারাও ঘুমে বিভোর। সেই ঘরের বউটা তুলে নিয়ে রাজ-রানীকে শুইয়ে দিল সেখানে। বউকে রাজার পালঙ্কে নিয়ে এলো।

হৈ-হৈ পড়ে যায়। ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন, পাশে রানী নেই, কুৎসিত এক প্রেতিনী। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুক করে প্রেত-শান্তি হচ্ছে। আর ওদিকে চিঁড়াকুটি লোকটা দেখছে তার কুঁড়েঘরে স্বর্গ থেকে দেবীর আবির্ভাব। লোকজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে মহা আয়োজনে পূজোর যোগাড় হচ্ছে। খবর পেয়ে রাজাও এসে পড়লেন—

বলে যাচ্ছেন বলাধীকারী। শ্রোতারা হেসে খুন। গল্পের আরও আছে, অনেক সব ঘটনা।

—চোর ধরবে কোটাল, পুরী তোলপাড়। খরবর নাস্তানাবুদ করে সেই কোটালকে। কোটালের মেয়ে লীলাবতীর নতুন বিয়ে হয়েছে, জামাই হয়ে খরবর কোটালের বাড়িতেই উঠল। কোটাল সর্বত্র খুঁজবে নিজের বাড়ি বাদ দিয়ে। খুঁজলেই বা কি—এমন কায়দা-কৌশল, মেয়ে নিজেই তো বর ভুল করে বসে আছে। লোক-লজ্জায় শেষটা কোটালকে দেশান্তরী হতে হল মেয়ে-বউর হাত ধরে। যাকে পায় তাকেই জব্দ করে বেড়াচ্ছে খরবর—'যে কথা শুনিলে লোক হয় তো চতুর।'

ছেলে-ভুলানো কাহিনী, কিন্তু বড়দেরও ভাল লাগে। সর্বসমাজে সব বয়সের মানুষই আসলে ছেলেমানুষ—গল্পের জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। শ্রোতা বুঝে তুমি কেমনভাবে বলবে, সেই হল কথা। হেসে এরা সব লুটোপুটি যাচ্ছে, বড্ড জমেছে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলাধিকারী বলেন, বিশ্বাস হয় না—কেমন?

ঘুমন্ত মানুষ কাঁধে করে এত পথ নিয়ে গেল। দু-দুজন—রাজবাড়ি থেকে একটি, চিঁড়াকুটির বাড়ি থেকে একটি। কেউ কিছু টের পেল না—রাত পোহালেও বহাল মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। যে শুনবে, সেই ঘাড় নাড়বে: এমন কখনো হতে পারে না।

তারপর বলাধিকারী নিজেই বোঝাচ্ছেন, 'রাজার মন্দিরে গিয়ে নিদালি

ভেজাইল'—নিদালির উপরে কাজ হচ্ছে, খেয়াল রেখো। বাড়িতে হাজির হয়েই থরবর সকলের আগে নিদালি করেছে।

সাহেব বলে, নিদালি যত যা-ই করুক, ঘুমই তো মোটের উপর। জেগে না উঠে পারে না। চোরের হাতে মরণকাঠি-জীবনকাঠি থাকলেও না-হয় বুঝতাম। রানীকে কাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে এলো রূপকথার মতন—

বলাধিকারী সহাস্যে বললেন, ঘুম পাড়িয়ে মানুষ-চুরি বিশ্বাস হয় না তোমাদের?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, পুঁথিপত্রে অনেক আজগুবি লেখে।

বলাধিকারী বললেন, সাহেব নতুন কিছু বলছে না—সবাই ঠিক এই বলবে। আমিও বলে বেড়াতাম যদ্দিন না পচা বাইটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, বাইটার মুখে তার কাজকর্মের কথা শুনলাম। বুড়োথুথ্‌রে বাইটা মশাই—কবে আছে, কবে নেই। আমায় খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলেই হয়তো। আমার কাছে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছে, বিশ্বাস করব না।

বংশী অবাক হয়ে বলে, আজ্ঞামশায় মানুষও চুরি করেছে? আমরা তো কই শুনি নি।

দরকার হলে তা-ও সে পারত। কিন্তু মানুষ নিয়ে কী মুনাফা—মানুষের গায়ে যা থাকে, সেইগুলোই শুধু নিয়ে নিত।

হাসেন বলাধিকারী। বললেন, মানুষ-চুরিতে মুনাফা তো নেই-ই, উল্টে নানান ঝামেলা। নিদালির ঘোর এক সময় না এক সময় কাটবে, জেগে উঠে গোলমাল করবে। সেইজন্য ধীরে-সুস্থে নিখুঁতভাবে সর্বাঙ্গ ন্যাড়া করে নিয়ে তারপরে মক্কেল-রমণীটা ফেলে চলে যায়। আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে দেবার মতন। মক্কেলই হতে দেয় তাই। ডানহাতের আঙুলের আংটি মণিবন্ধের চুড়ি-কঙ্কণ, বাহুর অনন্তবেঁকি—সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল তো বাঁ-হাতটা আবেশে এগিয়ে দেবে কারিগরের দিকে।

ভালবেসে—সোহাগ করে? জুত মতন প্রসঙ্গ পেয়ে এইবার নফরকেষ্টর কথা ফুটল। সে খি-খি করে হাসে।

বলাধিকারীও লঘুভাবে বলেন, একটা নিশির নিশিকুটুম্ব—চোখেই তো দেখল না মেয়েটাকে, ভালবাসা জমে কিসে? গরজ তো ভালবাসার নয় যে মাল নগদ-মূল্যে বাজারে চলবে, তাই কেবল হাতড়ে নিচ্ছে। নইলে যা অবস্থা তখন—নাকের খরকেকাঠি খুলে নিচ্ছে, নাক কেটে বোঁচা করে নিলেও সে রমণী আপত্তি করবে না। নিদালির এমনি মহিমা।

নিদালির কথা শোনে সবাই—রাত্তের কুটুমের বড় সহায়। কালের হাওয়ায়

এবং তেমন পাকা ওস্তাদের অভাবে লোকে ইদানীং আস্থা হারাচ্ছে। কিন্তু অতিশয় প্রাচীন পদ্ধতি। বৈদিক আমলেও ছিল—অবস্বাপনিকা। মন্ত্র পড়ে ঘুম পাড়ানো। রেওয়াজটা চলে এখনো—মক্কেলের উঠানে গিয়েই কারিগর আগেভাগে মন্তর পড়ে নেয়। সংস্কৃত নয়, গ্রাম্য-বাংলা কথা। মন্তর পড়ে, বাইটা একদিন শুনিয়েছিল আমায়। গোড়ার এক-আধ লাইন মনেও আছে : নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি, নাকের শোয়াসে তুললাম মঞ্চপের ধূলি—

পড়ে গেলেই হল না, প্রক্রিয়া আছে সেই-সঙ্গে। মঞ্চপ হল মণ্ডপ—ঘর। নাকের শ্বাসে ধুলো টেনে তুলতে হবে। মন্তরের কথা কিংবা প্রক্রিয়ার চেয়ে আমি কিন্তু মনে করি পড়াটাই আসল। বাইটা পড়ল, যেন,বালি-খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে। মুখ-চোখের রকম আলাদা—

হেসে নফরার কথায় জবাব দিলেন : তা-ও না হয় চেষ্টা করতাম, কিন্তু তোমার সামনে সাহস হয় না। এমনিই তো জেগে জেগে ঘুম—নিদালি করলে আর সে-ঘুম তোমার ভাঙানো যাবে না।

সামনের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলাধিকারী আবার বলেন, মক্কেলের উপর মন্তরের কি গুণ, সঠিক আমি বলতে পারব না। কিন্তু যে পড়ে তার বুকে বল জাগে, মনে প্রত্যয় আসে। সেই যে এক পুরানো গল্প—গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রপূত লাঠি পেয়ে গেল, লাঠি মুঠোয় ধরলে মানুষটা অজেয়। এদেশ-সেদেশ বৃত্তান্ত চাউর হয়ে গেল। রোগা লিকলিকে সেই মানুষ পালোয়ানের আখড়ায় হামলা দিয়ে পড়ে—বগলের লাঠি আস্তে আস্তে নিয়ে নিচ্ছে। পালোয়ানের কাকুতি-মিনতি : রক্ষে কর, রক্ষে কর। লাঠি কঠিন মুঠিতে ধরে বেদম পিটছে। অসহায় দুর্বল ভেড়ার মতো মার খেয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। গুরু মরবার সময় অনুতাপের বশে ব্যাপারটা ফাঁস করে গেলেন : মন্তর ভাঁওতা, নিতান্তই সাধারণ লাঠি একটা। সেই লাঠি, সেই মানুষ সবই রইল, কিন্তু গুণ আর খাটে না এর পরে। এ-ও তেমনি। ওস্তাদ কানে দিয়েছে, সেই মন্তর পড়ে কারিগর অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা পেয়ে যায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। কাজের তো অর্ধেক হাসিল এইখানে।

দম নিয়ে বলাধিকারী বলতে লাগলেন, কেন হবে না বলো দিকি, অসম্ভব কিসে ? সম্মোহনের ব্যাপার দেখেছ নিশ্চয়—হিপনটিজম্‌। মানুষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—তারপর যা বলছে, তা-ই সে করে। তেমনি খানিকটা। মন্তর ছাড়াও কত রকমের ব্যবস্থা। আবহাওয়া বুঝে হিসেব করে নিয়েছে—রাতের মধ্যে কোন্‌ সময় ঘুমটা এঁটে আসবে। উঠানে ঢিল ফেলে, জানালায় দরজায় ঘা দিয়ে পরখ করে দেখেছে। নিশ্বাসের শব্দ বুঝে নিয়েছে ঘরের মানুষের।

সিঁধের মুখে প্রতিপুরুষ ঢুকিয়ে দেখেছে। আরও আছে—এক রকমের ডাল-পাতা শুকিয়ে রাখা—ঘরে গিয়ে সেই বস্তু ধূপের মতো জ্বালিয়ে দেবে। মক্কেলের নাকে-মুখে কিছু ধোঁয়া যাওয়া চাই। সেই পাতারই বিড়ি বানানো আছে—কারিগর কাজ করছে, আর বিড়ি টেনে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে মক্কেলের নাকে। এমনি তো শতেক বন্দোবস্ত, কিন্তু সকলের উপরে কারিগরের হাত দুটো। হাত বেতালা চললে সমস্ত বরবাদ। আঙুল বেয়ে আনন্দ যেন চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে মক্কেলের প্রতি রোমকূপে। কতক্ষণ আর যুঝবে হেন অবস্থায়? তখন এমনি গতিক—যা তুমি চাইবে, এমন কি চাওয়ার আগেই, দেবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

ইঙ্গিতময় হাসি হেসে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, এতখানি যদি হল, ছাইভস্ম দেড়খানা গয়না নিয়েই শোধ যাবে কেন?

শিউরে উঠে বলাধিকারী জিব কাটলেন: ছি-ছি, এমন চিন্তা লহমার তার মনে আসবে না। মহাপাতক। নিশিকালী উন্মত্তকালী সহায় থাকবেন না। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে হাতও বেসামাল হবে, ধরা পড়বে কুমার কার্তিকেয়র অভিশাপে।

বলেন, সাধুসন্ন্যাসীরা কামিনীকাঞ্চনে নিস্পৃহ। চোর সে হিসাবে আধা-সন্ন্যাসী। কাঞ্চনই চাই, কিন্তু কামিনী একেবারে পরিত্যাজ্য। যুবতী কামিনীর সঙ্গে চোরে এক শয্যা নিয়েছে—ঘটনার এই অবধি শুনে সতীসাধ্বীরা আশঙ্কিত: কি সর্বনাশ, কী না জানি ঘটে এর পর! বুদ্ধিমানের ঘাড় নড়ে ওঠে: অসম্ভব, এই কখনো হয়! কোন চোরে বাহাদুরির আজগুবি গল্প রটিয়েছে। কিন্তু পচা বাইটার নিজ মুখে শোনা—ঠিক এমনিটাই ঘটেছিল তার হাতে। এখনো আবার ঘটতে পারে—

সাহেব লুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে; পারে তাই ঘটতে?

বলাধিকারী বলেন, বাইটা বলে তাই। বুকের ধুকপুকানিটুকু ধরে রেখেছে নাকি সেই লোভে। ক্ষেত্র পেলে খাঁটি জিনিস কিছু ছাড়বে। মরবার আগে—নিজের ক্ষমতায় আর হবে না, শিষ্য-সাগরেদের খেলা চোখ মেলে দেখে যাবে দু একখানা। বলে বাইটা, আর নিশ্বাস ছাড়ে।

গুরুপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, আর তোমরা বলো স্বার্থপর বুড়ো, কৃপণের জাসু। গুণজ্ঞান নিজের সঙ্গে নিয়ে মরবে। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো যায় না—ক্ষেত্র না জুটলে তাই অবশ্য করতে হবে বাইটাকে।

আজ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নয়, সাহেবের কাছে এসে তুষ্টুরাম ধর্না দিয়ে পড়ল।

সঙ্গে বংশী আর গুরুপদ। তুষ্টু বলে, বলাধিকারীর নেকনজর তোমার উপর, তুমি ধরে পড় সাহেব। খবর আমার সাচ্চা, নইলে এত করে বলতাম না।

গুরুপদ আগুন। আশায় আশায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে সেই থেকে বংশীর অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছে। হাত-পা কোলে করে মানুষ কাঁহাতক ধৈর্য ধরতে পারে! বলে, তোমাদের ভাব বুঝি নে। থলেদার যেন দুনিয়ার উপর নেই। ক্ষুদিরাম খুঁজিয়াল বাদ হল তো জগবন্ধু থলেদারও বাতিল। থলেদার আমি এনে দেবো। কত পড়ে ফ্যা-ফ্যা করছে।

সাহেব আহত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, বলাধিকারী মশায় থলেদার নন—মহাজন।

গুরুপদ আরও ক্ষেপে যায়: খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়ে এখন মহাজন। ব্যাঙাচির লেজ খসে কোলাব্যাঙ। পেটের ক্ষিদে মরে আছে, কাজের আর চাড় নেই। মজাই তো তাই। তামাম মুলুক চুঁড়ে পাহাড়প্রমাণ মাল এনে দিলাম—হিসাবের বেলা থলেদার বলবে, মোটমাট সাড়ে দশ টাকা হল, তোমার ভাগে এই এগারো আনা। কারিগর মরে, থলেদার কেঁপে ওঠে। বুড়ো বয়সে একটু ভগবানের নাম করব—তা কি করি, পেটের দায়ে ছ্যাচড়া কাজে আবার আসতে হল।

তুষ্টু ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে: আমারও ঠিক তাই। ধার-দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে বসে আছি। তাগিদের চোটে ঘেন্না ধরে যায়। বলি, দুত্তোর, সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাওয়া ভাল। বনে গিয়ে ভগবানের নাম করিগে।

খপ করে সে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে: তিলকপুরে আজকেও ঘুরে এলাম। দেখে আরও উতলা হয়েছি। মুফতের পয়সা পেয়ে রাখাল রায় দু-হাতে উড়াচ্ছে। নোনায়-খাওয়া পাঁচিলে মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়েছে, ছাত দিয়ে নাকি জল পড়ে—ছাত খুঁড়ে নতুন করে পেটাচ্ছে। ছাত-পেটানো মুগুরের ঘা আমার বুকেই যেন পড়তে লাগল।

জোয়ানপুরুষ তুষ্টু ডোম বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। বলে, বুঝলে সাহেব, যা-কিছু এক্ষুনি। দেরিতে ভেস্তে যাবে।

বংশী জুড়ে দেয়: বলাধিকারী মশায় একটিবার ঘাড় নেড়ে দিন, মালপত্তর পাদপদ্মে এনে ফেলি।

তুষ্টু আবার বলে, এত বড় ঘা-খানা কপালে নিয়ে ঘুরছি। ঘা বেড়েছে, সমস্ত রাত্রির টাটানি। তাই নিয়ে চলে গেছি রাখাল রায়ের হালচাল দেখতে।

সাহেব কি ভাবছিল। তুষ্টুর দিকে চমকে তাকায়। কপালের একটা পাশ পেঁচিয়ে ন্যাকড়ায় বাঁধা। রাজা যেমন কাত করে মুকুট বসিয়ে যাত্রার আসরে আসে।

সাহেব বলে, তুষ্টু, তোমার কপাল কেমন করে ফাটল, সেটা কিন্তু ভাল করে শোনা হয় নি।

তুষ্টু নিরীহভাবে বলে, বিধাতাপুরুষ ফাটাল।

এমন কথায় হাসি না এসে পারে না। সাহেব বলে, সে কি রে! বিধাতা এসে ইট মারল? সেদিন যে বললে তোমার মনিব-গিন্নি?

কথা সেই একই। ইটখানা বিধাতাপুরুষের, গিন্নির হাত দিয়ে এসে পড়ল।

দার্শনিক মানুষের মতন কথা। হেসে উঠে সাহেব বলে, বিধাতাপুরুষ ত্রিভুবন সৃষ্টি করে বেড়ান, হঠাৎ তিনি নুলো হয়ে গেছেন—ইট মারবার জন্য গিন্নিকে ডাকতে হয়?

তুষ্টু বলে, কার কোন্ ঘরে জন্ম, সেটা তো ষোলআনা বিধাতার এক্তিয়ার। জন্মের দোষে ইট খেতে হয়। মেরেছে মন্দা বউ বটে, কিন্তু আসল মার বিধাতাপুরুষের। ডোমের ঘরে যিনি জন্মটা দিলেন।

ঘটনা শোনা গেল সবিস্তারে। সন্ন্যাসী দত্তের বাড়ি তুষ্টুরাম মাহিন্দার। সন্ন্যাসী মারা গেছে, তার শ্রাদ্ধ। ভিতর-উঠান বাইরের উঠান সাফ-সাফাই হয়েছে। সামিয়ানা খাটানো হবে। কুড়াল নিয়ে তুষ্টু বাঁশঝাড়ে গেছে বাঁশ কেটে আনতে। এনেছেও অনেকগুলো, সকাল থেকে এই করছে। একলা টেনে-হিঁচড়ে ঝাড় থেকে বাঁশ বের করা কত খাটনির কাজ, সে যারা করে তারাই শুধু বুঝবে। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে কষ্টটা বড্ড বেশি লাগছে এখন।

তুষ্টুরাম বসে পড়ল বাঁশঝাড়ের ছায়ায়। নারকেল-খোসার নুড়িতে আগুন ধরিয়ে তামাক সেজে নিয়েছে। তামাক টানছে পা ছড়িয়ে বসে—আর যে যে বাঁশটা ফেলা হয়েছে, কুড়ালের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠকঠক করে বাঁ হাতে ঘা মারছে তার উপর। অর্থাৎ বাড়ি বসে শুনুক তারা, ঝাড়ে গিয়ে তুষ্টু বিষম কাজ করছে। অবিরত বাঁশ কেটে যাচ্ছে। খেটে খেটে লোকটা নাজেহাল হয়ে গেল।

আয়েশ করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এমনি সময়ে বোঁ করে ইট এসে পড়ল কপালে। ঠিক বাঁ চোখটার ওপরে। রক্তের ধারা বয়ে গেল।

মন্দাকিনী স্বামীর শোকে উন্মাদিনীপ্রায়, তা বলে সে রমণী কাজ ভোলবার বান্দা নয়। অনেকক্ষণ থেকে বাঁশ বাড়ি আসছে না—শুধু কুড়ালের আওয়াজ। মনে কেমন সন্দেহ হল, পা টিপে টিপে গেল চলে বাঁশঝাড় অবধি। গিয়ে দেখে তুষ্টুরামের কাণ্ড।

কপালের রক্ত হাতে মোছে তুষ্টু। মুছে মুছে পারা যায় না। ধারায় পড়ছে মুখের উপর দিয়ে। তুষ্টু গরম হয়ে বলে, ইট মারলে কেন ঠাকরুন?

মন্দাকিনী অবিচল কণ্ঠে বলে, কি করব তবে, কি করতে বলিস তুই? হাতে মেরে ছোঁয়াছুঁয়ি করব নাকি রে হারামজাদা? অবেলায় তার পরে চান করে মরি! হবিস্থি করে করে এমনিই আধমরা—এর উপরে নিউমোনিয়া ধরলে তো রক্ষে পাস তোরা সকলে।

শুনতে শুনতে হঠাৎ সাহেব গর্জে উঠল: যাব রে তুষ্টু। কাজ না হোক, গিন্নিকে একবার চোখে দেখতে হবে। সেইজন্যে যাব।

আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল। তুষ্টর হাসির তোড়ে গর্জন জমল না। হেসে হেসে বলছে, যাই বলো, জাতে ছোট হয়ে ভালই আছি। বিধাতাপুরুষকে দোষ দিই না—বেশ ভালই করেছে। সুবিধা কত ছোটজাতের! আমি সকলের ভাত খেতে পারি, আমার কাছে ভাত চেয়ে কেউ খরচার দায়ে ফেলবে না! মজা করে রাঁধা-ভাত খেয়ে বেড়াব, আমায় কেউ রাঁধতে বলবে না। আর এই মারধোরের কথা যদি বলো, মন্দাঠাকরুনের মতো ধড়িবাজ ক-জনা? ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় সন্ন্যাসী দত্তেরও ছিল—কিন্তু সে কেবল মুখেই তড়পাত। ইট মারার বুদ্ধি মাথায় ঢোকে নি তার কোনদিন।

শীতের সন্ধ্যা। জগবন্ধুর উঠানের সামনে জামতলায় চারজনে গোল হয়ে বসেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। সাহেব ডাকে: এক ছিলিম টেনে গরম হইগে চলো।

সাহেব দাওয়ায় থাকে, সেখানে চলল। তামাকের সরঞ্জাম সেখানে। তুষ্টু-রামের সুখের কাহিনী শেষ হয় নি। ফিকফিক করে হাসছে। আগের কথার জের ধরে বলে, ছোঁবে না, ঘরে উঠতেও দেবে না আমাদের। উঃ, জাতে ছোট হয়ে কত রকমে যে রক্ষে হয়েছে! মাহিন্দারি এদ্দিন ধরে, তা ঝাঁট দিতে হয় না, জল আনতে বলে না, বাসন ছুঁতে দেয় না। জলচল নবশাখ হলে মন্দাঠাকরুন ছেড়ে কথা কইত! তেমন মেয়েমানুষই নয়। সমস্ত কাজ চাপান দিত একটা মানুষের ঘাড়ে। এ বেশ দিব্যি ছিলাম—বাইরে বাইরে কাজ, গৃহস্থের চোখের আড়ালে। এক দিনের বাঁশকাটা ধরেছে। সব দিনের সব কাজ ধরতে পারলে ইট তবে একখানা-দুখানা নয়—পুরো একপাঁজা খতম হয়ে যেত।

তিনজনে দাওয়ায় ওঠে, তুষ্টুরাম নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাহেব বলে, কী হল? এক্ষুনি চলে গেলে হবে না। উঠে এসো। আরও শুনতে হবে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

ছাঁচতলায় আরও খানিকটা এগিয়ে এসে তুষ্টু বলে, এইখান থেকে বলছি, দাওয়ায় উঠব কেমন করে?

সাহেব তাকিয়ে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে হল। জাতে ছোট—

সাহেব বলে, ছোট হোক বড় হোক তবু একটা জাতের ছায়ায় আছ তুষ্টু, আমার যে তা-ও নেই। আমার দাওয়ায় উঠতে মানাটা কিসের ?

উঠানে নেমে হাত ধরে হেঁচকা টানে তুষ্টুকে দাওয়ায় এনে তুললে। বলে, পৈঠায় কাঁটা দেওয়া নেই, দেখলে তো? উঠে পড়লে কেউ আটকাতে পারে না।

তামাক সাজতে সাজতে তুষ্টুর দিকে চেয়ে আবার বলে, জাতই নেই মোটে আমার। এক বলতে পারো মানুষজাত। সেদিক দিয়ে অবশ্য সুবিধা। তোমার চেয়েও ঢের সুবিধা আমার—বামুন থেকে মুচি যে-কোন জাতের মধ্যে গরজ মতন ডুব-সাঁতার দিয়ে উঠতে পারি।

হেঁয়ালির মতো কথাবার্তা—জাত-বেজাতের বিরুদ্ধে আজকাল লম্বা লম্বা বচন শোনা যায়, তেমনি কিছু হবে হয়তো। গুরুপদ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কাজের মধ্যে এখন জাতকুল কিসের ? বলি, তুষ্টুর ঘরে আর সাহেবের ঘরে বিয়ের সম্বন্ধে নয় তো! কাজের কথা হোক।

তিন

কাজ তিলকপুরে। সামান্য সাত-আট ক্রোশ পথ। আদ্যপান্ত আবার ভাল করে শোনা গেল। মক্কেল রাখালপতি রায়। বোনাই সন্ন্যাসীপদ মরে যেতে বোন-ভাগনে সঙ্গে করে তিলকপুরে নিজের বাড়ি এনেছে। বোন নিয়ে এসেছে এককাঁড়ি টাকা। খবর খুব পাকা। পারার ব্যাধি আর টাকার গরম মানুষে চেপে রাখতে পারে না, ফুটে বেরোয়। রাখালের আগেকার কথাবার্তা আর এখনকার হাঁকডাক—কানে পড়লেই তফাত ধরা যাবে। আজকেও তুষ্টুরাম তিলকপুরে চলে গিয়েছিল।

এই সন্ন্যাসীপদ লোকটা ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বিশেষ জানা। খলিফা লোক —ভাল বিষয়-আশয়, তার উপরে বন্ধকি কারবার। সোনা-রূপো রেখে টাকা কর্জ দিত। টাকা শোধ করে বন্ধকি কারবার। সোনা-রূপো রেখে টাকা কর্জ দিত। টাকা শোধ করে বন্ধকি মাল ছাড়িয়ে নেবার নিয়ম একটা আছে বটে, কিন্তু সুদ লাফিয়ে লাফিয়ে আসলের ঘাড়ের উপর চড়ে। দেখতে দেখতে মালের দামের দুনো তেদুনো হয়ে যায়। মালিক আর নিতে আসবে কেন ? এমনি সোনা-রূপো অঢেল সন্ন্যাসীর ঘরে।

বয়স হয়েছিল, মন্দাকিনী সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। ভারী সংসার, কিন্তু নিজের ছেলেপুলে নেই। এই এক দুঃখ ছিল সন্ন্যাসীপদর। অনেক কাল দেখে, অনেক টালবাহনা করে বড়বউ বর্তমান থাকতেই রাখালের বোনকে বিয়ে করে আনল। মন্দা-বউ মান রেখেছে বটে—বংশরক্ষার মতো ছেলে হয়েছে একটা এই পক্ষে। অমূল্য। সন্ন্যাসী আর মন্দাকিনীতে বয়সের বিস্তর ফারাক। হাঁপানির অসুখ বেড়ে সন্ন্যাসীর হঠাৎ যায়-যায় অবস্থা। বুড়োবয়সের পেয়ারের বউ বলে মন্দাকিনীকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। ভাইকে বিপদ জানিয়ে কেঁদে-কেটে সে চিঠি লিখল।

বোনের এত বড় বিপদে রাখাল কেমন করে স্থির থাকে? পত্রপাঠমাত্র ছুটল। মন্দাকিনী মাথা-ভাঙাভাঙি করেঃ কী হবে ও দাদা? ও-মানুষ চলে গেলে জগৎ অন্ধকার। কী করব আমি, এ পোড়া সংসারে কেমন করে থাকব? মরব আমিও—এক চিতেয় সহমরণে যাব।

রাখাল হেন পাটোয়ারি পাকা মানুষটারও চোখ বুঝি সজল হয়ে আসে। মন্দাকিনীকে ধরে তুলে চোখ মুছে দেয়ঃ ভেঙে পড়িস নে বোন। অমূল্য রয়েছে—তার মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। এসে যখন পড়েছি, এ অবস্থায় যদ্দূর যা সম্ভব ত্রুটি হবে না।

বড়বউ অর্থাৎ মন্দাকিনীর সতীন শাশুড়ি, জা-জাউলিরা—কুটুম্বর আবির্ভাবে বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে সামনের উপর কেউ নয়—যে কয়েকটা দুয়োর-জানলা, সবগুলোর আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করছে কখনো বা। একটা অতিমৃদু হাসি খেলে যায় রাখালের মুখে। বোনের মাথায় হাত রেখে অভয় দিচ্ছেঃ ভয় কিসের? এমন শাশুড়ি, এমন সব জায়েরা—পর্বতের আড়ালে রয়েছিস তুই। আর আছেন বড়বউ-ঠাকরুন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোন তোরা, দেখে চক্ষু জুড়ায়। আমি পর-অপর বই তো নই—আমি এর মধ্যে থেকে কি করব? বিপদ শুনে এসেছি, একদিন দু-দিন থেকে চলে যাবো।

সন্ন্যাসীপদর ভাইরা সব এসে রাখালের পায়ে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে। রাখাল বলে, চলো ভায়ারা, রোগির ঘরে দেখে আসি। মনে তোমাদের কি হচ্ছে, সে কি আর বুঝিনে! আমার ভাই ছিল না—বোনেদের একটি গেছে, আজও তার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে বুকের মধ্যে চড়চড় করে ওঠে। এক মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ—এ যে কত ব্যথা, যার গেছে সে-ই শুধু বুঝবে।

রোগির উপর ঝুঁকে পড়ে রাখল ডাক দেয়ঃ দত্তজা, চিনতে পার? আমি রাখাল, তিলকপুরের রাখালপতি।

রোগি চোখ মেলে। চোখের মণি বিঘূর্ণিত হচ্ছে। দেখে ভয় করে।

রাখাল পুনরপি বলে: দত্তজা, ঠিকেদারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে এসেছি। তোমার কাছে কবে তারা আসবে? তারিখ বলে দাও।

বাদাবন কাটার ঠিকেদার নিয়োগ হয় এই সময়টা সরকারি তরফ থেকে। সে কাজে টাকার দরকার, ভাল সুদে টাকা ধার করে তারা। টাকাও নিরাপদ। সন্ন্যাসীপদ ইতিপূর্বে রাখালকে ধরেছিল তেমনি কোন কোন ঠিকাদারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে, মুমূর্ষুকে রাখাল মিছামিছি বলল। সন্ন্যাসীপদ সংজ্ঞালাভের এমন মোক্ষম অষুধ আর হয় না। তবু কিন্তু সাড়া নেই। পিটপিট করে একবার চোখ বুজল।

অন্তরালে গিয়ে মন্দাকিনী বলে, কি রকম দেখে এলে দাদা? ফাঁকি দিয়ে ভুলিও না।

রাখাল বলে, বুক বাঁধ রে বোন, নাবালক অমূল্যর ভবিষ্যৎ ভেবে। বিচার-বুদ্ধি হারাসনে। দুনিয়ার উপর কেউ চিরকাল থাকতে আসে নি। দত্তজা বোধহয় চললেন। আমিও একদিন যাব, যাবে সকলেই।

সন্ন্যাসীপদর সোহাগিনী বউ—সংসারের চাবিকাঠি মন্দাকিনীর আঁচলে বাঁধা। সেই জন্য বাড়িসুদ্ধ সকলের রাগ! কিন্তু সে রাগ মনে মনে চাপা আছে —সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রে যতক্ষণ শ্বাস বইছে, মন্দার কেউ কিছু করতে পারবে না। শ্বাস বন্ধ হলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

গলা অত্যন্ত নামিয়ে রাখাল বলে, কপাল সত্যিই যখন পুড়ছে, আমি বলি কি, এখন অবধি তোর মুঠোয় সংসার—ভালমন্দ সাধ মিটিয়ে খেয়ে নে যে ক'টা দিন হাতে পাস, দু-দুটো পুকুর মাছে ঠাসা—জেলে ডেকে জাল নামিয়ে দে, ভারী ভারী রুই-কাতলা তুলে ফেলুক, ছ্যাচঁড়া-মুড়িঘণ্ট, কালিয়া-কোপ্তা জন্মের মত খেয়ে নে।

তাই চলল। কুটুম্ব বড়ভাই এসেছে—জেলেরা দুই পুকুরে জাল নিয়ে পড়ল। তার উপর রোজ রাত্রে একটা করে পাঁঠার ঘাড়ে কোপ পড়ছে। সন্ন্যাসীর সেজ ভাই স্ত্রীর কাছে রাগে রাগে টিপ্পনী কাটে: কায়দায় পেয়ে দেদার খেয়ে নিচ্ছে। মোটা পয়সা মারবে বলে এদ্দিন ধরে বড়দা মাছ পুষে রেখেছে, পুকুরে কাপড় ছাঁকনাও দিতে দেয় না—সেরে যদিও ওঠে টের পাবে তখন। মাছ তোলার মজা বেরিয়ে যাবে। উঠবেই বড়দা সেরে, ওকে নিয়ে যাবে যমরাজের এতখানি তাগত নেই।

সেরে উঠবার কিন্তু কোন লক্ষণ নেই। অনেকবার পিছলে বেরিয়ে এসেছে, এবারে যমরাজ দৃঢ়সংকল্প। ডাক্তার-কবিরাজ জবাব দিয়ে গেল। ভাইরা তবু

ভ্রূক্ষেপ করে না : অমন তো কতবার জবাব দিয়েছে। বিনিঅষুধেই তারপর খাড়া হয়ে উঠল। একবার তো চিতার খরচার জন্য আমগাছ কেটে চেলা করে ফেলা হল। সেরে উঠে সেই গাছ কাটা নিয়ে ধুন্দুমার। হাতে মারতে কেবল বাকি রেখেছিল আমাদের।

অতএব শাশুড়ি সতীন দেওর ও জা-জাউলিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। রোগির ঘরে একা মন্দাকিনী। আট বছরের ছেলে অমূল্য মামা রাখালের সঙ্গে শুচ্ছে কয়েকটা দিন।

নিশিরাত্রে মন্দাকিনী এসে গায়ে ঝাঁকি দেয় : ওঠো, দেখে যাও দাদা কি রকম করছে। ভয় করছে বড্ড আমার।

রাখাল ঘরে গিয়ে এক নজর দেখেই বলে শ্বাস উঠেছে।

মন্দাকিনী হাউহাউ করে কাঁদে, ও দাদা কী হবে আমার।

সন্ন্যাসীপদর খাটের খুরোয় মাথা কুটছে। ধরে ফেলে রাখাল খিঁচিয়ে ওঠে : আচ্ছা হাঁদা মেয়েমানুষ তো তুই। এমন করে লাভটা কি শুনি? যে মানুষ চলে যাচ্ছে তারই শুধু মন খারাপ করে দেওয়া। মাথা কুটলে যম ছেড়ে যাবে না তোরই কপাল ফুটো হবে।

কানে কানে ফিসফিস করে উপদেশ ছাড়ল : সিঁদুর-পরা মাছ-খাওয়া ঘুচে গেল, তা হলেও বেঁচে থাকতে হবে। তার উপরে অমূল্য—মায়ে-পোয়ে অন্তত চাট্টি ডাল-ভাত খেয়েও যাতে বাঁচতে পারিস সেই উপায় করে নে। গোড়ার দিনে আমায় বলেছিলি, পোড়া-সংসারে কেমন করে থাকব—বড় খাঁটি কথা। শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা যা এক-একখানা চিজ—দত্তজা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। এক্ষুনি একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারিস, তবে রক্ষে।

চতুর্দিকে আর একবার দেখে নিয়ে রাখাল ইঙ্গিতে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়। বলে, যদ্দুর যা পেরে উঠিস, গুছিয়ে নে। এক্ষুনি—এই একটা ফাঁক পেয়েছিস। মায়েপোয়ে চিরকাল তা হলে ডাঁটের উপর থাকবি—এখন যেমনধারা আছিস। কাঁদবার অনেক সময় পাবি বোন, গোছগাছ সারা করে ধীরে-সুস্থে এর পরে যত খুশি কাঁদিস।

স্বামীর বিছানার পাশে মন্দাকিনী বড় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। ভাইয়ের পাকা বুদ্ধির কথায় সম্বিত পেয়ে সন্ন্যাসীপদর কোমরের ঘুনসিতে হাত চালিয়ে চাবি খুলে নিল। এই খাটেরই শিয়রের খানিকটা অংশে সিন্দুক বানানো, বড় তালা ঝুলছে। সন্ন্যাসীপদ সিন্দুক চেপে বরাবর শুয়ে আসছে—তালা খুললেও ডালা তুলবার উপায় নেই। কিন্তু আজকে হাঙ্গামা নেই—ঘরের ভিতরের ছাতা-লাঠি-লণ্ঠনের মতোই অচেতন মানুষটি। ঠেলে দিল তাকে এক পাশে। সন্তর্পণে

ডালা তুলে হাতড়ে হাতড়ে পাওয়া যায়—নগদ টাকা এমন কিছু নয়, সোনা-রুপো বেশি। সন্ন্যাসীপদ সোনা-রুপো কিনে সঞ্চয় করত, কাগজের নোট বিশ্বাস করত না।

রাখাল বলল, তোর এখন মাথার ঠিক নেই মন্দা। আমার কাছে দে ওগুলো, সেরে সামলে রেখে আসি।

কিন্তু দেখা গেল, শোকাচ্ছন্ন হলেও মন্দাকিনী কিছুমাত্র হুঁশ হারায় নি। বলে, কুটুম্ববাড়ি তো খালি-হাতে এসেছ, তুমি কোথায় রাখবে দাদা? যতক্ষণ মানুষটার ধড়ে প্রাণ আছে, ওর জিনিস আমি ঘরছাড়া হতে দেবো না। জিনিস এই ঘরের মধ্যেই থাকবে। এত বাক্সপেঁটরা আমার—তারই কোন একখানে কাপড়চোপড়ের মধ্যে গুঁজে রেখে দেবো।

এর উপরে কি বলবে আর রাখাল! একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, সেই মুখে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি ভাল দেখায় না। মাল সরিয়ে মন্দাকিনী নিজের একটা পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর রাখল। রেখে যথারীতি খাটের সিন্দুকের তালা এঁটে সন্ন্যাসীপদকে পূর্বস্থানে সরিয়ে কোমরের ঘুনসিতে চাবি যেমন ছিল পরিয়ে দিল আবার।

সন্ন্যাসীপদ মারা গেল সে রাত্রে নয়, পরের দিনও নয়, তার পরের দিন। সবক্ষণ অবিরত শ্বাস টেনেছে। যমরাজ চোখের সামনে দেখা দেন না, মানুষের প্রাণবায়ুও অদৃশ্য। তবু সুনিশ্চিত এই কদ্দিন উভয়পক্ষে টানাটানি চলেছে। এবং যমই জিতলেন এবারে। মরা স্বামীর পায়ের উপর মন্দাকিনী আছাড় খেয়ে পড়ে। পাড়ার মেয়েছেলেরা ধরে তুলে এক-একবার বসিয়ে দেয়, ধড়াস করে পড়ে গিয়ে আবার মাথা কোটে। সখেদে সকলে মুখ-তাকাতাকি করে: সতীসাধ্বী স্বামী-শোক সামলে উঠতে পারবে না। মরব মরব ইদানীং তো বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওকেও আবার ক'দিনের মধ্যে চিতায় তুলতে হয় কিনা দেখ তাই।

এবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতের কোমর থেকে চাবি খুলে সর্বসমক্ষে খাটের সিন্দুক ও বড় ছাপবাক্স খুলে ফেলা—সন্ন্যাসীপদ যার মধ্যে যাবতীয় গয়না-টাকা ও হিসাবপত্র রাখত। মন্দাকিনীর প্রায় অচেতন অবস্থা, ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে উঠছে—তাকে এদিকে আনা গেল না। কান্নার মধ্যেই একবার বলে, আসল মানুষটা ফাঁকি দিয়ে গেছে—উচ্ছিষ্ট ছাইভস্ম কি পড়ে আছে, আমি তা দেখতে যাব না। চোখ মেলে দেখতে পারব না। দেখুকগে গরজ যাদের।

পাড়ার গিন্নি-বউ মন্দাকিনীর দশা দেখে চোখ মোছে। সিন্দুক খুলে ওদিকে শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা গালে হাত দিয়ে বসেছে। ঝিমিয়ে ছিল

মন্দাকিনী—হঠাৎ কিছু চাঙ্গা হয়ে মাথা-ভাঙাভাঙি লাগিয়েছে আবার, পাড়ার সকলে থামাতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে তাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।

শোকের অবস্থা চলল একনাগাড়ে মাসাবধি। বোনের অবস্থা দেখে রাখালও চলে যেতে পারেনি। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর সন্ন্যাসীর মাকে বলল, মন্দা বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে—দেখতে পাচ্ছেন মা। অনুমতি দেন তো সঙ্গে করে আমি তিলকপুর নিয়ে যাই। দিনকতক রেখে খানিকটা তাউত করে আবার রেখে যাব।

শাশুড়ি তিক্তকণ্ঠে বলে, রেখে যাবে আবার কেন? এত পয়সাকড়ি—সন্ন্যাসী দেখছি সবই ফুঁকে দিয়ে গেছে। খাবে কি এখানে পড়ে থেকে? বোন-ভাগনে সঙ্গে করে নিয়ে যাও তুমি। চিরকাল ধরে তাউত করগে, কোনদিন এমুখো যেন না হয়।

রসিয়ে রসিয়ে তুষ্টু সবিস্তারে বলে যাচ্ছে। একজন মানুষ মারা গেল, কত বড় দুঃখের ব্যাপার—কিন্তু বলার ভঙ্গীতে শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি খায়। সাহেব বলে ওঠে, খাসা গল্প বানাতে পারো তুমি তুষ্টু। বলছ এমনভাবে, যেন নিজে হাজির থেকে চোখের উপর সব দেখেছ। কথাবার্তার খুঁটিনাটি কানে শুনে মুখস্থ করে এসেছ।

বংশী বলে, চোখে দেখা বইকি! সন্ন্যাসীপদর শ্রাদ্ধ অবধি সে বাড়ির মাহিন্দার ছিল। শ্রাদ্ধের সময়ের দাগ ঐ চোখের উপর রয়েছে।

তুষ্টুরাম বলে, কানেও প্রায় সমস্ত শোনা। মাহিন্দারি কাজটা তো খতম হয়ে গেল। নতুন মরশুমের বিস্তর বাকি, ঘরে বসে বসে কি করব? দিনরাত তক্কেতক্কে থাকতাম, ছুটো কাজ একটানা গুছিয়ে তোলা যায় যদি। ষোলআনা গুছিয়ে এসে তবেই না খোসামুদি করে বেড়াচ্ছি!

শেষ পর্যন্ত জগবন্ধু নিমরাজি হলেন: কী করা যায়। তেজি ঘোড়া বেঁধে রাখলে অবিরত পা ঠোকে। সাহেবের ঠিক সেই ব্যাপার। নানারকম চমকদার কাজের গল্প শুনে শুনে তার ধৈর্য থাকে না, একখানা করে সে দেখাবেই। তার উপরে উপসর্গ—গুরুপদকে লোভ দেখিয়ে এনে হাজির করেছে। নানান ছুতোয় আমার সঙ্গে সে ঝগড়া বাধায়, ঝগড়া করে শক্ত শক্ত কথা বলে গায়ের ঝাল মেটায়। যাও তোমরা, দেখাই যাক কি করে এসো। এইটুকু বলতে পারি, তুষ্টুরামের খবরে ভুল নেই।—

তুষ্টুরাম আনন্দে থই পায় না। বলাধিকারী তবে নির্বিকারী ছিলেন না। অন্য সূত্রেও খবরবাদ নিয়েছেন। খোঁজদারির প্রশংসা অমন মানুষটার মুখে!

বলাধিকারী বলেন, কোরবান শেখ রাখাল রায়ের বাড়ির নগদি। তার কাছে আলাদাভাবে শুনে নিলাম। খুঁটিনাটি তেমন না হলেও মোটের উপর একই বস্তু পাওয়া গেল। রাখালের বাড়ি মন্দাকিনীর গুরুঠাকুরের অধিক আদরযত্ন। সে যত্ন খালি-হাতের মানুষকে কেউ দেয় না—বোন না হয়ে গর্ভধারিণী মা হলেও না। কোরবানকেও একটু বখরা দিতে হবে কিন্তু। সামান্য—ধরো, আধ পয়সার মতো।

দু-তরফের পাকা খবরের পর ইতস্তত কিসের? কাজে ঝাঁ দেবার জন্য সকলে পাগল। সাত-আট ক্রোশ পথ হয়তো দুপুর নাগাদ বেরিয়ে সন্ধ্যা হতে হতেই গাঁয়ে গিয়ে উঠবে। তিথিটা চমৎকার, কৃষ্ণপক্ষের শেষ—সঙ্গে সঙ্গেই কাজের আরম্ভ, চুপচাপ সময়ক্ষেপ করতে হবে না। বহু রকমের সে কাজ—সকলের আগে বাড়ি-ঘরদোর বাড়ির মানুষজন জীবজন্তু পাকচক্কোর দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরখ করে নেওয়া। এই সবেই সময় যায়—গৌরচন্দ্রিকায় খুঁত না থাকলে আসল কাজে এক দণ্ডের বেশি লাগে না।

কাজে কবে বেরুচ্ছি, বলে দিন এবারে বলাধিকারী মশায়।

বলাধিকারী সহাস্যে বলেন, খবর তো আনলি তুষ্টু, গাঁয়ের মধ্যে দু-দুটো বন্দুক সে খবর কিন্তু জানিস নে।

বংশী চমৎকৃত হয়ে গুরুপদর গায়ে ঠেলা দেয়: বোঝ

দৃষ্টি কত দিকে বলাধিকারীর! এই সব গুণেই মানুষটা এত বড়, সকলে এমন মান্য করে।

বলাধিকারী বংশীর ভাব লক্ষ্য করেছেন। বলেন, কিছু না, কিছু না। এ হল যেমন দাবাখেলার উপর-চাল। খেলুড়ের নজর গেছে গেছে, কিন্তু পাশে যে লোক দেখছে হঠাৎ সে একখানা মোক্ষম চাল বলে দিল। কাঁচা মানুষ তোমরা প্রায় সবাই। সাহেব আনকোরা নতুন। তুষ্টুরাম যা করে, সেটা বলা যায় বমাল-বওয়া মুটের কাজ। গুরুপদ বয়সে বেড়েছে, কিন্তু হাতও পেকেছে এমন কথা কেউ বলবে না। বংশীকে তার আজামশায় কেবল তো কুকুর-ডাক, শেয়াল ডাকই শেখান। গাঁয়ে বন্দুক থাকতে সেখানে তোমাদের না ওঠাই ভাল।

চৌকিদারের কাছে একটা বন্দুক, আর চকদার অবিনাশ সামন্ত সম্প্রতি লাইসেন্স করে বন্দুক কিনে এনেছেন। অবিনাশের জন্য কিছু নয়, জগবন্ধুর সঙ্গে দহরম-মহরম আছে ভদ্রলোকের। ভাবনা চৌকিদারের সরকারি বন্দুকটা নিয়ে।

বলেন, দারোগার হলে কিছুই ভাবতাম না। অধমের গরিবখানায় তাঁদের সদাসর্বদা চরণ পড়ে। ক্ষমতা ধরেন তাঁরা, বন্দোবস্তেও তাই সহজে আনা যায়। একটা বখরার ওয়াস্তা—কোরবান শেখের মতো। বন্দুক তখন বুকের সামনে

উঁচিয়ে ধরেও দেওড় করবে না। চৌকিদারের সামান্য চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা নেই —বুকে তাই বল পায় না, ধর্য-ধর্য করে মরে।

ভেবেচিন্তে অবশেষে চৌকিদারের বন্দুকের ব্যবস্থাও হল। ঐ অবিনাশকে দিয়ে। অবিনাশের এক খুড়ো হলেন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—যত চৌকিদারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অবিনাশের তখনও বন্দুকের লাইসেন্স হয় নি—মনে পড়ল, চৌকিদারের বন্দুক নিয়ে খুড়ো-ভাইপোকে একদিন জামলার বিলে পাখি মারতে দেখেছিলেন। এখনই বা কেন তাই হবে না?

চিঠি লিখে জগবন্ধু বংশীর হাতে দিলেন: তিলকপুর তুমি একটিবার ঘুরে এসো। জামলার বিলে খুব কাঁকপাখি পড়ছে। সামন্তদের খুড়ো-ভাইপোকে নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছি। সমস্ত দিন শিকার হবে রাত্রে ফিস্টি আমার এখানে মক্কেলের বাড়িখানা তুমিও একটাবার দেখে এসো।

কায়দায় পেয়ে বংশী গুরুপদকে বলে নেয়, নিন্দে করছিলে যে বড়! কারিগর মেরে টাকা করে—সে মহাজন আর যেই হোক বলাধিকারী মশায় নয়। বলি, এত বড় একটা ফিস্টি তো মাংনা হচ্ছে না—ক্ষেতের ফসল কোথায় কি, মবলগ খরচা করে বসে রইলেন। হুঁশ করে নিজে থেকেই করছেন এত সব। কাজের কী দরাজ ব্যবস্থা বুঝে নাও, কাজের মুখে তখন আর টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না।

গুরুপদও প্রসন্ন মুখে বলে, বন্দুক হাতানোর বুদ্ধিটা বেড়ে হয়েছে। একবার কী গেরো! সোনাদানায় মিছরি সর্দারের বাড়ি কাজে গিয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পড়ে গেলাম! মনে পড়লে গা কাঁপে এখনো। শিকার-টিকার বুঝিনে বাবা—ফুল্‌হাটায় বন্দুক এসে পৌছল, সেইটে চোখে দেখে তবে পা বাড়াব।

অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা ধরেন বলাধিকারী। সেটা অবশ্য এই নতুন দেখা যাচ্ছে না। মাঝে একটা দিন বাদ দিয়ে অবিনাশ সামন্ত পাখি-শিকারে এসে পড়ল। পিছু পিছু চৌকিদার। বিলের এত জলকাদা ভাঙা একটামাত্র বন্দুকের লভ্যে পোষায় না। প্রবীণ প্রেসিডেন্ট মশায় কষ্টের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন, তাঁর অনুমতি আদায় করে অবিনাশ চৌকিদারকে সঙ্গে এনেছে।

দুপুর না হতেই ওঁরা নেমে পড়লেন জামলার বিলে, কালী-কপালিনীর নাম স্মরণ করে এরা চলল তিলকপুরের দিকে। যাবার আগে বলাধিকারীর সঙ্গে এক জায়গায় হয়েছে, কাজের ছকটাও মোটামুটি তিনি বেঁধে দিচ্ছেন।

নফরকেষ্ট রোখ ধরে: আমি যাব কিন্তু। আমায় বাদ দিলে হবে না।

বলাধিকারী দরাজ অনুমতি দিলেন: যাবেই তো। না বলছে কে? এ

তল্লাটে একেবারে নতুন তুমি। কেউ চেনে না। তোমায় না, সাহেবকেও না। কাজের পক্ষে সেটা বড় ভাল। ঠিক এই লাইনের না-ও যদি হও, আনাড়ি লোক নও তুমি। রেল-গাড়িতে তোমার পালানোর কায়দা দেখে বুঝেছি। তবে আর কি—পাঁচজন হলে, পঞ্চপাণ্ডব মিলেমিশে দল গেঁথে নাও এবারে।

নিতান্তই ছুটো কাজ। এবং দল নয়—দল অনেক বড় জিনিস, বিস্তর বিচার-ব্যবস্থা ও আয়োজন তার জন্য। পাঁচটি প্রাণীর সঙ্কীর্ণ সামান্য দল একটু। কিন্তু সামান্য হলেও কাজের বিভাগ বড় দলেরই মতন। দলের মাতব্বর চাই একজন। গুরুপদ পুরানো লোক—ক্যাপ্তেন বল সর্দার বল তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল, তার কথার উপর সকলে চলবে। শিয়াল-ডাক কুকুর-ডাক বিড়াল ডাক নানান ডাকের ওস্তাদ বংশী পাহারাদার হলে উচিত হবে। তুষ্টু তো খোঁজদার আছেই। নফরকেষ্ট যখন যাচ্ছে, সে হল ডেপুটি। বাকি রইল সাহেব —নতুন হলেও হেলাফেলার লোক নয় সে। জমাদার বলে পদ আছে, কাজের সঠিক সংজ্ঞা নেই। কোন কাপ্তেন বলে, সে পদ সর্দারেরও উপরে। আবার কেউ বলে নিচে।

ভেবেচিন্তে বলাধিকারী রায় দিলেন: এ কাজের জমাদার হলে তুমি সাহেব।

এই ভরা মরসুমে সরঞ্জাম সমস্ত বাইরে, কাঠি দুখানার বেশি জোটানো গেল না। একটা ফলা ত্রিকোণ—মাটির দেয়াল কাটা যায়। আর একটার মাথা চতুর্ভুজের মতো, পাকা দেয়াল খুঁড়তে লাগে। কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে সর্দার গুরুপদ দু-রকমের কাঠি বেঁধে নিল। কাঠি নেবার কায়দা এই। লোকের নজরে পড়ে না। হালকা জিনিস বলে হাঁটা এবং প্রয়োজন হলে দৌড়ানোর কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

আর খুঁজেপেতে নফরকেষ্ট আবিষ্কার করল খাপসুদ্ধ ছোরা একখানা। ভোঁতা মরচে-ধরা জিনিস। নফরা বলে, তাই সই। আসল সাপ না-ই হল, বেতের সাপ দেখিয়ে কাজ হবে। খুনে লোকের চেহারাখানা আছে, যা হাতে ধরব তাই অস্তোর।

এখন একসঙ্গে বেরুচ্ছে—রাস্তায় পড়েই আগুপিছু হবে, এপথ-সেপথ ধরবে। কাজের তাই নিয়ম। কারো নজরে না আসে, সন্দেহের আঁচটুকু না পড়ে দলের উপর।

সত্যিই বেরুল তবে। এখন যা করেন কালী করালী। জীবনের প্রথম কাজের মুখে সাহেব একমনে কালী-নাম করছে। চোর-চক্রবর্তীর পুঁথিতে যে কালী-বন্দনা:

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম—
চরণে পড়িলাম মাতা, আইস এই ধাম

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য রান্নাঘরে ফিষ্টির আয়োজনে ব্যস্ত। শৌখিন রান্না কাজলীবালাকে দিয়ে হবে না। কোটনা-কোটা বাটনা-বাটা ইত্যাদি আগের কাজগুলো করিয়ে রাখছে এখন। মালমশলা এসে পড়লে পৈতে কোমরে গুঁজে নিজ হাতে খুন্তি নিয়ে পড়বে। নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। অথচ কী আশ্চর্য ব্যাপার—টনক নড়ে গেছে ঘরের ভিতর থেকেই। ছুটতে ছুটতে ঠিক সময়টিতে তেমাথার পথ আটকে দাঁড়ায়।

শুনে যাও ও সর্দার, আমারও একটা বখরা রইল কিন্তু।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার দাবি জানিয়ে যাচ্ছি জমাদার। বলাধিকারী মশায়কে বাতলে দিও। কারিগরের সুপারিশ না হলে মহাজনের বখরা বসানোর এক্তিয়ার নেই।

সর্দার গুরুপদ খিঁচিয়ে ওঠে: কোন কাজটা করলে তুমি, কিসের বখরা? বেহদ্দ খোশামুদি করেছি, তখন রা কাড়লে না। লজ্জা করে না বলতে?

সমান তেজে ক্ষুদিরামও কলহ করে: বৈঠকখানার ফরাস ছেড়ে রান্নাঘরে উনুনের মুখে বসেছি—কিসের জন্য শুনি?—আমার পিতৃকুল উদ্ধার হবে বলে? এটাও দলের কাজ।

এই এক ব্যাপার। মাংনা কেউ কুটোগাছটি নাড়বে না—কম হোক বেশি হোক বখরা আছে সকলের। কাজ অনুযায়ী রকমারি হিসাব! মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু অলিখিত আইন অনুযায়ী নির্গোলে ন্যায্য বখরা মিটিয়ে দিতে বলাধিকারীই শুধু পারেন। করে আসছেন বরাবর।

জামলার বিলের দুর্গম কাদায় বলাধিকারী সারাক্ষণ শিকারী দুজনের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। হল খারাপ নয়। কাঁকপাখিই গণ্ডা দুয়েক—ছোটখাট জিনিষও কিছু পড়েছে। বেলা পড়ে আসতে বিল থেকে উঠে বাসায় ফিরলেন। চৌকিদার কিছু জরুরি কাজ সেরে ভিন্ন পথে অনেক পরে এসে পৌঁছল। থানা অবধি চলে গিয়েছিল সে – কয়েকটা ভাল পাখি থানার বড়বাবু ছোটবাবুকে ভেট দিয়ে এসেছে। ফিরবার সময় অমনি দুটো বোতল গঞ্জ থেকে কিনে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে এল। থাকা বলাধিকারীর—রাত্রে পক্ষি-মাংসের ফিষ্টি—ফিষ্টির কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

স্ফূর্তির আসর সন্ধ্যে থেকে। বাইরের আরও দু-চারটি জোটানো হয়েছে। হারমোনিয়াম ও ডুগিতবলা এসেছে, গাওনা-বাজনা হবে। বাড়তি লোকের

দরকার অতএব চৌকিদার গঞ্জের আবগারি দোকানে বসেই কিছু করে এসেছে কিনা কে জানে। শৈশবে কিছুদিন যাত্রার দলে ঘুরেছে, সখীর গান হঠাৎ স্মরণে এসে গেল। শুঁক-শুঁক করে বারকয়েক নাক সিঁটকে বলে, জুত হচ্ছে না। বলি, ঘুঙুর-টুঙুর আছে? নেই তো বয়ে গেল,—কুচ পরোয়া নেই।

ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল চেপে ঘুঙুরের মতো খানিকটা আওয়াজ বের করে, আর নাচে।

মাঠ পার হয়ে তিলকপুর গাঁয়ে পা দিয়েই বড় বড় তিন তেঁতুলগাছ। যে পথেই যাও, ঐ জায়গার নিরিখ থাকল। তেঁতুলতলায় সবাই হাজির হবে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের মানুষটাও চিনে নেওয়া মুশকিল। তুষ্টুর অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। খোঁজদার মানুষ—মক্কেলের বাড়ি অন্তত একটা পাক দিয়ে তবে আসবে এখানে, মক্কেলের শেষ খবর এনে দেবে। কাজের ঠিক আগে, একটু সাজ-গোজের ব্যাপারও আছে—সে খানিকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতন। ছুটো কাজ বলে কাড়াকাড়ি নেই তেমন—রীতরক্ষা কোন প্রকারে। সমস্ত সমাধা করে তৈরী হয়ে আছে। ঘোড়দৌড়ের আগে ঘোড়ার যেমন চনমনে ভাব সেই অবস্থা।

এসেছে তুষ্টুরাম। ঝাঁকবাঁধা প্রশ্ন—তূণ থেকে যেন তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছে। সর্দারের দায়িত্ব প্রশ্ন করা এবং উত্তর আদায় করে নেওয়া।

বাড়ির লোক গণে এসেছ আবার? ক জন মোটমাট? মেয়ে কত, বেটাছেলে কত, বাচ্চা কত? অতিথি-কুটুম্ব এলো কেউ বাড়িতে? বাড়ির লোক বাইরে পড়ে নেই? গুরুতর রকমের রোগপীড়ে হয়নি কারও?

না, কিছুই নয় সেসব। যেমনটি দেখে এসেছিল, আজকেও অবিকল তাই। খাওয়া-দাওয়া সেরে কতক শুয়ে পড়েছে। বাড়ির কর্তা রাখাল হুঁকো টানতে টানতে গোয়ালের গরুবাছুর তদারক করছে, ফুলেবাছুর আটকানো হয়নি বলে ধমকাচ্ছে বড়ছেলে নিশির উপর। এই অবস্থায় দেখে এসেছে তুষ্টুরাম। আরও তো কতক্ষণ গেল—শুয়ে পড়েছে। টিপিটিপি এগুলো উচিত এইবারে।

তেঁতুলতলা থেকে বেরিয়ে পড়ে পাঁচটা প্রাণী।

নীতিনিয়ম কয়েকটা শুনে রাখবেন নাকি সুবুদ্ধি পাঠক? ভবসংসার বড্ড কঠিন ঠাঁই—কখন কোন্ পথ ধরতে হয়, কেউ বলতে পারে না। শুনুন। রোগী থাকলে সে বাড়ি কদাপি ঢুকবেন না। গুরুর নিষেধ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকর্মে যেমন চৌরকর্মেও ঠিক তেমনি গুরু ধরতে হয়। গুরু বলুন, অথবা ওস্তাদ।

গুরুর কৃপা ভিন্ন বড় কিছু হওয়া যায় না। বহুদর্শী গুরু পইপই করে মানা করেন রোগির বাড়ি ঢুকতে। ডাক্তার-কবিরাজের আনাগোনা—হয়তো বা বাড়ির লোকে বুক ছেড়ে কেঁদে উঠল, হায়-হায় করে পাড়াপড়শি ছুটে আসবে, চোর আপনি বেড়াজালে আটক পড়ে যাবেন তখন। ভ্রষ্টা মেয়ে যে বাড়ি সেখানেও যাবেন না। প্রেমিকরা নিশিরাত্রে আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। সাতচোরের এক চোর—সিঁধেল-চোর কোন ছার তাদের কাছে! লম্পট ছেলে-ছোকরা থাকলে সেখানেও না—রাতের মধ্যে সেই ছোঁড়া এক সময় না এক সময় স্রুট করে বেরিয়ে পড়বে। প্রেমের দাপটে সাপ-বাঘের ভয় ঘুচে যায়—বিল্বমঙ্গলের পবিত্র কথা যাঁদেব জানা আছে, সহজে তাঁরা বুঝবেন। এমন মক্কেলের ঘরে ঢুকে কারিগরের পক্ষে স্থির মনে কাজকর্ম অসম্ভব। বিস্তর ধৈর্য ও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন এক-একখানা কাজ নামাতে। এতই যদি সোজা হত, লোকে চাকরিবাকরি অথবা ব্যাপারবাণিজ্যের ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সিঁধকাঠি নিয়ে সরাসরি লক্ষ্মীঠাকরুনকে হরণের পথ ধরত।

নেই তো তুষ্টুরাম এমনিধারা হাঙ্গামা? খুঁটিয়ে দেখে এসেছে—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে বলছ?

চার

তুষ্টুরাম আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ গ্রামপথ। রাখাল রায়ের বাড়ির সামনে এসে গেল। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। খবর ঠিকই দিয়েছে—পাঁচিলের গায়ে ভারা-বাঁধা। আজকেও বোধ হয় কাজ করে গেছে, ভারার এদিকে-ওদিকে ইটের টুকরো ছড়ানো।

পাঁচিলের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা খুলে ভিতর-উঠানে ঢুকতে হবে। বিধি হল, টিপিটিপি একজন পাঁচিল বেয়ে উঠে ওপাশে নেমে পড়ে খিল খুলে দেবে। ভারা-বাঁধা অবস্থায় পাঁচিলে ওঠার কাজটাও সহজ হয়েছে।

প্রাচীন চৌরশাস্ত্রে এক রকম পাতার কথা রয়েছে, পাতা ছুঁয়ে চোরে দরজা খুলত। আর এক রকম মায়ামন্ত্র—কৃষ্ণাক্ষর নামে শাস্ত্রে বিদিত—পাঠমাত্রেই দরজা আপনি হাঁ হয়ে যাবে, আঙুল ঠেকাবারও প্রয়োজন হবে না। বলাধিকারী মশায় পড়ে শোনান এই সব। হায় রে হায়, পোড়া যুগের মূর্খস্য মূর্খ আমরা সমস্ত-কিছু হারিয়ে বসে আছি।

নফরকেষ্ট গোড়াতেই গোলমাল ঘটিয়ে বসল। নতুন মানুষ এইজন্য নেয়

না। দরজায় সত্যি সত্যি খিল দেওয়া, অথবা শুধুমাত্র ভেজানো রয়েছে, পরখ করে দেখতে গিয়েছিল। মহিষের মতো মানুষটা, হাতির মতো গায়ের বল। ভেবেছিল অতি ধীরে একটুখানি নেড়ে দেখবে—নাড়াটা বে-আন্দাজি রকম জোরদার হয়ে গেল। এই মানুষটাই ভিন্ন ক্ষেত্রে হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়, বিশ্বাস করা শক্ত।

জরাজীর্ণ দরজা। তুষ্টুর খবরে ত্রুটি ছিল না—সমস্ত পাঁচিল, এবং কোঠা-বাড়িটুকুও নড়বড়ে। বোন-ভাগনে এসেছে—তারা যাতে আরামে থাকতে পারে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—যে বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাই যাতে নির্বিঘ্নে থাকে, তাড়াতাড়ি সেজন্য মেরামতির রাজমিস্ত্রি লাগিয়েছে। দরজার কিছুই বড় নেই—ধাক্কাটা এমন-কিছু জোরের না হলেও খিল ভেঙে দুই পাল্লা দুই দিকে দড়াম করে খুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে, কোথায় ছিল রাখাল রায়—লম্ফ দিয়ে উঠানে এসে পড়ল।

বাড়িতে টাকা এসে পড়ে মানুষটার চোখের ঘুম হরে গেছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, কে? কারা তোমরা? ছেলেকে ডাকছে: ওঠ রে নিশি শিগগির বেরো। কারা সব ঢুকে পড়ল—

নির্গোলে অহিংস মতে কাজ সেরে বেরুবে, গণ্ডগোল হয়ে গেল। অবস্থা রীতিমত ঘোরালো। চুরিতে এসে ডাকাতি। কাজ হোক তবে সেই নিয়মেই। সর্দার গুরুপদ ছুটে এসে পায়ের সিঁধকাঠি খুলে এলোপাথাড়ি মারছে—বাড়ির মুরুব্বি ঠেঙিয়ে মালের খোঁজ আদায় করা। তা মার খেতে পারে বটে রাখাল। দেহখানা পাকানো দড়ির মতো—রক্তমাংস রসকষের বালাই নেই। যে বস্তু আছে, ঘা মেরে দেখা গেল, হাড়ও নয়—লোহার মতো কোন কঠিন বস্তু। লোহার সিঁধকাঠি তার ওপর পড়ে ঠং করে যেন বেজে ওঠে। আবার তৈলাক্ত পাঁকাল মাছের মতো। পাঁচ-দশ ঘা খেতে খেতে সড়াৎ করে হাত পিছলে দৌড়।

পিছনে পিছনে তুষ্টু ছুটেছে। বাড়ির মানুষ বাইরে যেতে দেওয়া মারাত্মক ব্যাপার। মানুষ তো মানুষ—কাজ চলছে সেই সময়টা বাড়ির গরু-ছাগল কুকুর বিড়াল অবধি বাইরে যাবে না। তুষ্টুর সঙ্গে ছুটে কেউ পারে না। কিন্তু গ্রহ আজ নিতান্তই খারাপ। গোয়ালের পাশে গোবরের গাদা—পা হড়কে তুষ্টু পড়ে গেল। গোবরে মাখামাখি। ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে—চীৎকার করে রাখাল দৌড়চ্ছে। ক্ষমতা এ ব্যাপারেও আছে। পলকের মধ্যে বিলীন।

সে চীৎকারে পুত্র নিশির পাত্তা নেই—মন্দাকিনী দালানের দোর খুলে বেরুল। তুষ্টুরামের মনিবঠাকরুন। অস্ত্রাগারে তুষ্টুরাম—আজকে আর পরোয়া

নেই, পাহাড়প্রমাণ অস্ত্র। ইট মেরেছিল ঠাকরুন—এসো না এগিয়ে, তাল তাল গোবর ছুঁড়ব, রাতদুপুরে চান করে মরবে।

কিন্তু তার আগেই রণক্ষেত্রে নফরকেষ্ট রুখে দাঁড়াল। চুরিতে নেমে ডাকাতির কাজ রীতিমত। নফরার ভুলের জন্য এত ব্যাপার—কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে যাবার জন্য মন্দাকিনীর সামনে একটানে খাপের ছোরা বের করে ধরল : গয়নাগাঁটি যা আছে দিয়ে দাও। নয়তো এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে।

ঈশ্বর জানেন, একটা লাউ কি বেগুন অবধি এ ছোরায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয় না। নিতান্তই বেতের সাপ। এই ক'দিন নতুন হাঁড়িতে ঘসে ঘসে চকচকে করেছে। তাতেই কাজ দিল। দৈত্যসম মানুষটার কাছে ছোরার ধার পরীক্ষার জন্য কে এগোবে ?

নফরকেষ্ট হুঙ্কার দিল : গয়না খোল বলছি।

মন্দাকিনী কেঁদে পড়ল : মেরো না, ধর্মবাপ তোমরা। বিধবা-বেওয়া মানুষ —আমার গয়নাগাঁটি সাধআহ্লাদ সেই এক মানুষের সঙ্গে ঘুচে গেছে।

গুরুপদ আজ ফেলনা মানুষ নয়—দলের সর্দার। কাজ দেখাতে কোন দিক থেকে অতএব ছুটে এসে পড়ল। বলে, বেওয়া-বিধবার গলায় কি ওটা চিকচিক করে ? ফেলে দাও, দিয়ে দাও। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে না—ছুঁড়ে দাও বলছি।

ছেলের মায়ের শুধু-গলায় থাকতে নেই যে বাবা—

পুত্রের অমঙ্গল শঙ্কাতেই বোধকরি আঁচলের বেড় দিয়ে গলার মবচেন ঢেকে দিচ্ছিল, তুষ্টু চিলের মতন পড়ে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিল। নিয়ে কাজের যেমনধারা দস্তুর—ডেপুটি নফরকেষ্টর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মন্দাকিনী হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। যে ছেলের কল্যাণে গলার হার, খোলা দরজায় সে-ও বেরিয়ে এসেছে। হার না হয়ে ঐ অমূল্যর মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিলেও মন্দা বোধ করি এমন নিদারুণ কান্না কাঁদত না।

খরদৃষ্টি নফরকেষ্ট বলে, থান-কাপড়ের নিচে থেকে হাত দুটো বের করো দিকি বিধবাঠাকরুন।

হাতে কি বাবা ?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য হামেশাই যেমন বলে, সেই ধরনের কথা নফরার মুখে এসে গেল : হাত চিতিয়ে ধরো, ভাগ্যফল বলে দিই।

জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ—চেনহার গেছে, রুলিজোড়াও না যায়, সারাক্ষণ তাই হাত ঢেকে আছে। শনির দৃষ্টি এড়ায় না, উদ্যত ছোরার মুখে হাত বের করে ধরতে হয়। কতই যেন টানাটানি করছে রুলি খোলবার

জন্য। কাতর চোখে চেয়ে বলে, খোলে না যে বাবা। কি করি—কি করব আমি এখন ?

নির্বিকার নফরকেষ্ট সহজ উপায় বাতলে দিল : হাত টান-টান করে ধরো, পোঁছা পেড়ে কেটে দিই। টুকরো হাত ফেলে দিয়ে মাল নিয়ে নেবো।

তুষ্টুরাম যেন মুকিয়েই আছে। প্রস্তাব পড়তে না পড়তে মন্দার দুটো হাত সামনে টেনে ধরল—অর্থাৎ লাগাও পোঁচ এবারে। বলির মুখে পাঁঠা যেমন পাছাড় ধরে কামারের মেলতুকের সামনে। আর নফরকেষ্টও পলকে চেহারা বদলে ভিন্ন এক মানুষ। রাঙা রাঙা চোখ দুটো আয়তনে ডবল হয়ে গেছে। বিঘূর্ণিত হচ্ছে। চাপা গর্জনে বলে, গলা দিয়ে টু-শব্দ বেরিয়েছে কি পোঁচটা হাতে না হয়ে গলায় উঠে যাবে।

অমূল্য পাথর হয়ে দেখছিল, তার দিকে কারো লক্ষ্য হয় নি। বালকের কচি গলায় হঠাৎ আকাশ-ফাটা কান্না : ও মা, মাগো—

পাখির পাখনার মতো ছোট ছোট হাত দুটো মেলে উড়েই যেন এসে পড়ল নফরকেষ্ট আর মান্দার মাঝখানে। আকুল হয়ে বলছে, ও মা, পালাও। শিগগির পালিয়ে যাও, কাটবে।

কাজের ধান্দায় সাহেব কোন দিকে ছিল। তার সেই চিরকালের রোগ—মা-মা কান্নায় বুকের মধ্যে আর্তনাদ ওঠে। কত চেষ্টা করেছে, রোগ কিছুতে নিরাময় হল না। এত বড় মহাগুণী হয়েও যার জন্য বুড়ো বয়সে দুটো পেটের ভাতের জন্য বংশীর দুয়ারে পড়ে থাকতে হত। কোথায় ছিল সাহেব, পাগল হয়ে ছুটে এসে নফরাকে দিল বিষম এক ধাক্কা। মন্দাকিনী সেই ফাঁকে হাতের রুলি-সহ নির্বিঘ্নে দালানে গিয়ে দড়াম করে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

কাজটা করে ফেলেই সাহেবের হুঁশ হয়েছে। অনুতাপ আর লজ্জায় মরে। মোক্ষম সময়টা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এত লোকসান ঘটিয়ে দিল, এমন লোকের মঠ-আশ্রম বানিয়ে পর-হিত করে বেড়ানোই উচিত—রাতের কাজে আসা ঝকমারি। যে না সে-ই এই কথা বলবে।

অপরাধ করেছে, প্রায়শ্চিত্তও সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বেছে নিল। অমূল্যটা বাইরে—বাঘ ছাগশিশুর উপর যেমন পড়ে, গর্জন করে তেমনি তার টুঁটি চেপে ধরে। মারছে—কিল-চড়-ঘুসি বৃষ্টিধারার মতো পড়ছে। লাথিও এক-একবার। কুক ছেড়ে অমূল্য কেঁদে ওঠে।

কাঁদ রে ছোঁড়া, যত পারিস কাঁদ। গলা ফাটিয়ে ফেল।

হিড়হিড় করে সাহেব দালানের কাছে টেনে নিয়ে যায়। ভিতরে মন্দাকিনী হুড়কো দিয়ে আছে। সেই মুখো হাঁক পাড়ছে : কান্না নাকি গো ঠাকরুন ?

শুনতে পাও না, পিটছি তোমার ছেলে ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছি। ছেলে চাও তো গয়না খুলে ছুঁড়ে দাও।

অমূল্যও সমান তালে চেঁচাচ্ছে : ও মা, মেরে ফেলল আমায়—

কিছু নড়াচড়া যেন দালানের ভিতরে। আশায় আশায় সাহেব তাকায়। না—কিছুই না। দালানের কাছে চকিতের মতো এসে আবার সরে গেছে। অত কাঁচা মেয়েমানুষ মন্দাঠাকরুন নয়।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি পাষণ্ডী মা ? সাড়া না পেয়ে সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে গালিগালাজ শুরু করে : মাগুলো এই রকমই। রাক্ষুসী ওরা সব—ছেলে মরে, নিজেরা গয়না ঝিকঝিকিয়ে ঘোরে। থুঃ-থুঃ—

পরের দিন নৌকোয় যাচ্ছিল সাহেব আর নফরকেষ্ট। সাহেবকে নফরকেষ্ট টেনেটুনে নিয়ে চলেছে—ভাঁটি-অঞ্চলের পাট চুকিয়ে কালীঘাটের পুরানো জায়গায় নিয়ে তুলবে। সোনার রুলি বেহাত হওয়ার দুঃখ তখনো মনে খচখচ করছে। সেই কথা উঠে পড়ে। নফরা বলে, দয়াময় হয়ে দয়াটা দেখালি বটে ! ধাড়ি মা'কে ছাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলের উপর মারধোর। বলিহারি বিচার তোর !

সাহেব হেসে বলে, তোমার যেমন ভোঁতা ছোরা, আমরাও তেমনি ভোঁতা মারধোর। রেলের কামরায় বলাধিকারী আমায় মারলেন, সেই সময় কায়দাটা শিখে নিয়েছি। শিক্ষা সার্থক। ছেলেটা নিজেও ভাবল, ভয়ানক মার খাচ্ছে। ছেলেমানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু তুমি হেন ঝানু মানুষটাও ভড়কে গিয়েছ। অথচ দেখ, মা বেটী কী পাজি—

বলতে বলতে সাহেবের কণ্ঠে যেন আগুন ধরে যায়। বলে, পেটের সন্তান মরে তো মরে যাক, নিজেদের গয়নাগাঁটি সুখ-শান্তি সম্মান-ইজ্জত বজায় থাকলেই হল। বাঘের বেলা বাপে বাচ্চা খায়, মানুষের বেলা মা—ঐ মন্দা-ঠাকরুনের মতো মায়েরা—

কোন এক নিষ্ঠুরা মা অবোধ শিশুর গলা টিপে একদিন জলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও খানিক গাল দিয়ে সাহেব মনের আক্রোশ মেটাল।

এ সমস্ত কথাবার্তা পরের দিনের—নফরা আর সে যখন ফুলহাটা থেকে সরে পড়ছে। আজকে এখন তো ধুন্দুমার রাখাল রায়ের বাড়ি। মারতে মারতে অমূল্যকে শুইয়ে ফেলল, তারস্বরে সে চেঁচাচ্ছে, তবু দেখ মা-জননীর প্রাণ গলে না। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি আবার ?

এদিকে এই। তালপাতা কেটে রেখেছে গোয়াল ছাওয়ার জন্যে বোধহয়। একটা পাতা নড়ে উঠল। ঝড়-বাতাস নেই, গাছের উপরের পাতা নড়ে না, মাটিতে গাদাকরা শুকনো তালপাতার একটা নড়ে কেন ?

যা ভেবেছ তাই—মানুষ। রাখালপতি রায় ভোগো সমেত তালপাতা মাথায় চাপিয়ে বসে আছে। মুরুব্বি মানুষটাকে পাওয়া গেল এতক্ষণে।

তবে রে বুড়ো ! আমরা হুড়হুড় করে মরি, তালপাতা মুড়ি দিয়ে মজা করে দেখছ তুমি ?

রাখাল বলে, হুঁ, মজা ! কেন্নো আর শুয়োপোকা গায়ে কিলবিল করে ওঠে, এর মধ্যে মজাই তো দেখবেন আপনারা ! মার-গুতোন দেবেন না, যেমন যেমন হুকুম হয় করছি।

মারব না। বোনের যা সমস্ত গ্রাস করেছে, উগরে দাও। ফুল-বিল্বপত্রে তোমায় পূজো করে যাব।

সেই রটনা বুঝি ? গরিবের বাড়ি সেইজন্য পায়ের ধুলো পড়ল ? বোনের ব্যবহারে রাখাল কত যে মর্মাহত, এই নিদারুণ বিপদের মধ্যেও গলার স্বরে প্রকাশ পায় : মন্দার জিনিস গ্রাস করবে, তত বড় মুখের হাঁ ত্রিভুবনে কারো নেই। বেকবুল যাচ্ছি নে মশায়রা, গেলেও তো মানবেন না। গচ্ছিত রেখেছে সামান্য কিছু—নিতান্তই যৎসামান্য।

অধৈর্য নফরকেষ্ট খাপের ছোরা ধাঁ করে খুলে রাখালের সামনে একপাক ঘুরিয়ে বলে, ধানাই-পানাই ছেড়ে কোথায় কি আছে বের করে দাও। বের করো শিগগির, নয় তো গলা কাটব।

রাখাল বলে, গলা কেটে কিছু পাবেন না মশায়রা, গলার মধ্যে নেই, যথাধর্ম বলছি। আসুন—

আগে আগে গিয়ে গোলার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। তুষ্টুর হাতে কয়েকটা মশাল—নারকেল-তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কাঠির মাথায় জড়ানো। এই বস্তুও সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে। চুরির কাজে তেমন না হলেও ডাকাতিতে একেবারে অত্যাজ্য। অধিক আলোর প্রয়োজনে মশাল জ্বালাতে হয়। মানুষের গায়ে গুঁজে ধরে ভয় দেখিয়ে এই তুষ্টুরামই খোঁজ আদায় করেছিল একবার। খড়ের চালের উপর জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিয়ে গৃহস্থকে সেই দিকে ব্যস্ত রেখে রাতের কুটুমরা পালিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক।

চালের কাছাকাছি হাত দেড়েক মাপে চৌখুপি দরজা। একটা মশাল জ্বেলে তুষ্টুরাম ভিটের উপর উঠে দরজার মুখে ধরে। গোলার গলায় গলায় ধান। ধানের ভিতর রাখাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

অধীর হয়ে তুষ্টু তাড়া দিয়ে ওঠে : হল কী ?

রাখাল সকাতরে বলে, আছে বাবা, মিছে কথা বলিনি। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না তেমন—

কোথায় ছিল সাহেব, গোলার ভিটের তুষ্টুর পাশে উঠে পড়েছে। তুষ্টুকে বলে, মশাল উঁচু করে ধরো। মুরুব্বিমশায় ঠাহর করতে পারছে না, খুঁজে দিয়ে আসি।

হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে যায় তুষ্টু। ঐ তো সঙ্কীর্ণ একটুকু দরজা—ইঁদুরের বাক্সকলে যাওয়ার মতো হচ্ছে। সাহেব গ্রাহ্যও করে না, ফুড়ুত করে ঢুকে গেল। বলে, ভাঁওতা দিচ্ছ না তো ? টাকাকড়ি ধানের গোলায় কেন রাখলে ?

রাখাল বলে, সেরেস্থরে রাখতে হয় বাবা। সিন্দুকে রাখা যায় না আপনাদের দশজনার ভয়ে।

বলেই বুঝি খেয়াল হল, নিন্দেমন্দ হয়ে গেল এদের। তাড়াতাড়ি সামলে নেয় : দশজনা বলতে তো সবাই—আপন-পরে তফাত নেই। অন্যের কথা কি—নিজের ছেলেটা পর্যন্ত। কোন্‌খানে কি রেখেছি, শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। ঝগড়া-কচকচি ঠেঙাঠেঙি—জন্মদাতা পিতা বলে রেহাত করে না। তিতবিরক্ত হয়ে গেলাম বাবা। আপনারা নিয়ে চলে যান, এর পরে হারামজাদা ছেলে অত্যাচারের ছুতো পাবে না।

দু-জনের চারখানা হাত মিলে ধান হাতড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে সাহেব সর্বক্ষণ শাসায় : মিছে খাটনি যদি খাটাও, ধানের নিচে জ্যান্ত গোর দিয়ে যাব। নয় তো গোলার দরজায় তালা আটকে মশালের আগুন ধরিয়ে দেবো বাইরে থেকে।

না বাবা, মিথ্যে নয়—। বলছে আর দ্রুত হাতে ধান ঠেলে গর্ত করছে এদিক-সেদিক। সন্দিগ্ধভাবে বলে, বারো আঙুল এক বিঘতের ভিতরেই থাকবার কথা। শয়তানের বেটা শয়তান ঐ নিশিটা কিছু করল নাকি ? তাই বা কেমন করে—গোলার চাবি সর্বক্ষণ আমি কোমরে নিয়ে ঘুরি।

না, মানুষটা সত্যবাদী। ধান হাতড়াতে হাতড়াতে ন্যাকড়ার বল অবশেষে হাতে ঠেকে। খানিকটা ন্যাকড়া গোল করে পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা—দড়ি ধানের নিচে গভীর দেশে চলে গেছে। নিশানা এই বল—দড়ি ধরে ধান সরাতে সরাতে চলে যাও গোলার তলার দিকে। রাখাল আর সাহেব তাই করেছে। দড়ির শেষ বেরিয়ে গেল, পিতলের ঘটির কানার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। দড়ি টেনে ঘটি উপরের দিকে আনে। কী ভারী !

ঘটির মধ্যে কি ভরেছ বুড়ো—লোহালক্কড় ?

ঘটির মুখ-বাঁধা। খুলে দেখা যায়, কাঁচা-টাকা আধুলী সিকি দুয়ানি আনি এবং পয়সা। তাই এত ভার। রাখাল কৈফিয়ৎ দেয়: কাগুজে নোট হাতে এলেই ভাঙিয়ে ফেলি। স্বদেশিবাবুরা সাহেবদের থাকতে দেবে না। তাদের নোটের কাগজে তখন ঘুঁড়ি বানিয়ে ছেলেপুলেরা ওড়াবে।

মাথায় জড়ানো গামছাটা খুলে সাহেব ঘটির বস্তু ঢালছে। কোমরে বেঁধে নেবে। দস্তুর এই। কাজের মধ্যে কখন কি দশা—হয়তো জল ঝাঁপাতে হল, হয়তো বা গাছের মাথায় চড়ে বসতে হল। মাল দেহের সঙ্গে আঁটা রইল—মানুষ বজায় থাকে তো মালও থাকবে।

গামছায় বাঁধতে বাঁধতে বিরক্তি ভরে সাহেব বলে, আধ-পয়সা পাই-পয়সা রাখনি যে বড় ?

তুচ্ছ কথা রাখালের কানে যায় না। সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে বলে, হাড়-বজ্জাত আমার ঐ বোন। দালান সারানো দেখিয়ে বিস্তর ভুজং-ভাজাং দিয়ে সামান্য কিছু বের করেছি। চেটেপুঁছে নিয়ে যেও না বাবা, কিছু প্রসাদী রেখে যাও।

হেন অবস্থার মধ্যেও সাহেবের হাসি পেয়ে যায়। বলল, প্রসাদী নিলে তো বিপদ। ছেলে ঠেঙানি জুড়বে। জন্মদাতা পিতা বলে খাতির করবে না।

জানতে দিলে তো ? সে জেনে রইল, সবই আপনারা নিয়েথুয়ে গেছেন। কিছু যদি দয়া করে যান, সে জিনিস আমি জীবন থাকতে বের করব না। মরার সময়েও না।

খানিকটা নরম হয়েছে অনুমান করে রাখাল পুনশ্চ বলে, দয়া কিছু হবে দয়াময় ?

সহসা তীক্ষ্ণ ভয়াল চিৎকার পাঁচিলের বাইরে: মাছি ঘন—। পাহারাদার বংশী হাঁক পেড়ে সকলকে জানান দিচ্ছে:

মাছি ঘন, মাছি ঘন—

গোলার দরজার মুখে তুষ্টুরাম মশাল ধরে আছে, মশাল মাটিতে ছুঁড়ে দিল। নেভে না। কুড়িয়ে নিয়ে বাইরের কলসিতে ঢুকিয়ে দেয়। অন্ধকার। উঠানে তবু একটু চিকচিকানি, গোলার ভিতরে একেবারে নীরন্ধ্র।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সাহেব দেখে, রাখালের কোটরগত চোখের মণি দপ্ করে জ্বলে উঠল। ধানের গাদার উপরে টলতে টলতে গিয়ে গোলার সঙ্কীর্ণ দরজা আটকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহেবের কোমরের গামছা টেনে খসানোর জন্য। দন্তহীন মাড়ি মেলে উৎকট হাসি হাসছে।

বলা নেই কওয়া নেই, সাহেব দু-হাতে দু-মুঠো ধান নিয়ে রাখালের চোখ

নিরিখ করে মারল। এই নিয়ম—একেবারে যা ভাবে নি তাই করতে হয়। হকচকিয়ে যায় মানুষ। ঘোর কাটিয়ে সুস্থির হয়ে রাখাল আবার ধরতে যাবে তার আগে সাহেব লাফ দিয়ে পড়েছে। পুরানো বাতিল ইটের গাদা সেখানটা, তার উপরে গিয়ে পড়ল। হাঁটুতে বিষম লেগেছে, ছড়ে গেছে খানিকটা, উঠে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু দাঁড়ানো তো নয়, হাঁটাও নয়—ছুটতে হল সেই অবস্থায়।

ধর্, ধর্—পালিয়ে যায়।

তিলকপুরের মানুষ হৈ-হৈ করে ছুটছে। ডাকাত পড়েছে রাখাল রায়ের বাড়ি। হুড়কোর বাঁশ লাঠি টর্চ হেরিকেন দা-কুড়াল যা পেয়েছে, হাতে তুলে নিয়েছে। রাখালের ছেলে নিশি বংশীর চোখ এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে পাড়ায় বেরিয়ে খবর দিয়েছে। বড় ভাগ্য, বন্দুক দুটো চলে গেছে ফুলহাটায়। বলাধিকারীর কতখানি দূরদৃষ্টি, আর একবার তার পরিচয় হল। সকলের দুটো করে চোখ, তাঁর বোধ হয় অদৃশ্য তৃতীয় নেত্র কপালের উপর—আগেভাগে সমস্ত দেখতে পান। তুষ্টুরামও খানিকটা ভেবে এসেছে বিপদআপদের কথা। মশাল এনেছে, আবার দেখা গেল পটকাও আছে কয়েকটা গামছার ঝুলিতে। গোটা-দুই ছেড়ে দিল পর পর। পাঁচিলের দরজা পর্যন্ত যারা এসে পড়েছিল, দুড়দাড় করে তারা পিছিয়ে যায়। অন্য কেউ না হোক, তুষ্টুরাম বেরুতে পারত এই ফাঁকে। কিন্তু হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

মানুষ দেখে সাহস পেয়ে মন্দাকিনী এইবারে দালান থেকে বেরুল। মায়ের কর্তব্যবোধ চাড়া দিয়ে উঠেছে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে: আমার অমূল্যকে মেরে ফেলল গো, সর্বস্ব লুটেপুটে নিল।

জালুয়ার তলার কালি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তুষ্টুরাম সারা মুখে মেখেছে। চোখদুটো পিটপিট করছে তার ভিতর। পাগড়ির মতো করে মাথায় উড়ানি জড়িয়েছে মুখের অনেকটা ঢেকে দিয়ে। এমনি সাজ মোটামুটি সকলেরই। মুখোশ না নিলেও চেহারা কিম্ভূতকিমাকার করতে হয়, চোখে দেখে যাতে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

মনিবঠাকরুনের মারমূর্তি দেখে কী রকম যেন হল—চনচন করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দু-একটা পটকা তখনো ঝুলিতে—কিন্তু পালানোর কথা ভুলে উল্টোমুখো রোয়াকের উপর লাফিয়ে উঠে মন্দাকিনীর চুলের ঝুঁটি ধরল।

কেমন লাগে?

বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটল। সর্বনাশ, কথা বলে ফেলেছে, রাগের

বশে সেই মুহূর্তে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। লোক অচেনা হলে দায়ে-বেদায়ে এক-আধটা কথা বললেও বলতে পার গলায় ভিন্ন আওয়াজ তুলে। চেনা মানুষের কাছে একেবারেই বোবা। পুরানো লোক হয়ে তুষ্টুরাম এত বড় বেকুবি করে বসল। রাগ না চণ্ডাল—স্বর বিকৃত করে বলতে হয়, রাগের বশে সে খেয়ালও ছিল না।

চুলের মুঠি ছেড়ে সাঁ করে সে ছুটল। যাবে কোথা, বেরুবার পথ নেই। মন্দাকিনী ওদিকে চেঁচামেচি করছে: তুষ্টু, তুই—তোর এই কাজ? নুন খেয়ে এত বড় নেমকহারামি—হায় কলির ধর্ম!

একবার এদিক একবার সেদিক তুষ্টুরাম ছুটোছুটি করছে। আর গাল চড়াচ্ছে শতেক বার। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি—পিছন দিকে খিড়কির দরজা, সেদিকেও মানুষ জমেছে। কেলেঙ্কারি আজকে। নফরকেষ্ট দিয়ে শুরু—চুরি করতে এসে ডাকাত হতে হল। তুষ্টুরাম তার উপরে পরিচয়টা পরিষ্কার জানান দিয়ে দিল। ঘিরে ফেলেছে, দলসুদ্ধ লোপাট হবার দশা।

নতুন মানুষ সাহেব ওদিকে কী বুদ্ধি করেছে—দেখ, তাকিয়ে—দেখ একবার। পাচিলের উপর রাজমিস্ত্রিদের ভারা, পিলপিল করে তার উপরে উঠে পড়ল। ওঠার কায়দাও চেয়ে দেখবার মতো। গাছে ওঠা দেয়ালে ওঠা ঘরের চালে ওঠা—কারিগর-সমাজে কথা চলিত আছে, মাটির উপরে পায়ে হেঁটে চলাচল করো, ঐ সমস্ত জায়গায় কানে হেঁটে উঠতে হবে। সাহেব সেই কায়দায় উঠে পড়ল টিকটিকি কাঠবিড়ালি যেমন উঠে যায়। মানুষ জমে গিয়ে লোকারণ্য সামনেটায়। সকলের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে সাহেব, সকলের চোখের উপর। তারার আবছা আলোয় মুখ চেনা যায় না, কিন্তু তাল-নারিকেলের মতোই খাড়া মানুষটা দেখা যাচ্ছে। দূরের দিকে যারা আছে, সাহেব সকলকে ডাকছে গলা ফাটিয়ে: চলে এসো, কাছে এসে শোন সকলে, দলের জমাদার আমি বলছি—

গামছায় বাঁধা টাকাপয়সা কোমর থেকে খুলে হাতে নিয়েছে। বলাবলি কিছু নয়—সাহেব একমুঠো নিয়ে ছুঁড়ে দিল মানুষজনের দিকে। গোড়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিল—কুড়ানোর জন্য তারপরে ঠেলাঠেলি ধাকাধাক্কি। যত লোক এদিক-সেদিক ছিল, রে-রে করে ছুটেছে পাঁচিলের গায়ের ভারা এবং ভারার উপরের মানুষটা নিরিখ করে। কুড়ানো শেষ হয়ে যায়, সাহেব তত আবার মুঠো মুঠো ছড়ায়। টর্চের আলো ফেলেছে, হেরিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—ডাকাত যে এক এক করে চোখের উপর দিয়ে পালাচ্ছে সেদিকে নয়। ঘাস-বনের মধ্যে টাকাপয়সা পড়েছে, আলো নিয়ে তাই খুঁজছে। হরির-লুটের

মতো এক এক মুঠো ছড়িয়ে দেয়, আর নজর ফেলে দেখে নেয়—বেরিয়ে পড়ল কিনা সকলে, গেলই বা কতদূর।

কথা বলে ওঠে আবার। কণ্ঠ একেবারে আলাদা—সাহেব নয়, ভিন্ন এক মানুষ বলছে যেন। রীতিমতো এক বক্তৃতা। বলে, চোরের সেরা চোর রাখাল রায়। কুটুম্ববাড়ির সর্বস্ব মেরে এনেছে। বোন-ভাগনেকে পথে তুলে দেবে দু-দিন বাদে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাচ্ছে, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাব। তবে কেন তোমরা পিছনে লাগতে এসেছ ?

কানে শুনে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। ঘাড় তুলে তাকানোর ফুরসত কোথা ? নিজ নিজ কর্মে সকলে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি কে কত কুড়িয়ে তুলতে পারে। একজন চেঁচিয়ে ওঠে: আমার কপালে শুধুই পয়সা—তামার উপরে উঠতে পারলাম না। মোটা মোটা মাল ছাড় দিকি ভাই, লম্বা হাত করে ফেল। রাত্রে চোখে কম দেখি—সাফাই জায়গায় ছুঁড়ে দাও।

যেমন ইচ্ছে বলুক, সাহেবের হাতের মাপ আছে। ছড়াচ্ছে অল্প অল্প করে ভিতরে-উঠানের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে। তুষ্টুরাম বেরিয়ে পড়েছে। নফরকেষ্টও বেরুল নিঃশব্দ একটি ছায়ার মতন। মন্দাকিনী আর রাখাল যেন ওদিকে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে: পালিয়ে যায়, ধরো ধরো, বেড় দিয়ে ধরে ফেল।

কেবা শোনে কার কথা! গৃহস্থবাড়ি কুকুরের মুখে এক এক কুচি মাংস ছুঁড়ে যাবার নিয়ম, যতক্ষণ না চোরের কাজ হাসিল হয়। মানুষের বেলাতেও সাহেব সেই নিয়ম খাটিয়ে যাচ্ছে!

বাইরের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ নিশিকে দেখে রাখাল গর্জন করে উঠল: তুই হারামজাদা সকলের সঙ্গে পয়সা কুড়োতে লেগেছিস—লজ্জা করে না ?

নিশিও সমান তেজে বাপের কথার জবাব দেয়: বলি, পাড়ার মানুষ জুটিয়ে আনল কে ? সকলে ভাগ কুড়াচ্ছে, আমি বুঝি বোকা হয়ে হাত গুটিয়ে থাকব ?

যুক্তি অমোঘ। বয়স এবং লজ্জায় না বাধলে—কী জানি, রাখালও হয়তো গিয়ে পড়ত। কিন্তু গুরুপদ মানুষটার কী হল বল দেখি। সর্দার হয়ে কাজের মধ্যে শুধু করেছে—দুর্বল বৃদ্ধ রাখালের আগাপাস্তালা লোহা পেটানো। গণ্ডগোল জেঁকে উঠবার পর আর তাকে দেখা যায়নি। হয়তো বা সে-ও তালপাতা মুড়ি দিয়ে পড়েছে কোথায়। সাহেব এদিকে পালাবার পথ খালি করে দিয়েছে, বুঝতে পারেনি দলের সর্দার।

অধীর হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি ইঙ্গিত দিয়ে চেঁচায়: জাল গুটাও সর্দার, জাল গুটাও। এক্ষুনি—

সর্বত্র নজর হানা দিয়ে অবশেষে দেখতে পায়, পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁষে দুই হাত দুই পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে টিপিটিপি চলেছে একটি প্রাণী। গুরুপদ সন্দেহ নেই, পচা বাইটার সাগরেদ বলে যার দেমাক।

মজা-নদীর ধারে কসাড় জঙ্গল—এই বড় সুবিধা। ছুটোছুটি করে কোন রকমে দঙ্গলে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তাক বুঝে তারপর গ্রাম ছেড়ে মাঠে নামবে। ভারার উপরে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখতে পাচ্ছে, তীরবেগে ছুটেছে ছায়াগুলো। অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবারে তার নিজের—বাঁশ বেয়ে সড়াক করে মাটির উপর যেন পিছলে পড়ল। পড়বি তো পড়—একেবারে পয়সা-কুড়ানো দলটার মধ্যে। দু-একজন চোখও একটু তুলেছে—তাদের সেই চোখের সামনে গামছার অবশিষ্ট টাকাপয়সা দুই হাতে দু-দিক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। চোখগুলো সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে আবার। পলক ফেলতে যেটুকু সময় সাহেব আর নেই।

আরও পরে এক সময় জনতার হুঁশ হল। কুড়ানো প্রায় শেষ তখন। কর্তব্য-বুদ্ধির তাড়ায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে : এই যাঃ, গেল কোনদিকে রে ?

কেউ উত্তর দিক দেখায়, কেউ বলে দক্ষিণে। নজর তখনো মাটিতে—শেষ পয়সাগুলো খুঁটে নিচ্ছে। এইটুকু হয়ে গেলে কোমর বেঁধে লাগবে। আচমকা সকলের মাঝখানে এমনভাবে নেমে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছে ?

রাত ঝিমঝিম করছে। শিয়াল ডেকে উঠল বহু দূরে। বার বার তিনবার। তারপর এদিকে সেদিকে আরও শিয়ালের ডাক। মজা-নদীর ধারে জঙ্গলের ভিতর থেকেও যেন ডাকল কয়েকবার। সব শিয়ালের এক রা, ধুয়া একবার উঠে গেলেই হল। প্রথম তিন ডাক মাঠ-পারের তেঁতুলতলা থেকে। ডাকের আন্দাজ নিয়ে নানান দিক থেকে অন্য শিয়াল সেই তেঁতুলতলায় জুটেছে। ডেকেছে শিয়াল নয় বংশী—পশুপাখির ডাকে যে ওস্তাদ। ছুটেছেও শিয়াল নয়, দলের অন্য চারজন। পালানোর মুখে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছিল, পাহারাদার বংশী আবার সকলকে একত্র করেছে। নিয়ম এই। [নিয়মটা বড় বেশি চাউর হয়ে যাবার পর হালে কিছু কিছু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। একটা হল, শিয়াল ডাকার বদলে গাছের মাথায় চড়ে আকাশমুখো টর্চ জেলে ধরা। চোর খুঁজতে যারা বেরিয়েছে, তারা মাটিতে খোঁজাখুঁজি করে, আকাশে তাকায় না। দলের লোকই শুধু নজর তুলে দেখবে কোন্ দিকে আলো।]

মজা-নদীর কিনারা থেকে শেয়াল ডেকে সাহেব বংশীর জবাব দিয়েছে। ঠিক তার পনের-বিশ হাতের মধ্যে একই সঙ্গে আর একজনের ডাক। তুষ্টুরাম।

এত কাছাকাছি, কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখেনি। ডাকের আন্দাজে সাহেব গিয়ে তার হাত ধরল।

চলো তুষ্টু—

তুষ্টুরামের দুঃখ হয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আমি যাব না। যেদিকে দু-চোখ যায়, বেরিয়ে পড়ব। কোন্ মুখে বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই? আনাড়ি কাঁচালোক বুঝতে পেরেই ওঁার অমত ছিল। যা-কিছু তুমি তো একলাই করলে সাহেব। পাঁচিলের মধ্যে বেড় দিয়ে ফেলেছিল, তুমি বাঁচালে। বেঁচে গেছি, তাও বলা যায় না। সর্বনাশটা আমিই করলাম। চিনে ফেলেছে, হনুমানের লেজের আগুন সহজে ওরা নিভতে দেবে না।

বলতে বলতে তুষ্টু কেঁদে ফেলে। জোয়ান মানুষটার কান্না দেখে সাহেবের কষ্ট হয়। তিরস্কার মুখে আসে না, তুষ্টুর গলা জড়িয়ে ধরল। বলে, ভাবনা কিসের, বলাধিকারী আছেন কেন তবে? বাহাদুরি বটে তোমার তুষ্টুরাম! টাকাপয়সার মুনাফা আজকে কাণাকড়িও নয়, কিন্তু মস্তবড় মুনাফার কাজ তুমি করে এলে। মন্দাঠাকরুনকে থাপ্পড় কষিয়ে এলে। মানুষকে শেয়াল কুকুরের মতো ইট মেরেছিল, তার পাল্টা-শোধ। মরদমানুষের কাজই তো এই। শোধ এমনি নিজের হাতে দিতে হয়—বড়লোকের আদালতে বড়লোকদের কিছু হয় না। মুখের ঐ রেখাটুকু—কী করবে, চাপতে পারো নি, আপনি এসে গেল। আমরা হলাম মুখ্যুস্থুখ্যু চোর-ছ্যাঁচোড় মানুষ—মনে একরকম মুখে অন্য পেরে উঠিনে। সেসব ভালোরা পারে।

যেতে যেতে আবার বলে, মা বটে দেখলাম। মা-নামে ঘেন্না ধরিয়ে দিল। মা নয়, মেয়েলোকই নয় ওর চোদ্দপুরুষে। ডাকিনী বাঘিনী হাকিনী—মায়া করে মেয়েলোকের রূপ ধারণ করেছে।

সান্ত্বনা দিতে দিতে তুষ্টুর গলা জড়িয়ে তেঁতুলতলা নিরিখ করে চলল। সেখানে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বংশীকে দুষছে: নিশি রায় বেরিয়ে গিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, কিচ্ছু জানো না—চোখ বুঁজে পাহারা দিচ্ছিলে নাকি? রাগটা কিন্তু নফরকেষ্টর উপরেই সকলের বেশি। এই মারে তো সেই মারে: কাঠ-গোঁয়ার একটা। গোড়াতেই কাঁচিয়ে দিলে। এ কাজে বুদ্ধি লাগে। সে জিনিস এক-ফোঁটাও নেই মাথার মধ্যে—ঝুড়িখানেক গোবর।

হাত বেড় দিয়ে সাহেব নফরকে ঠেকায়। সর্দার হিসাবে গুরুপদর কণ্ঠ বেশি প্রবল, তার উপরে সাহেব খিঁচিয়ে উঠল: সবচেয়ে বড় দোষ তোমারই। দেয়াল কাটার জন্য কাঠি, তাই দিয়ে মানুষ ঠেঙাতে লাগল। কাঠি কেড়ে নেবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল—সর্দার বলে মান্য দিয়ে

বসেছি, তাই পারলাম না। বুড়োমানুষটাকে অমন করে মারলে, কী দোষ করেছে শুনি ?

গুরুপদ নির্বিকার কণ্ঠে বলে, দোষ না করুক, টাকা করেছে। সেইজন্য মারি। এদ্দিন ছিল না, ডাকাত কেন—একটা ছিঁচকে-চোরও ওর বাড়ি থুতু ফেলতে যেত না।

কারো মন ভাল নেই। তোড়জোড় করে এসে ডাহা বেকুব হয়ে ফেরা! কতদূর যে গড়াবে, তা-ও বলা যাচ্ছে না। বিরক্ত স্বরে বংশী এর মধ্যে বলে, চিরকালের নিয়মই তো চলছে—নতুনটা কি হল ? ডাকতে মক্কেল ঠেঙায়, মনিব চাকর ঠেঙায়, জমিদার রায়ত ঠেঙায়, মাস্টার ছাত্র ঠেঙায়, বর বউ ঠেঙায়, বাপ-মা ছেলে ঠেঙায়। তুমি আমাদের এক দয়ারাম গোঁসাই—পিঁপড়ে মেরো না। ছারপোকা মেরো না, মশা মেরো না : ছোটমামা ঠিকই ধরেছিল—ভাবের মানুষ তুমি, ভক্ত মানুষ। ঐ লাইনে যাও। চেহারাখানা আছে, হবে দু-চার পয়সা।

গুরুপদ বলে, আজেবাজে কথা ছেড়ে কোন্‌খানে গিয়ে উঠছি সেইটে ভাবো দিকি এখন। বলাধিকারী মশায়ের ফিষ্টির জের এখনো বোধহয় চলছে, বন্দুক নিয়ে অবিনাশ সামন্ত মোতায়েন আছে। সেখানে জুত হবে না। খালি হাতে মহাজনের কাছে যাবই বা কোন লজ্জায় ? ঘরবাড়ি ছেড়ে কদ্দিন ধরে পড়ে আছি—আমি এই ডাইনের পথ ধরলাম।

ডাইনে মোড় নিয়ে গুরুপদ ঘরমুখো হল। সর্দার হিসাবে বিদেশি মানুষ সাহেব ও নফরার উপর কিছু উপদেশ ছেড়ে যায় : তোমাদের কে চেনে, তোমরা সরে পড় এইবেলা। যদি দেখ হাঙ্গামাহুজ্জুত হল না, নতুন মরসুমে কাজ ধরতে এসো। একলা তুমিই এসো সাহেব—নফর যেন না আসে, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

তুষ্টুরাম বলে আমিও চললাম—

বংশী অভয় দিচ্ছে : ঘাবড়াস কেন তুষ্টু ? সদর হল বিশ ক্রোশ পথ। গাঙখাল ঝাঁপিয়ে সদরের আইনকানুন এতখানি পথ পৌঁছয় না। তা যদি হত, আমার দাদামশায় অতকাল ধরে রাজত্ব করতে পারতেন না। যা-কিছু করেন দারোগাবাবু—কত দূর কি করবেন, তারও হদিস পাওয়া যাবে বলাধিকারী মশায়ের কাছ থেকে।

সাহেব বলে, ভয় নয় তুষ্টুরামের, লজ্জা। কিন্তু লজ্জার কি হল ? জোয়ান-মরদের যা করা উচিত, তুষ্টু সেইরকম করেছে। ঠাকরুন থাপ্পড়টা খেল, মানুষটা কে জানতে পারবে না—এই বা কোন বিচার ? আমি বলি, বেশ করেছ তুমি তুষ্টু।

তুষ্টুরায়ের কোন কিছুই যেন কানে যায় না। থপথপ করে চলেছে। নিজের মনে বলে ওঠে, কাঠ কাটতে সব বাদাবনে যাচ্ছে। কাঠুরে হয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়ি। বড়-শিয়ালে মুখে করে নেয় তো আপদ চোকে।

বড় শিয়াল অর্থাৎ বাঘ। কাজে হেরে অবসাদে এখন ভেঙে পড়েছে। বাঘের মুখে যেতেও রাজি। হারাধনের ছেলেগুলোর মতো দলের লোক যে যার পথে সরে পড়েছে।

কেবল বংশী দেমাক করে : আমার ঘর আছে, বউ আছে, ছেলে আছে। আমি কোন চুলোয় যেতে যাব ? কী দরকার! মক্কেলের বাড়িতেই ঢুকি নি, কেউ দেখে নি, নিশানদিহি হবে না আমার।

বলছে, বউ জানে সোনাখালি মামার বাড়ি গেছি। মামার বাড়িই তো ছিলাম এতক্ষণ। গণ্ডগোল বুঝলে বড়মামা নিজে গিয়ে হলপ পড়ে সাক্ষি দেবে।

অতএব বংশীও নিজের বাড়ি সৎ-গৃহস্থ হতে চলল।

সাহেব আর নফরকেষ্ট দুজনে এইবার খালের মোহানায় এসে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে কুঠিবাড়ির ছাত অস্পষ্ট দেখা যায়।

নফরকেষ্ট হঠাৎ সাহেবের হাত এঁটে ধরে : ওদিকে নয় রে, আমরাও বাড়ি চলি।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, আমাদের আবার বাড়ি!

হ্যাঁরে রে, হ্যাঁ! বস্তি-জায়গা, খারাপ মেয়েমানুষের বাস। কিন্তু বাড়ি আমাদের ভাল। টাকা থাকলে ভালবাসা, দয়ামায়া উপে গিয়ে টাকাটাই সকলের বড় হয়ে যায়। ভাগ্যিস টাকা নেই। সেজন্যে, দেখলি তো, মন্দাঠাকরুন মা আবার সুধামুখীও মা।

সুধামুখীর কথায় গদগদ হয়ে ওঠে : দুটো নাম একসঙ্গে তুলতেও ঘেন্না করে সুধামুখী হল জাত-মা। গর্ভের মেয়েটাকে নুন খাইয়ে মেরেছিল, গড়াতে গড়াতে শেষটা ঐ বস্তি-বাড়িতে উঠল। সন্তান-শোকে লোকে পাগল হয়ে যায়, সুধামুখীও তাই। সাহেব, তুই কোনদিন তাকে ছাড়িস নে।

বলতে বলতে কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দস্যু-মানুষটার। বলে, কালীঘাটে ফিরে যাই আবার। শহরের মানুষ শহরে কাজের ধাঁচ বুঝি। নোনাজল, ধান-বন, বাদার-জঙ্গল আমাদের ধাতস্থ হয় না। তার উপরে গুরুপদ যা বলে গেল, সেটাও ভাবতে হবে বই কি। এক্ষুনি এই পথে সড়ে পড়ি।

সাহেব গোঁ ধরে বলে, তুমি যাও, আমি থাকব।

নফরকেষ্টরও জেদ : তোমায় রেখে কক্ষনো আমি যাব না। মায়ের ছেলেটা

নিয়ে চলে এসেছি, সুধামুখীর হাতে হাতে হাজির করে দিয়ে তবে খালাস। তাই-ই বা কেন? আমার নিজেরও বুঝি দাবি থাকতে পারে না তোর উপর!

বিস্তর দিন দেশ-ছাড়া, শহর মন টেনেছে, সেখানে কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল, রাতদুপুরে সুধামুখীর গালিগালাজ। সেখানে পথের মোড়ে হঠাৎ সহোদর ভাই ও সুন্দরী বউ হয়ে দেখা দেয়। নফরাকে আর আটকে রাখা যাবে না।

গতিক বুঝে সাহেব চুপ করে যায়। নদী কূল ধরে চুপচাপ দু-জনে অনেকটা দূরে চলে গেল।

সাহেব বলে, হেঁটে হেঁটেই কালীঘাট চললে?

যাই তো গাবতলী অবধি। সেখানে গয়নার নৌকো পেয়ে যাবো।

কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, নৌকো আগেই পেয়ে গেল। চরের উপর কাদার মধ্যে নেমে নফরকেষ্ট হাত তুলেছে, নৌকোর লোকই তখন চেঁচায়ঃ খুলনা যাবে তো উঠে এসো। দুই টাকা দু-জনার। যাক গে যাক, দেড় টাকা দিও। পাইকারি দর।

সাক্ষির দল নিয়ে খুলনার সদরে মামলা করতে যাচ্ছে কাছারির গোমস্তা। যাচ্ছে জমিদারের খরচায়, এই দেড় টাকা উপরি রোজগার। গরজটা সেইজন্য।

বলে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। টানের মুখে নৌকো রাখা যায় না। পা ঝুলিয়ে বোসো। ভাল ভাল মহাশয়-ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। গাঙের জলে ভাল করে ধুয়ে তারপরে পা তুলবে। তোমরা যাবে কদ্দুর?

কলকাতা শহর। খুলনা থেকে রেলের টিকিট কাটব।

কী করা হয় মহাশয়দের?

নফরকেষ্ট বলে, ছুরি-কাঁচির কারবার।

পাঁচ

জোয়ার ধরে নৌকো তরতর করে চলল। মোকদ্দমায় সাক্ষি দিতে যাচ্ছে, এখন তো প্রতিজনে এক-এক লাটসাহেব। যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠে তাদের কথাগুলো বলা হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে এই গোমস্তা-মশাই তাদের চিনতে পারবে না। সাক্ষিরা বোঝে সেটা বিলক্ষণ। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। তামাক হয়ে গেল তো পান, পান হল তো আবার তামাক। গোমস্তা নিজ হাতে সেজে সেজে এগিয়ে ধরে। মুখে অবিরত খোশামুদি ও রসিকতার কথা।

সাক্ষিদের দাঁত একটু যদি ঝিকঝিক করল, গোমস্তা অমনি ফেটে পড়ে হাসিতে। নৌকোর ছইয়ের নিচে এমনি সব চলছে।

সাহেবরা শেষ প্রান্তে কাড়ালের উপর। সবুর সইছে না নফরকেষ্টর : পোড়া আবাদ রাজ্যের এলাকা ছেড়ে বেরুতে পারলে বাঁচি রে বাবা। নামধাম যোগাড় করে জল-পুলিশের মোটর-লঞ্চ গাঙে খালে তক্কে তক্কে ঘুরবে। সাহেবকে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠতে পারলে যে হয়!

হাসিখুশিতে মন ভুলিয়ে রাখছে। সাহেবকে বলে, কাজকারবারের কথা জিজ্ঞাসা করল—জবাবটা কি দিলাম শুনলি তো? সাধু-মহাজনের বাড়ি থেকে এসেছি, মিথ্যে কথা এখন মুখ দিয়ে বেরোয় না।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, মিথ্যে নয়?

নফর বলে, বুঝতে পারলি নে—আ আমার কপাল! বললাম ছুরি-কাঁচির কারবার। কাঁচির কারবারি আমি তো চিরকাল। ছুরির কারবারে এই নতুন বটে!

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ছ'-টা জিভ চেপে বলেছিলাম, শুনতে 'চ'-এর মতন। বোঝ এখন, কী দাঁড়াল!

গাবতলির হাটখোলা। সারি সারি হাটের চালা দেখা যায়। বেলা পড়ে এসেছে।

সাহেব জেদ ধরল : গাবতলি নেমে ভাত খেয়ে নেবো। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি পটপট করছে।

নফরকেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে, আচ্ছা বায়নাদার তুই বাপু! পথের মাঝখানে ভাত রেঁধে কে বাতাস দিচ্ছে। টানের মুখে নৌকো রাখা যাচ্ছে না, শুনলি তো! একটা রাত্তির চিঁড়ে-মুড়ি, ছাঁচ-বাতাসা খেয়ে পড়ে থাক খুলনায় নেমেই ভাত। বাঁধা হোটেল রয়েছে—ভাত-মাছ, ছ্যাঁচড়া-মুড়িঘণ্ট অষ্ট ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাইয়ে দেবো দেখিস।

কিন্তু অবুঝ সাহেব শুনবে না। বলে, দোকানে চাল-ডাল কিনে নিয়ে একটা চালার নিচে ফুটিয়ে নেবো। নৌকো না রাখতে পারে, যাক চলে ওরা। খেয়েদেয়ে গয়নার নৌকোয় চার-ছ আনা দিয়ে যেতে পারব।

মাঝির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, ঘাটে ধরো একটু মাঝি। কেউ না নামে, আমি একলা নেমে যাই। ভাত না হলে আমার চলবে না।

যে-ই না বলেছে, যেন বোলতার চাকে ঘা পড়ল। হুঁশ হল, ক্ষিধে সকলেরই পেয়েছে। ছইয়ের নিচে সাক্ষিরা রে-রে করে উঠে : সবাই নামব আমরা, সবাই ভাত খাব। না খাইয়ে অর্ধেক মেরে কাঠগড়ায় তুলতে চাও? উল্টো-পাল্টা কথা বেরুবে তা হলে কিন্তু।

সাহেবের দিকে গোমস্তা একবার ভ্রুকুটি করে দরাজ হুকুম দিয়ে দেয় : বাঁধো নৌকো। মামলা খারিজ হয় হোক গে, ধীরে-সুস্থে যবে হয় হাজির হওয়া যাবে। মচ্ছবের কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বেঁধে রান্নাবান্না হচ্ছে। এক-চালার ভিতরে তিনটে মাটির ঢেলা বসিয়ে সাহেবদের আলাদা উনুন। চাল-ডাল, নুন-তেল-ঝাল এসেছে। একসঙ্গে ঘুঁটে খিচুড়ি হবে। জুটো পদ্মপাতাও পাওয়া গেল হাঁচ-বাতাসের দোকানে। পদ্মপাতায় খিচুড়ি ঢেলে হাপুস-হুপুস খেয়ে নিয়ে ক্ষিধে শান্ত করবে! উনুনের সামনে বসে নফরকেষ্টরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে এখন।

কিন্তু মুশকিল করল উনুনে। জ্বলে না, কেবলই ধোঁয়ায়। ফুঁ পেড়ে পেড়ে নফরা নাজেহাল। সাহেব বলে, শুকনো কাঠ খানকয়েক কুড়িয়ে আনি। এক ছুটে এনে দিচ্ছি।

গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

কাঠ কুড়াতে গিয়ে সাহেব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। খোঁজাখুঁজি করে নফরকেষ্ট যাতে না ধরতে পারে। চলেছে সোনাখালি গাঁয়ে—পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি যেখানে। বংশীয় আজামশায়—সুবিখ্যাত পচা বাইটা। একালের চোর-চক্রবর্তী—বলাধিকারীর মতো মানুষও যার কথায় শতমুখ হয়ে ওঠেন। ক্ষিধে-ক্ষিধে করে গাবতলির ঘাটে নৌকো ধরানো—মূলে তার এই মতলব। নফরকেষ্টকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি, জানলে কোনক্রমে ছাড় হত না। হয়তো বা নিজেই পিছন ধরত। বাইটার যা মেজাজ শোনা গেছে, দল বেঁধে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

সোনাখালি বংশীর মতে ক্রোশখানেক পথ। পথের মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে-ও বলে এক ক্রোশ। ডাল-ভাঙা ক্রোশ বলে থাকে—সেই বস্তু নিশ্চয়। একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রওনা হলাম—ডালের পাতা শুকাল, তখনই ধরা হবে ক্রোশ পুরেছে এইবারে। আবার মনে হচ্ছে, এ পথ দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড। গল্পে আছে, দীনবন্ধু-দাদা এক খুরি দই দিয়ে গেলেন, শত শত লোক পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে যাচ্ছে! খুরি যতবার উপুড় করে তত আবার ভরতি হয়ে যায়, কমে না। সেই গাবতলির ঘাট থেকেই এক ক্রোশ চলছে—বেলা ডুবে সন্ধ্যা হয়ে আসে, জিজ্ঞাসা করলে এখনো সেই এক জবাব : ক্রোশখানেক এখান থেকে।

এক সময়ে অবশেষে সোনাখালি এসে গেল, পঞ্চানন বর্ধনের কিন্তু খোঁজ হয় না। এত বড় ডাকসাইটে মানুষ, অথচ যাকে বলছে সে-ই হাঁ করে থাকে।

সোনাখালি বলে কেন, তল্লাটের ভিতরেই ও-নামের মানুষ নেই। চিনতে কি তাহলে বাকি থাকত ?

অন্ধকারে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে পড়েছে। দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে পাটটাকুর নিয়ে মুরুব্বি মানুষটা কোষ্টা কাটছে। মুখ তুলে বাঁ-হাতটা কানের পাশে নিয়ে সে বলে, অ্যাঁ, কী নাম বললে—পঞ্চানন বর্ধন, আমাদের সোনাখালির ?

সেই বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মাথার উপর বার কয়েক টোকা দিয়ে বলে, ও হয়েছে। পঞ্চানন নয় তিনি, পচা। বর্ধন নয়, বাইটা। পচা বাইটা পঞ্চানন হয়েছে বুঝি ! পয়সা করেছে, দালানকোঠা দিয়েছে—দশানন শতানন হলেই বা কে ঠেকায় ? উল্টো পথে চলে এসেছ বাপু। দক্ষিণ মুখো ফেরো, ওরা দক্ষিণ পাড়ার লোক। পঞ্চানন নয়, বোলো পচা বাইটা। বরঞ্চ বড় ছেলের নাম ধরেই জিজ্ঞাসা কোরো, মুরারি বর্ধন মশায়ের বাড়ি যাব। সেখানে বাইটা বলে বোসো না কিন্তু—খবরদার, খবরদার ! বে-ইজ্জতি হবে। বাপ বাইটা, ছেলে বর্ধন।

সে বাড়ি কদ্দুর ?

এক ক্রোশ।

অতএব সাহেব দক্ষিণমুখো পুনশ্চ এক ক্রোশ ভাঙতে চলল।

মানুষটা সন্দিগ্ধকণ্ঠে পিছন থেকে ডাকে : শোন, শুনে যাও। পচা বাইটার কাছে কি তোমার ?

সাহেব নিরীহভাবে বলে, কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরছি। বর্ধনমশায়ের নাম শুনলাম। যদি একটা কাজে লাগিয়ে দেন।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়। ধান কাটার মরশুম, তার জন্য বিস্তর জনমজুর লাগে। এবং ধান পেয়ে অবস্থা সচ্ছল হওয়ার দরুন ছেলেপেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য হঠাৎ পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজন হয়, অসুখবিসুখ ডাক্তার-কবিরাজের খোঁজ পড়ে। বাদাবনে ঢুকে কাঠ ও গোলপাতা কাটবারও সময় এই, এবং আরও কিছু পরে চাকের মধু ভাঙবার। ডাঙা অঞ্চলের বিস্তর লোক কাজের চেষ্টায় এই সময়টা নাবালে নেমে আসে। হাটে গিয়ে বসে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে।

কী কাজ করবে তুমি ?

বাছাবাছি নেই, পয়সা পেলেই হল। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাড়া ! যা-কিছু পাই, লেগে পড়ব।

গৃহস্থমানুষ আমিও, কাজ কি আমার কাছে নেই ? রাখালের কাজ করবে তো বলো, এক্ষুনি বহাল করে নিই। ছোট ছেলেটা করত, নতুন পাঠশালা হয়ে

সে এখন পাঠশালায় বসতে লেগেছে। গায়ে ফুঁ দেওয়া কাজ। গরু-বাছুরে মিলে তেরোটা, আর ছাগল দুটো। গাই দোওয়া হয়ে গেল—এক কাঁসর পান্তা আচ্ছা করে ঠেসে নিয়ে টিকিটিকি তুমি গরু-ছাগলের পিছন ধরে বেরুলে। কারো ক্ষেতে গিয়ে না পড়ে। সাঁজের বেলা গোয়ালে তুলে সাঁজাল ধরিয়ে জাবনা মেখে দিয়ে—বাস্ ছুটি। মাস-মাইনে চৌদ্দ সিকে, দেশে-ঘরে ফেরবার সময় ধান এক মলি—তার উপর তিন বেলা পেটে খেয়ে যদ্দূর উশুল করে নিতে পার, তাতে কেউ 'না' বলবে না।

সোনার চাকরি—সন্দেহ কি! রাত্রিবেলা কোথায় এখন হড্ড-হড্ড করে বেড়াবে! যা গতিক—এক ক্রোশ ভেঙে দক্ষিণপাড়া পৌছতে সকাল হয়ে যাবে হয়তো। সাহেব এক কথায় রাজি। বলে, রাখালির উপরেও পারি আমি। লেখাপড়া শেখা আছে খানিকটা ইংরাজিতে নাম দস্তখত পর্যন্ত পারি।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে সেই লোক বলে, বটে, বটে এত গুণ তোমার! তা হলে গোমস্তার কাজটাও নিয়ে নাও না কেন সকালবেলা। গোমস্তাগিরি সারা করে কলম রেখে, পান্তা-টান্তা খেয়ে রাখালিতে বেরুবে। ধান বাড়ি দেওয়ার ব্যবসা আমার। কত ধান কে কর্জ নিয়ে গেল, কার নামে কি পরিমাণ উশুল পড়ল, সেই উশুলের মধ্যেই বা সুদ কত, আসল কত—এ সবের নির্ভুল হিসাব রাখা গোমস্তার কাজ। মাইনে তিন টাকা, আর খাওয়া অমনি তিন বেলা। কিন্তু একলা একটা মানুষ তুমি—তিন বেলার জায়গায় ছ-বেলা খাবে কেমন করে? খেতে চাও কোন আপত্তি নেই। দুই চাকরির মাইনে দাঁড়াল চৌদ্দ সিকে আর তিন—একুনে সাড়ে ছয়। ওরে বাবা, লাটসাহেব পেলেও তো বর্তে যান।

নিশ্চিন্তে আহার-আশ্রয়, মাস মাস মাইনের টাকা। রাত্রিবেলা আসল কাজকর্ম—সেই সময়টা পুরো অবসর থাকছে। আর কী চাই। খোশামুদি করে সাহেব কথা আরও পাকা করে নেয়ঃ কপাল ভাল আমার, ভাল জায়গায় এসে পড়েছি।

লুফে নিয়ে মানুষটা বলে, ভাল বলে ভাল! এসেছে পাটোয়ার-বাড়ি—রাতে ঠাহর করতে পারছ না। বাইটারদের গুলে খেতে পারি। আমার নাম দীননাথ পাটোয়ার। পচা বাইটা যখন পঞ্চানন, আমি হতে পারি মহারাজ রাজবল্লভ। হইনে কেন জানো? এখন লোকে একডাকে চেনে, তখন চিনতেই পারবে না। 'মহারাজ রাজবল্লভ' লিখে কপালের উপর সেঁটে বেড়াতে হবে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

তালপাতার চাটকোল এগিয়ে দিল পাটোয়ারমশায়ঃ বোস—

দাওয়ায় উঠে সাহেব মুখোমুখি বসল। আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। একবার উঠে গিয়ে গোয়ালের গরু-ছাগল দেখে এলো—সুঁচাল-শিং দামড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাব-সাব করে এলো খানিকটা। রাত পোহালেই চাকরি—দু-দুটো চাকরি একসঙ্গে।

প্রহরখানেক বেলায় গরু নিয়ে বেরিয়েছে। গরু তাড়িয়ে দক্ষিণপাড়ার দিকে গেল। এপাড়া-ওপাড়ায় এমনি কিন্তু পথ বেশি নয়। মাঝখানে বাঁওড় একটা —সেজন্য জলকাদা বাঁচিয়ে রাস্তাপথে অনেকখানি বেড় দিয়ে যেতে হয়। পচা বাইটাকে এক নজর অন্তত না দেখে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। খোঁজে খোঁজে বাড়ির সামনে চলে এলো। ভিতর-বাড়িতে পাকা-দালান দু-তিন কুঠুরি আর বাহির-ভিতর মিলিয়ে কাঁচঘর যে কতগুলো, গুণতিতে আসে না। লোকে বলে, চোরের যত বড় রোজগারই হোক বাড়িতে কখনো দালানকোঠা হবে না। জোর করে দালান দিতে গেলে পুলিশের হাঙ্গামা কি পারিবারিক দুর্ঘটনা কিন্তু অপর কোন বাধা মাঝখানে পড়ে আয়োজন পণ্ড করে দেবেই। পচা বাইটার বেলা কেবল নিয়মটা খাটল না। একটা কথা এই হতে পারে, দালান-কোঠার সঙ্গে পচার সম্পর্ক কি? একটা রাতও সে পাকা ছাতের নিচে শোয়নি, বাইরের দোচালা খোড়োঘরে তাকে চালান করে দিয়েছে।

সকলের অলক্ষ্যে চারিদিক ঘুরে দেখে সাহেব আপাতত ফিরে গেল। প্রহর দেড়েক রাত্রে ছুটেছে আবার দক্ষিণপাড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুড়ুত করে ঘরে ঢুকল। পচা বাইটার সামনাসামনি।

টেমি জ্বলছে। উবু হয়ে বসে পচা ভড়ফড় করে হুঁকো টানছে। আশি বছরের উপর বয়স। তেমাথা মানুষ বলে কথা আছে—এক মানুষের তিন মাথা পাশাপাশি—অবিকল তাই। দুটো হাঁটু দু-দিকে, মাঝখানে পাকাচুল-ভরা আসল মাথাটুকু।

বাপ মারা যাচ্ছেন—ছেলেরা কেঁদে বলে, কেমন করে সংসার চলবে বলে যাও। বেশি বলবার তাগত নেই, মাত্র দুটো কথা বলে গেলেন তিনি: নিত্য মাছের মুড়ো খেও, তেমাথার কাছে বুদ্ধি নিও। পিতৃ-উপদেশে ছেলেরা পুকুরের যাবতীয় রুই কাতলা ধরে ধরে মুড়ো খায়, তেমাথা পথে গিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকে বুদ্ধি নেবার জন্য। এমনি করে ফতুর হয়ে যাবার দাখিল। হঠাৎ এক বুড়োথুত্থুড়ে বিচক্ষণ মানুষের দেখা পেয়ে গেল। তিনি বললেন, তেমাথা আমিই হে। যখন বসি, দুই হাঁটুর ভিতর মাথা নুয়ে পড়ে মোট তিন হয়ে যায়। কাতলা নয়, চুনোমাছ কুচোচিংড়ি খেতে বলেছে—গ্রাসে

গ্রাসে যে মুড়ো গণ্ডা গণ্ডা খাওয়া হয়ে যায়। তার মানে, দিনকাল বুঝে কঞ্জুষ হয়ে চলবে।

পচা বাইটাও তেমনি এক তেমাথা মানুষ।

চোখ বুঁজে আয়েশে হুঁকো টানছিল, পায়ের শব্দে পিটপিট করে তাকায়ঃ কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

সাহেব বলে, বিদেশি লোক, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। দীননাথ পাটোয়ার মশায়ের বাড়ি উঠেছি। তিনি একটু কাজ দিয়েছেন।

দীননাথটা কে হল আবার?

চুপচাপ পচা বাইটা ভাবে। বয়সের দরুন বিভ্রম এসেছে হয়তো। কিন্তু এমন কিছু নয়। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, ও, সুখময় পাটোয়ারের বেটা দীনে। একরত্তি মানুষটাকে নিয়ে তুমি আজ্ঞে-হুজুর মশায় করতে লেগেছে— বুঝি কেমন করে?

সাহেব সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে একরত্তি তিনি কেমন করে হলেন? গাল দুটো জুড়ে কান অবধি এই মোটা গোঁফের তাড়া—

পচা বাইটা অধীর হয়ে বলে, পেট থেকেই যদি গোঁফ নিয়ে পড়ে, তাই বলে বয়সে বুড়ো বলতে হবে? সাতানব্বুই সালে সেই যে বড় বুড়ি হল, সে আর ক'টা দিনের কথা! সেইবারে দীনের জন্ম। সুখো পাটোয়ার রাত দুপুরে জল ঝাঁপিয়ে নেত্য-দাইয়ের বাড়ি যাচ্ছে, আমি মানা করে দিলাম—নেত্যকে পাওয়া যাবে না। চকদার পুঁটে চক্কোত্তির বউয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে, বিকাল থেকে নেত্য সেইখানে পড়ে আছে। দাই বিনেই ছেলে হল ভোররাত্রে। ঐ দীনে।

বাংলা বারো-শো সাতানব্বুই সালে বড় বন্যা হয়। লোকের বড় সুখ—

গল্প শোনার মানুষ পেয়ে পচা বাইটা শুরু করে দিয়েছে: উঠোনের উপর এক-হাঁটু এক-বুক জল। লোকের সুখের অন্ত নেই সেই ক'টা দিন। ছাঁচতলায় মাছের আফালি—ঘরের দাওয়ায় জলচৌকি পেতে মনের আনন্দে মাছ ধরে। ঘোলা জলের আবর্ত—তার মধ্যে মাছ খুব খায়, টানে টানে উঠে আসে। চাষবাসের কাজে ভুঁইক্ষেতে যেতে হচ্ছে না—মাছ মারো, খাও আর ঘুমোও। কলসির চাল বাড়ন্ত হবে এবং বন্যার জল সরে গিয়ে ক্ষেতের পচা ধানচারা বেরিয়ে পড়বে একদিন। সে হল পরের কথা। তখনকার ভাবনা ভেবে আজকে সুখ মাটি করা কেন?

সেদিনের গল্প এই অবধি। পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে সাহেব গল্পের গূঢ় অংশটুকুও শুনেছে। এক একখানা কাজ নামাবার আগে অনেকদিন—এমন কি এক বছর

দু-বছর ধরে খোঁজদারি করে বেড়াতে হয়। চকদার চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ি এবং আরও কয়েকটা জায়গায় খোঁজদারি চলছিল কিছুকাল ধরে। ডাঙার কাজে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াতে হয়। কিন্তু বন্যার কারণে শুধুমাত্র দাওয়ায় বসে মাছ ধরা নয়, এসব কাজেও সুবিধা এসে গেছে। ডাঙাই নেই, হাঁটি কোথা এখন? ডোঙা একেবারে মক্কেলের ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে সিঁধ কাটা চলে। ভগবান যখন এতই সদয়, বানের জল থাকতে থাকতে কাজগুলো সমাধা করে ফেলবে। কিন্তু পুঁটে চক্কোত্তির বাড়ির কাজে বাগড়া পড়ল। নেত্য-দাইকে নিয়ে এসেছে, সকলে রাত জাগছে। সেই খবরটাই দিয়েছিল দীনুর বাপ সুখময় পাটোয়ারকে।

কলকে উপুড় করে পচা ঠকাস করে ঘা দিল মাটিতে। তামাক পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। দু-চোখ এতক্ষণে স্পষ্টভাবে মেলে সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে: পাটোয়ার বাড়ি-তো অনেকখানি দূরে। তোমাদের এ বয়সে অবিশ্যি কিছু নয়। তবু যে রাত্তিরবেলা চলে এলে, বাঞ্ছাখানা কি শুনি?

মনোগত বাঞ্ছা প্রথম দেখাতেই বলে ফেলতে সাহস হয় না। ভাব বুঝে নিতে হবে আগে। সাহেব বলে, নাম শোনা আছে অনেক। গাঁয়ের উপর এসে পড়েছি, তাই ভাবলাম দেখাশোনা করে আসা যাক। উঠবেন না, উঠতে হবে না। কলকেটা আমায় দেন দেখি, আমি সেজে দিই।

বুড়োকে উঠতে দেয় না: কলকে একরকম হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব তামাক সাজতে বসে।

ছোকরার খাতির দেখে পচার কণ্ঠ কিছু প্রসন্ন: নাম শুনেছ আমার—কার কাছে শুনলে? কি শুনেছ, কেবলই তো নিন্দেমন্দ—হ্যাঁ?

হাঁটুর মাঝ থেকে উৎসাহ ভরে একটুখানি ঘাড় তুলেছে তো ঘাড়ের কাঁপুনি। কাঁপুনির চোটে কথাই বেরোয় না। আবার যথাস্থানে ঘাড় রেখে বলে, আত্মীয় কুটুম্ব আপনপর মরে গেলেও আজ আমার নাম করতে চায় না। নিজের ছেলে দুটোই তাই, অন্যের কথা কী বলব। বাপের নামে বেটাচ্ছেলেদের লাজ লাগে, লাজে মাথা কাটা যায়।

একবার কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগল: কালে কালে রেওয়াজ বদলায়—বুঝলে? আমাদের বয়সকালে কাঁদিনথের খুব চলন। বিয়ে করে এলাম—মা নথ দিয়ে বউয়ের মুখ দেখলেন। বউ দেখি মুখ ভার করে বেড়ায় —কী না, নথের চক্কোর ছোট, ভাতের গ্রাস নথের ফুটো দিয়ে মুখে ঢোকে না, টানা দিয়ে নথ সরিয়ে ভাত খেতে হয়। শেষটা নথ ভেঙে অনেক বড় করে

গড়ে দিতে হল। গলায় হাঁসুলি পরে—প্রায় সেই মাপের। আর এখন তো নথ পরা উঠেই গেছে একেবারে। নাক ফুটিয়ে মেয়েলোকে গয়না পরতে চায় না।

শুধু গয়না বলে কেন, হালচাল সব দিক দিয়ে বদলেছে। বোম্বেটে কথাটা সংক্ষেপে করে হল বেটে। তাই থেকে বাঙাল রীতির উচ্চারণ বাইটা। পচার প্রথম বয়সে বাইটা কথার ভারি কদর ভাঁটি-অঞ্চলে। পচা বাপ-পিতামহের বর্ধন উপাধি ছেঁটে বাইটা জুড়ে নিজ নামের উল্লেখ করত। এখন বাইটা নামে লোক নিচু চোখে তাকায়। দুই ছেলে বড় হয়ে আবার বর্ধন হয়েছে—শ্রীযুক্ত বাবু মুরারিমোহন বর্ধন ও শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দমোহন বর্ধন। কিন্তু পিতৃনাম শতেক চেষ্টা সত্ত্বেও, বাইটা মুছে পঞ্চানন বর্ধনে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। সেইজন্যে মনোভাব, বাপ মানুষটাই ভবধাম থেকে মুছে গেলে মন্দ হয় না।

আত্মকথা বলতে বলতে পচা বাইটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনুপস্থিত দুই ছেলেকে সম্বোধন করে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ওহে শ্রীযুত বাবুরা, তোদের বাবুয়ানিটা নিয়ে এলো কে? জমি, ঘরবাড়ি, আওলাতপশার সবই এই বাইটার রোজগারে। এখন হয়েছে—মানুষটা আমি চলে যাই, বাকিগুলো ষোলআনা বজায় থাকুক। কলিকাল নয়তো বলেছে কেন? দুটো ছেলেই মায়ের রীতচরিত্র পেয়েছে। বেশি হল ছোটটা—সাধু হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে ফুলহাটায় পড়ে থাকে। রাহু কেতু দুটোর দৃষ্টি কি না তার উপরে—ছোট বয়সে মা কানে মন্তোর দিত। বয়সকালে বউ হয়ে যে এলো, সে-ও দিচ্ছে।

রাগের চোটে লম্বা লম্বা দম নিয়ে কলকের তামাক শেষ করে ফেলল। সাহেব তম্মুহূর্তে সেজে দেয় আবার। পর পর তিন-চার ছিলিম চলল। কেউ আসে না সেকালের এক-ডাকে-চেনা মানুষটার কাছে। মানুষ পেয়ে পচা বর্তে গেছে, সাহেবের সবিনয় কথাবার্তা বড় ভাল লাগছে। শেষের ছিলিমটা কয়েক টান টেনে পচা ভুঁয়ে রাখে না, সাহেবের হাতে এগিয়ে দেয়ঃ খাও—

সাহেব বাঁ-হাতের উপর ডান-হাত ধরে তটস্থ ভাবে হুঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেশান দিয়ে রাখল।

পচা বলে, সামনে না খাবে তো আবডালে গিয়ে খাও। হাত্‌নের ওদিকটায় নিয়ে দু-টান টেনে এসো। তামাকটা ভাল, মিছে পুড়িয়ে নষ্ট কোরো না।

এ কথার ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে সাহেব বলে, আপনার কাছে এসেছি একখানা-দুখানা গল্প শুনব বলে।

গল্প? গল্পটল্প আমি জানি নে। আমার কাছে গল্প আছে, কে বলল তোমায়?

কোটরগত চক্ষুদুটো যথাসম্ভব বড় করে পচা বাইটা সাহেবকে দেখছে। কী রূপের ছেলে মরি মরি! দেখে চক্ষু শীতল হল। এককালে পচা বাইটা

অঞ্চল তোলপাড় করে বেড়িয়েছে। গল্পে আর কী থাকে, সে জিনিস গল্পের চেয়ে ঢের ঢের আজব। কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি—একটা কথাও ফাঁস করতে নেই। যতদিন কাজের ক্ষমতা থাকে, তার মধ্যে তো নয়ই। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় শেষটা, সেরেসামলে ঢেকে ঢুকে জীবন কাটিয়ে একদিন অবশেষে চোখ বোজে। কোন দেশের ছোঁড়া তুমি, ঢাকা ধরে টান দিতে এসেছ।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে পড়ে কিছু নরম হয়ে পচা বলে, কিসের গল্প শুনতে চাও? ভূতের বাঘের—?

সাহেব হেসে বলে, আর একটা জিনিস বাদ রাখলেন কেন? সেই গল্প বলেন যদি দুটো-পাচটা—

[ভাঁটি-অঞ্চলের ছেলেপুলের তিন রকমের গল্পের ঝোঁক। বাঘের গল্প, ভূতের আর চোরের গল্প। এই তিন ব্যাপার নিয়েই সদাসর্বদা চলাচল—রাজা-রানী-রাজকন্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।]

সাহেব বিশদ করে বলে, এই আপনাদের আমলে যা-সমস্ত হত। আপনার মতন ডাকসাইটে গুণী মানুষ সদরে হাকিমের কাছে গিয়ে একবার করলেন—তদ্বির করে পায়ে পায়ে গিয়ে যেন ফাটকে ঢুকে পা—জিনিসটা আমার কেমন-কেমন লাগে।

পচা বাইটা রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠল: কে বলল তোমায়? এত সব খবর জোটালে তুমি কোথা থেকে?

সাহেব বলে, ফুলহাটায় ছিলাম অনেকদিন। আপনার নাতি বংশীর সঙ্গে ভাব—সে-সব বলত। সকলে নিন্দেমন্দ করে বলছেন, বংশী তো দেখলাম আজামশায়ের কথায় পঞ্চমুখ।

পাঁচটা মুখে হুক্কাহুয়া করে, তার উপরে বিশ্বাস করে তুমি এত পথ ছুটে এসেছ? যাও তুমি, বিদেয় হও।

বেজার মুখে বুড়া বলে যাচ্ছে, বংশী আবার একটা মানুষ! কী বোঝে সে, আর কী বলবে? দাও-দাও করে আমায় জ্বালিয়ে মারে। না পেরে শেষটা শেয়াল-কুকুরের ডাক ধরিয়ে দিলাম। নরদেহ হলেও আসলে তো ঐ। যা শালা, জাতকর্ম করে বেড়াগে—

মুখে হাসির চিকচিকানি দেখে সাহেব কিছু সাহস পায়। বলে, আপনার আর এক সাগরেদ গুরুপদও বলে আপনার কথা।

গুরুপদ গিয়ে জুটেছিল? ওটা একেবারে মুখ্যু, এমন কথা বলিনে। কিন্তু যেটুকু গুণজ্ঞান তার শতেক গুণ দেমাক। সেজন্য কিছু হল না। ঐ যে আমার একবারের কথা বললে, তার জন্যে গুরুপদরও দায় আছে। আমার

ফাটক হলে গুরুপদ এদিককার কাজকর্ম ছেড়ে কেনা মল্লিকের সঙ্গে জুটেছিল। সেখানে তো শুনি নৌকোর উপরে দাঁড়ে বসিয়ে রাখত, আর কোন কাজ দিত না। বয়স হয়ে গিয়ে এখন আর দাঁড়ের কাজও পারে না।

সইয়ে সইয়ে সাহেব টান দিচ্ছে, বেরুচ্ছেও কথা। বলে, গুরুপদকে সর্দার ধরে আমরা একটা কাজে গিয়েছিলাম এর মধ্যে।

শিউরে উঠে চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে পচা বলে, আরে সর্বনাশ! বেরিয়ে এসেছ ভালোয় ভালোয়—এমন তো হবার কথা নয়। ওস্তাদের আশীর্বাদের জোর বলতে হবে। ওস্তাদ কে তোমার বাপু?

সাহেব মুখ চুন করে বলে, সে ভাগ্যি আর হল কোথায়? কার দয়া পাব—আশায় আশায় তল্লাট চুঁড়ে বেড়াচ্ছি। পাকেচক্রে জগবন্ধু বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি তো গুরু-ওস্তাদ নন, মহাজন।

পচা বলে, ওস্তাদ না-ই হোক, তা-বড় তা-বড় ওস্তাদের কান কেটে দিতে পারে সেই মানুষ।

দেখা গেল, বলাধিকারী যেমন পচার কথায় মেতে ওঠেন, পচারও ঠিক সেই ভাব বলাধিকারীর নামে। কিন্তু পয়লা দিন আর অধিক নয়। মানুষটা রগচটা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বংশীর কাছে অনেক শুনেছে। তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, ধৈর্য ধরে চেপে বসে তবে যদি কিছু আদায় হয়। তক্ষুনি ওঠে না তা বলে। নিরীহ গোছের ছাড়া-ছাড়া গল্প হল কয়েকটা। হয়তো বা পচার নিজেরই, কিন্তু বলল পরের নাম করে। যথেষ্ট হয়েছে, থাক এখন এই পর্যন্ত।

চলল এইরকম। তাড়াতাড়ি গোয়ালের কাজ সেরে নাকে-মুখে কোন গতিকে দুটো ভাত গুঁজে সাহেব চুপিসারে পাটোয়ার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকে জানে, সারাদিন খাটাখাটনি করে ছোঁড়া সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। ওদিকেও জমে আসছে—পরের বেনামি গল্প হতে হতে এখন স্পষ্টা-স্পষ্টি পচার নিজের কথা। সংসারসুদ্ধ লোকের উপর পচার রাগ—ছোটছেলে মুকুন্দর উপর সকলের বেশি। বাপের নাম পরিচয়ের লজ্জা, সেজন্য বাড়ি ছেড়ে বেরুল। কালেভদ্রে যখন বাড়ি আসে, উঠানের উপর রামায়ণের আসর বসায়। বাপের কাছেও ধর্মকথা শোনাতে যায়, এত বড় আস্পর্ধা। হুবহু মায়ের স্বভাব পেয়েছে—সেই রমণী যতকাল বেঁচে ছিল, কায়দায় পেলেই ভাল লোক হবার জন্য মাথা খুঁড়ত বাইটার কাছে। নানান ফন্দি আটত।

ছয়

নিধিরাম নাথের বাড়ি চুরি। ভাঙা কুড়েয় পড়ে থাকে লোকটা। কুষ্ঠব্যাধি —পচে গলে এক এক অঙ্গ খসে পড়ছে। একটা কবিরাজী পাঁচন কিনে খাওয়া সঙ্গতিতে কুলায় না। সেই লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে থানায় এসে চুরির ফর্দ দেয়। ফর্দ শুনে বড়বাবু-ছোটবাবু, মুন্সি-বরকন্দাজ থানাসুদ্ধ সকলের চক্ষু কপালে ওঠে। থান থান সোনার মোহর, ঘটি-ভরা রুপোর টাকা। বিধবা বোন থাকে সংসারে, সদরের উপর তার বেনামে ফলাও কাপড়ের ব্যবসা। মালিক বোন অবধি তার বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না। ত্রিসংসারের মধ্যে ধন-সম্পত্তির খবর জানে একমাত্র কুটে-নিধিরাম।

আর জানত চোরে, যাদের ভয়ে এতদূর সামাল-সামাল করে বেড়ায়। ঠিক এসে তুলে নিয়ে গেছে। এজাহার দিতে এসে নিধিরাম ঢিবঢাব করে বুক থাবড়ায়ঃ নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকি আমি—কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। রোগের কষ্টে আপন ঘরে শুয়ে ছটফট করি, রাতের মধ্যে ঘুম হয় না। বলি, খুব ভাল, যক্ষি হয়ে মাল আগলাচ্ছি, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাত বাড়াতে হবে না। বলব কি বাবুমশায়রা, চোর যেন মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে জায়গার নিরিখ করেছে। ইঞ্চি ধরে মাপ করে এসেছিল—যেখানটা মাল, ঠিক সেইটুকু গর্ত খুঁড়েছে। এক বিঘত এদিক-ওদিক নেই। তারই হাত তিনেক দূরে আমি বেহুঁশ হয়ে আছি।

থানায় তখন বটুকদাস রাউত—অত বড় ঘড়েল দারোগা হয় না। বটুকদাস বলেন, ঐ তিনটে হাত ঠেলে তোকেও কেন গর্তে ফেলে কবর দিয়ে দিল না? চিরকাল ধরে ঘুমুতিস।

নিধিরাম হাউহাউ করে কেঁদে উঠলঃ সেইটে হলে বেঁচে যেতাম বড়বাবু। খালি ঘরে কেমন করে থাকব! মোটে ঘুমুইনে—সে সময়টা কী কালঘুমে যে ধরল আমায়।

পিছনের জানলায় আড়চোখে একটু দেখে নিয়ে বটুকদাস কথার মাঝখানে হঠাৎ বলেন, সেই থেকে তো উপোসি রয়েছিস—কিছু খেয়ে নে, ওদের বলে দিচ্ছি। তারপরে সব শোনা যাবে।

পচা বাইটা নিজের নামেই বলে এখন। হাকিমের কাছে গিয়ে কাজের

ব্যাপার নিজেই স্বীকার করেছিল, সেই গল্প উঠেছে। সাহেব কৌতূহলে প্রশ্ন করে, সত্যিই তো। কুটে-নিধে মাটির নিচে মাল রেখেছে, টের পান তা কেমন করে ?

সেকালের অনেক তুকতাক বলাধিকারীর কাছে শোনা আছে। মায়া-অঞ্জন—চোখে লাগিয়ে নিজে তো অদৃশ্য, সেই সঙ্গে দুটো চোখে এমন জোর আলো এসে যায়, পাতালের তলে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় মাল লুকানো থাকলেও নজরে পড়ে যাবে। মৃচ্ছকটিক নাটকে আছে মন্ত্রপূত বীজ—ঘরে ঢুকে মেঝের উপর বীজ ছড়িয়ে দিন, মাটির নিচে মাল পোঁতা থাকে তো খইয়ের মতন ফটফট করে বীজ ফুটে যাবে। মাল না থাকলে যেমনকার বীজ তেমনি। কথারত্নাকরে একরকম শিকড়ের উল্লেখ আছে—বাক্স-পেঁটরায় শিকড় বুলিয়ে মালের হদিস পাওয়া যায়। দশকুমারচরিতে যোগচূর্ণ আর যোগবর্তিকার কথা পাওয়া যায়। যোগচূর্ণ মায়াঅঞ্জনেরই রকমফের—চোখে লাগাতে হয়। যোগ-বর্তিকা জালিয়ে দিলে গৃহস্থের চোখে ধাঁধাঁ লাগবে, চোর দেখতে পাবে না। কিন্তু সেই আলোয় সব বমাল চোরের নজরে পড়বে।

এসব সেকালের পুঁথিপত্রের ব্যাপার। মানুষ এখন তুকতাক শিকড়-বাকড মানতে চায় না। হাল আমলের কায়দাটা কি ? সাহেব জিজ্ঞাসা করে : সত্যিই কি মাটির গন্ধ শুঁকে নিধিরামের মালের খবর বুঝে নিলেন ?

গল্প অবধি পচা উঠেছে বটে, কিন্তু এমনি সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। অথবা চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পড়ে। আজকে একটা মোক্ষম তুলনা দিল হঠাৎ। সেই তুলনা সাহেবের সারাজীবন মনে থেকে গেল।

বাইটা হেসে বলল, অন্তর্যামী আমরা—তা বুঝি জানো না ? আকাশের দেবতা অন্তর্যামী, আর ভবসংসারে সিঁধেল চোর। চোখে সব দেখতে পাই, টের পাই সমস্ত।

বর্ণে বর্ণে সত্য, পরবর্তীকালে সাহেব খাটিয়ে দেখেছে। দরকারে লাগুক আর না লাগুক, অঞ্চলখানা নখদর্পণে রাখতে হয়। আশালতার গয়না চুরি করল, মধুসূদনের তারপরে তড়পানি : বাড়িটা আমাদের না চোরের ? বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেষ্টদাস শুনে এসে বলেছিল। হাসির কথা—জানে না, সেইজন্য বলে। আইন মতে স্বত্ব তোমার বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন এক নিশীথে পুরোপুরি অধিকার নিশিকুটুম্বর হয়ে যায়। বাড়ির খুঁটিনাটি খবর অনেক বেশি জানে সে তোমার চেয়ে। মানুষজন গরুবাছুর গাছগাছালি খানাখন্দ সমস্ত। নিজের জিনিস—সেই দেমাকে তুমি কখনো অতশত খুঁটিয়ে জানতে যাও না।

আরও আছে। তুমি শুয়ে পড়লে, তারই মধ্যে কত-কিছু পরিবর্তন হয়ে

গেছে। দরজার মুখে হয়তো শেয়াকুলের কাঁটা, বেরুতে গিয়ে কাঁটায় জড়িয়ে পড়বে। অথবা নোংরা বস্তু কিছু— পা হড়কে রাতদুপুরে নরক-ভোগ। তার উপরে কাঁচা ঘুমের মধ্যে উঠে পড়েছ, ঘুম লেগে রয়েছে চোখে। সতর্ক সক্ষম চোরের সঙ্গে পারবে তুমি? আধিপত্য তারই তখন। মুখে তড়পালে কি হবে!

নিধিরামের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলেই বটুক দারোগা বুঝেছেন, পচা বাইটার পাকা হাত রয়েছে এই কাজে। আগেভাগে ঘাঁটা দিয়ে লাভ নেই, তাতে বরঞ্চ সতর্ক করে দেওয়া হবে। বড় মাছ ধরবার যে কায়দা—বেড়জাল দূরে দূরে নামিয়ে দিয়ে ক্রমশ আঁটো করে নিয়ে আসা। অত্যন্ত চুপিসারে সেই আয়োজন চলছে।

এমনি সময় অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কাজের মধ্যে গুরুপদও ছিল সুযোগ করে দিল সে-ই। এমন একখানা কাজ নামিয়ে এসে ধরাকে সরা দেখছে সে এখন। মাথায় মুকুট পরে অকস্মাৎ যেন রাজচক্রবর্তী হয়ে বসেছে—দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কুটে নিধের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। এয়ারবন্ধুদের মধ্যে বলে, কাজ করা বুঝি কেবল পয়সার জন্যে? পয়সা তো মাথায় মোট বয়েও রোজগার হয়। পয়সা আমাদের কাজের উপরি-লাভ। পাই তো ফেলে দেব না, না পেলেও হা-হুতাশ করব না। ইঁদুরের মতন ঘরের মধ্যে ঢুকে—কুটে-নিধে রোগের কষ্টে দিনরাত ছটফট করে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে কাজ হাসিল করা হল—এইসবই তো আসল। মাটি খুঁড়ে সোনার মোহর না উঠে যদি হাঁড়িকুড়ির চাড়াই খানকয়েক উঠত, কী আসে যায়! যে শুনেছে ধন্য ধন্য করছে—খোদ মক্কেল নিধেটাই বা কি বলে কানে শুনতে হবে না? না-ই যদি শুনব, কষ্ট করা কেন তবে?

অথচ গুরুপদ মক্কেলের ঘরে ঢোকে নি, বাড়ির উঠান অবধিও আসতে হয় নি তাকে। সে শুধু পাহারাদার। তা-ও পয়লা-দোসরা নয়, তিন নম্বরের পাহারাদার। বাড়ির চতুঃসীমার বাইরে তার ঘোরাঘুরি। কোন লোক বাড়ির দিকে আসছে দূরে থাকতেই গুরুপদ সাড়া দিয়ে জানাবে। তাকে পার হয়ে আরও দু-জন। সেই মানুষটার এত দেমাক!

কুটে-নিধি থানায় এজাহার দিতে গেল। গুরুপদ থাকতে পারে না, অলক্ষ্যে তার পিছন ধরে চলেছে।

এয়ারবন্ধুরা অবাক হয়ে যায়: সাহস বলিহারি তোর! গাঁ ছেড়ে গঞ্জের থানায় পুলিশের খপ্পরের মধ্যে গিয়ে উঠলি!

গুরুপদ বলে, অঞ্চল জুড়ে যশ গাইছে, তাতে ঠিক মন ভরল না। পথ ঘাটের কথা কানে যাচ্ছে, থানার সরকারি লোকে কি বলে শুনতে চাই।

কথা শুনবার মতলব নিয়ে গুরুপদ থানার দালানের পাশে জানলায় কান দিয়ে দাঁড়াল। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ সাহস বেড়ে যায়— জানালার কবাট একটুখানি ঠেলে দিয়ে কান ভিতর দিকে আরও বাড়ল। চতুর বটুকদাস দেখতে পেয়েছেন। নিধিরামকে বলেন, খেয়ে নে তুই কিছু, তারপরে আবার শোনা যাবে। সিপাহিদের চোখ টিপে দিলেন, দুজনে দু-দিক দিয়ে গিয়ে গুরুপদর দুটো হাত চেপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে বটুক দারোগাও গিয়ে পড়েন।

সমস্ত বীরত্ব কর্পূরের মতো উবে গিয়ে গুরুপদর কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। বলে, গঞ্জে কেনাকাটা করতে এসেছি, আমি কিছু জানিনে বড়বাবু। চেনা মানুষটা থানায় এসে উঠল—ভাবলাম, কি বলছে একটুখানি শুনে যাই।

বটুকদাস হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : তুড়ুমে নিয়ে তোল ওকে।

তুড়ুম যন্ত্রণা দেবার যন্ত্র—দুখানা জোড়া কাঠে অর্ধচন্দ্রের আকারে খাঁজ কাটা। আসামীর পা খাঁজে ঢুকিয়ে পেষণ করে। বাপ বাপ বলে পেটের কথা ছিটকে বেরোয়।

তুড়ুমের কাছে এসে গুরুপদর আর্তনাদ : আমি চুরি করিনি। বাপ-পিতামহ-চোদ্দপুরুষের নামে কিরে করছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে কিরে করছি।

বটুক দারোগা হুকুম দিলেন : শুইয়ে ফেল তুড়ুমের উপর।

বীর গুরুপদ দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরে : রক্ষে করুন ধর্মবাপ। আমি-করিনি, পচা বাইটা—

দারোগার কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে অতি মোলায়েম। কনস্টেবলকে হুকুম দিলেন : গুরুপদবাবুর জন্য মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। আসুন গুরুপদবাবু, আমার ঘরে বসে খাবেন।

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বুঝে নিয়ে বটুক-দারোগা সদলবলে পচা বাইটার বাড়ি রওনা হলেন। শেষরাত্রে পৌঁছে নিঃশব্দে ভোরের অপেক্ষায় আছেন। টের না পায়, তাহলে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। ঢেঁকিশালে ঢুকে ঢেঁকির উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন—

সেখানেও আশ্চর্য ব্যাপার অপেক্ষা করে আছে। সবেমাত্র বসেছেন, পচা বাইটা যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হয়ে বলল, আপনি ঢেঁকিশালে এসে বসলেন— লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বড়বাবু। গরিবমানুষ হলেও ঘরদুয়োর আছে তো এক-আধখানা।

অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বটুক দারোগা আরও বেশি রকম রেগে উঠলেন: ধানাই পানাই করে আমায় ভুলাতে পারবে না। প্রমাণ পকেটে নিয়ে এসেছি!

পচা বলে, এই দেখুন, ভোলাতে কে চায় আপনাকে? গুরুপদ যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। থানায় গিয়ে আমিই একরার করতাম, তা এই দেখুন অবস্থা। পা দেখাচ্ছি, অপরাধ নেবেন না বড়বাবু। প্রমাণ না দিলে চোরের কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

ডান-হাঁটুর কাপড় তুলে দেখাল। ফুলে ঢোল। কী সব তেল লাগিয়েছে, অতিশয় দুর্গন্ধ। পা ফেলতে পারছে না মাটিতে। টিপে না দেখে দারোগার তবু প্রত্যয় হয় না। গায়েও জ্বর।

কি হয়েছিল রে?

বন্ধুলোকের কাছে যেন খোলাখুলি গল্প করছে—পচা বাইটা বলে, বিস্তর পেয়ে গেলাম, কুটে মানুষের ঘরের মেজেয় রাজ্যির ভাণ্ডার কে ভাবতে পারে বলুন। স্ফূর্তির চোটে পথ তাকিয়ে দেখিনি, থানায় গিয়ে পড়লাম। ভাই-বোন দুটোয় আঙুল মটকে শাপশাপান্ত করছে। তারই খানিকটা ফলে গেল। পায়ের হাডগোড চুরমার হয়েছে বলে ঠেকে। সেই থেকে ঘরে আছি. তাড়শে জ্বর! আজকে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল, না উঠে তো পারি নে। এই দু-পা আসতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

কাতর হয়ে পড়েছে সত্যি। দু-হাতে ডান-পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে। একটু দম নিয়ে বলে, লোকে ভয় দেখাচ্ছে বড়বাবু, খোঁড়া হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবি। প্রাণে বেঁচে থাকব, কাজকর্ম কিছু হবে না—তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। সদরে বড় ডাক্তারকে একবার দেখাতে পারলে হত—কিন্তু একে মুখ্যমানুষ আমি, তার উপরে গরিব।

পচা বিরস মুখে তাকিয়ে থাকে। খোঁড়া পা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকবে, অথবা পা পচে গিয়ে অক্কাই পেয়ে যাবে, এমন উপাদেয় কথা বাইটার স্বমুখে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। ফোলা হাঁটু আরও খানিকটা টিপে দেখে তবে দারোগা নিঃসন্দেহ হলেন।

বললেন, থানায় চলে আয়। ওখানে গিয়ে যা করবার করব। গরুর-গাড়িতে যত্ন করে নিয়ে যাব, কষ্ট হবে না।

থানায় যেতে পচার আপত্তি নেই, কিন্তু গরুর-গাড়িতে নয়। পথ খারাপ, চাকা খানাখন্দে গিয়ে পড়বে, ঝাঁকিতে জীবন থাকবে না।

বটুক-দারোগা প্রস্তাব করেন: পালকিতে বেহারার কাঁধে চেপে চল্ তা হলে!

পচা বাইটা রাজি হয়েও বলে, বেটাদের পালকিগুলো যেন এক-একটা পায়রার খোপ। মুশকিল হল বড়বাবু, আমি তো গুটিসুটি হয়ে যেতে পারব না। পায়ে লাগবে।

বড়-পালকির ব্যবস্থা করছি তোর জন্যে। বিয়ের বর যে রকম পালকি চেপে যায়। ষোল বেহারা হুমহাম কার নিয়ে যাবে। তোদের বিয়ে তো পায়ে হেঁটে। পালকি চাপা বাকি ছিল—সেই সুখটা এদ্দিনে হয়ে যাচ্ছে।

থানায় নিয়ে এসে সাক্ষিসাবুদের সামনে যথারীতি একরারনামা লেখাপড়া হল। চুরির যাবতীয় বৃত্তান্ত পচা গড়গড় করে বলে যায়, জেরা করতে হয় না। বুড়ো আঙুলে নিজেই কালি মাখিয়ে এগিয়ে ধরে: নিয়ে আসুন।

দলিলের উপর টিপসই দিল পচা, আঁকাবাঁকা অক্ষরে নামসইও করল।

বমাল?

পচা মুখ টিপে হাসল এবার। বলে, বমাল চলে গেছে মহাজনের কাছে। যা আমাদের নিয়ম। তার পরের খবর জানি নে, জানবার কথাও নয়।

মহাজনটা কে বলে দাও তা হলে।

পচা বলে, নিজের উপরে ষোলআনা এক্তিয়ার, যদ্দূর খুশি বলতে পারি। নিজের বাইরে সিকিখানা কথাও পাবেন না বড়বাবু। বলতে পারেন, গুরুপদও দলের মানুষ। সব দলেই ওরকম ঘরভেদী বিভীষণ থাকে একটা-দুটো। যে অবধি বলবার সম্পূর্ণ বলে দিয়েছি, এ ছাড়া আর কিছু নেই। যা করতে হয় করুন এবারে আপনারা।

দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। খুন করলেও এর উপরে বেরুবে না, নিঃসন্দেহ সকলে। কিছু সলা-পরামর্শ চলে নিজেদের মধ্যে। বটুক বললেন, ঠিক আছে। পালের গোদটা তো সামনের উপর থেকে সরে যাক। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করে দিই। মহাজন-ডেপুটিগুলোকে বের করে ফেলতে তখন আর দেরি হবে না।

ষোল বেহারার পালকিতে তুলে পচাকে ঘাটে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পানসিতে খুলনার সদরে—সিবিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট রিচার্ডসনের এজলাসে।

কতকালের কথা, কিন্তু আজও লোকে রিচার্ডসনের নাম করে। পাগলা সাহেব, কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। মস্ত বনেদি ঘরে নাকি জন্ম। নিমকির সাহেব, জুট-কনসারনের সাহেব, পুলিস সাহেব ইত্যাদি নিয়ে এক খুলনার উপরেই সাহেব-মেম আট-দশটা। রিচার্ডসনের কারো সঙ্গেই তেমন মেলামেশা নেই। ঘেন্না করে তাদের। বলে, ছোট বংশে জন্ম—চেহারা মানুষের, কিন্তু

বিলাতি ঘোড়া-ভেড়াই ওগুলো। কোন একটা চাকরি দেবার সময় রিচার্ডসন সকলের আগে জাত-কুল জিজ্ঞাসা করে নেয়। কুলীন-সন্তান—বিশেষতঃ মুখ্য-কুলীন হলে সে মানুষের নির্ঘাৎ চাকুরি।

কাছারির আমলা-কর্মচারীর অসুখে সাহেব চিকিৎসার ব্যবস্থা দিত। অসুখ যাই হোক, ওষুধ একটি মাত্র···শ্রীফল অথাৎ বেল। মাথা ধরেছে—বলে, শ্রীফল খাও। কাশি হচ্ছে—বলে, শ্রীফল খাও! পেট নামছে—বলে, শ্রীফল খাও। পরের দিন। জিজ্ঞাসা করবে: খেয়েছিলে শ্রীফল, আছ ভাল?

ঘাড় নেড়ে বলতেই হবে শ্রীফল খেয়ে নিরাময় হয়েছে।

আর ছিল—শড়কি-বন্দুকে অগ্রাহ্য করে বড় বড় দাঙ্গার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু কাকের ডাক সইতে পারত না। কাক ডাকলে পাগল হয়ে উঠত। কাছারির সামনে শিরিষগাছের উপর কাকে কা-কা করে উঠেছে তো এজলাসের ভিতর মামলা করতে করতে রিচার্ডসন আর্তনাদ করে: খুন করল গো, তাড়াও —তাড়াও—। নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে কাঁপতে কাঁপতে খাসকামরায় ঢুকে দরজা এঁটে দেয়। তিনটে চারটে মানুষ সেইজন্য বহাল হল—লাঠি ও লগি নিয়ে তারা ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কাছারির সময়টা কোন গাছে কাক এসে বসতে না পারে।

আরও কত, বলতে গেলে মহাভারত হবে। গাইগরু কিনেছে সাহেব, কেনার সময় দুধ দশ সের দেখে নিয়েছে। কুঠিতে এসে গরু তিন-চার সেরের বেশি দেয় না। সাহেব রেগে খুন। গরুর পিঠে এবং যে গোয়ালা গাই দুইছে, তার পিঠে ছড়ির ঘা।

গোয়ালা বলে, আর আসব না—গরু দুধ না দিলে আমি কোথায় পাই? খাস বেহারা তখন বুদ্ধি বাতলে দেয়: হাঁড়িতে আগে-ভাগে দুধ রেখো, সেই হাঁড়িতে দুয়ে সাহেবের সামনে ভজিয়ে দিও। তারপরে আর কে দেখতে যাচ্ছে, তোমার দুধ ফেরত নিয়ে যাবে তুমি।

তাই। দুধ মেপে দশ সেরের জায়গায় হল বারো সেরের উপর। রিচার্ডসন গর্বভরে বুকে থাবা দেয়: দেখলে? ছড়ির ঘায়ে দুধ বেরিয়ে গেল। গোয়ালাকে দু-টাকা বখশিস সঙ্গে সঙ্গে।

পনের দিন অন্তর বিলাতের ডাকের জাহাজ ছাড়ে কলকাতা থেকে। সেই তারিখের দিন চারেক আগে থেকে রিচার্ডসনের চিঠি লেখা শুরু হত। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, লিখেই যাচ্ছে। খাসকামরায় বসে বসে লিখছে, এমনি সময় মামলার রায় নেবার জন্য আমলা এসে উপস্থিত। রিচার্ডসন বলে, নথি পড়ে যাও আমি সব শুনছি।

পড়তে পড়তে একসময় আমলা চুপ করল। রিচার্ডসন বলে, কি হল, থেমে গেলে কেন?

শেষ হয়ে গেছে হুজুর।

ঘাড় না তুলে হুজুর রায় দিল: তিন মাস ফাটক, দশটাকা জরিমানা।

আশ্চর্য হয়ে আমলা বলে, খাজনার মোকর্দমা যে হুজুর—

খিঁচিয়ে উঠে রিচার্ডসন বলে, দেওয়ানি না ফৌজদারি আগে থেকে বলবে তো সেটা। আছ কি জন্যে সব? ফাটক জরিমানা কেটে ডিসমিস লিখে নাওগে যাও।

এমনি বিস্তর গল্প রিচার্ডসনের নামে। বটুক দারোগা পচা বাইটাকে তার কাছে পাঠালেন। থানার ছোটবাবু ও কয়েকজন সিপাহি সঙ্গে এসেছে, বটুক নিজে আসেন নি। পচার সঙ্গীসাথী ও বমাল বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছেন তিনি, এই সময়টা থানা ছাড়লে তদ্বিরের গোলমাল হয়ে যাবে।

রিচার্ডসন একরারনামা পড়ল। বাংলাটা ভাল শিখেছে, বলেও ভাল। আদ্যোপান্ত মনোযোগ করে পড়ে বলে, সই তোমার?

আজ্ঞে।

যা লিখিত আছে, সমস্ত সত্য?

পচা বাইটা অম্লানবদনে বলে, কি লিখেছে আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে। সই করতে বলল, করে দিলাম। পা ভেঙে বিছানায় মাসাবধি শুয়ে আছি, এর উপরে মারধোর সহ্য করার ক্ষমতা নেই হুজুর।

রিচার্ডসন দলিলটার দিকে চোখ রেখে বলে যায়, নিধিরাম নাথের বাড়ির চুরি তোমারই কাজ, সরলভাবে স্বীকার করে যাচ্ছ তুমি—

পচা বলে, বহুত দয়া যে চুরির কথা লিখেছেন। ছ-মাস ছ-মাসের জেল। ডাকাতি আর সেই সঙ্গে একটা দুটো খুনের কথা লিখে দিলে তো ফাঁসিই হয়ে যেত হুজুর।

মুহূর্তকাল পচার মুখে চেয়ে থেকে খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেট বলল, কিছুই হবে না, বেকসুর খালাস তুমি।

খানিকটা ইতস্তত করে পচা বলল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, হাজতে পাঠাবেন হুজুর আমায়। তৈরি হয়েই এসেছি।

কিন্তু রিচার্ডসনের মেজাজ দরাজ এখন। বলে, দোষের যখন প্রমাণ নেই, হাজতে কেন পুরব? মহান বৃটিশ-আইন বলে, এক-শ দোষী মুক্তি পেয়ে যাক কিন্তু একজন নির্দোষীর অঙ্গে হাত না পড়ে। আমার জাতি এই কারণে এত

বড়। দারোগাদের আমি সতর্ক করব, সন্দেহের উপর মানুষকে ভবিষ্যতে কষ্ট প্রদান না করে। তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত পঞ্চানন, যথা ইচ্ছা চলে যাও।

সঙ্গের ছোট-দারোগা রাগে গরগর করছে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মোলায়েম কণ্ঠেই বলতে হয়। বলে, ওঠ্ গিয়ে পানসিতে, তা ছাড়া আর কোন চুলোয় যাবি ? ঘাটে পৌছে আবার সেই ষোল-বেহারা খুঁজব।

বটুক-দারোগাও বসে নেই। পচাকে সদরে পাঠিয়ে দিয়ে তোলপাড় লাগিয়েছে—বমাল চাই, মহাজন মানুষটাকেও চাই। গুরুপদ পচা বাইটার খবর বলল, তারপর লোকটা একেবারে ফৌত। থেকেও লাভ ছিল না। নিতান্ত বাইরের মহেষ, গূঢ় বৃত্তান্ত সে কিছু জানে না—ধুরন্ধর বটুকনাথ বুঝে নিয়েছেন সেটা ভাল মতো।

প্রতি সোমবারে এলাকার সমস্ত চৌকিদার থানায় এসে হাজিরা দেয়। বিধি এই রকম। সোনাখালির চৌকিদার এসেছে। তাকে আলাদা ডেকে বটুক দারোগা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পচা বাইটার বাড়ির লোকে হয়তো জানে —পচা নেই, এই সুযোগে চাপাচাপি করলে কিছু আদায় হতে পারে।

চৌকিদার বলে, বউয়ের সঙ্গে বনিবনাও নেই। পচা আর পচার মা একজোট, বউ আলাদা। সেই যে কোমরে দড়ি দিয়ে পচাকে টানতে টানতে নিয়ে এল, তার পরেই শাশুড়ী-বউয়ে তুমুল ঝগড়া। বউয়ের গলাধাক্কা দিল শাশুড়ি, বউ এখন বাপের বাড়ি গিয়ে আছে।

ভাল খবর, আশার খবর। রাগের বশে বউ বলে দিতেও পারে। বাপের বাড়ির গ্রাম দূরবর্তী নয়, এলাকার ভিতরেই। বটু-দারোগা লোক পাঠালেন, ভাইকে সঙ্গে করে বউ থানায় চলে এলো।

অল্পবয়সি, চেহারা মন্দ নয়। ভাইটা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে। সে-ই শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে। দারোগার পা জড়িয়ে ধরে বউ কেঁদে পড়ল : বাঁচান বড়বাবু।

ভয় পেয়েছে, বটুক-দারোগা তার উপর আরও ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চান। বলেন, আমি বাঁচাবার কে ! খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে গিয়ে পড়েছে, হাতে মাথা কাটে। তবে এখনো যদি সরলভাবে সমস্ত বলেকয়ে মালপত্র বের করে দিস, দয়া হয়ে যাবে। নইলে পাঁচ-সাত-দশ বছর অবধি ঠেলে দিতে পারে। একেবারে মাথা পাগল তো !

পুলকিত হয়ে উঠে বউ তাড়াতাড়ি বলে, তাই যেন দেয় বড়বাবু। নেহাৎ পক্ষে পাঁচটা বছরের কম না হয়।

ভাই এবারে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে : ভাই-বোনে নাবালক আমরা তখন, মামা কর্তা। টাকাকড়ি খেয়ে মামা চোর পাত্তর এনে জোটালেন। কিন্তু

পাণ্ডরের পুরো খবর মামাও বোধ হয় টের পান নি। মনের ঘেন্নায় তিন তিন বার বোন গলায় দড়ি দিতে গেছে। খুব লম্বা মেয়াদে যদি ফাটকে নিয়ে পোরে, ভেবে নেব বোন আমার বিধবা। আর ঐ বুড়ি শাশুড়ীরও তখন ডাঁট থাকবে না, কেঁচো হয়ে যাবে।

বটুক-দারোগা সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নেন: সেই জন্যেই তো বলছি মালপত্র বের করে দিতে। পাজি আইন আজকালকার—বমাল বিনে মামলা টেঁকানো মুশকিল। হয়তো দেখবি, খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে ডবল করে তোদের জ্বালাচ্ছে।

বউ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, আমি তো দলের বাইরে, মালপত্রের কথা আমায় কিছু বলে না। বুড়ি মাগি জানে সব। ধরে এনে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ওটাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিন, পেটের কথা সব বমি হয়ে বেরুবে।

দারোগা ভেবে নিয়ে বললেন, ভাই-বোনে যাসনে তোরা এখন। বুড়িটা আসুক। ছুপুরটা এইখানে থাক।

খুব রাজি তারা। গলাধাক্কা দিয়েছিল, খোয়ারটা দেখবে এইবার। নয়ন ভরে দেখে যাবে।

রাত ছুপুর। ঘরে-বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে পচা বাইটা গল্প করছে। মুখোমুখি সাহেব। বলতে বলতে কথার মাঝখানে হঠাৎ পচা চুপ করে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, মানুষ—

সাহেব চোখ তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাইরে তাকায়। বলে, দেখতে পাইনে তো।

পচা খিঁচিয়ে উঠল: চোখ আছে কি তোমাদের দেখতে পাবে! ছুনিয়াসুদ্ধ কানা। মানুষটা ছাঁচতলা হয়ে এবারে বেড়ার দিকে যাচ্ছে। চোখের উপর ছিল তখনই দেখতে পেলে না, এখন আর তুমি কি দেখবে?

অথচ একটিবারও পচা জায়গা থেকে নড়ে নি। নড়ে ঘুরে দেখবার কৌতূহল এখনও নেই। যেমন ছিল তেমনিভাবে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানছে, আর বলে যাচ্ছে দৈববাণীর মতো। পচার পিঠের উপরে বুঝি ছুটো চোখ বসানো—পিঠের চোখে দেখেই যেন বলছে।

বলে, বেড়ার গায়ে মানুষটা এইবার ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ রেখেছে—উঁহু, উঁকি দিয়ে কি দেখবে অন্ধকারে? শুনছে কান পেতে।

কিম্বা বুড়ো হয়ে মাথার গোলমাল হয়েছে পচার। মনের সন্দেহ-বাতিক। সাহেব অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, শুনুকগে। গল্পই তো শুধু, যত ইচ্ছে শুনে

যাক। কিন্তু আমি ভাবছি, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাতের কুটুম আপনার উঠোনেও আসে!

বাইটা গভীর নিশ্বাস ফেলল: সে একদিন ছিল। এই সোনাখালি বলে কেন, আমায় খাতির করে আশপাশের পাঁচটা-সাতটা গাঁয়ে কোন কুটুম্ব পথ হাঁটত না নিশিরাতে। সে পচা বাইটা এখন মরে আছে।

কান পেতে আবার একটু কি শোনে। বলল, বাইরের মানুষ নয়, চলনে তাই বলছে। এ বাড়ির। আমার বউ শয়তানী মরে গিয়ে হাড়ে বাতাস লাগল। অনেক দিন আরামে ছিলাম। মরণ পর্যন্ত অমনি কাটবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আর এক শয়তানী সংসারে ভর করেছে। ইচ্ছে করে, হারামজাদির মুণ্ডটা চিবিয়ে খাই কচকচ করে।

দাঁত একটিও নেই বৃদ্ধের গালে। সেই কারণেই বোধ করি মুণ্ডের বদলে জোরে জোরে তামাক টেনেই আক্রোশ মিটাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে সে মানুষ মুকুন্দর বউ—সুভদ্রা। চোরের সংসারে যার বড় ঘৃণা। কোন একদিন ধর্ম-বাসা বাঁধবার আশায় স্বামীকে পাপ-সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। বার-কয়েক কেশে নিয়ে পচা বাইটা আবার গালিগালাজ শুরু করে দিল।

বলে, যত নষ্টের গোড়া ছোটবউমা। ভাল গৃহস্থ-ঘর দেখে মেয়ে আনলাম—দুটো দিন যেতে না যেতে দেখি, মেয়ে নয় বিচ্ছু। আরও ভুল, মুকুন্দটাকে ইস্কুলে পাঠানো। বিদ্যে শিখলে পৌরুষ থাকে না, ছিটেমন্তোর দিয়ে বউ তাকে গুণ করে ফেলেছে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, বাঘের মতন ডরায় বউকে। বর্ধনবাড়ি কোনদিন ধর্মকর্ম ছিল না, ওর শাশুড়িও পেরে ওঠেনি, ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ি গিয়ে সেরে আসত। ছোটবউমা এসে ব্রত-নিয়ম, পুজো-আচ্চা ঢোকাচ্ছে। ছেলেটারও শতেক খোয়ার—আধা-বিবাগী হয়ে ফুলহাটা ইস্কুল-বাড়ি পড়ে থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে-বেড়ে খায়।

যত বলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ততই। সাহেব জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন উনি?

আমি ঠিক মতন আছি না বেরিয়ে পড়েছি, সারারাত সেজন্য তক্কে তক্কে থাকে। ধর্মের পাহারাওয়ালা। ঘুমোবে না পণ করে টহল দিয়ে বেড়ায়। কিছু দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। ওরে হারামজাদি, তুই বেড়াস ডালে ডালে—আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। রাতে বেরুব না—আবদার! অন্তত একটা বার যদি বেরুতে না পারি, তিন দিনেই তো অক্কা। সেই বেরুনো তুই ধরতে যাস কালকের কাঁচা-ফকোড় মেয়ে!

বিরক্তিভরে সাহেবকে হঠাৎ বলে উঠল, যা যা, চলে যা আজকে তুই। গল্প কাল-পরশু যেদিন হয় হবে। হারামজাদি ছোট বউমার কানে ঢুকলে এই সব নিয়ে খোঁটা দেবে আমায়।

সাহেবও তাই চাচ্ছে। বাইরে গিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দেখবে। চোখে না দেখে এই যে পচা বলে দিল, পরখ হবে তার কথা।

সাহেব বেরিয়েছে। জমাট-বাঁধা এক টুকরো অন্ধকারেও সাঁ করে সরে গেল বেড়ার কাছ থেকে। পালায় না কিন্তু, দূরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। পথের মুখে জামরুলতলায়—ঐখান দিয়ে বাইরে যেতে হয়। সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শিকারি জন্তু ওত পেতে রয়েছে যেন।

আরও কিছু এগিয়ে যেতে যেচে কথা বলল সুভদ্রা-বউ। এই পাড়াগাঁ জায়গায় বউরা তো লম্বা ঘোমটা টেনে আড়ালে আবডালে বেড়াবে। কিন্তু এ বউয়ের খাপছাড়া রকমসকম। স্বল্পপরিচিত বিদেশি ছোকরা—মানুষটাকে নিজেই এসে ডাকছে। 'আপনি' বলছে প্রথম দিনটাঃ ও কি! দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ঠাকুরপো? এই রাত্তিরে ভয় তো মেয়েমানুষেরই পাবার কথা।

খুকখুক করে চাপা হাসিও যেন কথার সঙ্গে। দ্রুতপায়ে সুভদ্রা-বউ একেবারে সামনে চলে এলো। ব্যবধান বোধ করি এক বিঘতও নয়। পচার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে ধমক দেয়ঃ মানুষটা কান দিয়ে দেখতে পায়। কাছে না এসে কি করে কথাবার্তা বলি? আপনি ঠাকুরপো, মেয়েমানুষের মতো লাজুক। চেহারাতেও ঠিক তাই। মেয়ে যদি হতেন, কোন এক রাজপুত্তুর হরণ করে রাজবাড়ি নিয়ে তুলত। আপনি আসেন, রোজ রোজ দেখতে পাই। ক'দিন সেই বড় বৃষ্টি-বাদলা গেল, তা-ও কামাই নেই। এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভারি বজ্জাত চোর আপনি!

এবার হেসে সাহেব বলে, আপনিও কিন্তু বড় ঝানু গৃহস্থ। বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে সজাগ থেকে চোর পাহারা দেন। আজকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেললাম।

সুভাদ্রার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেঁপে উঠল অন্ধকারের ভিতর। বলে, সবাই ঘুমোয়। এ বাড়িতে ঘুম নেই শুধু দুটো মানুষের। আমার, আর ও ঘরের ঐ বাসি বাইটার—

না, সাহেব ভুল ভেবেছিল। তীক্ষ্ণ নজর ফেলে দেখে, হাসছেই তো

সুভদ্রা। বলে, শ্বশুরের নাম ধরতে নেই কিনা। আমি তাই বলি, বাসি বাইটা। জিনিস যত ভালোই হোক, বাসি হওয়ার পরে আমার শ্বশুর হয়ে যাবে। বলুন তাই কিনা।

আবার বলে, এ তবু ভাল। আমার বড়দিদির কথা শুনুন। ভাসুরের নাম তুলসি, বর হল মধু। কবিরাজি অষুধ খায়। বলে, অষুধের সঙ্গে কবিরাজ অনুপান দিয়েছে ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিটে। বুঝলেন তো ঠাকুরপো? মধুর ছিটে তুলসিপাতার রসে—নাম ধরতে পারে না, তাই অমন বলছে।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে এবার। ঘরের মধ্যে ওদিকে পচা বাইটা নতুন এক ছিলিম চড়িয়েছে। ফড়কড় করে হুঁকো টানার আওয়াজ।

পচা বাইটার মা'কে থানায় নিয়ে এলো। থুনথুনি বুড়ি। পচা আজকে তেমাথা-মানুষ, বুড়ি সেই সময়টা অবিকল তাই। বটুক-দারোগার কাছে এনে তাকে হাজির করল।

বউকে দেখতে পেয়ে স্থান-কাল ভুলে বুড়ি করকর করে ওঠে: লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এইখানে উঠেছিস—সর্বনাশের মূলে তবে তুই? সতী নারী স্বামীর দোষ ঢেকে বেড়ায়, তুই সর্বনাশী মিছামিছি লাগিয়ে স্বামীর হাতে দড়ি দিলি! উপরওয়ালা সব দেখতে পায়,—দেখে দেখে লিখে রাখে। হাতে যেদিন পাবে, বুঝতে পারবি সেইসময়। নরকে নিয়ে ঠাসবে।

বউয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ভাইকে বলছে, চোরানি কি বলে, শোন দাদা। আমার নরকবাস, ওঁর জন্য স্বর্গধামে গদির বিছানা পেতে রেখেছে! গেলেই তো হয় সেখানে, সৃষ্টি-সংসার রক্ষে পেয়ে যায়।

লেগে গেল শাশুড়ি-বইয়ে! ঐ থানার উপরে। স্বয়ং বড়বাবু থেকে চাকর-বাকর সবাই দাঁত মেলে পরম পরিতৃপ্তিতে শুনছে। তারপরে একসময় বটুক-দারোগার কর্তব্যের কথা স্মরণ হল: থাম, থাম! কী হচ্ছে, সরকারি অফিস নয় এটা?

হুঙ্কার দিয়ে কলহ থামিয়ে বুড়িকে বললেন, কতটুকু কী আর জানে বউ, কী বলবে! বাড়ির বউকে মায়ে-পোয়ে তোমরা তো বিশ্বাস করো না। বউ শুধু বলল, শাশুড়ি-ঠাকরুনের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে চামচিকের মতন কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দাও, মালের খবর বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তুড়ুম রয়েছে আমাদের, মত বাঁধাবাঁধির দরকার কি? তুড়ুমটা কেউ একবার দেখিয়ে দাও বুড়ি-মাকে—

তুড়ুম দেখিয়ে পদ্ধতিটা সবিস্তারে বুঝিয়ে বুড়িকে আবার দারোগার কাছে নিয়ে এলো।

দেখলে ?

বুড়ির কিছুমাত্র ভয়ের লক্ষণ নেই। বটুক-দারোগা হাস্যমুখে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে তারিফ করেন: এই মা না হলে অমন ধুরন্ধর ছেলে! পাতিশিয়ালের গর্ভে মেনিবিড়াল জন্মে না কখনো।

বুড়ি বলছে, মালের খবর কিচ্ছু জানিনে বাবা। কাজটা আমার পঞ্চাননেরই নয়। ভুল খবর পেয়েছে।

খবর বাইরের মানুষের কাছ থেকে নয়। নিজেই একবার করে টিপসই নামসই দু-রকম দিয়েছে।

একরারনামার নকল আদ্যপান্ত বুড়িকে পড়ে শোনালেন। বলেন, পড়েছেও সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। যার নাম বিলাতি গোখরো! জলপানেই ওদের আধখানা করে গরু-শুয়োর লাগে, মেজাজটা কেমন এই থেকে বুঝে নাও।

বুড়ি বলে, তোমাদের যন্তোরে চাপিয়ে বাছার মুখ থেকে আবোল-তাবোল বের করে নিয়েছ। আজ চার মাস সে পায়ের ব্যাথায় বিছানায় শুয়ে। সমস্ত মিথ্যে, পঞ্চানন এর মধ্যে ছিল না। যাতে সে রক্ষে পায়, তাই করে দাও বাবা। আমরা তোমার কেনা হয়ে থাকব।

শুধুমাত্র মানুষ কিনে কারো সন্তোষ লাভ হয় না—বুড়ি অতএব কথাটা স্পষ্ট করে দেয়: যাতে খালাস হয়ে আসে, তাই করে দাও। ন্যায্য গণ্ডা দিতে পঞ্চানন আমার কসুর করে না। বেরিয়ে এসে খুশি করে দেবে।

আর কী চাই। বটুক নিজে যে কথা বলতে চাচ্ছিলেন, বুড়ির মুখ দিয়ে তাই বেরুল। উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। মুখ বাড়িয়ে পচার বউকে বললেন, তোমাদের দরকার নেই, বাড়ি চলে যাও এবারে তোমরা।

আসন পিঁড়ি হয়ে বসলেন চেয়ারে। বলেন, এই জন্যেই তো ডাকিয়ে এনেছি মা। বুড়োমানুষ বলে আগে কষ্ট দিতে চাই নি—বউকে ডাকিয়ে আনলাম, তাকে দিয়ে যদি হয়ে যায়। তা দেখলাম, বউটা কাজের নয়, একেবারে বাজে।

বুড়ি মিনমিন করে বলে, মাল কোথায় যে বের করব? আমরা কিছু জানিনে বড়বাবু।

বটুক বলেন, বউ যা বলল তোমার মুখেও অবিকল সেই কথা। আমাদের কিন্তু শোনা আছে বাইটা খুব মাতৃভক্ত, মাকে না বলে কিছু করে না। উপায় যখন নেই, কি হবে। পড়েছে পাগলা সাহেবের হাতে, দেবে নিশ্চয় বছর-দশেক ঠুকে। তোমার জীবনে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে না। যাও বাড়ি চলে যাও।

কথাবার্তা শেষ করে দরজার কপাট খুলে দিয়ে দারোগা কয়েকটা ফাইল টেনে নিয়ে বসলেন। অর্থাৎ বিদায় হয়ে যাও—আমাদের যা করণীয়, করি এবার আমরা।

ক্ষণপরে চোখ তুলে বললেন, বসে আছ এখনো ? বুড়োমানুষ যাবে তো এতটা পথ—

বুড়ি বলে, মামলা সত্যি তুলে নেবে তো ?

বটুক-দারোগা বিরক্ত হয়ে বলেন, এক কথা কতবার বলি। মাল ফেরত ডেকে দিই, তার মুখেই শুনে যাও।

বুড়ি আর একটু ভেবে নিয়ে বলে, মুখের কথা মানিনে বাবা। ইস্টাম্বর-কাগজে লেখাপড়া করে দিক।

ইস্টাম্বর অর্থাৎ স্টাম্প। স্ট্যাম্প-কাগজে নিধিরাম দস্তুরমত দলিল করে দিক, পচার নামের মামলা তুলে নেবে। তবেই বুড়ি বিবেচনা করতে পারে। হল তাই—চার আনার স্ট্যাম্প-কাগজে এগ্রিমেণ্ট হল, স্থানীয় কয়েকজন সাক্ষি হলেন। কুটে-নিধে ও থানার কয়েকজন বুড়ির সঙ্গে সোনাখালি চলল—মালের হদিস দেবে সে এইবারে।

পচা বাইটাও এদিকে সদর থেকে ফিরল। ছোটবাবু বলে, শয়তানিটা দেখুন একবার। স্বেচ্ছায় সমস্ত স্বীকার করে রিচার্ডসনের কাছে ডাহা বদনাম দিয়ে এল, একরার নাকি জোর করে আদায় হয়েছে।

বটুক-দারোগা চোখ পাকিয়ে বলেন, বলেছিস এইসব ?

সবিনয়ে পচা বলে, আজ্ঞে হাঁ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলতে হল বড়বাবু। নয়তো রেহাই ছিল না, পাগলা সাহেব ফাটকে পুরত। সামনে নতুন মরসুম, সেই সময়টা ফাটকে ঢুকে পড়ে নবাবি করব—তা হলে কাজকর্মের কি, সংসার চলবে কিসে ? ইতর-ভদ্দোর দশজনে যারা মুখের পানে চেয়ে আছে, তারাই বা কি বলবে ?

বটুক বলেন, তবে বেটা একবার করতে গেলি কেন ? আমাদের বেইজ্জতির জন্যে ?

সে-ও প্রাণ বাঁচানোর দায়ে। সবাই বলছে, ঘা-খানা তোর ভাল নয় পচা। ভাল ডাক্তার দেখা, নয়তো জন্মের মতন খোঁড়া হয়ে থাকবি, ভয় হয়ে গেল বড়-বাবু। বলি, সদরের সাহেব ডাক্তারের চেয়ে তো বড় হয় না। মা-কালী সুবিধা করে দিলেন, আপনার মতন মানুষ নিজে চড়াও হয়ে পড়লেন গরিবের বাড়ি। নিখরচায় ডাক্তার দেখিয়ে নেব, অথচ ফাটকে যাব না—তার কায়দাটা কি ? থানায় একরার করে সদরে গিয়ে বেকবুল যাব। হাজতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রমাণের

জন্য তদন্তে আসবে, মাল বের করবার চেষ্টাচরিত্র করবে। সেইসব হতে থাকুক, পায়ের ঘা তার মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

নিশ্বাস ফেলে পচা বলে, এইরকমই তো হবার কথা বড়বাবু, বলুন, হয়ে আসছে কিনা বরাবর। কপালের দোষে নয়-ছয় হয়ে গেল। এত বড় একখানা মামলা সাজিয়ে সদর অবধি চালান করলেন, এক কথায় ডিসমিস। আপনাদের বেইজ্জত করেছি—বলুন দিকি, আমি না ঐ পাগলা সাহেব? সাহেবের দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।

দারোগা গর্জন করে ওঠেন: অত্যাচার করে কথা বের করেছি—সাহেবের কাছে তুই বদনাম দিয়ে এলি। তা-ও পারি। মিথ্যে বলে এসেছিস, সত্যি হোক এবারে। তোকে ছাড়ব না।

পচা সকৌতুকে বলে, তুড়ুমে শোয়াবেন বুঝি বড়বাবু?

সেকালের কাহিনী বলতে বলতে আজকের বৃদ্ধ পচা বাইটা খিকখিক করে উৎকট হাসি হাসে: বটুক-দারোগা তুড়ুমের ভয় দেখিয়ে কথা বের করবে, অা আমার কপাল! টেমিটা জ্বাল দিকি সাহেব, একটা জিনিস দেখাই।

হাঁটুর কাপড় তুলে পচা কালো কালো দাগ দেখাল। বলে, টেমি ঘুরিয়ে পিঠের দাগগুলো দেখে নে। গরম কলকের ছ্যাঁকা-দেওয়া—সেই সব দাগ গোল। আর চিমটে-বেড়ি পুড়িয়ে ধরে লম্বা দাগগুলো করেছে।

সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে: ওরে বাবা!

এতেই বাবা বলিস। এসব তো আনাড়ির হাতের মোটা কাজ। গায়ে দাগ করে দিয়ে নিজেরাই শেষটা বিপদে পড়ে। ঝানুদের আলাদা কায়দা। পেটের ভিতর সিকিখানা কথা থাকতে দিল না, কিন্তু মানুষটার গায়ের উপর আঁচড়টি নেই—শ্বশুরবাড়ির খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল যেন সে এতক্ষণ। জো-সো করে একটা আসামিকে হাতকড়া পরালে তো তারপরে আর দেরি হবে না। দশ দিকে দশজনে বেরিয়ে হুড়মুড় করে একগাদা ধরে নিয়ে এলো। জিয়ানো মাছ যেমন তুলে নিয়ে আসে। কিনা, ধর্মে মতি হয়ে পয়লা লোকটা সমস্ত বলে দিয়েছে। ধর্মে যাতে মতি আসে, নানাবিধ তার কায়দাকানুন। বাইরের লোকে টের পায় না, এমন কি উপরওয়ালারাও না।

পচা বাইটার নিজেরই উপর বিস্তর রকম হয়ে গেছে। তারই দু-চারটে বলে স্মৃতি থেকে। আর তামাক টানে।

ছাই-ভরতি বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে সেই বস্তা এঁটেসেঁটে বেঁধে দিল: নিশ্বাস নিতে গিয়ে ছাই উঠে নাক বুজে যায়। হাত-পা বেঁধে হাঁটুর নিচে বাঁশ চালিয়ে

দিয়েছে ; বাঁশের দুই প্রান্ত ধরে দুজনে দোল দিচ্ছে ; দোলনে জোর দিয়ে দুমদুম করে মানুষটাকে আছড়ে মারে দরজার গায়ে। নাক ও কানের ফুটোয় লংকার গুঁড়ো দিয়ে দেয়। ঝুলিয়ে দেয় মানুষটাকে—হাতে পায়ে চুলে গোঁফে ঝোলানোর হরেক পদ্ধতি। দু-হাতের বুড়োআঙুলে দড়ি বেঁধে আড়ার সঙ্গে ঝোলায় ; শুধুমাত্র পায়ের বুড়োআঙুল মাটিতে ঠেকবে ; অজ্ঞান হয়ে যাবে এই অবস্থায়, নামিয়ে তাউত করে আবার ঝুলিয়ে দেবে ঐরকম। কাঁটার বিছানায় শোয়াবে। উপুড় করে ধরে মাটিতে মুখ ঘষবে। নখের মধ্যে বাবলাকাঁটা কিংবা স্থঁচ ফোটাবে। রাতে ঘুমুতে না দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে ; প্রশ্নকর্তার ঘুম ধরে গেল তো তার জায়গায় আর-একজন এসে প্রশ্ন করছে। আর-এক কায়দা—চারপায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলল মানুষটাকে, পা দুটো বেরিয়ে আছে ; পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে মারছে সেই পায়ের তলায় ; দাগ হবার শঙ্কা নেই, নির্ভাবনায় মেরে যাচ্ছে ; একজনের হাত ব্যথা করল তো আর একজন আসছে। আগুনের প্রক্রিয়া আর জলের প্রক্রিয়া : আগুনের চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে পচা বাইটার গায়ে। সাঁড়াশি চিমটা কলকে অথবা জ্বলন্ত কাঠই গায়ে চেপে ধরে, নাক-কানের ফুটোয় গরম তেল ঢেলে দেয়। শীতের রাত্রে নগ্ন গায়ে জল ছিটিয়ে চাবুক মারে ; খানিক মার হয়ে গেলে আবার জল ছিটায়। দুজনে পাখা করে যাচ্ছে দু-দিক থেকে।

সকলের চেয়ে সাংঘাতিক হল, নাভির উপর গুবরে-পোকা ছেড়ে দেওয়া। বাটি চাপা দেওয়া আছে, পোকা যাতে বেরিয়ে না যায়। পথ না পেলে পোকা তখন নাভির মুখে শুঁড় ঢুকিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। এমনি কত! এসব পুরানো পদ্ধতি, মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। একালের ধুরন্ধরেরা আরও কত নতুন নতুন বের করছে। সকল জন্তুর মধ্যে মানুষ বুদ্ধিমান। নিজের জাত জব্দ করতে মানুষের মতন কে পারবে ?

পচা বাইটার স্পষ্ট কথা : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না বড়বাবু। মারধোরেও কায়দা করতে পারবে না। পুরোনো ঘাগি, বিস্তর ঘাটের জল খাওয়া আছে। আইনকানুন অজানা নেই। মালের খবর পাবেন না। বলেন তো আরও একবার না-হয় একবার সই করে দিচ্ছি, উপরে গিয়ে বেকবুল যাব।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর কে চাচ্ছে ? ব্যবস্থার বাকি আছে নাকি ? রিচার্ডসনের কাছে নিন্দে করে এলি, মেরে খানিকটা হাতের সুখ করব।

পচা হেসে আকুল : সুখ হবে না বড়বাবু, হাত ব্যথা হবে। যত ইচ্ছে মারুন, আমার অঙ্গে সাড় লাগবে না। চামড়ার নিচে রক্ত-মাংস নিয়ে এ

লাইনের কাজকর্ম হয় না। গোড়ায় দু-চার বছর হয়তো ছিল, রক্ত-মাংস শুকিয়ে এখন পাথর। পাথরে হাতের কিল মারুন কিংবা লাঠির বাড়ি মারুন, নিজেরই কষ্ট। দেখুন না পরখ করে। আপনার মতো অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে, গায়ে কিছু চিহ্নও আছে। সেগুলোই একবার চোখে দেখুন।

পিঠের ও পায়ের দাগ দেখে বটুক-দারোগা বুঝলেন, চেষ্টা করা বৃথা। এমনি সময় পচার মা কুটে-নিধে এবং পুলিসের দলটা পথের মোড়ে দেখা দিল। সোনাখালি থেকে ফিরছে। এবং উল্লাস দেখে বোঝা যায়, ষোলআনা কার্যসিদ্ধি।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর তোকে দিতে হবে না, তোর মা-বুড়ি বলে দিয়েছে। মাল নিয়ে ঐ আসছে ওরা, দেখ চেয়ে।

পচা বাইটা তিলেকমাত্র বিচলিত নয়। বলে, আমার মা দেবে খবর! বরঞ্চ বলুন আকাশের এক চাংড়া উঠোনে ভেঙে পড়েছে, ঝাঁটার মুখে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। সেটা তবু প্রত্যয় পেতে পারি। আমি যদি একগুণ হই, মা আমার এক-শ গুণ। মায়ের গুণেই যা আমার শিক্ষাদীক্ষা।

বুড়িমানুষ পচার মা থপথপ করে আসছে, বেশ খানিকটা দূরে আছে তখনো। জমাদার স্ফূর্তির চোটে ছুটে এসে সর্বাগ্রে খবরটা দেয়ঃ কী জায়গায় সেরেছিল বড়বাবু। মাঠের মধ্যে খেজুরগাছ জড়িয়ে মস্ত বড় অশ্বত্থগাছ, তার গোড়ায় ফোকর। ফোকরের ভিতর মালসার মুখে সরা চাপা দিয়ে মাল রেখেছে। উপরে ঘাসের চাপড়া। না বলে দিলে খুঁজে বের করবে, কারও বাপের সাধ্যি নেই।

পচা বাইটা চকিতে ফিরে তাকাল। দলটা উঠানে এসে পড়েছে। পচা আর্তনাদ করে ওঠেঃ ও মা, তুমিই শেষে বের করে দিলে—তোমার এই কাজ?

বুড়ি এসে ছেলের হাত চেপে ধরল। দারোগাকে বলে, দাও বাবা, আমার পচাকে। নিয়ে চলে যাই।

ধূর্ত হাসি হেসে বটুক বলেন, নিয়ে আর যাবে কোথায়? গ্রামসুদ্ধ লোকের মোকাবেলা বমাল বের করে দিয়েছ, তুমিও বুড়ি বাদ যাচ্ছ না। মায়ে-পোয়ে সদরে একসঙ্গে চলে যাও। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার বেকবুল করে এসেছে পচা। মিথ্যে কথায় সাহেব ক্ষেপে যায়। আগের বার যা দিত, এবারে তার ডবল করে ঠেসে দেবে দেখো।

বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, দারোগার একটা কথাও যেন বুঝতে পারে না। মালসা থেকে চোরাই মাল তুলে তুলে জমাদার সকলকে দেখাচ্ছে, আর শতকণ্ঠে নিজেদের বাহাদুরির কথা বলছে।

হঠাৎ বুড়ি চিৎকার করে ওঠেঃ যাব আমি সদরে। কুটে-নিধে ইস্টাম্বর

কাগজে দলিল করে দিয়েছে। দারোগা, তোমার সাক্ষি মানব। সাহেবের কাছে বিচার চাইব।

বটুক হি-হি করে হাসেন: আইন জান না বুড়ি। চোরাই মামলার ফরিয়াদ মহামান্য সরকার বাহাদুর। নিধিরাম যাচ্ছেতাই লিখে দিকগে, তার কি ক্ষমতা আছে মামলা তুলে নেবার!

পচার মা ভেঙে পড়ল: ধাপ্পা দিয়েছ বাবা বুড়োমানুষের সঙ্গে? তোমাদের ধর্মাধর্ম নেই? আমার পচা বেঁচে যাবে—আমি যে বড় আশায় মালিকের হেপাজতে মাল দিয়ে দিলাম।

জমাদার বলে, চোরাই মাল বের করেছ বুড়ি—পচা বাঁচলেও তোমার বাঁচন নেই। তোমায় নিয়ে ফাটকে পুরবে।

পচা গর্জন করে ওঠে: ফাটকে পুরবে আমার মাকে? মা কী জানে! এজলাসে দাঁড়িয়ে সমস্ত খুলে বলব। চোর আমিই। মাল রাখবার সময় মা কেমন করে দেখে ফেলেছিল। চোর ধরিয়ে দিল, আমার মায়ের সরকারী পুরস্কার তার জন্যে।

সেই প্রথম পচা জেল খাটতে গেল। ক্রুদ্ধ রিচার্ডসন রীতিমত ঠেসেই দিয়েছিল।

গল্প শেষ করে পচা বাইটা বলে, কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায় রে সাহেব। বটুক-দারোগা যা বলেছিল—জেল থেকে বেরিয়ে এলাম, মা তখন নেই। মামলার রায় দিয়ে দিল, আদালতের বাইরে এনে কয়েদি-গাড়িতে আমায় টেনে তুলল। বটতলায় তখনো মা দাঁড়িয়ে আছে। মা আমার ডুকরে কেঁদে উঠল, কান্না শুনতে শুনতে চলে গেলাম। সেই আমার শেষ দেখা মায়ের সঙ্গে।

চুপ করল পচা বাইটা। ঘর অন্ধকার। সাহেব তাড়াতাড়ি আর-এক ছিলিম তামাক সেজে আনে। হুঁকা হাতে নিয়ে বাইটা বসে আছে, টানে না। মায়ের কান্না এখনো যেন শুনছে। পচাই আবার না ডুকরে কেঁদে ওঠে তার সেই মরা মায়ের মতন।

সাত

বেরিয়ে যাচ্ছে সাহেব। জামরুলতলায় ছায়ামূর্তি।

ও-ঠাকুরপো শুনুন শুনুন। রোজ রোজ কী আপনাদের বলুন তো? কী অত ফুসফুস গুজগুজ বাসি বাইটার সঙ্গে?

গল্প শুনি। ভাল ভাল গল্প করেন উনি, ভারি মজাদার।

তিক্তকণ্ঠে সুভদ্রা বলে, ঐ কাজটাই পারে এখন শুধু। কবে নাকি তালপুকুরে হাতি ঘোড়া তলিয়ে যেত, এখন ঘটি ডোবে না। বিঘত প্রমাণ জলও নেই—ঐ যে নাম করতে পারিনে, বাসি কাদাই সার। পারে না কিছুই—জাঁক করে তবু খারাপ নামটা বজায় রেখে যাচ্ছে। ঘেন্নাপিত্তি থাকলে কেউ করে না। কবে যে মরবে হাড়-জ্বালানো বাসি বুড়ো—

সাহেবের কাছে ঘেঁষে এসে বলে, গেল-শীতকালে, জানেন ঠাকুরপো, এক দুপুরে নাড়ি বসে গেল। কত্তই অবধি টিপে টিপে নাড়ি পায় না। সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি: বিধাতা সদয় হলেন বুঝি এতদিনে! রান্নাঘরে রাত্রের জন্য মাছ ভেজে রেখেছে। এর পরে তো ক'দিন নিরামিষ চলবে—ভাবি, ওগুলো মিছে নষ্ট হয় কেন? রান্নাঘরে ঢুকে সকলে মিলে তাড়াতাড়ি শেষ করে কাঁদবার জন্য তৈরি হয়ে আছি। আঁচলে লঙ্কার গুঁড়ো বেঁধে নিয়েছি—চোখে জল না এলে এক টিপ চোখের ভিতর দেব। ওমা, সমস্ত ফুসফাস—সন্ধ্যে নাগাত বুড়ো উঠে বসে খাই-খাই করছে। মাছগুলো সব সেঁটে দিয়েছিস, বলি, পুকুর কাটা কার পয়সায়? দেখেশুনে ভরসা ছেড়ে দিয়েছি ভাই। কচুর পাতা মুড়ি দিয়ে এসেছে, যমরাজ দেখতে পায় না। ও-বুড়ো কোনদিন মরবে না।

হঠাৎ বুঝি বউয়ের গলাটা ধরে আসে: ঐ লোকের জন্য একজনকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তরী হতে হল। আমিও পা বাড়িয়ে আছি। বাসা করবে শিগগির —বাইটা-বাড়ির মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

সাহেব বলে, তাঁকে আমি জানি। ভাব-সাব হয়েছে তাঁর সঙ্গে।

কেমন করে ভাই? কোথায়?

সাহেব বলে, অনেক দিন ছিলাম যে ফুলহাটায়। তাঁর পাঠের আসরে গিয়ে বসতাম। আমার ছোড়দা তিনি, আমি সাহেব ভাই।

সুভদ্রা ব্যাকুল আগ্রহে বলে, আসুন না ঠাকুরপো রোয়াকে বসে দুটো গল্প

করে যাবেন। শুনি সেখানকার কথা। ভিতর-বাড়ির ঐ রোয়াক। সকলে ঘুমুচ্ছে, টের পাবে না। এ পোড়া-বাড়িতে কথা বলার একটা মানুষ পাইনে।

পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। বুঝি বা হাতই ধরে ফেলে। সাহেবের ভয়-ভয় করছে। বলে, আজ থাক বউঠান, আর একদিন।

এঁকেবেঁকে পালাল। কাজটা রপ্ত আছে ভাল মতন। পাহারাওয়ালা পারে না, গাঁয়ের বউ কি করে ধরবে!

এর পরে সাহেব আরও গভীর রাত্রে অতি সতর্কভাবে আসে, সুভদ্রা বউয়ের কবলে পড়ে না যায়। গল্পগুজব বেশ চলছে, খাতির জমেছে পচার সঙ্গে। কিন্তু আসল কাজের কিছুই হল না এত দিনে। একটু-আধটু ইঙ্গিত দিলে বাইটামশায় নতুন কোন জোরালো গল্প ফাঁদে।

একদিন মরীয়া হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসল, বিদ্যেসাধ্যি কিছু দিতে হবে বাইটামশায়। আশায় আশায় দূর-দূরন্তর থেকে এসেছি।

পচা উড়িয়ে দেয় একেবারে: বিদ্যে? সেসব কোনকালে হজম হয়ে গেছে। কোন বিদ্যে নেই এখন। থাকলে বুঝি হেনস্থা সয়ে এদের সংসারে পড়ে থাকি। যাও তুমি, চলে যাও, আর এসো না।

ওকথা বললে শুনছিনে বাইটামশায়। খালি হাতে কেন যেতে যাব? দেবেন কিছু, তারপরে যাবার কথা।

বাইটা রেগে বলে, গায়ের জোরে আদায় করবি?

আপোষে দিলেন আর কই!

হাসতে হাসতে পা-দুটো জড়িয়ে ধরতে যায়। ধ্বক করে চোখ জলে উঠল বুড়োর। দুই হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে হুকো টানছিল। কলকে ছুঁড়ে মারল রাগ করে। আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাহেবের গায়েও পড়ল আংরার কয়েক টুকরো, কাপড় পুড়ে গোল গোল ছিদ্র হয়ে গেল। হাসছিল সাহেব— মুখের উপর এখনো তেমনি হাসি।

পচা বাইটা চোখ মিটমিট করে দেখছে। যেন কিছুই হয়নি—কলকে কুড়িয়ে সাহেব নতুন করে তামাক সেজে পচার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে বলে, খান—

পচা হঠাৎ বলে, ছেঁক লেগেছে নাকি রে?

তাকিয়ে দেখে অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, নাঃ!

ঠোলা উঠেছে ঐ যে—মিথ্যে বলছিস?

কি জানি, ঠাহর হয়নি তো—

ঘুরে বসে ঠোসকা-ওঠা জায়গাটা পচার চোখের আড়াল করল। কি ভেবে

তারপর বেড়ার একটু চোঁচ ভেঙে রিয়ে ছেঁদা করে দিল ঠোসকাগুলো। জল বেরিয়ে গিয়ে চামড়া সমান হয়ে যায়, চোখে দেখে কেউ ধরতে পারবে না।

পুরো ছিলিম শেষ করে পচা প্রশ্ন করে, জ্বালা করছে না?

সাহেব একগাদা কথা বলে এবার: কী আশ্চর্য! দু-চারটে ফুলকি পড়েছে কি না পড়েছে, তার জন্যে ঠোসা উঠবে, জ্বালা করবে—আপনার শ্রীচরণে বসতে এসেছি তবে কোন্ সাহসে? শহুরে ছেলে শহরের খোপেই তা হলে পড়ে থাকতাম, ভাঁটিমুলুকে আসতাম না।

দন্তহীন মাড়িতে পচা একগাল হাসল। হুঁকো রেখে দিয়ে এইবারে সে শুয়ে পড়ে। বলে, রাত হয়েছে, ঘরে চলে যা। আর একদিন তোর কথা শুনব।

শুয়ে পড়েছে কুণ্ডলী হয়ে—সোজা হয়ে শোবার শক্তি নেই? বাইটার মুখে হাসি। দেখে সাহেবের বড় স্ফূর্তি। পাশে বসে মোলায়েম হাতে পা টিপতে লাগল?

পচা বলে, ওকি রে?

পদসেবা করতে দিন। আমি তো কিছু চাচ্ছিনে।

বেটাচ্ছেলে বড় সেয়ানা তুই! ভারি নাছোড়বান্দা!

আর কোন উচ্চবাচ্য না করে পচা চোখ বোঁজে। বুড়োমানুষের ঘুম বেশিক্ষণ থাকে না, ক্ষণপরে চোখ মেলল। সাহেবের নিরলস হাত চলেছে।

নড়েচড়ে উঠে পচা বলে, আওয়াজ শুনতে পাস?

সাহেব কান পাতে। নিঃসাড় হয়ে শোনার চেষ্টা করে। মৃদু শব্দ একটু কানে আসে বটে। বলে, দেখে আসি—

বচা বাইটা বলে, না দেখেই বলে দিচ্ছি। কুকুর ঘুমুচ্ছে জামরুলতলার উত্তরে। তাই কিনা মিলিয়ে দেখ গিয়ে।

আবার বলে কাজ করতে হলে কান ভাল রকম রপ্ত চাই। সেই শিক্ষা সকলের আগে। রাত্রিবেলার কাজ—যত ঘুরকুট্টি অন্ধকার, ততই ভাল। ধরে নিবি চোখ দুটো নেই একেবারে, একটু-আধটু যা দেখিস সেটা উপরি। হতচ্ছাড়া চোখ ভুল জিনিস দেখিয়ে ক্ষতিই করে অনেক সময়, কান কিন্তু কখনো ভুল করবে না। চোখ বুজে কান খাড়া রেখে ঘোরাফেরা করবি—কানে শুনে বলে দিতে হবে কোনখানে কি ঘটছে। বলতে হবে কুকুর, না বিড়াল, না মানুষ। না আর কোন জীবজন্তু। বলতে হবে ঘুমন্ত না জেগে রয়েছে।

বিদ্যার ভূমিকা শুরু হয়ে গেল তবে। পচা বাইটার মতো গুরু—সাহেবের কত বড় কপালজোর। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর পচা বলে, চলে যা এখন তুই কাল আসিস। আরও বেশি রাত করে আসবি। দুপুর-রাতে শিয়াল

ডেকে যায় প্রহর বাদে ফের আবার ডাকে। সেই তিন প্রহরের ডাকের মুখে এসে পড়বি। ছোট বউ হারামজাদি সেই সময়টুকু অঘোরে ঘুমায়। ভালরকম পরখ করা আছে আমার। আসবি খুব চুপিসারে। পা পড়ছে, কিন্তু পাতা পড়ার আওয়াজটুকু নেই। দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াবি—ডাকবিনে, দুয়োরে টোকা দিবিনে, কিছু না। যা বললাম ঠিক ঠিক সেই নিয়মে আসবি।

পরের রাত্রে সাহেব এলো যেমন পচা বলে দিয়েছে। তিন প্রহর রাত্রে এত চুপিসারে এলো, অথচ যেইমাত্র উঠানে পা পড়া পচা সহজভাবে উঠে দরজা খুলে দেয়। কানে দেখতে পায়, সুভদ্রা বলেছিল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সাহেব ঐ কান দুখানার মহিমা ভাবছে। ঘাসে একটা ফড়িং লাফানোর যে শব্দ, তা-ও তো সে হতে দেয়নি।

পচা বলে, পায়ের শব্দ না-ই হল! মাটির উপর পা পড়ে, বাতাসে তার দোল লাগে—চেষ্টা করলে সেটুকু কেন শোনা যাবে না। সবুর কর না, তুইও শুনবি একদিন।

সগর্বে বলে, বড়বিদ্যে তবে আর বলে কেন? ইস্কুল-পাঠশালার বিদ্যে তো সোজা জিনিস। সে বিদ্যের কাজ যে একেবারে চলে না, এমন নয়। বেশির ভাগই তো করছে তাই। কিন্তু বিস্তর ভড়ং আর কায়দাকৌশল খাটাতে হয়। আমাদের বিদ্যেটা সোজা হলে মানুষ লেখাপড়ায় না গিয়ে সোজাসুজি সিঁধেল হতে যেত।

সাহেব যথারীতি তামাক সেজে দিয়েছে। মউজ করে ছিলিমটা শেষ করে হুঁকো রেখে দিয়ে পচা বলে, শোন, পিঠে খাওয়াব বলে রাত করে আজ আসতে বললাম। ঘুমুচ্ছে এখন ছোটবউমা—

সাহেব বাধা দিয়ে বলো ছোট বউ-ঠাকরুন ঘুমোন না যে মোটে! টহল দিয়ে বেড়ান—আপনিই সেদিন বললেন।

ইচ্ছেটা তাই বটে। কিন্তু একেবারে না ঘুমিয়ে পারে কেউ? আমায় পর্যন্ত ঘুমুতে হয়। একদণ্ড হোক আর আধদণ্ড হোক, না ঘুমিয়ে পার নেই। যে ঘুমোয় নিজেই হয়তো সে টের পায় না—ভাবছে, জেগে রয়েছি। ছোটবউমা সত্যি ঘুমই ঘুমুচ্ছে, নিজের কানে সঠিক শুনে এলাম। কাল বেটি চাল কুটেছে, সারাক্ষণ বসে বসে আজ পুলিপিঠে বানাল। এমনি হাড়বজ্জাত, কিন্তু রান্নাবান্নায় খাসা হাত। হরেক শিল্পকর্মও জানে, ঐসব নিয়ে থাকে। পুলিপিঠে বাসি করে খেতে ভাল, রান্নাঘরে তালাচাবি এঁটে রেখেছে। কুকুর উঠে এইবার কড়াই সুদ্ধ খেয়ে যাবে, মরবে কাল কপাল চাপড়ে।

তড়াক করে পচা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এমনি তো ত্রিভঙ্গ মুরারি—শুয়ে পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়, উঠবার সময়টা আর একজনে ধরে তুলে দিলে ভাল হয়। কাজের বেলা সেই মানুষ দাঁড়িয়েছে যেন সোজা এক তালগাছ—দেহে একটুকু বাঁকচুর নেই। একেবারে আলাদা মানুষ। কোটরের ভিতর প্রায়-বিলুপ্ত চোখ দুটোও যেন বড় হয়ে উঁচুর দিকে বেড়িয়ে এসেছে। উঠানে নেমে পড়েই পচা বাইটা সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিঠের কড়াইয়ের অংশটা দু-হাতে ধরে ক্ষণ পরে ফিরে আসে। সাহেবকে নিয়ে বসে পড়ল কড়াইয়ের ধারে। বলে, কত সব ভালমন্দ রাঁধে ছোটবউমা—তা গেল পাকস্থে কাকের কি? আকণ্ঠ নিজে গিলবে, আর মুরারির বাচ্চা-গুলোকে গেলাবে। ভাসুরপো-ভাসুরঝির পল্টনটাকে খাওয়ায় খুব। এইসব হয়ে বাড়তি যা রইল, বাড়ির অন্য সকলের। আমার নামে রে-রে করে ওঠে: এত বয়স অবধি বিস্তর তো খেয়েছে, শুয়ে শুয়ে তাই এখন জাবর কাটুক। বিচারটা দেখ একবার। সারাটাদিন ধরে রকমারি রান্নার বাস নাকে আসবে, বুড়ো হয়েছি বলে কোন-কিছু দাঁতে কাটবার এক্তিয়ার নেই। আমিও তক্কে তক্কে থাকি—দিনমান গিয়ে আসুক না রাত্তির। আমার যেটা সময়, তাই এসে যাক। এক পেটের ভিতরে ছাড়া অন্য কোনখানে মাল রেখে রক্ষে করতে পারবিনে।

সাহেবের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে: নেমন্তন্ন করে আনলাম, খাচ্ছিস তুই কোথায়? অন্ধকার বলে এ চোখ ফাঁকি দিতে পারবিনে। বাটি ভরে কেউ সাজিয়ে দেবে না, কড়াই থেকে থাবা তুলে ঝটপট খেয়ে নে।

সাহেব বলে, আপনি খান।

খাব না তো শুধু দানসত্র করবার জন্য কষ্ট করে নিয়ে এলাম? ঠিক খেয়ে যাচ্ছি—চোখ তোর চোখা নয় বলে দেখতে পাস না। ঘাবড়াস নে, হবে। চোখ আমারই কি একদিনে ফুটেছিল?

কিন্তু যে সামান্য দেখতে পাচ্ছে, তাতেই সাহেব তাজ্জব। কথাটা ভদ্রতা করে বলেছিল। কী খাওয়া রে বাবা থুনথুনে বুড়োমানুষটার! গবগব করে খাচ্ছে—কে বুঝি মুখ থেকে এক্ষুনি কেড়ে নিয়ে যাবে, এমনিতরো ভাব। দাঁতের অভাবে গিলে খাচ্ছে, চিবানোর কষ্ট করতে হয় না, এই এক সুবিধা। বড় চুষিগুলো গিলবার সময় কোঁৎ-কোঁৎ আওয়াজ। সাহেবের বারংবার চমক লাগে, গলায় আটকে চোখ উল্টে পড়ে বুঝি এইবার।

এবারে উল্টো কথাই বলছে, তাড়া কিসের? আস্তে আস্তে খান বাইটা-মশায়। রয়ে সয়ে।

পুলিপিঠে ততক্ষণে সাবাড় হয়ে গেছে। খেয়েছে নেহাৎপক্ষে সাহেবের ডবল। হেঁচকি তুলে মুখের ভিতর যা একটু-আধটু ছিল, উদরস্থ করে নিয়ে পচা বলে, কাজের নিয়মই এই। শিখে নে। মাল এসে পড়লে যত তাড়াতাড়ি পারিস পাচার করবি, মায়া করে রেখে দিবি নে। আহা, চেটেমুছে খাস কেন রে, কড়াইয়ে কিছু ছড়ানো থাক। কুকুর হয়ে খেয়ে গেলাম যে আমরা।

খলখল করে পচা হাসে: হারমজাদি ছোটবউমা মরবে কাল বকুনি খেয়ে। মনের ভুলে দুয়োর দেয়নি, বড় বউমা তাই ধরে নেবে, কুকুর ঢুকেছে বলে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলবে। গুরুজন শ্বশুরকে হেনস্থা করে—মুখের বকুনি না হয়ে ওকে যদি ধরে ধরে ঠেঙাত, সুখ হত আমার।

সাহেব তখন অন্য কথা ভাবছে। বলে, গিয়েই তো অমনি পিঠেসুদ্ধ কড়াই বের করে আনলেন। তালা খুললেন কেমন করে—মন্তোরের গুণে না অন্য কোন কায়দায়? শাস্ত্রে আছে, মন্তোরে দরজা আপনাআপনি খুলে যায়। গাছের পাতা ছোঁয়ালেও খোলে।

কৌতূহলী পচা বাইটা নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে: বটে বটে! বলাধিকারীর কাছ থেকে শাস্তরে পোক্ত হয়ে এসেছিস। বল দেখি দুটো-পাঁচটা কথা, শুনে নিই।

শাস্ত্রচর্চা চলে কিছুক্ষণ, শাস্ত্রের বিবিধ উপাখ্যান। ষন্মুখকল্পের পথ-সংক্ষেপকথা—যে পদ্ধতিতে যোজন পথ লহমায় অতিক্রম করে, যোজন দূরের মানুষ আকর্ষণ করে আনে। বিদ্যা-হরণের কথা—অন্যের বিদ্যা নষ্ট করে দেবার অকাট্য প্রক্রিয়া। মায়াঅঞ্জনের কথা—যে বস্তু চোখে পরে চোর বাতাসের মতন মিলিয়ে যায়। সকলের চোখে সে অদৃশ্য, তার নিজের চোখ এখন শতগুণ প্রখর। রাজা ব্রাহ্মণ বৈশ্য নৃত্যগীত-রঙ্গোপজীবী চোখের জোরে সকলকে বশে এনে ইচ্ছাসুখে সে হরণ করতে পারে।

এক চোরকে নিয়ে কী কাণ্ড! মায়াঅঞ্জন পরে চুরি করতে ঢুকেছে। বুঝতে পারছে বাড়ির লোক, ধরবার উপায় নেই। একজনে বুদ্ধি করে তখন দুঃখের গল্প ফাঁদল—চোরের মায়ের মৃত্যুকথা। ইনিয়েবিনিয়ে বলছে। মায়ের শোক উথলে ওঠে চোরের, দরদর করে জল পড়ছে। চোখের জলে অঞ্জন ধুয়ে গেল। এইবারে যাবি কোথা চাঁদ—ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলে চোরের উপর।

মহাকুলীন রৌহিনেয়-কথা—পিতৃকুল-মাতৃকুল উভয় কূলই যার কীর্তিমান। বাপ পাখির মতন যে-কোন ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়বার ক্ষমতা রাখে। নিজে রৌহিনের হরিণ ময়ূর থেকে আরম্ভ করে যে-কোন জন্তুজানোয়ার পাখপাখালির ডাকের নকল করতে পারে। যে বিদ্যার সামান্য কিছু পচা বাইটা নাতিকে

শিখিয়েছে। রৌহিনেয় উপাখ্যানে চৌরমন্ত্রের কথা আছে—যারা চোর ধরতে বেরিয়েছে, মন্ত্র পড়ে তাদেরই মধ্যে মারামারি বাধানো যায়। চোর ধরার কাজ মুলতুবি থাকে তখন।

ভরা পেটে পচা বাইটার মেজাজটা প্রসন্ন। সাহেবের মুখে অনেকক্ষণ ধরে শুনল। বলে, আমার কিন্তু মন্তোরতন্তোর নয় সাহেব। আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলেছি।

বলতে লাগল, মন্তোর ঢের ঢের শেখা আছে। নিদালি মন্তোর, চাবি খোলার মন্তোর, কুকুরের মাড়ি আঁটার মন্তোর—কতরকমের কতজিনিস, লেখা-জোখা নেই। একটা বয়স ছিল, যার মুখে যা শুনেছি—সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতাম। ছুটো-চারটের বেশি খাটিয়ে দেখিনি। শুধু মন্তোরে কি হবে—প্রক্রিয়া আছে, উচ্চারণের কায়দা আছে। উপযুক্ত গুরু না থাকলে রপ্ত করা যায় না। একালের ত্যাঁদোড় মানুষের উপর মন্তোর খাটেও না আর তেমন। না-ই বা হল মন্তোর—এমন হাত-পা কান-নাক-চোখ রয়েছে, গাছগাছড়া শিকড়-বাকড় রয়েছে, মন্তোরের উপর দিয়ে যায় এ সমস্ত। আমার কাজকর্ম এই সব নিয়ে।

রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ার কৌশল বলে দিল। অতি সহজ। চাবিওয়ালা তালা মেরামত করতে এসে যেমন করে তালা খোলে। উকো ঘষে পিছন দিককার বোল্টুগুলো ক্ষইয়ে ফেল, একটু চাপেই পাতখানা উঠে আসবে। আঙুলে ভিতরের কল ঘুরিয়ে দিলেই তালা খুলে পড়ল। কাজকর্ম অন্তে পিছন দিককার পাতা চেপে দিয়ে যেমন তালা তেমনি আবার ঝুলিয়ে দাও। কেউ কিছু ধরতে পারে না।

সেই পাকা ব্যবস্থা হয়ে আছে। সেদিন খুশি পচা ঢুকে পড়ে। ব্যবস্থাটা গোড়ায় ক্ষিধের তাড়নাতেই করে নিতে হয়েছিল। এখন সব ঘরে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের ব্যবস্থা। প্রতিটি বাক্স-পেঁটরার তালার পিছনে উকো ঘষে মোলায়েম করা আছে, গা-চাবির ইস্ক্রুপ সব আলগা। বাড়ির এতোগুলো লোকের কারও চোখে তার একটা ধরা পড়ে না।

মোক্ষম এক তত্ত্ব শোনাল বহুদর্শী ওস্তাদ। মানুষ জাতটাই হল তালকানা অভ্যাসের দাস। ধরিয়ে না দিলে চোখে পড়বে না। ঘরে হয়তো তিন-চারটে দরজা—একটা তার মধ্যে বন্ধই থাকে সর্বদা। ঘরে জো-সো করে একবার ঢুকে সেই দরজার খিল খুলে রেখে এসো। রাত্রে শোবার সময় চালু দরজায় খিল ডবল করে দেবে, ছিটকিনি আঁটবে। বন্ধ দরজার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তালার ব্যাপারেও তাই—চাবি আঁটছে-খুলছে, তাতেই খুশি। উল্টো করে ঘুরিয়ে ধরে পিছন দিক দেখতে যাবে না।

গর্ব ভয়ে পচা বলে, ঐ যে কোন্ রৌহিনেয়র বাপের কথা বললে—পাখির মতন ঢুকছে বেরুচ্ছে, আমিও তাই। এই বয়সে—এখনো রোজ রাত্রে। বাড়ির অন্ধিসন্ধি জুড়ে।

বাড়িটা পচার নয় বুঝি ? এইসব ঘরবাড়ি জমিজিরেত বাগান-পুকুর তার রোজগারে হয় নি ? বুড়ো হয়ে পড়েছে বলে শত্রুপক্ষ বেদখল করে নিয়েছে। শত্রু তার নিজের ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি এবং অন্য যারা ভোগে-সুখে রয়েছে তারই গড়া বাস্তুর উপরে। দোচালা খোড়োঘরখানার ভিতর তাকে আটক রেখে সকলে নেচেকুঁদে বেড়ায়। দিনমানে সকলকে দেখিয়ে বুড়োমানুষটা চুপচাপ তক্তাপোশে পড়ে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহরে, ছোটবউ সুভদ্রা অবধি যে সময়টা নিষুপ্ত, বন্দিত্ব ঝেড়ে ফেলে সেকালের পচা বাইটা উঠে পড়ে তখন। নিজের জায়গায় বিচরণ করে। যে ঘরে ইচ্ছা ঢুকে পড়ে, বাক্স-পেঁটরার মধ্যে যেটা খুশি খুলে ফেলে। হাতের আর মনের সুখ করে নিয়ে আবার রেখে দেয়। মরার পরে প্রেতাত্মা নাকি নিশিরাত্রে অলক্ষ্যে এমনি ঘোরাফেরা করে। পচা বাইটার তাই হয়েছে—মৃত্যুলোকেরই প্রাণী সে এখন। শ্মশানের বদলে বাইরের দোচালা ঘরটুকুতে সকলে মিলে তাকে বিসর্জন দিয়েছে।

আজকে সাহেব নিঃশব্দে সহজভাবে উঠানে বেরিয়ে এলো। বর্ধনবাড়ি নিশুতি। ছোটবউও ঘুমিয়ে গেছে বাইটামশায়ের হিসাব মতো। সত্যি তাই, উঠানের কোন প্রান্তে ছায়ামূর্তি নেই।

আট

বালগোপালের মূর্তি—দিব্যি বড়সড়, ফুটফুটে বাচ্চাছেলের মত। টানা চোখ, হাসি-হাসি মুখ। দুষ্টামির ভাব মুখের উপর। অর্থাৎ ফাঁক পেলেই ননী-চুরির কর্মে লেগে ওড়েন আর কি চতুর ঠাকুর। সুধামুখীর বড় ভাল লাগে। গোপাল সকৌতুকে যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকটা দূরে গিয়ে সুধামুখী মুখ ফিরিয়ে দেখে। ডাকছে যেন তাকে : মা আমি বাড়ি যাব। সত্যি সত্যি ঠোঁট নড়ছে। মাটির পুতুল ডাকাডাকি করছে—তাই কখনও হয়! তবু স্থির থাকতে পারে না, পায়ে পায়ে ফিরে আসে আবার দোকানে। দোকানিকে বলে, পয়সা এখন কাছে নেই। এ গোপাল অন্য কেউ যেন নিয়ে না যায়। বাসা থেকে পয়সা নিয়ে আসছি।

বাসায় যেন পয়সার ভাণ্ডার—মুঠো করে এনে দিলেই হল। পারুলের কাছে ধার করতে হয়। ঘরের একটা কোণ এবং সেই দিককার দেয়ালটায় বালতি বালতি গঙ্গাজল এনে ঢালে। জলচৌকিটা গঙ্গায় নিয়ে রগড়ে রগড়ে ধোয়। অশুচি লেশমাত্র লেগে না থাকে। জলচৌকির উপর ঘরের ঐ কোণটায় গোপাল এনে বসাল। ঘুরে ফিরে এপাশে-ওপাশে সুধামুখী কত রকম করে দেখে। দেখে দেখে ছু-চোখের আশ মেটে না।

এই এখন সকলের বড় কাজ সুধামুখীর। গোপাল নিয়ে পড়ে আছে। কাপড় পরাচ্ছে, জামা পরাচ্ছে। টিপ পরাচ্ছে কপালে। পুঁতির মালা গেঁথে গেঁথে রকমারি গয়না বানাচ্ছে—সে গয়না একবার পরায়, একবার খোলে। সন্ধ্যার পরে শুইয়ে দেয়, সকালবেলা তুলে বসায়। মাটির বস্তু বলে স্নানটা চালানো যাচ্ছে না। আমতলার দিকে গাঁদা-দোপাটি ফুলগাছ কয়েকটা—ফুল তুলে জলচৌকির উপর সাজিয়ে দেয়। খেলনা-রেকাবি ভরে ভোগ সাজিয়ে গোপালের মুখের কাছে ধরে।

এই খেলা চলেছে অহরহ। মেয়েগুলো চোখ-ঠারাঠারি করে: যৌবন চিরকালের নয় রে ভাই। বৃদ্ধ হলে আমরা তপস্বিনী হই। হতেই হবে যদি না সময় থাকতে আখের গুছিয়ে নিতে পারি।

পারুল ঝঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে: কাণ্ডখানা কি দিদি, সমস্ত ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসিনী হতে চাও?

সুধামুখী বলে, ছাড়ছি কোনটা রে! তুই রাণীর এত খবরদারি করিস সন্ন্যাসিনী তুইও তবে। যেখানে যত মা আছে, সবাই সন্ন্যাসিনী।

এর পিছনে কত আশাভঙ্গের কথা! নিভৃতে ভাবতে গিয়ে পারুলের চোখে জল এসে যায়। তার রাণীর সঙ্গে সুধামুখী গোপালের তুলনা করল। ঠাকুর নয়, শয়তান। সংসারের বড় সাধ ঐ হতভাগীর। সংসার যতবার আঁকড়ে ধরতে যায়, লাথি খেয়ে ফেরে। গোড়া থেকেই ধরো না। বিয়ে হল—বলিষ্ঠ পৌরুষময় বর, লেখাপড়া জানা। সন্ধ্যারাত্রে বর নিয়ে মনের আনন্দে শুয়েছে, শেষরাত্রে কলেরা। পরদিন বেলা শেষ না হতেই বর চিতায় উঠল। তারপরে ভরা যৌবনের দিনে আর একজন উদয় হয়ে মনপ্রাণ রাঙিয়ে তুলল। বিপদের ইঙ্গিত বুঝে সুধামুখী বলে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক তবে—ভিনজাত, রেজিস্ট্রী বিয়ে হোক। সে মানুষ বলে, বিলাত-দেশ নয়, বিয়েতেও কলঙ্ক ঘুচবে না, বিষ খাও।

দায়ী যখন দুইজনেই, দুজনকে খেতে হবে একসঙ্গে।

সাইনাইড বিষ সংগ্রহ হয়েছে। কিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে সুধামুখী কোটা ধরে এগিয়ে দিল: এবারে তুমি।

সে-মানুষ কৌটা ছুঁড়ে পিঠটান। ধরতে পারলে সুধামুখী তার প্রাণটাও বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাবে! প্রাণ নিত না ঠিকই, অমন প্রাণ ঘৃণার বস্তু—ঘা কতক খ্যাংরা মারত। আর সেই বস্তু বিষও নয়, সৈন্ধবনুনের গুঁড়ো। বেঁচে রইল সুধামুখী। সে-মানুষ ভেবেছিল চুকেবুকে গেছে—শেষটা গর্ভের মেয়ে মেরে নিষ্কলঙ্ক হতে হল। জলে ভেসে এসে আবার একদিন ছেলে কোলে উঠল, কষ্ট করে বড় করল তাকে। পাখা বেরিয়ে সেই ছেলেও এখন তেপান্তরের মুলুকে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সুধামুখী হেসে বলে, এবারের গোপাল ছেলেটা আমার বড় সুশীল। ছটফট করে না, বায়নাক্কা নেই কোনরকম। যা বলি চুপচাপ শুধু শুনে যায়। বসিয়ে দিলে বসে থাকে, শুইয়ে দিলে শোয়।

পারুল বলে, সাহেব তেপান্তরে ঘুরুক আর যা-ই করুক দিদি, মায়া এখনো ষোল আনা তোমার উপর। কালও তো শুনলাম মনিঅর্ডার এসেছে।

স্নিগ্ধ চোখে গোপালের দিকে চেয়ে সুধামুখী বলে, এই ছেলে বড় হোক, দেখিস তখন। ঘর ছেড়ে এক পা নড়বে না—যা কিছু আমার দরকার, ঘরে বসেই সমস্ত দেবে।

আর এক বড় কাজ—গোপালকে গান শোনানো। অতি মধুর গলা। সুরেই প্রাণ কেড়ে নেয়, তার উপর শিশু ঠাকুরের কাছে আজেবাজে গান চলে না—মহাজনদের রচিত পদাবলী-কীর্তন। গানের চর্চায় সুধামুখী উঠে-পড়ে লেগেছে—ভাল গান কত দূর ভাল গেয়ে প্রাণ মাতানো যায়, দিবারাত্রি সেই সাধনা। তখন যেন সম্বিত থাকে না—দু-চোখের জল বয়ানে ধারা হয়ে পড়ে। বস্তিবাড়ির যে যেখানে ছিল, কাজকর্ম ফেলে সুধামুখীর ঘরের সামনে ভিড় করে তখন।

গানের নামডাক বস্তির বাইরেও যাচ্ছে। বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে এবার। জন-কয়েক এসে প্রস্তাব করে, খোল-কত্তাল একতারা-হারমোনিয়াম নিয়ে পুরোপুরি কীর্তনের দল করি আসুন। পুণ্যি আছে, পয়সাকড়িও আছে। গোপাল একলা কেন শুনবেন, মানুষজন সবাই শুনুক আসর জমিয়ে বসে। থালা ভরে পেলা দিক।

নফরকেষ্ট কলকাতায় ফিরছে। ক্রমশ কালীঘাট-টালিগঞ্জ-চেতলায় তার নিজের কোটে এসে পড়ল। গাবতলির হাটে-সাহেব সেই নিরুদ্দেশ হল—সাহেবকে ফেলে সুধামুখীর সামনে আসতে ভরসা পায়নি। এখানে ওখানে অনেকদিন গেছে—অবশেষে মরীয়া হয়ে একদিন আড্ডির বস্তিতে ঢুকে পড়ে।

শহরে এসে একে একে পুরানো নেশার টান ধরছে, সুধামুখীকে বাদ দিয়ে কতদিন পারবে ?

পড়বে গিয়ে তো তোপের মুখে—সেই সময় কি বলে কোন্ কৌশলে মাথা বাঁচবে, অনেক দিন ধরে মনে মনে মহড়া দিয়ে নিয়েছে। নিরীহ মুখের প্রথম কথা : কেমন আছে সব, সাহেবের খবর কি ? অর্থাৎ সাহেবের পালানোর বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরে নফরকেষ্ট জানে না—কোনরকম যোগাযোগ নেই দুজনের ভিতর।

কিন্তু দেখা সর্বপ্রথম রানীর সঙ্গে। বড় বড় চোখ মেলে মুহূর্তকাল রানী অবাক হয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে বুঝি একটু। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

রানী তো রাজরানী ! সেদিনকার এককোঁটা মেয়েটাকে একেবারে চেনা যায় না। বিধাতাপুরুষ নতুন করে গড়ে-পিঠে বানিয়েছেন। সাজপোশাকে গয়নায় পারুল সাজিয়েছেও বটে আদরের ধনকে। ঝুনঝুন করে পায়ের তোড়ার আওয়াজ তুলে রাজরাজেশ্বরীর মতো রানী এসে দাঁড়াল। এবং সারাপথ নফর যা তালিম দিয়ে এসেছে, সেই কথাগুলোই কেড়ে নিয়ে রানী বলে, সাহেবদা'র খবর কি ?

নেই বুঝি সে এখানে ? নফরকেষ্ট আকাশ থেকে পড়ে : আমি তো মা অনেকদিন বাইরে বাইরে। আমি কি করে জানব তার খবর ?

সে আর তুমি একই দিনে বেরুলে। সবাই বলে, তুমি সঙ্গে নিয়ে গেছ।

ঠিক এই কথাগুলোই সুধামুখীর মুখ থেকে শোনবার কথা। বলছে রানী। নফরকেষ্টও জবাব নিয়ে তৈরি। রাগ করে চেঁচিয়ে উঠতে হয় এর জবাবে : না, না—একশ' বার বলছি, না। আমার পথে আমি গেছি—সে যদি গিয়ে থাকে, তার আলাদা পথ। কত আমার আপন কিনা, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ! কারো সে আপন নয়, চরম স্বার্থপর ছোঁড়া—

আরও বিস্তর কথা ঠিক করা আছে। অনেকক্ষণ ধরে বলা চলে। কিন্তু রানী আঁচলে অবিরত চোখ মুছছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই সেদিন মেয়েটাকে জন্মাতে দেখল, কোলেপিঠে নিয়ে বেড়িয়েছে কত ! মনটা কেমন কেমন করে উঠল নফরকেষ্টর, গলা দিয়ে ভিন্ন সুর বেরিয়ে আসে : হয়েছে কি তোর রানী ?

রানী ঝুপ করে মাটিতে নফরার পায়ের উপর পড়ল। দু পায়ে মাথা কুটছে : জান তো বলে দাও নফর-মেসো। আমার বড্ড দরকার।

হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে কালীমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেয়। বলির পাঁঠাই বুঝি মানুষের গলায় আর্তনাদ করছে। বলির পরে কবন্ধ পশুর ধড়ফড়ানি—

সে বস্তু খানিকটা যেন রানীর ঐ মাথা-কোটার মতো। কালীঘাটের মানুষ—মন্দিরে গেলেই বলি চোখে পড়ে। তুলনাটা তাই আপনাআপনি মনে এসে যায়। রানীকে তুলে ধরে সস্নেহে নফরকেষ্ট বলে, আরে পাগলী, বলবি তো সব কিছু! তাকে না পাস আমি তো আছি। সাহেবের আপন-জন। বল্‌ কি হয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানী বলে, কিছু আমি বলতে পারব না। সাহেব-দা'কে চাই। এ-বাড়ি আমি থাকব না, আমায় সে নিয়ে যাক।

নফরকেষ্ট ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভবঘুরে বাউণ্ডুলে একটা—সে কোথা নিয়ে যাবে তোকে?

যেখানে তার খুশি। আমি কি ভাল জায়গা চাইছি, ভাল খেতে পরতে চাইছি? খবর জানো তো বলে দাও নফর-মেসো, তোমার পায়ে পড়ি।

আবার পা ধরতে যায়। এমনি সময় গলা শুনেই বুঝি সুধামুখী বেরিয়ে এল। পলকে রানী পালিয়ে যায়। কথাবার্তা কিছু কানে গিয়ে থাকবে সুধামুখীর। বলে, রানী অমন করে ছুটল কেন?

এতকাল অদর্শনের পর নফরকেষ্ট ফিরছে, সে সম্বন্ধে একটি কথা নয়। পুরানো ব্যাপার—এর চেয়ে আরো বেশি দিন সে বাইরে থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব একটা পাওয়া যাবে—সত্যি জবাব নয়। এতক্ষণ সুধামুখী গোপালের কাছে ছিল—আজেবাজে কথা-কথান্তর ভাল লাগবে না। রানীর কথা তাই জিজ্ঞাসা করে: বলছে কি রানী?

সাহেবের খবর নিচ্ছিল। সাহেব কোথায় আছে, আমি কেমন করে বলব? কালীঘাটে নেই, তাই তো জানতাম না।

সুযোগ পেয়ে তালিম-দেওয়া কথাগুলো শুনিয়ে দেয় সুধামুখীকে। শুনিয়ে সোয়াস্তি পেল। সুধামুখী বলে, যেখানে থাকুক ভালই আছে, রোজগারপত্তর করছে। তিনবার এর মধ্যে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছে। অল্প টাকা—কিন্তু মনে করে পাঠাচ্ছে তো। আমায় তার মনে আছে।

নফরকেষ্ট কৌতূহলী হয়ে ওঠে: তবে তো তুমি সব জান। রানী তোমার কাছে জেনে নিলে পারে। কোথায় আছে সাহেব এখন?

ঠিকানা জানিনে, চিঠিপত্র লেগে না। মনিঅর্ডারের কুপনে কত-কিছু লেখা যায়, খরচা লাগে না—কিন্তু সাহেব লেখে নাম আর টাকার অঙ্ক। পিওনকে ধরলাম: ফরমে প্রেরকের কোন ঠিকানা আছে? চিঠি দিলাম, ভুয়ো ঠিকানা সেটা, শিলমোহরের অনেক ঘা খেয়ে সে চিঠি অনেকদিন পরে ফেরত এলো। সেই পোস্টাপিসের অধীন সে-নামের কোন গ্রাম নেই।

ঘরের মধ্যে গিয়ে নফরকেষ্ট কুপন উল্টে-পাল্টে দেখে। নাম-সই সাহেবেরই —ছয় টাকা চার আনা। পর পর তিন মাস পাঠিয়েছে। টাকা বরাবরই ছয়, আনায় হেরফের—কোনবার কিঞ্চিৎ বেশি, কোনবার কম। সাহেব কোন মাইনের কাজকর্ম ধরেছে নিশ্চয় এখন।

সহসা মন্তব্য করে ওঠে : বেটা বাপ-মায়ের স্বভাবখানা পেয়েছে।

সুধামুখী চমক খেয়ে বলে, কারা ওর বাপ-মা, জানতে পেরেছ নাকি?

মানুষ জানিনে, কিন্তু স্বভাব জানি বটে। একফোঁটা মায়ামমতা নেই তাদের। থাকলে আপন-ছেলের গলা টিপে জলে ফেলতে পারত না। এমন ছেলে—পর-অপর হয়েও আমরা তার জন্য আকুপাকু করে মরি।

সজোরে নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, সাহেবও ঠিক তাই। একফোঁটা মায়ামমতা নেই ওর মনে। কারো সে আপন নয়।

সুধামুখী ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে বলে, অমন কথা মুখেও এনো না নফর। মায়ায় ভরা আমার সাহেব। যেখানেই থাকুক ভুলতে পারে না। ঘাটে-পথে শ্মশানের ভিতরেও দেখেছি। জানে আমার অভাব-অনটনের কথা—মুখ ফুটে চাইতে হয়নি—যা কিছু থাকে, মুঠো ভরে দেয়। কী দিল, তাকিয়েও দেখে না।

নফরকেষ্ট লুফে নিয়ে বলে, আমারও ঠিক সেই কথা। টাকাপয়সা বলে এক তিল ওর মায়া নেই। দেখ না, আনা অবধি মনিঅর্ডার করেছে। পয়সার মনিঅর্ডারের নিয়ম নেই, সেইজন্যে পারে নি। যখন কাছাকাছি ছিল, পকেট উলটে উজাড় করে তোমায় ঢেলে দিত। নোংরা-আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে যেন সাফ-সাফাই হল। মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই। যত এই দিচ্ছে—তুমি ভাবো মায়ায় পড়ে, আমি জানি দয়া করে। কোনমানুষ কোনদিন ওর আপন হবে না। উদাসী সাধু-ফকিরের মতো। সংসারে না থেকে ও-ছেলে ভগবানের পথেও যেতে পারত।

সুধামুখী সহসা তিক্ত হয়ে বলে ওঠে, কিন্তু নিয়ে তো নিলে তোমার চুরির পথে—

নফরকেষ্ট বলে, ভাল চোর আর সাচ্চা সাধুতে তেমন কিছু তফাত দেখিনে। ভালো চোরের আশেপাশে থেকে বুঝে-সমঝে এলাম। কারিগর চোর থলিসুদ্ধ ডেপুটির দিকে ছুঁড়ে দিল। ডেপুটি দিল মহাজনের কাছে। ন্যায্য বখরা ঠিক ঠিক ঘরে এসে সরে যাবে, পাই-পয়সার এদিক-ওদিক হবে না। সিঁধ-কাঠি ধরে যা নেবার সোজাসুজি আমরা নিয়ে নিই। মক্কেলও ক্ষতির হিসাব সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। অলিগলির চোরাপথে বেমালুম পরের মাল পাচার করে মুখে সাধু সাধু বুলি কপচায়, তাদের চেয়ে অনেক ভাল চোর-ছ্যাঁচোড় আমরা।

নয়

পিঠে খেয়ে পরের দিন বিষম কাণ্ড। হয়তো বা সুভদ্রা-বউয়ের শাপমন্যি এর মূলে। পেট ছেড়ে দিল বুড়োমানুষ পচার। সঙ্গে বমি। বড়বউয়ের দেখা যাচ্ছে যা-একটু দয়ামায়া। কিন্তু গিন্নিবান্নি মানুষ, এক দঙ্গল ছেলেপুলের মা, ভাঁড়ারের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে এ-ঘর-ওঘর করে বেড়ায়। সময় কোথা শ্বশুরের কাছে বসবার? এসে তবু ঘুরে যায় এক-একবার, মহিন্দারকে করকচি-ডাব পেড়ে মুখ কেটে দিতে বলে। জায়গাটাও একবার-দুবার নিজ হাতে সাফ করে দিয়ে গেছে। আর ছোটবউ সুভদ্রার গতিক দেখ—বাঁজা মানুষ, কাজ খুঁজে পায় না তো কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তুলছে। শ্বশুরের ঘরে তবু একবার উঁকি দিতেও যায় না।

পরের রাত্রে সাহেব এসে দেখে এই ব্যাপার। ভাল হল। মানুষটার জন্য নয় ঠিক—এ হেন গুণীমানুষ মরে গেলে বিদ্যাটাও যে তার সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে। মন নরম হয়েছে, একটু-আধটু করে মুখ খুলছিল—খাড়া করে তুলতেই হবে যেমন করে হোক।

বড়ছেলে মুরারি জমিদার-কাছারির নায়েব। কাছারির কাজকর্ম সেরে অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরল সে। জিজ্ঞাসা করে, অসুখ কেমন? মিনমিন করে বড়বউ কি একটা জবাব দিল—শোনা যায় না এত দূরের ঘরের ভিতর থেকে। খাওয়াদাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে কোঠাঘরে গিয়ে মুরারি শুয়ে পড়ল। অপর ছেলে মুকুন্দ বাড়ি থাকলে বোধকরি জিজ্ঞাসাটুকুও করত না—চোর বাপের উপর এতদূর বিতৃষ্ণা! কিন্তু সাহেবের কথা আলাদা। পচা বাইটা বাপ নয় তার, ওস্তাদ। বিদ্যা আদায়ের ফিকিরে আছে। বিদ্যাটুকু পাওয়া হয়ে যাক, তারপরে পচা বাইটা তুমি অর্ধেক-মড়া হয়ে ঘরের তক্তাপোশে পড়ে আছ, কিংবা পুরোপুরি মরে চিতার উপর চড়েছে, বয়ে গেছে চোখ তুলে দেখতে।

রাত্রির পাটোয়ার-বাড়ি ফেরা চলবে না। পচার সাড়া নেই, আলো জেলে সাহেব সতর্ক চোখে ঠায় বসে আছে। কী করছে আর কী না করছে! করকচির জল খাওয়ায় ঝিনুকে করে, বার্লি খাওয়ায়, পাখা করে। একরকম হাত পেতেই মুখের বমি ধরছে। মাদুর নোংরা করে রেখেছে, ধোওয়ার জন্য ঐ রাত্রে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল।

নিশাচরী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ের উপর। একনজর দেখে নিয়ে বলে ওঠে, ছিঃ—ছিঃ!

সাহেব চমকে তাকায়: কি বলছেন বউঠান?

অমন স্বর্গের চেহারা নিয়ে নরক ঘাঁটিতে ঘেন্না করে না ঠাকুরপো?

সাহেব তিক্তকণ্ঠে বলে, নরক হতে দিয়েছেন কেন? কাজটা তো আপনাদেরই। দুর্গন্ধে ঘরের ভিতর তিষ্ঠানো যায় না। বাইটামশায়ের বেহুঁশ অবস্থা—ফেলে যেতেও পারি নে।

অন্যদিনই বা কি করে থাকো ভেবে অবাক হই। ভেদবমির কথা বাদ দিয়ে মানুষটারই তো বেশি দুর্গন্ধ। একজনে সেই দুর্গন্ধে ঘরবাড়ি ছেড়েই সরে পড়ল। নামের মধ্যেও দুর্গন্ধ। বাহাদুর বলি শ্বশুরের বাপ-মাকে, জন্ম থেকেই কেমন করে বুঝে ফেলে নামকরণ করেছিলেন। টাটকা নয়, তাজা নয়—একেবারে সেই নাম, আমি যাকে বাসি বলে থাকি।

ভিজে, মাদুর সাহেব উঠানের আড়ে ঝুলিয়ে দেয়, জলটা এইখানে ঝরে যাক। 'আপনি' থেকে কখন তুমিতে এসেছে, কি জন্যে এসেছে—তা সে জানে না।

সুভদ্রা বলে, কোমর বেঁধে শত্রুতায় লেগেছে, কেন বল দিকি? যমরাজ ভয়ে ও-লোকের কাছ ঘেঁষেন না—হয়তো দেখবেন, যে মহিষ চড়ে এসেছেন, কোন্ ফাঁকে চুরি হয়ে গেছে সেটা। চোরকে সবাই ডরায়। আমার বাবাই কেবল ডরাল না। বসে, স্থবির হয়ে পড়েছে, ক'টা দিন আর! মানুষটা গেলে জমিজিরেত দালানকোঠায় তো দাগ লেগে থাকবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে ভোগ করিস। সে-ও তো হয়ে গেল আজ—

বিড়বিড় করে হিসাব করে নিয়ে কান্নার সুরে বলে উঠল, ও ঠাকুরপো, আট বছর হয়ে গেছে। আট-আটটা বছর ঐ এক ঘরে, এক বিছানায় এক ভাবে পড়ে রয়েছে।

মানুষটার এখন-তখন অবস্থা, পুত্রবধূ সেই সময়টা হিসাব নিয়ে পড়েছে। কান জালা করে শুনতে। দ্রুতপায়ে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। সুভদ্রা মরে গেলেও ঢুকবে না—যে কথা ঐ বলল, ভেদবমির ভয়ে নয়, মানুষটারই দুর্গন্ধে। নিরাপদ দুর্গ অতএব—ঢুকে পড়ে সাহেব নিশ্চিন্ত।

সকালবেলা কাজের গরজে পাটোয়ার-বাড়ি ফিরতে হল কিন্তু সাহেবের মন পড়ে থাকে পচার কাছে। খেতে দিচ্ছে, মাইনে দিচ্ছে দীনু পাটোয়ার, তার কাজ ফেলে দিনমানে আসা চলে না। সন্ধ্যা হতে না হতে গরুর জাবনা দায়সারা গোছ মেখে দিয়ে পালায়। তিন-চার দিন চলল সেই এক অবস্থা। বড় শক্ত

বুড়ো—যমরাজ সাহসে ভর করে এবারে বোধকরি দোরগড়া অবধি এসেছিলেন, নিরাশ হয়ে ফিরতে হল।

এরই ভিতর সুভদ্রা আবার একদিন সাহেবকে ধরেছিল। টিপিটিপি বাড়ি ঢুকছে, সেই সময়টা—বাইটার ঘরে ঢুকে পড়বার আগেই বলে, আমারও পালটা শত্রুতা তোমার সঙ্গে। বাসি বাইটার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, মতলব তোমার ভাল নয়। জব্দ তোমায় করবই—এবাড়ি আসা যাতে বন্ধ হয় তাই করব। ভেবেছিলাম, কোন একদিন রাত দুপুরে চিৎকার করে বড়-বর্ধনের কানে তুলে দেব—তুমি আমার হাত ধরে টানাটানি করছ। বাড়িসুদ্ধ রে-রে করে এসে পড়ে উচিৎ শিক্ষা দেবে।

সেদিন জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার মধ্যে সুভদ্রা কি রকম তাকাচ্ছে—মাথা খারাপ বোধহয় বউটার। হাত ধরে আজই না টানাটানি করে এবং মুলতুবি চিৎকারটা জুড়ে দেয়।

সুভদ্রা বলে, ভেবেছিলাম এমনি এত কি। কিন্তু ফিকির পেয়ে বড়-বর্ধন আমাকেও তো দূর করে দেবে বাড়ি থেকে। কলঙ্ক রটাবে। জমিদারি সেরেস্তার ঘুঘু নায়েব—চাচ্ছেও ঠিক এই জিনিস। ভাইটা মরেছে, আমি সরে গেলে একচ্ছত্র অধিপতি। ঠাকুরপো, আমি বড় দুঃখী।

গর্জন করে উঠেছিল, মুহূর্তে কেঁদে পড়ে চোখে আঁচল দেয়। মাথার গোলমাল ঠিকই। বলে আমায় কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। যার উপর মেয়েমানুষের সকল নির্ভর, সে মানুষটা পর্যন্ত বিরূপ। ভাসুর সেই জন্যে জো পেয়ে গেছে। বাপ-মা দুজনেই গত হয়েছে, ভাইও একটা নেই। বাপের ভিটেয় ঘুঘু চরে বেড়ায়। পা বাড়ানোর জায়গা নেই এত বড় দুনিয়ার উপরে। হাত ধরে টানাটানি কিম্বা চিৎকার করে কলঙ্ক রটানো—তার মধ্যেও হয়তো সাহেব দাঁড়াতে পারত। কিন্তু হেন অবস্থায় পালানো ছাড়া উপায় নেই। তারও চোখ ভিজে আসবে, কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে। পাশ কাটিয়ে একছুটে সাহেব পচার ঘরে ঢুকে পড়ে। সেই নিরাপদ দুর্গে।

ক'দিনের সেবাশুশ্রূষায় বড়বউয়ের সঙ্গেও সাহেবের পরিচয় হয়েছে। বড়বউ প্রস্তাব করেঃ দিনমানেও ক'টা দিন থাকো না। তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সাহেব বলে, সঙ্কট পার হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।

বুড়োমানুষের ব্যাপার কিছু বলা যায় না। চোখে দেখছ দিব্যি ভাল, নাড়ি ধরে হয়তো বা নাড়ি মেলে না। শতেক কাজ আমার—ভাল করে একবার

তাকিয়েও দেখতে পারেনি। গা কাঁপে—দেখাশোনার অভাবে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে চিরকাল মনের মধ্যে কাঁটা ফুটবে।

সাহেব অবাক হয়ে তাকাল। বাড়ির মধ্যে আছে তবে এমনি ধারা কথা বলার একজন। বড়বউ বলছে, থাকো এসে তুমি। এইখানে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিও। পাটোয়ারদের বলেকয়ে কাপড়-গামছা নিয়ে চলে এসো। ভাল করে সেরে উঠলে চলে যেও।

ভালই হল, সাহেবের, শাপে-বর হয়ে গেল। এককথায় সে রাজি। ভ্রুভঙ্গি করে বলে, বলাবলির ধার ধারিনে। কী এমন চাকরি গো! গরু রাখা আর ধানের হিসাব রাখা—আবাদ অঞ্চলে এখন যার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াব, সে-ই চাকরি দেবে।

সৌদামিনি নামে এক বিধবা মেয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে—মুরারি-মুকুন্দর বোন হয় কি রকম সম্পর্কে। এক দুপুরে পচার ঘরে ভাতের থালা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, মুরারির নজরে পড়ে গেল। সকালবেলার কাছারি সেরে বাড়ি ফিরছে সে তখন। দ্রুতপায়ে চলে এসে সৌদামিনীর পথ আটকে জিজ্ঞাসা করে, ভাত কোথায় দিয়ে এলি?

দুই থালা যেন দেখলাম—

ধরা পড়ে সৌদামিনী চুপ করে থাকে। ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে বড়বউ এগিয়ে এল। স্বামীকে যমের মতো ডরায়। কৈফিয়তের ভাবে বলে, ঐ যে ছেলেটা—দেখেছ তুমি তাকে, একটা থালায় করে তাকেও চাট্টি দিতে বললাম। রাত নেই দিন নেই যা সেবাটা করল—ওরই জন্যে এ যাত্রা রক্ষে হয়ে গেল। ভাবলাম, গৃহস্থবাড়ি দুপুরবেলা না খেয়ে থাকবে, সেটা ভাল হয় না—

ধমক দিয়ে মুরারি থামিয়ে দিল: ভাবনাটা আমার জন্যে রাখলেই হত। মরিনি আমি, দুপুরে ফিরে এসে আমিও তো খাব।

স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে মুরারি সেই ধূলো-পায়ে বাপের ঘরে উঠল। পচা আর সাহেব সামনা-সামনি বসে খাচ্ছে।

অসুখ তো সেরে গেছে, এখনো ছোঁড়া তুই কি জন্যে ঘুরঘুর করিস? কি মতলব? কাজকর্ম নেই কিছু তো?

তম্বি সাহেবের উপর। সাহেব বলার আগে পচা তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দেয়: কই আর সারল। ধরে বসাতে হয়, ধরে তুলে বাইরে নিতে হয়—

মুরারি বলে, অসুখ নয়, সেটা বয়সের দোষ। ঐ একটু ধরে তোলার অজুহাতে ছোঁড়া তুই থালা থালা ভাত ওড়াবি? অত মজা চলবে না। ভাবে পয়সা লাগে, ভাত এমনি আসে না।

সাহেবের চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু রোগশীর্ণ পচার দিকে চেয়ে সামলে নিল। ঠাণ্ডা গলায় বলে, উনি বলেন সেই জন্যে রয়েছি। দরকার না থাকলে তক্ষুনি বিদায় হয়ে যাব।

মুরারি খিঁচিয়ে উঠল: উনি আর বলবেন না কেন। গতর খাটিয়ে পয়সা আনতে হয় না, অনন্তশয্যায় চিত হয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে গল্প করার মানুষ পেয়ে গেছেন একটা। কিন্তু এর পরেও যদি পড়ে থাকিস, ভাত পাবিনে। উপোসি থাকতে হবে।

সাহেব গজর গজর করে: বার বার খাওয়ার খোঁটা, মানুষ যেন এই বাড়িতেই শুধু খেয়ে থাকে। খেয়ে খেয়েই এতখানি বয়স হয়েছে, এখান থেকে চলে গিয়ে তখনো খাব। খেতে কে চেয়েছে? এতদিনের আসাযাওয়া—খেয়েই তো আসি বরাবর। খাতির করে বলা হল খাওয়ার জন্যে, ভাত বেড়ে সামনের উপর ধরা হল। মা-লক্ষ্মীর ভাত কে ছুঁড়ে ফেলবে?

কী না জানি ঘটে যায়, মুরারির পিছু পিছু বড়বউও চলে এসেছে। তার উদ্দেশে মুরারি দন্ত-কড়মড়ি করে: কার ভাত কে বেড়ে পাঠায়। খাওয়াতে ইচ্ছে যায়, তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত খুশি অতিথিসেবা করোগে! হাঁসের মতন গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা দিচ্ছে, দিয়েই চলেছে—তাদের গেলাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। তার উপরে অতিথি! লজ্জাঘেন্নাও নেই।

ঝড়তুফান বড়বউয়ের উপরে প্রায়ই বয়ে যায়, নতুন কিছু নয়। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে, খাওয়া হলে থালা দুটো তুলে নিয়ে যাবে। রাগের ঝাল মিটিয়ে মুরারিও চলে যাচ্ছিল—

এমন সময় বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। সুভদ্রার কণ্ঠ—বাইরের দাওয়ায় কখন সে এসেছে, হঠাৎ কেমন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। ভাসুর বলে মান্য করে না। সৌদামিনী যদিচ কোনদিকে নেই, বলছে তবু তাকেই উদ্দেশ করে। মুরারি থ হয়ে শোনে। বলে, ছোড়দি, আমার নাম তুমি কি জন্যে চেপে গেলে? ওঁদের গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা, আমার একটাও নয়। একজন কেন, এক গণ্ডা-দুগণ্ডা অতিথিসেবার এক্তিয়ার আছে আমার। দিদি নয় আমিই ভাত বেড়ে পাঠিয়েছি তোমার হাত দিয়ে। খুলে বললে না কেন ভাসুরঠাকুরকে—

মুরারি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর খলখল করে হেসে ওঠে। অদৃশ্য সৌদামিনীকে সে-ও সম্বোধন করে: ওরে সদু, বলে দে, ভাসুর হয়ে ভাদ্রবধূর সঙ্গে কোন্দল করি কেমন করে? কুকুরে মানুষ কামড়ায়, তাই বলে মানুষ কখনো কুকুর কামড়ায় না। বলে দে পৈতৃক জমাজমি এক কাঠাও বজায় নেই ওঁদের। খাজনা না দিলে জমিদারে জমি নিলাম করে। সেই নিলাম

বড়বউ স্ত্রীধনে খরিদ করে নিয়েছে। বাড়িসুদ্ধ তারই খাচ্ছি এখন। ছোটবউমা নিজেই অতিথি—অতিথি আবার অতিথি আনবে কেমন করে?

শেষ করে চলে যাচ্ছিল, আবার কিছু মোক্ষম কথা মনে এলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, মহা বিদ্বান আমার মাষ্টার ভাই, মাস গেলে খাতায় সই করে পঁচিশ টাকা, পায় সত্যি পনের কি আঠারো। একবেলা ভাত আর একবেলা চিঁড়েমুড়ি খায়—দু-বেলা ভাতের সঙ্গতি নেই। বিবেচক ভগবান তাই বুঝেই ওদের কোলে-কাঁকালে দিলেন না। ছেলেপুলে হয়নি তবু রক্ষে। দেমাক করতে মানা করে দে মদু, ভাঙা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বেড়ালে লোকে হাসে।

যথোচিত প্রতিহিংসা নিয়ে মুরারি হেলতে দুলতে জামাজুতো ছাড়তে চলল। উঠানের উপর সুভদ্রা পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে, বুক থাবড়াচ্ছে, হাপুসনয়নে কাঁদছে: রোজগার দেখে বিচার হয় না। ধর্মপথে থেকে না খেয়েও সুখ। কাছারির ফুটো গোমস্তা হয়ে চাঁদের মুখে থুতু ফেলতে যান। তার কিছু নয়—থুতু ফেরত এসে নিজের মুখে পড়ছে।

বড়বউ দ্রুত এসে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে: ভিতরে চল্ রে ছোট, উঠোনে দাঁড়িয়ে লোক হাসাস নে। বিদেশি ছেলে একটা রয়েছে—তোদের ঝগড়াঝাটি দেখে সে-ই বা কী ভাবছে!

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে: ছোটভাইকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি বেনামি করে নিয়েছেন—বেহায়ার মতন তাই আবার জাঁক করে বলা। চোরের বেটা ভুয়াচোর—কিন্তু গুরুজন বলে মুখের উপর কিছুই তো বলতে পারলাম না দিদি।

বড়বউ তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় সুভদ্রার মুখে। বলে, বেনামি না আরো কিছু। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলে, ভাইয়ের যা মতিগতি, সম্পত্তি কোন দিন মঠ-মন্দিরে দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরুবে। ছোটবউমার তখন উপায়টা কি? কায়দা করে তাই বেঁধে রাখা—ঘরের সম্পত্তি পরের হাতে না চলে যায়।

দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বড়বউ টেনে নিয়ে চলল। কানের কাছে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে: বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে বুঝুকগে। পরের বাড়ির মেয়ে আমাদের কি? আবার তা-ও বলি, ভাসুরের কাছে অমন ক্যাট-ক্যাট করে বলা তো ঠিক হয়নি। এক কথায় দশ কথা উঠে পড়ল। কর্তামানুষ ওরা, পুরুষমানুষ—যেমন খুশি যাক বলে। অতিথি-সেবা হবে না—ওঃ, ঠেকাবে এসে! সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেবে! আজকে হঠাৎ চোখে পড়েছে, তাই বলে বুঝি ছেড়ে দেবো! যা করবার, করে যাব আমরা।

গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সাহেব হি-হি করে হাসে: কলকাতার বড়

বড় হোটেলে উঁকি দিয়ে দেখেছি—খাওয়ার সময়টা বাজনা বাজে, নাচ হয়। আমাদেরও তাই একদফা হয়ে গেল।

পচাও হেসে বলে, সব অঙ্গের ভিতর কানের খাটনি আজকাল বেশি। ভাবছি, একজোড়া শোলার ছিপি স্থতোয় বেঁধে কানে ঝুলিয়ে রাখব। গোলমালের সময়টা ফুটোয় ছিপি আঁটা থাকবে। কাজের মুখে সেটা খুলে ফেলব।

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে ক্লান্তিতে পচা বাইটা শুয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ সে উঠে বসে—বসা ঐ মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব। দুই হাঁটুর ভিতর থেকে জুলজুল করে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, কান রপ্ত করতে বলেছিলাম, কদ্দুর কি কি হল বল্।

করপোরেশন-ইস্কুলে পড়বার সময় বাড়িতে অঙ্ক করতে দিত। মাষ্টার হুঙ্কার দিয়ে ক্লাসে ঢুকত: হয়েছে টাস্ক? পচা বাইটার ভঙ্গিটা অবিকল তাই।

সাহেবও সেই আমলের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, হল আর তেমন কই! আপনার অসুখ হয়ে পড়ল, ফাঁকই তো পেলাম না।

পচা বলে, আজকেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যা। আমার বড়ছেলে যা বলে গেল। নিজের আখের তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে। পনের-বিশ দিন পরে আসিস, পরখ করে দেখব।

সাহেব আমতা-আমতা করে, আপনি এখনও ভাল করে সেরে ওঠেন নি বাইটামশায়।

এবারে পচা রেগে উঠল: তাতে তোর কি? তোর মাথাব্যথা কিসের? বড়ছেলের বাক্যি কানে শুনলি, ছোটবউয়ের মধু-মাখা বোলও শুনে থাকিস। আপন লোক হয়ে তারা ঐ রকম করে, তোর কোন দায়টা পড়েছে বল দিকি?

দম নিয়ে আবার বলে, আমার কাছে ঠায় না বসে ঘুরে ঘুরে বেড়া। যেখানে কথাবার্তা, সেইখানে কান পাতবি। নিশ্বাসের শব্দ শুনবি মন স্থির করে। দিনেরাত্রে সব সময় মানুষ ঘুমুচ্ছে—পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ বুড়োমানুষ বাচ্চামানুষ কাছে গিয়ে চোখ বুঁজে নিশ্বাসের তফাত বুঝে নিবি। গাঢ় ঘুম, পাতলা ঘুম, সাচ্চা ঘুম মেকি ঘুম—নিশ্বাস সব আলাদা আলাদা। শুধু মানুষ হলেও হবে না—কুকুর বিড়াল গরু-ছাগল যত রকম জীব আছে, নিশ্বাস চিনে ধরতে হবে। ধারালো দুখানা কান তৈরি হল তো কাজের বারো আনা শেখা হয়ে গেল। যেমন যেমন বললাম সেই মতো করে হপ্তা দুই পরে আসিস।

হুঁ—বলে কি বলতে গিয়ে সাহেব চুপ করে যায়। কোমল কণ্ঠে পচা বলে, কি করে?

মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে সাহেব ভয়ে ভয়ে বলে, যে রকম

বললেন—কান খাটিয়ে ঘুরে বেড়াব এখন থেকে। কিন্তু থাকতে চাই এক জায়গায়, আপনার পাদপদ্মে। গুরু বলে মান্য দিয়েছি—পদসেবা করব, নিত্যি-দিন সুখের কথা শুনব। বিস্তর শিক্ষা তাতে। খাব না এ-বাড়ি, এত কথা কথান্তরের পরে ভাতের দলা গলা দিয়ে নামবে না—

বলে চলেছে এমনি। পচা অন্য কি ভাবছে! কথার মাঝখানে বলে উঠল, মার খেতে পারিস কেমন তুই? কিল-চড়-ঘুষিতে লাগে?

সাহেবের চমক লাগে। মারের কথা উঠল কেন হঠাৎ? কাছারির নায়েব মুরারি বর্ধনের হাতে লেঠেল-বরকন্দাজ বিস্তর। তারই একদল জুটিয়ে বোধহয় মারধোর দেবার তালে আছে। হায়রে রে হায়, কিলচড় সাহেব কবে খেল যে ফলাফল বলবে! কিল তো কিল, চোখ রাঙিয়ে একটা কথা বলার জো ছিল কারো! সেই একদিনের ব্যাপার—চালাঘর তুলে নফরকেষ্ট শুইয়ে পরখ করবে, ভয় পেয়ে সাহেব সুধামুখীর কাছে ছুটে গেল! কী আগুন তখন তার দুই চোখে—কপিল মুনি চোখের আগুনে সগরপুত্রদের ভস্ম করেছিলেন, নফরকেষ্টও ভস্ম হত আর খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে। বাঘিনীর মতো আগলে রেখে সুধামুখী তাকে অপদার্থ করে দিয়েছে—

পচা প্রশ্ন করে: চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। কোনদিনই ধরা পড়বে না, এমন কথা হলফ করে বলার জো নেই। ধরে তো ফেলল—কি করবে বল্ দিকি সকলের আগে?

সহজ প্রশ্ন, সোজা জবাব। সাহেব বলে, মারবে—

ঘাড় নেড়ে পচা সায় দেয়: তাই। গৃহস্থ মারবে, মারবার লোভে বাইরের মানুষ দুড়দাড় করে ছুটে আসবে। মানুষ মেরে যত সুখ, এমন কিছুতে নয়। মানুষই তখন আর নেই—চোর—মারধোর সেরে হাত বেঁধে চোরকে তো থানায় জমা দিয়ে এল। সেখানেও মার, সে মারের হরেক কায়দা। সামলাতে না পেরে আনাড়ি চোর একবার করে বসে—দলের কথা মালের কথা বলে দেয়।

সেই সর্বনাশ না ঘটতে পারে—বড়বিদ্যার গোড়ার পাঠ তাই। মারখাওয়া শিখে নেওয়া শিক্ষার পদ্ধতি আছে দস্তুরমতো—দলের মধ্যে এ ওকে পেটায়। হাত দিয়ে—ক্রমশ, লাঠি-বেত-বাঁশ যা হাতের কাছে মেলে। পিটিয়ে রক্ত বের করবে। অভ্যাসে গোড়ার দিকে গা-গতর ব্যথা হবে, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়েও পড়তে পারে। রপ্ত হয়ে গেলে তখন আর কিছু না—আদর করে হাত বুলাচ্ছে যেন গায়ের উপর।

পচা বলে, যন্ত্রণা মারগুতোনে নেই—যন্ত্রণা ভয়ের। মারের সময় কত ব্যথাই না জানি লাগবে—ভয়টা সেই। সাধুরা পেরেকের শয্যায় শুয়েবসে থাকে,

বৈশাখের ঠা-ঠা রোদ্দুরে বসে আগুন পোহায়, মাঘের রাতে ঠাণ্ডা দীঘিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ধ্যান করে! গাজনের সন্ন্যাসী পিঠে বড়সি গেঁথে বাঁই-বাঁই করে চড়কগাছ পাক খায়। হয় কি করে এসব?

সাহেব মৃদুকণ্ঠে বলে, ভগবানের দয়া সাধু-সন্ন্যাসীর উপর—

কথা শেষ করতে না দিয়ে পচা বলে ওঠে, সাধু আর চোর এক গোত্রের আমরা—উনিশ আর বিশ।

পচা বাইটার কথা সেদিন হেঁয়ালির মতো ঠেকল। পরে সাহেব মিলিয়ে দেখেছে। বলাধিকারীও এমনি কথা বলতেন। শরীরের কষ্ট নিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ নেই, চোরেরও ঠিক তাই। সাধুরা সত্যনিষ্ঠ, নিজ দলের মধ্যে চোরও তাই। বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দল-ছাড়া করবে। খাঁটি সাধু কামিনী-কাঞ্চনে বিরাগী, মোক্ষলাভ তাঁর সাধনা। চোর এইখানটা একটি ধাপ নিচে—কামিনীতে বিরাগী কাঞ্চনের সাধনা তার। কাঞ্চনের ধাপ কাটিয়ে আর একটু উঠলেই নিষ্কলঙ্ক ষোল আনা সাধু। রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে যান—হদ্দ-মধুর হতে হলে জন্মান্তরের তপস্যা লাগবে।

কিন্তু এ-সব পরবর্তী কালে ধীর মস্তিষ্কের বিচার। মার খাওয়ার গুণগান করছে ওস্তাদ পচা। ভাল রকম মার খেতে পারলে শুধুমাত্র তারই গুনে বেঁচে আসা যায়—

সে কেমন?

ধরে ফেলে গৃহস্থ তো ঠেঙানি জুড়ল। পাড়া প্রতিবেশীরাও কোমর বেঁধে লেগে গেছে। চোরের কি কর্তব্য তখন? মারধোর অল্পে যাতে না থামে, সেইটে দেখতে হবে। মারুক, ক্রমাগত মেরে যাক। ক্লান্ত হয়ে মানুষের দম ফুরিয়ে এসেছে, রাগের ঝাঁঝ কমছে, ঝানু কারিগর সেই মুখটায় দুটো-পাঁচটা ফোড়ন কেটে রাগ বাড়িয়ে দেবে। পুরো জোর দিয়ে আবার লেগে যাক। নিজেও ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়বে, চোট লেগে যাতে কেটেকুটে যায়। পাঁচ-সাত জায়গায় রক্ত বের করতে পারলে আর কথা নেই। বেকসুর খালাস।

কেন?

অধীর কণ্ঠে বাইটা বলল, কী মুশকিল। কাজটা যে বে-আইনী। সরকারের নিয়মে হাতে মারার কারো এক্তিয়ার নেই। হাকিম রায় দিলে গুণেগুণে বেতের সেই কয়েকটা ঘা পড়বে, একটি তার বেশি হবার জো নেই। অথচ মারে সবাই—তলা থেকে উপর অবধি। জানেও সকলে। কিন্তু আইনের ইজ্জত আছে—দাগ রেখে কেউ মারবে না। ধরলে বেকবুল যাবে। সেই দাগ অঙ্গঅঙ্গে গেঁথে রয়েছে—দারোগা-হাকিম কোন্ ছার, তুই তো রাজচক্রবর্তী

তখন। যারা মেরেছে তারা চোরের অধম—থানা-পুলিশ করবার শখ নেই তাদের। গোলমাল না করে আপোসে যদি সরে পড়িস, তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চাই কি টাকাটা সিকেটাও হাতে তুলে দিতে রাজি।

অনেক কথাবার্তা হল। ভাতঘুম ধরেছে এবার, বাইটার চোখ বুজে আসে। সাহেব উঠে পড়ল, পাটোয়ার-বাড়ি একবার ঘুরে দেখে আসবে।

পচা বলে, সুঁচটা পড়লেই কানের সাড় হবে, আর পাহাড় ভেঙে পড়লেও গায়ের সাড় হবে না—শিক্ষা বলি তাকে। সে পাকা-লোক আজকাল আর দেখিনে। তোর হবে সাহেব, তোর কাজকর্ম দেখেশুনে তবে আমি যেন চোখ বুজি।

দশ

যা আন্দাজ করেছে তাই—চারদিন গরহাজির থাকার দরুন সাহেব বরখাস্ত। দীনু পাটোয়ার নতুন রাখাল রেখেছে। তবে ভাঁটি-অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের অকুলান বলে গোমস্তার কাজ এখনো খালি। শুধুমাত্র সেইটুকু হতে পারে। মাইনে গোমস্তাগিরি বাবদে ছিল তিন। দুরকমের কাজ একসঙ্গে—ধরে নিলাম তাই পাইকারি দর। এখন এই চাকরির জন্য কত হওয়া উচিত, তুমিই বল সাহেব। সাড়ে-তিন—কি বলো? কাগজ-কলমের কাজ হল বাবুভেয়ের কাজ—দর কিছু বেশিই হবে। মাইনে ঐ সাড়ে তিন সাব্যস্ত রইল।

সাহেব বলে পুরানো পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন পাটোয়ারমশায়। এখানে থাকব না, চাকরি সকালবেলা এসে করে যাব।

দিব্যি হল। টাকাপয়সা যা ছিল সুধামুখীকে মণিঅর্ডার করে একেবারে শূন্য হাত। আবার কিছু নগদ এসে পড়ল হাতে। সকল দিকে চমৎকার। নিজ রোজগারের ভাত—তক্কে তক্কে থাকতে হবে না, মুরারি বর্ধন কখন এসে ধরে ফেলে।

পচাকে এসে বলে, চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে এলাম। শোব আপনার ঘরে, যেমন যেমন বলবেন করে যাব। চাট্টি করে চাল ফুটিয়ে নেবো—এদের বাড়িতেও নয়। সীমানার বাইরে পথের ধারে জামরুলতলায়।

বাড়ি আজ ওদেরই বটে! ফোঁস করে পচা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেঃ জীয়ন্তে মড়া হয়ে ওদের বাড়ি পড়ে আছি। গতর থাকলে আমিও আলাদা চাল ফুটিয়ে নিতাম। ওদের ভাত না গিলে আমার যে উপায় নেই।

সেই ব্যবস্থা। জামরুলতলায় পরদিন সাহেব ভাত চাপিয়েছে। তিনটে মাটির ঢেলা উনুনের তিনটে ঝিক, তার উপরে মেটেহাঁড়ি। পুকুরঘাটে স্নান করে সুভদ্রা কলসি নিয়ে হেলতে দুলতে ফিরছে। কাঁখের কলসির মতো দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন—চলনের সঙ্গে সে যৌবনও ছলকে ছলকে পড়ে যেন। সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়, ঘাড় লম্বা করে দেখে।

কি হচ্ছে ঠাকুরপো ? রান্না করছ ওখানে ?

হুড়কো পার হয়ে ঘাসবন মাড়িয়ে জামরুল তলায় চলে আসে : রান্নার বিদ্যেও জানা আছে তোমার ? ঠাকুরপোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে বড় ভাগ্যধারী। ঠাকুরপো রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে, সে মেয়ে বিছনি বেঁধে আলতা পরে খাটে বসে পা দোলাবে। মাটিতে পা ছোঁয়াতে হবে না। তোমার সংসারে আজ আমার নেমন্তন্ন ভাই। রান্না হলে পাতা পেতে বসে যাব।

সাহেব জবাব দিল না, শুকনো ডাল-পাতা খুঁটে খুঁটে উনুনে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বলে, কি রাঁধছ গো ?

ভাত, কাঁচকলা-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

উঃ, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া একেবারে ! সাহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল : হবে আর কোন্ ছাই, পাবে কি কোথায় ? আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না, এমনি খেয়েই চলবে বুঝি বরাবর ?

সাহেব বলে, মন্দ হল কিসে ? দু-দুখানা তরকারি। তার উপরে কাগজি-লেবু আর কাঁচালঙ্কা তুলে এনেছি একজনের বাগান থেকে। ও কি, জল আমি ইচ্ছে করে কম দিয়েছি, ফ্যান গালবার হাঙ্গামে যাব না তো ! ও কি, ও কি, ও কি—

হুড়হুড় করে কাঁখের কলসি উপুড় করে দিয়েছে সুভদ্রা। ভাতের হাঁড়ি জলে ভরতি। ঢেলার উনুন ভেসে গেল জলস্রোতে। সুভদ্রাও সেই সঙ্গে খিল-খিল করে করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যায় : বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠাকুপো। বর্ধনবাড়িতে থেকে জঙ্গলে বসে রান্না করে খাবে, লোকের চোখে কি রকম ঠেকবে বলো তো ! এসব হবে না। খাবে যেমন এই ক'দিন খেয়ে যাচ্ছ।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহেব বলে, বড়বাবুর ঐসব কথার পরে এ বাড়ির ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

সুভদ্রা বলে, সদু-ঠাকুরঝি ভাত আনবে না, আমি নিজের হাতে এনে দেবো। তবু যদি আটকে যায় হাত বুলাব গলার উপর। ঠিক নেমে যাবে তখন।

বলতে বলতে লঘুকণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে : বড়বাবু যখন বাড়ি থাকে, ঠিক সেই সময়টা তার চোখের উপর দিয়ে ভাত বেড়ে আনব। আমি এ বাড়ির কেউ নই, ওদের দয়ার ভাত খাচ্ছি—তার একটা ভাল রকম বোঝাবুঝি হওয়া দরকার।

কিন্তু বোঝাবুঝিটা আমায় দিয়ে কেন বউঠান ?

তা ছাড়া মানুষ কোথা আমার ? মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই পর্যন্ত নেই। বরের ঘাড়ে ভূত চেপে তাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে—

দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, ভুল বললাম। ভূত নয়, ভগবান চেপেছে। মরুকগে ছাই। কিন্তু তোমায় সামনে করে বড়বাবু বলেছে, তোমাকেই নিত্যি দু-বেলা খাইয়ে তবে সে কথার খণ্ডন হবে। দিক তুলে পিঁড়ি থেকে, দেখি কত বড় ক্ষমতা! এ জিনিস তো অন্য কাউকে খাইয়ে হবে না ভাই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অধীর কণ্ঠে সুভদ্রা বলে, উঠলে না এখনো ?

দু-হাতে হাঁড়িটা তুলে আছাড় মেরে ভেঙে দিল, আধ-সিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বলে, রাগের পুরুষ, ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। চলে এসো বলছি—

এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরল। সাহেব স্তম্ভিত। দাঁড়াতে হল হাতকড়ি-পরানো এক চোরের মতোই।

ফিক করে সুভদ্রা হেসে পড়ে : দেখ, তুমি আমার হাত ধরেছে বলে চেঁচাব বলেছিলাম। উল্টোটা হয়ে গেল। তোমার বদলে আমাকেই ধরতে হল শেষটা। ধরিয়ে তবে ছাড়লে—তুমি কম লোক! চেঁচাও এবারে—

সৌদামিনী বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কি করছ ছোটবউ ? এক ফোঁটা জল নেই বাড়ি। কলসি নিয়ে ওখানে কি তোমার ?

সুভদ্রা হাত ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব বলে, সদু-দিদি কি ভাবল বলুন দিকি ?

সুভদ্রা সহজভাবে বলে, কি করে বলি! তোমার রূপে মজে গেছি, তা-ও ভাবতে পারে। শ্বশুর চোর, ভাসুর ফেরেব্বাজ, বর পলাতক—সে বাড়ির বউ নষ্টদুষ্ট হবে, অবাক হবার কি!

কালীঘাট থাকতে কথকতা শুনত খুব সাহেব। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হত তা-ও শুনত। পুরাণের ঘটনা মনে আসে। কোন জাঁদরেল ঋষি বা রাজা, তপস্যার যখন বড় বেশি এগিয়ে যান, রম্ভা-মেনকা-উর্বশীরা আদা-জল খেয়ে লাগে তপোভঙের জন্য। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই সিদ্ধি। সাহেবের সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউ সুভদ্রা। চেহারা সকলে ভাল ভাল করে সেই চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। কালীঘাটে একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে

দিয়েছিল—প্রণয়ের রেশারেশি ব্যাপারে। বেঁচে উঠল মেয়েটা, কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। প্রণয়ীরা তখন সব ভেগে পড়ল। সাহেব ভাবছে, তারও মুখেও কেউ অ্যাসিড ঢেলে চেহারা পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিয়ে যেত!

সেই দুপুরে ভাতের থালা সুভদ্রা নিজে নিয়ে এলো। জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে গেলাস দিয়ে পরিপাটি করে আগে ঠাঁই করে গেছে। ঘরের ভিতরে নয় —বাইরের দাওয়ায়। কাছারি থেকে মুরারির আসার সময় হল—ভাগ্যবশে যদি এসে পড়ে, নয়নভরে দেখবে। প্রকাণ্ড বগিথালা, ভাতও প্রচুর, মোচার আকারে ঠেসে ঠেসে বাড়া। বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি সাজিয়ে এনেছে। ভাতের থালা নামিয়ে চতুর্দিকে বাটিগুলো সাজিয়ে সুভদ্রা ডাক দেয়: চলে এসো ঠাকুরপো—

সেইমাত্র স্নান সেরে সাহেব উঠানে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। সুভদ্রা বলে, দুটো তরকারি আমি রেঁধেছি। আর সব সদু-ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির রান্না আগে খেয়েছ। আমার কোন্ দুটো চোখে বলে দেবে।

সাহেব আঁতকে ওঠে: সর্বনাশ, এত ভাত কে খাবে?

বসে পড় না তুমি। ভাত বেশি নয়, আগে থাকতে চেঁচিও না।

সামনের উপর সুভদ্রা চেপে বসল। কালীঘাটের সুধামুখী এমনি বসতে যেত, রাগ করে উঠত সাহেব। ভাত ফেলে উঠে পড়বার ভয় দেখাত। আজকে অনেক দিন পরে এত দূরের মুলুকে এসে আবার সেই ব্যাপার।

বিড়বিড় করে সুভদ্রা বলছে, এ পোড়া বাড়িতে কোন জিনিস কাউকে প্রাণ ভরে খাওয়াবার জো আছে! বড়জা যেখানেই থাকুক ছুটে এসে পড়বে। মুখ-মিষ্টি মানুষটা হাড়কঞ্জুষ। নিজের হাতে ভাত বেড়ে মাছ-তরকারি ভাগ করতে বসবে—অন্যের উপর ভরসা হয় না পাছে সে বেশি দিয়ে ফেলে। যত আঁটিসাটি পরের বেলা—নিজের পেটের একগাদা পঙ্গপাল, তাদেরই কেবল গণ্ডে-গণ্ডে গেলাবে। বদহজমে সবগুলো সলতে হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়বে না। তোমার ভাত বাড়ার সময় বড়দি'কে ঘেঁসতে দিইনি। খাওয়ার সময় এই যেমন আছি, তখনও এমনি আগলে বসে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়েছি। ট্যাসট্যাস করে মুখের উপর বলি, সেজন্য ভয় করে আমায়। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে পারল না, ছটফট করে বেড়িয়েছে।

সাহেব সকাতরে বলে, কিছু ভাত তুলে নেন বউঠান। মা-লক্ষ্মীকে ফেলা-ছড়া করতে নেই। লাগলে আবার চেয়ে নেব।

চাইতেই হবে তোমার। সে আমি জানি। আরম্ভ করে দাও, তখন বুঝবে।

কথা কানেই নেয় না। কেমন এক রহস্য-ভরা হাসি হাসছে সুভদ্রা। ভাত ভেঙে নিয়ে সাহেব হাসির কারণ বুঝতে পারে। ভাত অল্পই, বাড়া-ভাতের ভিতরে সাত-আটখানা মাছের দাগা। মাছ ভাতের তলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বলে, এত মাছ খেতে হবে?

সুভদ্রা বলে, দুই ভাই ওরা, সমান শরিক। ছোট শরিকের প্রাপ্য নিতে পারিনে বলে বট্‌ঠাকুর আস্পধা পেয়ে যাচ্ছেন। ওদের দশ-দশটা ছেলেমেয়ে কতগুলো করে খায় হিসাব করো দিকি।

সাহেব বলে, সেই দশখানা মুখের খাওয়া আমায় দিয়ে খাইয়ে শরিকানা বজায় রাখবেন?

দশই বা কেন! তার উপরে ও-তরফের বট্‌ঠাকুর নিজে রয়েছেন। আমাদের হা-ঘরে মানুষটা একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে ভিনগাঁয়ে পড়ে রয়েছে। তার হিসাবটাও ধরবে এই সঙ্গে।

সাহেব বলে, এতজনের খাওয়া একলা পেটে সামাল দিতে পারব না। মরে যাব বউঠান, রক্ষে করুন।

আমার যে একজনই ভাই। একলার বেশি কোথা পাই?

গলাটা কেঁপে উঠল বুঝি সুভদ্রার। সঙ্গে সঙ্গেই স্বর বদলে তাড়া দিয়ে ওঠে: মাছ ক'খানা ফেলে রেখেছ কোন্ আক্কেলে শুনি? বড়গিন্নি দেখতে পেলে পুটপুট করে বট্‌ঠাকুরের কাছে লাগাবে। ছুতো পেয়ে সে মানুষ চেঁচিয়ে জানান দেবে। যে কলঙ্ক এড়াতে চাইছ সেইটেই ঘটে যাবে। কিনা, ভালবাসার মানুষকে চুরি করে মাছ খাওয়াচ্ছি। ভাত চাপা দিয়ে দাও, যেমন করে নিয়ে এসেছি। আস্ত এক-একখানা মুখের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করো। পুরুষমানুষ হয়ে একটুও না পারবে তো বাসি বাইটার কাছে ঘোরাঘুরি কি জন্যে? বাড়ি ফিরে গিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের মতন বউ হয়ে বোসোগে।

ফিসফিসানি কথা—পচা বাইটার কিন্তু কান এড়ায়নি। ঘরের মধ্যে থেকে সে বলে, খেতে বসলি বুঝি সাহেব? রোগা মানুষ আমারও যে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। আমার ভাত কে এনে দেয়!

সুভদ্রা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: রোজ যে মানুষ এনে দেয়, তাকে ডাকলেই তো হয়। আমি কবে দিয়ে থাকি, আমায় কেন ঠেশ দিয়ে বলা?

সদয় হয়ে নিজেই ডেকে দেয়: ঠাকুরঝি, অ সদু-ঠাকুরঝি, ভাতের জন্য মূর্ছা যায় এদিকে মানুষ। কখন ভাত দেবে?

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। কোথায় কোন কাজে আছে, বাড়ির ভিতরেই নেই হয়তো। পচা বাইটা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে : যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলাম, তা বলেও কারো দয়ামায়া নেই। রোগা মানুষটা না খেয়ে পড়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কানে শুনেও সাড়া দেবে না।

সুভদ্রা টিপ্পনী কাটে : দুয়োর থেকে ফিরে আসতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? ঢুকে পড়লেই তো হত।

ক্ষেপে গিয়ে পচা বলে, হারামজাদির কথা শোন একবার। জন্মের পরে বাচ্চাকে মধু খাওয়ায়, তোকে বেয়ান নিমপাতা বেটে খাইয়েছিল।

নিঃশব্দে হেসে হেসে সুভদ্রা যেন পরমানন্দে উপভোগ করছে। সাহেবকে বলে, দোষ কিন্তু তোমারই ঠাকুরপো। এ যাত্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা তুমি ছাড়া কারো সাধ্য হত না। মানুষটার কষ্টের জন্য দায়ী তুমি। নিজে কষ্ট পায়, বাড়িসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে মারে।

পচা গজরাচ্ছে : এত কথা কিসের—সদুকেই বা ডাকাডাকি কেন? মুঠোখানেক ভাত নিজে এনে দিলে হাতে কাঁড়কুষ্ঠ হবে নাকি?

হতেও পারে, হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভালোলোকের সেবায় পুণ্য। পাপীর সেবা মানেই তো পাপকে জিইয়ে রাখা বেশিদিন ধরে।

আর যাবে কোথায়! অসুখ থেকে উঠলে কি হয়, মুখের জোরটা দিব্যি আছে। রে-রে করে উঠল : ওরে আমার পুণ্যির বস্তা! চোখে দেখতে হয় না আমার, এমনিই সব টের পাই। শোন তবে লো রাই, কুলের কথা কই—

আর হাসিতে ফেটে পড়ে এদিকে সুভদ্রা। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, চালাও না, চালিয়ে যাও শ্বশুরঠাকুর—

সাহেবকে বলে, শুনে নাও ঠাকুরপো, কী সমস্ত বিশেষণ আমার!

সাহেব ধমকের সুরে বলে, শ্বশুর গুরুজন—তাঁকেই বা আপনি কেন অমন করে বলেন?

সুভদ্রা পাড়াগাঁয়ের চলতি মোটা রসিকতা করে একটা : আর লোকের শ্বশুর গুরুজন, আমাদের ইনি গরুজন।

হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায় সুভদ্রার কণ্ঠে। বলে, দশের মধ্যে মুখ তুলতে পারিনে। বাইটাদের বউ বলে চোখ টেপাটেপি করে। ঐ মানুষের ছেলে হওয়ার ঘেন্নায় তোমার ছোড়দা দেশান্তরী হয়ে রইল, চোখেই তো দেখে এসেছ ভাই। অতবড় কাছারির নায়েব বটঠাকুর খরচা করে দালান কোঠা বানিয়েও বাড়ির নাম বর্ধন-বাড়ি করে তুলতে পারলেন না, সেই

চিরকেলে বাইটা-বাড়ি রয়ে গেল। মানুষটা মরে পুড়ে ছাই না হলে কলঙ্কের মোচন নেই।

বলে যাচ্ছিল সুভদ্রা এক সুরে। হঠাৎ সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বলতাম না এত সব ঠাকুরপো। মুশকিল হয়েছে, গাঁদালি-পাতার ঝোল রান্না হয় নি। ঐ ছাড়া কবিরাজ আর কোন তরকারি দেবে না। সদু-ঠাকুরঝির খেয়াল ছিল না—বাগানে বাগানে এখন সে গাঁদালিপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝগড়াঝাটি গালিগালাজে ভুলে আছে, নইলে ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পাগল করে তুলত। যতক্ষণ ঠাকুরঝি না আসে, আমায় এমনি চালিয়ে যেতে হবে।

গালির স্রোত অবিশ্রান্ত চলেছে। নির্বিকার সুভদ্রা। এক-একবার বড় অসহ্য হয়ে ওঠে, দু-হাতে সেইসময় কান চাপা দেয়। হাসি-ভরা মুখে মৃদু-কণ্ঠে গল্প করছে সাহেবের সঙ্গে, খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে উঠে না পড়ে সতর্ক চোখে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। একবার মনে হল, গালির তেমন যেন আর বাঁধন নেই। সৌদামিনী এখনো ফিরল না—বুড়োমানুষের দম ফুরাল নাকি?

ভাণ্ডার সুভদ্রার জোগানেই থাকে। মুখ টিপে একটুখানি হেসে ঘরের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শোন ঠাকুরপো, কচি মেয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলাম। শাশুড়ি বেঁচে নেই, ভালবেসে শ্বশুর নিজে এই সোনার চুড় পরিয়ে দিল। বলে, শাশুড়ির হাতের জিনিসটা, তোমার নাম করে রেখে গেছে ছোট-বউমা। ভাবি, সত্যিই বা! বড়দির কাছে পরে টের পেলাম, সমস্ত মিথ্যে, বউ-পরিচয় হবে বলে টাটকা সিঁধ কেটে এনেছে। কোন আটকুড়ো বাড়ির অপয়া জিনিস—বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতে তাই হাতে পরিয়ে দিল। বাঁজা নাম আমার সেই জন্যে ঘুচল না।

এত কুৎসা-গালিগালাজে যা হয় নি—নিজের এই কথায় সুভদ্রা-বউয়ের চোখ দুটো ছলছল করে আসে। বলে, বাসি বাইটার কি! তুই বেটার বউ—একটার যেমন হল না, আর একজনে তেমনি গণ্ডায় উশুল করে দিচ্ছে বছর বছর দিয়ে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগির মতো। বলব কি ভাই—অন্ধকারে দরদালানে পা ফেলতে ভয় করে। কোন্‌টা কোন্ দিকে পড়ে আছে—পা চাপিয়ে না বসি। আর আমার নিজের ঘর—সে ঘরে জগঝম্প পেটাও, ট্যা করে উঠবার কেউ নেই।

পচার গর্জন উঠল: ফেরত দিয়ে দে হারামজাদি আমার গয়না। নিরেট সোনার জিনিস, একগাদা পাথর বসানো। অপয়া যদি তো হাতে নিয়ে ঘুরিস কেন রে? ভোগ-ব্যাভার করবি, মুখে এদিকে শতেক নিন্দে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতদিন রাখতে পারিস হাতে। না দেখে ছাড়ব না।

আর সুভদ্রা এ-সব কথায় নেই, সৌদামিনীকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেছে। রান্নাঘরে সে গাঁদালির ঝোল রাঁধুক, ক্রোধের জের অন্তত ততক্ষণ অবধি চলবে। সাহেবকে নিয়ে পড়ল আবার। বলে, কী তুমি ভাই, গলা দিয়ে যে ঢুকতে চায় না, গলার নলি নিরেট বুঝি তোমার? মাছ তো তিন-চারটে বাকি। বড়গিন্নী আসছে—যা আছে মুখে পুরে ফেল। শিগগির, শিগগির—। জিভ দিয়ে টাকরায় ফিরিয়ে এনে খুশি মতন এর পর জাবর কেটো।

সুভদ্রাকে বাঁচানোর জন্য করতে হল তাই সাহেবকে। মিছেকথা—কোথায় বড়বউ! ফাঁকিজুকি দিয়ে খাইয়ে সুভদ্রা হি-হি করে হাসে। থালা শেষ হল তো সুভদ্রা তাড়াতাড়ি জামবাটি ভরে দুধ গরম করে নিয়ে আসে। দুধের মধ্যে মর্তমান কলা আর ফেনি-বাতাসা।

বলে তাকিয়ে কি দেখ? ঢকঢক করে চুমুক দিয়ে ফেল। হিসেব করে দেখ, বড়গিন্নির দশ বাচ্চায় মিলে কত সের দুধ টানে। তার উপরে বটুঠাকুরের গোঁফ ভিজিয়ে ক্ষীর খাওয়া আছে। আমি সেখানে কী পেলাম।

আর, ঘরের বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত বাইরে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। গাঁদালি-ঝোল আর ভাত এসে পড়লে তবে সেটা বন্ধ।

সিঁধের কথা উঠল।

পচা বলে, সাত রকম সিঁধের কথা বললি তুই—মোটে সাত?

সাহেব বলে, আমি কি জানি আর কি বলব। বলাধিকারী বলেছেন। কথা তাঁরও নয়। পুরানো সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা।

ছিল তাই হয়তো সেকালে। এখন সিঁধ আর সাতের মধ্যে নেই। সাত কেন, সত্তরে কুলাবে না। এক-এক দলের কাজ এক-এক কায়দায়। আজে-বাজে লোকে তফাত ধরতে পারে না। অনেক দলের আবার হাতে-লেখা নিজস্ব বই থাকে। গোড়ায় কোন বড় মুরুব্বির মুখ থেকে লিখে নিয়েছিল, তার উপরে কাটকুট চলে আসে। ওস্তাদ সেই জিনিস শিষ্য-সাগরেদের কাছে পড়ে শোনান, কায়দাগুলো হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। এ-দল ও-দলের মধ্যে কাজের ফারাক হবেই, যার চোখ আছে সে বলে দিতে পারে। আমার একদিন ছিল তাই, কাজ দেখে কারিগর বুঝতে পারতাম। এখন নজরের জোর নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনে আর তেমন।

নিশ্বাস ছেড়ে পচা বাইটা আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল। মুখ তুলে আবার বলে, বটুক-দারোগা সবে নতুন এসেছে। আমার কাজকর্মের কথা শুনেছে—পিছনে লাগেনি তখন অবধি, ভাব রেখে চলে। এই সোনাখালিরই এক বাড়ি সিঁধ—দারোগা নিজে হদ্দমুদ্দ দেখে শেষে আমায় ডাকল।

তাতিয়ে দিচ্ছে : তোমার গাঁয়ের উপর অন্য কারিগর ঢুকল, আস্পর্ধাটা বোঝ বাইটা।

সাহেবও অবাক এতবড় আস্পর্ধার কথা শুনে। নিয়ম হল, এক চোরের গাঁয়ে অন্য চোর ঢুকবে না। এই সুখে চোরের গাঁয়ের লোক রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দুয়োর খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই।

অবাক হয়ে সাহেব বলে, আপনার গাঁয়ে এসে সিঁধ কাটে এমনটা হয় কি করে বাইটামশায় ?

পচা বলে, বলছি তো সেই কথা, শোন। অন্যায় করেছে ঠিক, কিন্তু আমিই তার বিহিত করব। দারোগা এর মধ্যে ঢুকে পড়ে উপরওয়ালার কাছে নিজের পশার বাড়াবে, কেন সেই নিমিত্তের ভাগী হতে যাবো ?

বটুকদাস প্রস্তাব করলেন, কারিগরের নামটা বলো বাইটা, দুয়ে মিলে সায়েস্তা করে দিই।

পচা আকাশ থেকে পড়ে : আমি কি করে জানব বলুন। টের পেলে কি হাত দিতাম ?

দারোগার কাছে ঘাড় নেড়ে এলো। কিন্তু কাজের ধারা দেখে পচা বুঝেছে, কারিগর মুনসি আকুন্দি ছাড়া কেউ নয়। দো-চালা বাংলাঘর তার ভারি পছন্দ। বাড়ির সাত-আটখানা ঘর, সমস্ত তাই—চৌরিঘর সে বাঁধে না। সিঁধেরও হুবহু সেই ঢং—বাংলাঘর আড়াআড়ি যেমন দেখতে হয়।

আকুন্দির কাছে গিয়ে পড়ল : আমার পড়শির উঠোনে কোন্ সাহসে তুমি চলে যাও ?

আকুন্দি বলে, সে জায়গায় তুমি ঢুকবে না, অন্য কেউ ঢুকতে পাবে না—মজা হল বেশ গৃহস্থর। রাজরাজড়ারা গড় বানিয়ে থাকত, সেইরকমটা হয়ে দাঁড়াল। দল তো আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাব সেখানকার কারিগর এসে ঠিক এই কথা বলবে। সিঁধকাঠি তবে তো গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে উঠতে হয় !

ক্ষুব্ধ পচা বলেছিল, বাইটা আর আজেবাজে কারিগর এক হল তোমার কাছে ?

আকুন্দি খাতির করত পচাকে, মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল। তখন চুপ করে রইল। ক'দিন পরে শোনা গেল, বমাল সমস্ত মক্কেলের দাওয়ায় রাতা-রাতি ফেরত রেখে গেছে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ পচা এক প্রশ্ন করে বসে : জবাব দে সাহেব, দেখি জ্ঞানবুদ্ধি তোর কেমন। সিঁধ কাটা সারা, অপর যা-কিছু করণীয়,

সমস্ত হয়ে গেছে। এবারে কারিগরি নিজে তুই সিঁধে ঢুকবি। কি ভাবে সেটা—মাথা আগে দিবি না পা ?

গুণীরা এই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। মতভেদ আছে, সুবিধা-অসুবিধা উভয় দিকেই। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে আছে, সিঁধের গর্তে চোর মাথা দিতে যাচ্ছে, সর্দার হাঁ-হাঁ করে ওঠে : পরের ঘরে পা দুটোই ঢুকবে আগে। পচা বাইটারও সেই মত—সকল অঙ্গের আগে পা চালান করে দেওয়া। ঢোকার আগে নানান রকমে তুমি পরখ করে নিয়েছ, তা হলেও এক-একটা ঘাগি গৃহস্থ থাকে ধাপ্পায় তাদের ভোলানো যায় না। চোর ধরবে বলে বাপে-বেটায়, ধরো, সিঁধের পাশে ঘুণ হয়ে বসে আছে। উঠছে পা উঁচু হয়ে—উঠুক, উঠতে দাও। বেশ খানিকটা উঠে গেছে—দুই পা দুজনে চেপে ধরল অমনি 'কালী' 'কালী' বলে।

সেই উৎকট অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করে পচা বাইটা খিকখিক করে হাসে। বলে, গৃহস্থ চোরের পদধারণ করে আছে, গুরুঠাকুর ঘরে এলে যেমন হয়। কত বড় ইজ্জত, দেখ ভেবে সাহেব।

একচোট হেসে নিয়ে পচা বলে, গৃহস্থ পা এঁটে ধরেছে, বাইরে থেকে ডেপুটি ওদিকে কারিগরের মাথা ধরে টান। ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলতে না পারে। পাহারাদার খোঁজদার—যারা সব এদিক-ওদিক ছিল, তারাও ধরেছে ডেপুটির সঙ্গে ! কারিগরকে নিয়ে যেন দড়ি-টানাটানি—একবার বাইরের দিকে খানিকটা আসে, ঢুকে যায় আবার খানিকটা ভিতর দিকে। পা আগে দিয়েছিল তাই রক্ষে—এতক্ষণ ধরে এই কাণ্ড চলছে, কারিগরের তবু নিশানদিহি হয় নি। মুণ্ডু বাইরের দিকে, মুণ্ডু না দেখতে পেলে মানুষ চেনে কি করে ? ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল এরা—গৃহস্থের টানের চোটে কারিগর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, ঠেকানোর কোনরকম উপায় নেই। তখন কি করতে হবে বল্।

কোন্ জবাব দিত গিয়ে বেকুব হবে, ওস্তাদের খিঁচুনি খাবে—সাহেব একেবারে চুপচাপ রইল। পচা নিজেই তখন বলে দেয়। যা বলল—সর্বনাশ ! কানে শুনেই সাহেবের আপাদমস্তক হিম হয়ে গেল।

কথার কথা নয়, কাপ্তেন কেনা মল্লিক সত্যি সত্যি তাই করেছিল। না করে উপায় ছিল না। ঈশ্বর মাল্লা পুরানো লোক, মল্লিকের দলের পাকা সিঁধেল। এ হেন কারিগরকেও একবার সিঁধের মুখে ধরে ফেলল, পা ধরে হিড়হিড় করে ভিতরে নিয়ে তুলছে। ডেপুটি তখন হেসোদার এক কোপে মুণ্ডু কেটে নিয়ে দৌড়। খাও কলা গৃহস্থ। উল্টে কাটা-ধড় নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা। দলের একজন গেল, দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই···কিন্তু মানুষটা চিনলে গোটা দল

ধরেই টান পড়ত, অন্ন যেত বহুজনের। ঐ রকম অবস্থায় পড়ে বিবেচক কারিগর নিজেই কত সময় বলে, গায়ের বলে পেরে উঠবিনে তোরা, মুণ্ডু নিয়ে সরে পড়্—

সাহেবের মুখ ছাইয়ের মত সাদা। ভাব দেখে পচা খুশিই বরঞ্চ। বলে, আমারও এ-সব গরপছন্দ। মল্লিকটা চোর নয়, ডাকাতও নয়—দোঁআঁশলা একরকম। আমাদের কাজ হল—মাল বেমালুম সরে আসবে, মানুষের গায়ে কাঁটখানাও বিঁধবে না। সে মানুষ দলের হোক আর মক্কেলেরই হোক।

সাহেবের দু-গালে মৃদু মৃদু চাপড় মারে: গুম হয়ে রইলি কেন? ধরে নে কিছুই হয়নি, মক্কেলরা ঘরের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। নির্গোলে তুই তো সিঁধে ঢুকে গেছিস—তারপর?

সাহেব সসঙ্কোচে বলে, সেকালের কায়দা একটু-আধটু বলতে পারি—পুঁথি-পুরাণে যা আছে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শুনতাম। সিঁধে ঢুকে পড়ে শর্বিলক সকলের আগে ঘরের দরজা খুলে দেয়—নির্গমের পথ।

পচা ঘাড় দুলিয়ে বলে, এখনও তাই। তার আগেও কিন্তু কাজকর্ম আছে।

সাহেব বলল, আগ্নেয়-কীট ছাড়ল, দীপশিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পাখার ঝাপটায় পোকা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেজেয়। চোরের ভয়ে আর রাজার ভয়ে ধনরত্ন লোকে মেজেয় পুঁতত—সেইখানকার বীজ ফটফট করে ফুটে যাবে!

হেসে উঠে সাহেব কথাটা ফলাও করে দেয়: রাজা আর চোর দুটোরই ভয় তখন। রাজা মনে যদি জমিদার-চকদার দারোগা-চৌকিদার বলেন, বেশি ভয় এখনো তাদের নিয়েই।

পচা সায় দিয়ে বলে, আমরা যদি হই ট্যাংরা-পুঁটি তারা রাঘব বোয়াল। সাবেকি বীজ ছড়ানোর নিয়মটা আজও ঠিক চালু রয়েছে—আমরা ছড়াই মটরকলাই।

ঘরে ঢুকবার প্রণালীটা পচা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে। পা থেকে উঠতে উঠতে আস্তে আস্তে গোটা দেহটা উঠে গেল। সোজা উঠে দাঁড়াতে নেই, উঠতে গিয়ে ঠকাস করে হয়তো মাথায় ঘা লাগল, কিম্বা মাথার ঘায়ে একটা কিছু পড়ে গেল আওয়াজ করে। গুটিসুটি হয়ে বসবি একটুখানি। মুঠোখানেক মটরকলাই ছড়িয়ে দিয়ে কান পাতবি। আওয়াজ সূক্ষ্ম বটে কিন্তু কারিগরের কানে ফাঁকি পড়ে না। কলাই মাটিতে পড়লে একরকম আওয়াজ, কাঠের বাক্সে একরকম। টিনের তোরঙ্গ খাট-বিছানা—প্রতিটি জিনিসের আলাদা আওয়াজ। ঘরের কোন দিকে কি রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজে এসে গেল। কলাই আর

এক রকমের আছে, সাদা রং-করা। ছড়িয়ে দে তাই একেবারে। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চোখে সয়ে এসেছে, সাদা জিনিস দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কতটা উঁচুতে কোন্ মাল তাও একবার বোঝা গেল। ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভয়ে লেগে যা এইবারে।

সাহেব অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গভীর রাত্রে পচা বাইটা নিঃশব্দে তক্তাপোশ থেকে নেমে তার গায়ে হাত দিল : চল—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সাহেব বলল, কোথা ?

পচা খিঁচিয়ে ওঠে : গুরু ধরেছিস তো তর্ক করবি নে। বলছি যেতে, তাই চল্।

দূর বেশি নয়, বেশি হাঁটবার তাগত হয়নি এখনো পচার। কোন দিন হবে কিনা কে জানে! গোটা দুই বাঁশবন পার হয়ে পরামাণিকদের বাড়ি। সেই বাড়ি ঢুকে পড়ল।

ফিসফিসিয়ে পচা বলে, টিপে টিপে হাঁটনা এবারে—বেড়ালের চলাচল। বেড়ালের পায়ে ঠিক যেন তুলোর গদি। কেমন করে ইঁদুর ধরে, দেখেছিস ঠাহর করে ? গর্তের পাশে চুপটি করে আছে। গদির গুণে ইঁদুর টের পায় না। যেই বেরুল ঝাঁপিয়ে অমনি টুটি কামড়ে ধরে। চোরের পা-ও সেইমতো চতুর। হাঁটছিস, তার শব্দ নেই। পাঁই-পাঁই করে দৌড়াচ্ছিস উঁচু-নিচু মাঠ-জঙ্গল ভেঙে —তিল পরিমাণ শব্দ হবে না, হোঁচট খাবেনি। পায়ের তলায় তোরও যেন এক বিঘত পুরু গদি। দেহের সর্বঅঙ্গ শাসনে এনে ফেলতে হবে, হুকুমের গোলাম—যাকে যেমন বলবি সেইমত তামিল করে যাবে। এই যেদিন হবে—জানলি, বিদ্যা রপ্ত হয়েছে কিছু। বড় কঠিন বিদ্যা—সেই জন্যে বড়-বিদ্যা বলে।

শর্বিলকের গুণগরিমার কথা সাহেবের মনে পড়ে যায়। হাজার দুই বছর আগেকার কীর্তিমান সেই চোর! চলনে বিড়াল, ধাবনে মৃগ, ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাজপাখি। মানুষ সজাগ কি সুপ্ত শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে কুকুরের মতো। সরে পড়বার সময় সাপ। ম্যাজিকের মতন পলকের মধ্যে চেহারা ও পোযাক বদলে ফেলে। নানান ভাষায় কথা বলে—স্বয়ং বাগ্‌দেবী বুঝি চোরের সজ্জায়। রাত্রিবেলায় দীপের মতো উজ্জ্বল। সঙ্কটে ঢোঁড়ার মত অবিচল। ডাঙায় ঘোড়া, জলে নৌকো, স্থিরতায় পর্বত। যখন ঘিরে ফেলেছে, তখন সে গরুড়তুল্য। খরগোসের মতন চটুল চোখে চারিদিক সে দেখে নেয়। কেড়ে নেবার বেলায় নেকড়েবাঘ, বল-পরীক্ষার মুখে সিংহ। এত গুণ এক দেহে নিয়ে তবেই সে এত বড় চোর হয়েছে।

এগারো

আগে আগে পচা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফিসফিসিয়ে বলে, ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে চলবি। ফাঁকায় যমরাজ হাঁ করে আছেন—ফাঁকা না ধোঁকা। সাপে গর্ত খোঁজে, আমরা অবশ্য অতদূর পেরে উঠিনে—গাছতলায় অন্ধকারে আড়াল-আবডালে খুঁজে নিই।

যাচ্ছেও ঠিক তাই। অপথ-কুপথ ভেঙে। ঘরকানাচে এসে থমকে দাঁড়াল: এইখানটা মনে কর্ সিঁধ কাটতে হবে। বেড়ার ওধারে খাট-তক্তপোশ বাক্স-পেঁটরা নেই, পরিষ্কার মেঝে। খোঁজদার দেখেশুনে এই জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। কি করবি এবারে সাহেব?

সাহেব থতমত খেয়ে বলে, কাটতে লেগে যাব—আবার কি!

এমনি ভাবে বসে? হায় হায়, কী বোঝালাম তবে এতক্ষণ ধরে। বাড়ির কেউ যদি বেরোয়, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে একটা লোক ঐখানটায় বসে কি করছে। পথ-চলতি লোকেও দেখতে পাবে।

হতভম্ব হয়ে সাহেব বলে, তবে কি করব?

ফাঁকটা মেরে দিবি সকলের আগে। পাতাসুদ্ধ বড় ডাল এনে পুঁতে দিলি, তার আড়ালে বসে বসে কাজ। লোকে কারিগরি দেখতে পাবে না, দেখবে গাছ একটা।

কিন্তু বাড়ির লোক জানে, ফাঁকা জায়গা—গাছগাছালি নেই ওখানে।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে, সেটা মনে রাখিস। তখন অত তালিম করে দেখার হুঁশ থাকে না।

কানাচে ঘুরে দুজনে উঠানে এসে পড়ল। রাত ঝিমঝিম করছে, নিষুপ্ত বাড়ি। দাওয়ার ধারে গিয়ে পচা বলে, উঠে পড়। বেড়ায় গিয়ে কান পাত। বিদ্যার পরীক্ষা হবে।

শীর্ণ হাতের একটা আঙুল তাক করে ব্যঙ্গের স্বরে পচা বলে, ধড়াস-ধড়াস করছে যে বুকের ভিতরটা অ্যা, বাড়ি চল তাহলে। কাজ নেই।

সাহেব রীতিমত অপমান বোধ করে: লাইনের নতুন মানুষ নাকি? কলকাতার মতো জায়গায় রাস্তার কাজ করে বেরিয়েছি, ভিড়ের কামরায় শুয়ে বসে রেলের কাজ করেছি। গৃহস্থ-বাড়িতে রাতের কাজও একবার হয়ে গেছে

গ্রামময় সোরগোল তুলে। জগবন্ধু বলাধিকারী হেন মানুষ কাজ দেখে তাজ্জব। তিনি তো আপনার হদিস দিয়ে দিলেন।

মুখে এই বলছে, মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে। এত বড় ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা—ধুকপুকানি আসে বই কি! কিন্তু বুকের ভিতরের খবর এ-মানুষ টের পান কি করে? সে-ও কি কানের গুণে?

পচা বলে, ভয় নেই। মন্তোর বলে দিচ্ছি, নিদালি মন্তোর। জেগে থাকলে ঘুমে ঢলে পড়বে। কাঁচা ঘুম হলে ঘুম গাঢ় হবে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। গুরু কাড়লি যখন, গুরুর উপর ভরসা রাখিস।

পায়ের নখে একটু মাটি তুলে নিয়ে পচা বাইটা মন্ত্র পড়ছে। পুজোআচ্চার মতন অংবং নয়। তড়বড় করে পড়ে যাচ্ছে। বাংলা ঠিকই, কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারা যায় না। মন্ত্র পড়ে মাটি ছুঁড়ে দিল ঘরের দিকে। বলে, চলে যা, ঘুমিয়ে গেছে। ভয় করিস নে, ভয় থাকলে কি নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে?

লজ্জা পেয়ে সাহেব দাওয়ায় উঠে বেড়ায় গায়ে কান পেতে দাঁড়াল। পচা বাইটা সুড়ুৎ করে সরে আবার এক গাছতলার। গিয়ে কেবল দাঁড়ানো নয়, গুঁড়ির গায়ে জোঁকের মতন লেপটে আছে। সেই গাছতলায় দৈবাত কেউ এসে পড়লেও মানুষ বলে ঠাহর পাবে না, গাছের গুঁড়ি ভাববে।

কাজ সেরে সাহেব সেখানে এল। বাড়ির সীমানা ছেড়ে ওস্তাদ-সাকরেদ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ে। অগণ্য বাঁশঝাড়, জোনাকি ফুটছে নিভছে, নিবিড় অন্ধকার জায়গাটা। সেখানে এসে দাঁড়াল।

আসল পরীক্ষা এইবারে: ঘরে ক'জন?

সাহেব বলে, দু-জন।

ঠিক করে বলছ বটে?

সাহেব দৃঢ়স্বরে বলে, হ্যাঁ, দু-রকমের নিশ্বাস ঘরের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে, শুনে এলাম। দু-রকম ছাড়া তিন রকম নয়, এক রকমও নয়। তবে মানুষ নয় দু-জনাই, একটি ওর মধ্যে বিড়াল। বিড়াল ঘুমুলে ঘু-উ-উ—একটা শব্দ হয়। পাটোয়ার বাড়ি অনেকগুলো পোষ্য বিড়াল—শব্দটা ওখান থেকে চিনে নিয়েছি।

ভারি প্রসন্ন পচা। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, সাবাস ব্যাটা! মানুষ এক জনই বটে। মানুষ ঘরে ঢুকে যখন দুয়োর দিল, বাঁশতলা থেকে আমি তাক করেছিলাম তোকে আজ পরখ করব বলে। কী মানুষ দেখে বলতে পারিস কি তা।

মেয়েমানুষ। সধবা।

পচা প্রশ্ন করে, পুরুষ নয় কেন? সধবাই বা কেন বলছিস?

পাশ ফিরলেই চুড়ির আওয়াজ। বিধবা বা পুরুষ হলে হাতে চুড়ি থাকত না।

ভাল, ভাল। ঠিক বলেছিস। উল্লাসে ডগমগ হয়ে পচা বলে, সেই লোকের বয়সটা কী রকম বলতে পারিস? ছোট মেয়ে, না ভরভরন্ত যুবতী, না থুথড়ে বুড়ি? পারবি নে বলতে। দু-দিনে চার-দিনে, দু-মাসে চার মাসে কেউ পারে না। যতখানি বলেছিস, তাই তো তাজ্জব হয়ে গেছি। খাটতে হবে বাবা, বড় কঠিন সাধনা। তুই ঠিক পারবি। অন্তিম বয়সে আজ আমার বড় আহ্লাদ—ছেলের মতো ছেলে একটা পেয়েছি এতদিনে।

এত প্রসন্ন যে পয়লা পাঠ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল—শুভ এই নিশি রাত্রি থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পচা বাইটা নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর জুত করে বসল। সাহেবকে দেখিয়ে দেয়ঃ বোস—

সকলের বড় শিক্ষা হল নিশ্বাস থেকে মানুষ চেনা। বেড়ার ঘর হলে বেড়ার উপর কান রেখে নিশ্বাস শোনে, পাকা দালান-কোঠা হলে দুয়োর-জানলার ফুটোয় কান পাতে। দুয়োর-জানলা নিশ্ছিদ্র করে এঁটেছে তো সিঁধ কাটা ছাড়া উপায় নেই। শুধুমাত্র নিশ্বাস পরখের জন্তে সিঁধ—কারিগর হেন ক্ষেত্রে পা নয়, মাথা কিছুদূর অবধি ঢুকিয়ে ঝিম হয়ে থাকবে। নিশ্বাস শুনবে ঘরের লোকের। কজন মানুষ নিশ্বাসের ফারাক থেকে গুণতি হয়ে যাবে। কার ঘুম কি রকম, গাঢ় কি পাতলা—বুড়োমানুষের ঘুম পাতলা, জোয়ানযুবা ও ছেলেছুলের গাঢ় ঘুম। এত সমস্ত বিচার—সর্বশেষে ঘরে ঢোকা। পরের ঘরে অমনি উঠে পড়লেই হল না।

আরও আছে। ছেলেপুলে নিতান্ত কচি-কাঁচা থাকলে বিপদ—ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে অন্যের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঁচা বয়সের চনচনে মেয়ে-বউর ঘুম অতি পাতলা। বয়সের দোষে ছটফট করে, উঠে বসে এক-একবার বিছানার উপর। নষ্টদুষ্ট হয় তো আরও গোলমাল। এমন মেয়েমানুষ যে ঘরে আছে—মুরুব্বিরা বলেন, হীরেমুক্তোর পাহাড় পড়ে থাকলেও সেখানে ঢুকবে না।

বহুদর্শী প্রাচীনদের কথা কারিগরে বর্ণে বর্ণে পালন করে। তবে বাঁধা সড়ক হল সাধারণ দশজনের জন্য—আসল গুণী যারা, তাদের কথা আলাদা। কোন নিয়ম বাঁধতে পারে না তাদের, অবস্থা বিশেষে নিজের পথ দেখে নেয়। নিষিদ্ধ পথেই বরঞ্চ সহজে কাজ হাসিল করে। যেমন এই সাহেব—শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদের দেওয়া কাঠি প্রথম হাতে পেয়েছে। কাঁচা বয়সের বউ-মেয়ের গা ছুঁতে মানা—সাহেব কিন্তু অবাধে আশালতার পাশে শুয়ে গায়ের গয়না ধীরে-

সুদ্ধে একটা একটা করে খুলে নিল। আশালতাই হাত বাড়িয়ে, কান বাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে কাজের সুবিধা করে দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এক বাড়ির কথা বলি—

নাম-ধাম বলা যাবে না, মহামানী গৃহস্থ। কাঁচা-বাড়ি, তবে মাটির উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা চন্দ্র-সূর্য অবশ্য দেখতে পান, কিন্তু নরলোকের কেউ না দেখে সেজন্য কড়াকড়ির অন্ত নেই। গিন্নি-ঠাকরুনের বয়স সত্তর উত্তীর্ণ হবার পর তবে কর্তা অনুমতি দিয়েছেন—এখন তিনি মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দায়ে-বেদায়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে একটা-দুটো কথা বলেন। এমনি বাড়ি। বাড়ির জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে আজ ক'দিন। মেয়ে অতএব সাজসজ্জা করে গয়নাগাঁটি যেখানে যা আছে অঙ্গে চাপিয়ে বরের কাছে শোয়। খোঁজদার দেখেশুনে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলছে। ঐ গয়না বোঝা থেকে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

এক প্রহর রাত না হতেই নিশিকুটুম্বরা ঘরের কানাচে আস্তানা নিয়েছে। খেয়েদেয়ে জামাই ঘরে এসেছে, শুয়ে উসখুস করছে। বউ আসেই না। অনেক পরে বাড়িসুদ্ধ খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বউ মৃদু পায়ে আসছে। কাচনির বেড়া বলে সুবিধা—বেড়ার চোখ-কান দুটো ইন্দ্রিয়ই পেতেছে সাহেব। ভারি লজ্জাবতী মেয়ে তো—বরের কাছেও মুখ খুলতে পারে না লজ্জায় ভেঙে পড়েছে। খোঁজদার উল্টো রকম বলেছিল কিন্তু। আলো নিভিয়ে দিল। খানিকক্ষণ পরে ঘুমুচ্ছেন দুজনে বিভোর হয়ে। যেখানটা সিঁধ হবে, জায়গা নিরিখ করা আছে। কাঠি হাতে নিয়ে ডেপুটি তৈরি—ইসারা পেলেই খোঁচ দেয়। সে ইসারা আসে না কিছুতে। ভোগান্তি কতক্ষণ ধরে আছে না জানি! ডেপুটি নিজেও একবার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এল—স্বামী-স্ত্রী যেন পাল্লা দিয়ে ভোঁস-ভোঁস করছে, ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। তবু কিন্তু বেড়া ছেড়ে সাহেব নড়ে না, সেই এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। হুকুমহাকাম দেয় না কিছু।

অবশেষে একসময় সাহেব এসে ডেপুটির হাত ধরে টানে: সিঁধ হবে না, কাঠি বরঞ্চ পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে চলে এসো। কাজই হবে না এ-বাড়ি, আয়োজন বিফল—ডেপুটি ভাবছে এই সব। কিন্তু সাহেবের মুখে রহস্যময় হাসি, কাজে বেকুব হলে এমনধারা হয় না। ডেপুটিকে পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে—যেন দুটো মাটির ঢিবি অথবা দুখানা গাছের গুঁড়ি। অনেকক্ষণ কাটল। খুট করে মৃদু একটু আওয়াজ হয়ে ঘরের দরজা খুলে যায়। দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশিরাত্রের অন্ধকারে বাড়ির মেয়ে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। খোঁজদার ঠিক খবরই দিয়েছে বটে—নষ্ট মেয়ে নাগরের কাছে গেল।

এ সময়টা ভয়-ডর থাকে না। কিন্তু অন্য কেউ না জানুক, স্বর্গের অন্তর্যামী আর মর্ত্যের চোর—এ দুয়ের চোখে পড়বেই। লুকিয়ে ছিল সাহেব এরই জন্যে —টুক করে ঘরের ভিতর গিয়ে বালিশের তলা থেকে মাল নিয়ে যথাপূর্ব দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলো।

এক কণিকা ধূলোমাটি গায়ে লাগল না। কানের গুণে টের পেয়েছে, জামাই আর মেয়ের মধ্যে একটা ঘুম মেকি। ঘুমের ভান করে আছে মেয়ে, বরের ঘুম এঁটে এলে বেরিয়ে পড়বে। এত গয়না বাইরে আনতে সাহস হয়নি —কে আর জানবে, বালিশের নিচে খুলে রেখেচে। বেড়ার গায়ে সাহেবের তীক্ষ্ণ কান অন্ধকার গয়না খুলে রাখার ব্যাপারও ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে।

আনাড়ি কারিগর হলে হেন ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে। ঘরের মানুষ ঘুমন্ত ভেবে যে-ই না সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে, পরিত্রাহি চেঁচিয়ে মেয়েটা পাড়া মাথায় করত। মুরুব্বিদের এই জন্যেই বারণ: কচি-শিশু, রোগি, বুড়োমানুষ, লুচ্চাপুরুষ আর নষ্ট মেয়ের ঘর সতত এড়িয়ে চলবে।

অনেক পরের বৃত্তান্ত এ সমস্ত। সাহেবকে পচা নিশ্বাস পাঠের কথা বলছে। নির্ভুল যে পড়তে পারে, সেই কারিগরের ভাবনার কিছু নেই। পা আগে যাবে না মাথা, তার জন্যে সে বিতর্ক নয়। সিঁধের গর্ত থেকে সোজা মাথা তুলে বীরের মতো সে ঘরে উদয় হবে।

সাহেব মাঝখানে বলে উঠল, নিদালি মন্তরটা ভাল করে শুনি একবার।

বলাধিকারীর কাছে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র শুনেছে। চোরচক্রবর্তী পুঁথির পদ্যও জানে। ভাঁটি অঞ্চলের নিজস্ব নিদালিটা পরামাণিক-বাড়ি পচা তড়বড় করে পড়ে এলো, সেটা ভাল করে একবার শুনে নেবে সাহেব। শুনে মুখস্থ করবে, দরকার হলে লিখে নেবে কাগজে। বলে, ধীরে ধীরে বলে যান বাইটামশায় কথাগুলো শুনি।

নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি
নাকের শোয়াসে তুললাম মঞ্চপের ধুলি।
ঘরে ঘুমের কুকুর-বিড়ালি
জলে ঘুমায় রউ,
নিদালি-মন্তোরের গুণে
ঘুমাইয়া থাক গিরস্তর বেটা-বউ।

অতি-সাধারণ ছড়া একটা। পচা বলে, নাকের নিশ্বাস টেনে মঞ্চপের (মণ্ডপের) ধূলো তিনবার তোলবার কথা। আমি বাঁ পায়ের নখ তুলেছিলাম।

সেকালে মুরুব্বিরা নাকেই তুলতেন—অকর্মা অপদার্থ আমরা, সে বুকের জোর কোথা পাব ? শ্বাসের টানে ধুলো ওঠে না, মন্তোরও খাটে না আর তেমন।

সাহেব বলে, রউ হল তো রুইমাছ ?

পচা বাইটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলে মানে নিয়ে কিন্তু কথা নয়। কথাগুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই, হাঁকডাক করে রাস্তার মানুষকে শোনাতে পারি। পড়াটাই আসল, পড়ার একটু হেরফের হলে মন্তোরে কাজ হবে না। বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণীলোক এখন কম। সেইজন্যে বলি, মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।

মাসখানেক ধরে দিবানিশি ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারই চলল। সাহেব কোথায় থাকে কি করে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার দায়টা বা কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, এ সব খবর অন্য কেউ জানে না। একলা পচা বাইটাই জানে বোধহয়। পচার ঘরে সে শোয়। অনেক রাত্রে আসে, তারপর দরজা বন্ধ করে ফুসফুস-গুজগুজ চলে দু-জনে। কৌতূহলী সুভদ্রা লুকিয়ে চুরিয়ে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কানদুটো পাকাপোক্ত নয়, বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।

একদিন রাত্রে বড় জ্যোৎস্না: পাখিগুলো পর্যন্ত দিনমান ভেবে বাসার মধ্যে ডেকে ডেকে উঠছে। কামিনীগাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে —ডাল-পাতা প্রায় অদৃশ্য। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি আমোদ করেছে। সাহেব আসছে—সুভদ্রা-বউ তক্কে তক্কে ছিল—চিলের মতো ঝাপটা মেরে তার হাত এঁটে ধরে। চোরের হাতে হাতকড়ি পড়লে যেমন হয়—টেনে নিয়ে চলল হিড়হিড় করে। সর্বনেশে ব্যাপার। পরিষ্কার দিনমানের মতন চারিদিক ফুটফুট করেছে—নামেই শুধু রাত্রি। সাহস বেড়ে বেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা ! আর সাহেবের এমন অবস্থা—টানাটানি করে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবে, সে ভরসা হয় না ! শব্দ পেয়ে বাড়ির কেউ হয়তো জেগে উঠবে। দেখতে পেলে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো বিদায় ! মুরারি বর্ধন চাচ্ছেও তাই। হৈ-হল্লা করে সাহেবের সঙ্গে ছোটবউ সুভদ্রারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে পূজনীয় ভাসুরঠাকুর।

সাহেবের এত সব চিন্তা, বউটার তিলপরিমাণ ভয়ডর থাকে যদি ! হেসে হেসে সর্ব অঙ্গে দোলন দিয়ে বলে, চোর ধরেছি গো। নিত্যি নিত্যি আসা-যাওয়া, আজকে তোমার রক্ষে নেই ঠাকুরপো।

হাত ছাড়ুন বউঠান, কেউ দেখে ফেলবে।

বেপরোয়া সুভদ্রা সকৌতুকে মুখ নাচিয়ে বলে, দেখলে আমার কি ! অবলা

মেয়েমানুষের সাত খুন মাপ। বলে দেব, তুমিই হাত ধরে টানছ। পুরুষেই তো করে। আমাদের এই উল্টো রীত, মেয়ে হয়ে টানতে হল পুরুষকে—সে কেউ বিশ্বাস করবে না। ফাঁকা উঠোনের উপর তুমিই তো দেখার সুবিধা করে দিচ্ছ। অন্য কেউ না হোক বাসি বাইটা দেখছে ঠিক চেয়ে চেয়ে।

ফিক করে হেসে বলে, দেখলে কী-ই বা! চোরাই কাণ্ডবাণ্ড—চোরের বাড়ি সেটা বেমানান কিসে? চোরে চোরে লেগে গেছে—চোর বউয়ে আর চোর শ্বশুরে। বাসি বাইটা বরাবর পরের মাল চুরি করে নিজের ঘরে তুলেছে এবারে তার মালটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি আমায়?

সেই তো ভাল। ঢুকিয়ে নিয়ে একবার দরজা দিতে পারলে কারও আর নজর যাবে না। ও কি, ভয়ে যে মুখ শুখাল তোমার! বাঘের গুহা নয়—আমার ঐ কোঠাঘর, যেখানে আমি থাকি।

শিকার কামড়ে ধরে বাঘ-কুমিরে যেমন হিড়হিড় করে নিয়ে, সুভদ্রা তেমনি চলল। মেয়েমানুষের কোমল হাতে সাঁড়াশির আঁটুনি—কুমিরে কামড়ের মতোই সে মুষ্টি খুলে পালাবার উপায় নেই। নিয়ে চলল বাড়ির ভিতর। জল্লাদ আসামিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, সাহেবের সেই অবস্থা। শীতের রাত্রে দস্তুর-মতো ঘাম দেখা দিয়েছে।

মুখের দিকে চেয়ে বুঝি সুভদ্রার করুণা হল। হাসতে হাসতে বলে, বেশ না-ই হল ঘরে। ঘরের সামনে বারাণ্ডায় গিয়ে বসিগে। ভয় নেই গো, লেপ ফেলে বাইরে এসে আমাদের লীলাখেলা দেখবে, এত দায় কারো পড়ে নি।

বলতে বলতে থেমে যায়। কণ্ঠ বুঝি কাঁপল একটুখানি, সাহেবের তাই মনে হল। বলে, দায়টা যার হত, সে মানুষ কোন্ মুলুকে পড়ে রয়েছে। সারারাত আমি যদি ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াই, এ বাড়ির কেউ চোখ তুলে দেখতে আসবে না।

কোঠাঘরের সামনে টিনের চাল-দেওয়া বারাণ্ডা, সেইখানে নিয়ে বসাল। ঘরে ঢোকানোর প্রস্তাব, মনে হচ্ছে, নিতান্তই ভয় দেখানো। বারাণ্ডার উপর মাদুর পাতা, কাঁথার ডালা পাশে। ঘুম নেই তো বউটার চোখে—হতে পারে, নিরালা বারাণ্ডায় দিনের মতন এই চাঁদের আলোয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। খেয়ালের বসে কাঁথা ফেলে উঠে পচা বাইটার ঘরের অন্তরালে ওত পেতে দাঁড়াল।

সেই কাঁথার ডালা হাতড়ে ছবি বের করে একটা। কাপড়ের উপর চিকন কাজ। বলে, তুমি ভয় পেয়ে গেলে ঠাকুরপো, রাত দুপুরে মেয়েমানুষের

কোন্ মতলব না জানি। সাধু স্বামীর সতী নারী আমি—তোমারই পাপ মন বলে খারাপ জিনিস ভাবলে। এই ছবিটা আজকে শেষ করেছি। কাকে দেখাই বলো? এ বাড়ির মেয়েলোকে বোঝে রাঁধাবাড়া আর ছেলেপিলের নাওয়ানো-খাওয়ানো, পুরুষে বোঝে টাকাকড়ি বিষয়আশয়। তোমায় সেইজন্য ধরে নিয়ে এলাম।

সাহেব পুরো বিশ্বাস করে নি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমিই সে সমঝদার লোক, জানলেন কিসে?

জানিনে তো—জানব কেমন করে? এসব করো না তাই—ভালো জিনিস একটা শেষ হলে কাউকে না দেখিয়ে সোয়াস্তি হয় না। মন আনচান করে—

কাপড়ের সেই ছবি সুভদ্রা মেলে ধরল সাহেবের চোখের উপর। বলে, খেটেছি কত দেখ। সুতোয় রং মিলিয়ে মিলিয়ে সরু সুতোর ফোঁড়—চোখ দুটো আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ বাড়ি যারা আছে, এ জিনিসে হাত ছোঁয়াবে ভাবতে গেলেই গা-ঘিনঘিন করে। ভালমন্দ তোমার কিছুই জানি নে, চেহারায় দেখতে পাই সোনার পদ্ম। তাই কেমন ইচ্ছে হল। বোঝ না বোঝ, অমন হাতে ছবি আমার নোংরা হয়ে যাবে না।

শিল্পীমানুষ বটে সুভদ্রা-বউ। কালীঘাটের দরিদ্র মাতাল পটুয়ারা পট এঁকে এক পয়সা দু-পয়সায় বিক্রি করে। সাহেব দেখেছে সে বস্তু। হাল আমলে ফ্যাসন হয়েছে—বাবুলোকে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে গলিতে ঢোকেন, এক পয়সার পট দরাজ হাতে এক আনা মূল্যে কিনে নিয়ে যান। সুভদ্রাও দেখি জাত পটুয়া একটি। ফুলবাবু তাকিয়া ঠেশ দিয়ে পড়গড়া টানছে, বাবরি চুলে টেড়ি, কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে ফরাসের উপর, একটা টিয়া-পাখি খাঁচায় করে বাবুর কাছে বেচতে নিয়ে এসেছে। কাপড়ের উপর সুতোর বুনানিতে তুলেছে এই সব।

কেমন হয়েছে?

কী সুন্দর, মরি মরি! আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক লাগে বউঠান।

খোশামুদির কথা নয়, শতকণ্ঠে তারিপ করবার মতো। কাছে এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে, অনেকভাবে দেখে সাহেব। দূরে নিলে কে বলবে সুতোয় বুনে তোলা। কাগজের উপরে এঁকেছে মনে হয়।

আনন্দে ডগমগ সুভদ্রা। বলে, তুলি ধরে কাগজেও এঁকেছি ঠাকুরপো। ঘরে কোন ঝামেলা নেই—না ছেলেমেয়ে, না কেউ। আমার মতো ভাগ্যবতী কে! দিনরাতের সময় কাটতে চায় না—কি করব, ছবি আঁকি বসে বসে। গাদা গাদা এঁকেছি।

সাহেব বলে, ছোড়দা জানেন ?

মাষ্টার মানুষ, ছেলে ঠেঙিয়ে খায়। যেটুকু ফাঁক, ভগবানের নাম নিয়ে পরকালের কাজ করে। তার কি গরজ এ সবে ? লজ্জার মাথা খেয়ে তা-ও একবার গিয়েছিলাম দেখাতে। একেবারে কাঁচা বয়স তখন—বড় আনন্দ করে দেখাচ্ছিলাম। তা বলব কি জানো ঠাকুরপো—ছাই-ভস্ম জিনিস কি জন্যে আঁকতে যাও, আঁকবে তো ঠাকুর-দেবতাদের আঁকো। আঁকবার সময়টা অন্তত তাঁদের চিন্তা মনে আসবে। বলি, সেটা কি ধর্মকর্মের বয়স, ঠাকুরদেবতা আসবে কেন তখন ?

বলতে বলতে সুভদ্রা থেমে পড়ে। কথায় যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। বলে, তারপরে আর দেখাইনে। পাবোই বা কোথা, ফুলহাটায় তেড়ে ধরে দেখাতে যাব নাকি ? ঠাকুরদেবতা এখনো আসে না। কি করেছেন তাঁরা আমার, কেন আঁকতে যাব ?

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল—কান্না সামলাতে না কি করতে ? সাহেব অবাক। মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো নিজের আঁকা একগাদা ছবি নিয়ে। পালকি চড়ে সমারোহ করে বিয়ের বর আসছে। গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাচ্চা ছেলেপুলের কুমির-কুমির খেলা। হরি-সংকীর্তনের আসর। বাসরঘরের বর-কনে—মেয়েরা বাসর জাগছে। যা সমস্ত চোখে দেখেছে, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছে। আজ পাড়াগাঁয়ের সাধারণ এক বউয়ের মধ্যে এমন গুণ লুকানো আছে কে ভাবতে পারে ?

ছবি দেখতে দেখতে মনের মেঘ কেটে গেছে। মুখ টিপে হেসে সুভদ্রা বলে, তোমার ছোড়দার হাতে উল্কি আছে—

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাঁ-হাতে আছে। আপনি এঁকে দিয়েছেন বুঝি ? দিব্যি ছবিটা—

বড্ড ধারালো চোখ তোমার ঠাকুরপো। অন্যের চোখে পড়বে খানিকটা ধ্যাবড়া কালির পোঁছ। মানুষটার গায়ের রঙে আর ছবির রঙে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহেব বলে, ঠাকুর-দেবতার মন নেই বলছেন, কিন্তু সেই উল্কির ছবি কেষ্ঠঠাকুরের। মুখে মুরলী, ত্রিভঙ্গ হয়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মানুষটা সাধ করে আমায় বলল, খুশি হব বলে করে দিলাম। বিয়ের অল্প দিন পরে—সে একদিন গিয়েছে—বিয়ে তো করোনি ঠাকুরপো ! ও-মানুষকেও সেই সময়টা যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। বলল, যে ঠাকুর তোমার পছন্দ তাই এঁকে দাও। তোমার ছোড়দা কেষ্ঠঠাকুরই তখন, আমি

রাধিকা। মুরলীর ডাক লাগে না, হাঁচি-কাশির একটু আওয়াজ পেলেই যেখানে থাকি কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে পড়ি। আমার কেষ্টঠাকুরের হাতে কেষ্টমূর্তিই ভালো, সুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছবি করে দিলাম। এত আস্তে ফোটাচ্ছি, তাই যেন আমার নিজেরই গায়ে বিঁধছে। নতুন বয়সের বর-বউ কিনা তখন—সে এক কাণ্ড।

থেমে একটু দম নিয়ে সুভদ্রা আবার বলে, তোমার ছোড়দা-ও পাল্টা শোধ দিয়ে দিল আমার উপর। ছবি নয়, ছবি-টবি আসে না ও-হাতে—বুকের মাঝ-খানটায়, পরিষ্কার অক্ষরে লিখে দিল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী। ঠাকুর-ঠাকরুন জোড়ায়-জোড়ায়। আজও আছে। তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করলে, একবার ঝোঁক হয়েছিল বুক খুলে দেখিয়ে দিই। সাহস হল না ভাই। চোখ তোমার বড্ড ধারালো, বুকের নিচেটাও দেখে ফেল যদি। সেখানটা খালি, ধূ-ধূ করছে তেপান্তরের মতো--

কথা ঘুরিয়ে প্রলুব্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে, তোমার হাতে দিই না উল্কি করে। এমন ধবধবে হাতের উপর ছবি কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। কাপড়ের ছবিটা তোমার পছন্দ, এটাই পুরোপুরি তুলে দিই। ধরে ধরে মনের মতন করে আঁকব —তাই করি ঠাকুরপো, অ্যাঁ?

সবুর মানে না। এক ছুটে রঙ নিয়ে এসে তখনই বসে যায় আর কি! সাহেবের হাত ধরে নিরিখ করে দেখছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে সাহেব বলে, আমায় নয় বউঠান। ছোড়দার বাঁ-হাতে এঁকেছেন, ডান-হাতেও আর একটা এঁকে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি এনে হাজির করে দেবো। কেষ্টঠাকুর করেছেন, এবারে মহেশ্বর। সত্যিই ভোলা মহেশ্বর মানুষটি।

উঁহু, হনুমানজী। রাম-ভক্তিতে হনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। ধরা পাই তো লেজওয়ালা হনুমান আঁকব এবারে।

হাসতে গিয়ে সুভদ্রা জ্বলে ওঠে। বলে, তিন তিন জোড়া দেবদেবী লিখে বুক আমার নামাবলী করেছে। পেলে তাকে লেখাগুলো নষ্ট করে দিতে বলি। রঙ ঢেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধ্যাবড়া করে দিক। আয়না ধরে আমিও কত চেষ্টা করেছি—নিজে নিজে হয় না। মানুষটাকে যারা পর করে দিয়েছে, তাদের নাম রাত্রি-দিন বুকে করে রাখতে বুক আমার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কী যে যন্ত্রণা ঠাকুর-পো—

ফস করে বলে বসে, তুমি করে দেবে তো বলো—

সাহেবের মুখ শুকাল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। বদ্ধ উন্মাদ—কাণ্ডজ্ঞান

নেই, লোকলজ্জা নেই। পাগলা-গারদের বাইরে কেন রাখে এদের ? রাগ হয় মুকুন্দর উপর। ভেড়াকান্ত মাস্টারমশায় পরিবার ধর্মের-ষাঁড়ের মতো ছেড়ে সরে পড়েছে—সঙ্গে রাখতে না পারে তো পিটুনি দিয়ে সায়েস্তা করে রেখে যাক!

তাকিয়ে দেখে, সুভদ্রা নিঃশব্দে দু-চোখে হাসছে। বলে, ঠাট্টা করলাম একটা। সাধু স্বামীর সতীসাধ্বী বউ—বুক দেখাতে গেলাম আর কি! কিন্তু রঙ নিয়ে যে বসে রইলাম, হাত সরালে কিসের ভয়ে ? দারোগা-পুলিশ ভয় করো না, তাদের চেয়ে আমি বেশি ভয়ের লোক ?

সাহেব আমতা-আমতা করে বলে, ভয় কেন হবে ? উল্কি পরা আমি ভালবাসিনে।

ভয় নয়, তবে ঘেন্না। তোমার মতন ফর্সা মানুষ নই। কাছে বসে সূঁচ ধরে কাজ করব, ছোঁয়াছুঁয়িতে ধবধবে রঙ ময়লা হয়ে যাবে, সেই ঘেন্না তোমার ? জানি, জানি। চোর কিনা তুমি—গায়ের উপর চিহ্ন রাখতে চাও না। এক চিহ্ন—জেল থেকে লোহা পুড়িয়ে চোর দেগে দেবে। তার পাশে আমার হাতের ছবি মানাবে কেন ?

সাহেব এতটুকু হয়ে গিয়ে বলে, মিছামিছি আপনি ঝগড়া করছেন বউঠান—

ঝগড়া কে বলেছে, হাসি-মস্করা একটুকু। জানো ঠাকুরপো, দৃষ্টিতে আমার অভিশাপ আছে। যার কাছে আবদার করে একটা কিছু বলতে যাই, সে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ। পাষাণের মতো অসাড় আর কঠিন! যেমন তুমি হয়ে গেলে। এটা কিছু নতুন নয় আবার জীবনে।

এই ক'দিনে সাহেবকে কী চোখে দেখেছে, নিশিরাত্রে সুভদ্রা-বউ তার সামনে ভেঙে পড়ে। বলে, পাষাণের কাছে লজ্জা নেই—খুলে বলি আজকে তোমায়। বিয়ে যখন হল, কিছুই বুঝিনে—পুতুল-খেলার বয়স তখন আমার। খেলার মন নিয়ে হাতে উল্কি এঁকে দিলাম, ও-মানুষ আমার বুকে লিখল। তারপর একদিন দেখি বিশ্বসংসার রঙে রঙে ভরে গেছে। হায় আমার কপাল —মানুষটি তার মধ্যে কবে যে পাষাণ হয়ে গেছে টের পাইনি। লজ্জা-অপমান না মেনে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর—দেখি, ঠোঁট নড়ছে বিড়বিড় করে। জোর করি তো ঠোঁট নড়া বেড়ে যায় আরও। কি মন্তোর পড়ছ গো ? বলে, মন চঞ্চল হয়ে আসে কিনা—রাম-নামে মোহ কাটাই। রাতের বেলা ভয়ের জায়গায় রাম-রাম করে আমরা পথ চলি, ঠিক তাই। আমি তার কাছে পেত্নি-শাকচুন্নি। কিন্তু এ পেত্নি হে রাম-নামে ডরায় না! উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠলে শেষটা একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পিঠটান।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, বংশীর কাছে যে শুনলাম—

কথাটা সুভদ্রাই শেষ করে দিল: শুনেছ, ধর্মের কলকাটি আমি নেড়েছি। আমার বুদ্ধিতে বাড়ি ছেড়েছে। দু-জনে একদিন বাসা করে ধর্মভাবে সংসার করব, সেই আমার মতলব।

সাহেব সায় দিয়ে বলে, সকলে তাই জানে। বাইটামশায় অবধি সেই কথা বলেন।

আমি হতে দিয়েছি তাই। পাপের নামে নাক সিঁটকে সকলকে অকথা-কুকথা বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে কিছুই তো পেলাম না, ঐ একটু মিথ্যে রটনা আমার পাওনা: জাঁহাবাজ বউ আমি, বরকে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাই। দেমাক নিয়ে মাথা খাড়া করে আছি, নইলে তো কোনকালে মরে যেতাম—

হাসি-মস্করার কথা, অতএব হাসতে লাগল সুভদ্রা খিলখিল করে। কিন্তু সাহেব যে আর পারে না, ছুটে পালাবে। বুঝি জল এসে যায় চোখে। তার সেই চিরকালের রোগ।

বারো

আচ্ছা বিপদ হল দেখি। পচা বাইটার কাছে সাহেবের না এসে উপায় নেই, কিন্তু সুভদ্রা-বউ কোন্‌খানে ওত পেতে আছে কে জানে! ছোঁ মেরে হাত ধরবে এঁটে, হিড়হিড় করে টানবে। সে রাত্রে বারাণ্ডা অবধি গিয়ে ছাড় হয়েছিল, টানাটানি করে ঘরেই পুরে ফেলবে হয়তো এবার।

বর্ধন-বাড়ির অদূরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে তিনটা মানুষ! কাছাকাছি এলে চিনল, মুরারি বর্ধন এবং আগে-পিছে কাছারির দুই পাইক—মহাদেব সিং আর ভীম সর্দার। চোত কিস্তি চলছে, সাল-তামামি সামনে। খাজনাকড়ি কষে আদায়ের সময় এই। সোনাখালি তালুকের মালিক চৌধুরী কর্তা চলে আসছেন দিন কয়েকের মধ্যে, কাছারি-বাড়ি চেপে বসে নিজে তিনি আদায়পত্রের তদারক করবেন। বরাবরই আসেন এই সময়টা। বকেয়া বাকি বেশি দেখলে বকাবকি করেন: পান খেয়ে নিজেরা পেট মোটা করে বসে আছ—আদায় হবে কি! পান অর্থে ঘুষ। বুড়ো চৌধুরী আবার গুণগ্রাহীও বটে—আদায় ভাল হলে দরাজ বখশিস। মুরারি নায়েব দু-তিন বছর পেয়েছে, এবারও প্রত্যাশা রাখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে কাজকর্ম চলেছে, কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত্রি হয়। নায়েব গোমস্তাকে লোকে তো ভাল চোখে

দেখে না—রাত্রিবেলার চলাচলে তাই বেশি সতর্ক হতে হয়। মহাদেবের হাতে পাঁচ-হাতি লাঠি, ভীমের কাঁধে গাদা-বন্দুক।

ভীম সর্দারের আগে নজরে পড়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে : কে ওখানে ?

সাহেব বলে, আমি। নায়েব মশায় আমায় খুব চেনেন।

এই ছোঁড়ারই পক্ষ নিয়ে ভাদ্রবউ অপমান করেছিল। মুরারি জলে উঠল সাহেবকে দেখে। ধমক দিয়ে বলে, যা যা—চিনিনে তোকে? ভারি আমার গুরুঠাকুর কিনা, তাই চিনে রাখতে হবে। গাঁয়ের উপর কি মতলবে এখনো তুই ঘোরাফেরা করিস ? আমি জানি চলে গেছিস বিদায় হয়ে।

সাহেব বলে, গৃহস্থ-বাড়ি কাজ করছি, মরশুম সারা করে তবে তো যাব। রাগ করবেন কেন, বাইরে বাইরে তো থাচ্ছি এখন, শুই গিয়ে বাইটামশায়ের কাছে।

কেন্নোর মাথায় টোকা। মুহূর্তে মুরারি একেবারে গুটিয়ে যায়। দু-দুজন নিম্ন কর্মচারী, কাছারির পাইক—তাহাদের সামনে কথা বাড়াবে না। খাচ্ছে একটা মানুষ, তার ভাতের থালার সামনে গিয়ে ঝগড়াঝাটি করেছিল—ধান-চালের এই আবাদ অঞ্চলে সেটা অতিশয় নিন্দার ব্যাপার। অন্তরালে এরাই গিয়ে হাসাহাসি করবে : নায়েব কী কঞ্জুষ রে···অতিথিকে দুটো খেতে দিয়েছে বলে ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে ধুন্দুমার।

সাহেবই বলতে বলতে চলেছে, শুয়ে থাকি আপনার বাবার কাছে। তারই কথায় বড়বাবু। বুড়োমানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাত্তিরবেলা উঠতে গিয়ে হয়তো বা আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমায় তাই বললেন, দিনমানে কাজকর্ম, রাত্রে তো কিছু নয়। পাটোয়ার-বাড়ি থেকে রাত্রে এসে আমার কাছে শুবি। খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরোই, শুধুমাত্র শুয়ে থাকা ওখানে।

শুনতেই পায় না আর মুরারি, দু-কানে বুঝি ছিপি-আঁটা। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পাইক দুটো ফিরে গেল। হনহন করে মুরারি ভিতরে চলল, ফিরেও তাকায় না। পচার কামরায় সাহেব ঢুকে পড়ে। আর কিসের ভয়, আর কি করতে পার বউঠান ?

কৌশলটা চালু হল এবার থেকে—মুরারির পিছন ধরে আসা। কাছারির আশে পাশে সাহেব অপেক্ষা করে। মুরারি বেরিয়ে পড়লে পিছু নেয়। দূরে দূরে থাকে, বাড়ি ঢুকবার মুখে দ্রুত এসে একত্র হয়।

গুরু-শিষ্যে চুপিসারে কথাবার্তা। পচা নিজের কথা বলছে।

একবার হল কি—গৃহস্থ টের পেয়ে তাড়া করেছে। তিন সাঙত আমরা। গহিন গাঙ পড়েছে সামনে, বিষম তুফান। কুমির-কামট গাঙে গিজগিজ করছে,

সে জলে পা ঠেকালে রক্ষে নেই। খেয়া নৌকো শিকল করে, শক্ত তালা এঁটে মাঝিমাল্লা ঘুমুচ্ছে নৌকোর উপর—

পচার প্রশ্ন ঃ কী করলাম বল্ দিকি তখন ?

সাহেব বলে, তালাটা খুলে ফেললেন কায়দাকৌশল করে। কিম্বা ভেঙেই ফেললেন।

ঘুমুচ্ছে ওরা নৌকোর উপরে—জেগে উঠবে যে! জেগে উঠে চেঁচামেচি করবে ; ডাকাত নই, চোর আমরা—সেটা খেয়াল রাখিস।

দেমাক করে জোর দিয়ে পচা বলে, আমরা চোর, বুদ্ধির ব্যাপারি। গায়ের জোরে নয়, কলকৌশলে কাজ। কী করলাম বল্ ভেবে-চিন্তে।

ভেবে সাহেব কুল পায় না, চুপ করে থাকে।

মোরগ ডাক ডেকে উঠলাম। তাই শুনে পাড়ার যত মোরগ ডাকতে লাগল। এক সাঙাত বাগানে ঢুকে কাক ডাকল। এ-গাছে ওগাছে কাকে অমনি কাকা করে উঠল রাত পুইয়েছে ভেবে। মাথায় বোঝা তুলে তখন আমরা খেয়ার মাঝিকে ডাকছি ঃ পাইকার ব্যাপারি—পাঁচ ক্রোশ গিয়ে আমরা হাট ধরব। নৌকো শিগগির খুলে দাও। দুপুর রাত্রি এমনি কায়দায় সকাল করে নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে চলে গেলাম।

জন্তু-জানোয়ার পাখ-পাখালির ডাক ভাল করে শিখে নিতে হয়। শিয়ালের ডাক সর্বাগ্রে। ভাব করতে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে, কাজের দায়ে সময় বিশেষে জন্তু হতে হয়। ডাক আবার সকলের মুখে আসে না। বংশীটা পারে ভাল। সে শালা কিন্তু কদর বোঝে না, হেলাফেলার জিনিস মনে করে।

সাহেবকে নিয়ে সেই একরাত্রে কর্মকার-বাড়ি গিয়েছিল। শিক্ষা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পচা এখন হামেশাই বেরিয়ে পড়ে। কঠিন বিদ্যা—শুধুমাত্র মুখের উপদেশে হয় না। নানান জায়গায় ঘোরে দুজনে—সোনাখালির বাইরেও। অনেক বাড়ি চলাচল। মোটরগাড়ি আর পাকাবাড়ি। যে-বাড়ি একজন-দুজন বেওয়া-বিধবা থাকে, আবার যে-বাড়ি কিলবিল করে মানুষজন। যে-বাড়ির বিশেষ পাহারার জন্য গ্রাম্য চৌকিদারের সঙ্গে পৃথক বন্দোবস্ত, যে-বাড়ি বাঘা বাঘা কুকুর। আবার এমন বাড়িও—যেখানে ঢেঁকিশালে শব্দ-সাড়া করে ঢেঁকির পাড় পাড়লেও ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরুবে না।

সরকারি চৌকিদার কিম্বা মাইনে করা দারোয়ান এমন কিছু ভয়ের বস্তু নয়। বন্দোবস্তের উপরে বন্দোবস্ত চলে, টাকার খেলায় ভাব জমানো যায়। সামাল কুকুর নিয়ে। যে-বাড়ি কুকুর থাকে, রাতের কুটুম হঠাৎ সেখানে ঢুকবে

না। আগে থেকে হয়তো বা ছ-মাস এক বছর থেকে ব্যবস্থা চালাতে হয়। ছলে-ছুতোর দিনমানে যাবে সে-বাড়ি। ধরো, তলবদার হয়ে গেলে গৃহস্থের আমগাছ, জামগাছ, খেজুরগাছ চেলা করতে। করাতি হয়ে গেলে গাছ ফেড়ে তক্তা বানাতে। ব্যাপারি হয়ে গেলে ধানের দরাদরি করতে। জীবজন্তু যেন তোমার বড় প্রিয়, এমনিভাবে তু-উ-উ করে ডাকবে কুকুর। নিজে ভাত রান্না করে খাবে গৃহস্থ-বাড়ি, কিম্বা ভাত চেয়ে-চিন্তে খাবে—সেই ভাতের আধা-আধি দিয়ে দেবে কুকুরের মুখে। কুকুরের গায়ে হাত বুলাবে। যতদিন ভাল রকম চেনা পরিচয় হচ্ছে, রাত্রিবেলা গিয়ে পড়া ঠিক নয়।

পচা বলে, গভীর মনোযোগে সাহেব প্রতিটি পদ্ধতি শুনে নিচ্ছে। একবার বলে, মাড়ি আঁটার কী মন্তোর আছে শুনেছি—

পচা একটু হেসে বলে, মন্তোরে এত সব হাঙ্গামা নেই। ধূলো পড়ে ছুঁড়ে দিলে জীবের গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি এঁটে গেল। আওয়াজ বেরুবে না। মাড়ি ফাঁক করে খেতেও পারবে না। কাজ হয়ে গেলে সেইজন্যে ছাড়-মন্তোর পড়ে কারিগরে মাড়ি খুলে দিয়ে যায়।

সাহেবের ধ্বক করে নফরকেষ্টর কথা মনে পড়ে। শুধুমাত্র এই মন্তোরটা শেখা থাকলে তাকে কিছু ভাবতে হত না, ছোটভাইয়ের বাসায় পরমানন্দে জীবন কেটে যেত। কারখানা থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বউয়ের মাড়ি এঁটে দিত, ঝগড়াঝাটি বন্ধ। সকালে কারখানা যাবার মুখে মাড়ি খুলে দিয়ে সরে পড়ত। শুধু নফরা বলে কেন, কত ভাল ভাল সংসারি লোকের উপকার হত মন্তোরটা জানা থাকলে!

পচা বলে চলেচে, মন্তোর আছে ঠিকই, সে মন্তোর খাটাতে পারলে হয়। একালের আনাড়ি মানুষে পেরে ওঠে না। মন্তোরের চেয়ে দ্রব্যগুণে এখন আমাদের বেশি ভরসা।

পোষা বিড়াল বেশি সতর্ক কুকুরের চেয়ে। ঘরে বিড়াল ঘুমিয়ে আছে—সিঁধের মুখে, যত নিঃসাড়েই ওঠ, বিড়াল জেগে উঠে লাফ দিয়ে পড়বে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, গৃহস্থ চোখ মেলবে না। বিড়ালের স্বভাবই এই। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে বিড়ালে লাফ দেয়। আরশুলা-টিকটিকি দেখলেও। বিড়াল লাফালে গৃহস্থ জাগে না।

একদিন—সমস্তটা দিন ধরে পচা বাইটা ভারি ব্যস্ত। কামরার দুয়োর দিয়ে খুটখাট করছে, জিনিসপত্র নাড়াচ্ছে সরাচ্ছে। নিশিরাত্রে সাহেব এসে দাওয়ায় দিয়েছে, পচা বেরিয়ে এসে শক্ত করে তার চোখ বাঁধল। তারপর ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে। টিনের পোর্টম্যান্টো বেতের তোরঙ্গ সারি সারি সাজানো।

টোকা দে সাহেব। খুব আস্তে—তুই কেবল শুনবি, অন্য কানে পৌছবে না। গৃহস্থ শুনতে পেলে তো ক্যাঁক করে টুটি চেপে ধরবে। চোখে দেখেছিস না, কান দুটো খোলা। টোকা দিয়ে শুনে শুনে বল, কী আছে এসবের ভিতর।

শিক্ষা কত রকমের দেখ। মোটা মেহনতের কাজ যেমন, তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাজও তেমনি। বড়-বিদ্যা বলে জাঁক করে এমনি এমনি নয়।

কানের উপর ভর করো মা দক্ষিণাকালী! পরীক্ষায় পারবে বোধ হয় সাহেব। একটায় বলে, কাপড়চোপড় আছে। কি করে জানলি রে তুই? আওয়াজটা শুনুন বাইটামশায়, ঢ্যাব ঢ্যাব করছে।

বেতের প্যাটরায় ঘা দিয়ে বলে, ঘটি-বাটি আছে। গয়নাগাঁটিও থাকতে পারে। খনখনে আওয়াজ।

চোখ খুলে বাক্সর ডালা তুলে মিলিয়ে দেখ্ এবারে—

যা বলেছে, ঠিক ঠিক তাই। পচা বাইটা আনন্দে থই পায় না। বলে, বয়স থাকলে তোকে আজ কাঁধে তুলে নাচাতাম রে সাহেব। জনম শেষ করে এসে এদ্দিন সাগরেদ একটা পেলাম বটে। এত হেনস্থা সয়ে বোধকরি এইজন্যেই বেঁচে রয়েছে। রাতের কুটুম আমরা—অন্ধকারে কাজকর্ম। যত অন্ধকার ততই ভালো। সে অন্ধকারে চোখের কাজ নেই, চোখ কানা হলেই বা কি! কাজ কানের আর হাত-পায়ের। নাকেরও কখনো-সখনো। বাক্সের উপর টোকা দিয়ে আওয়াজের তফাতে ভিতরের মাল চেনা—বাজে লোকের ক্ষমতা নেই, গুণী কারিগরেই পারবে শুধু।

আদর করে সাহেবের পিঠ ঠুকে দেয়। নিতান্ত আপনজনের মতো প্রশ্ন করে: বড্ড কাজের ছেলে তুই বাছা, বাপ কি কাজ করে?

জবাব কি আছে সাহেবের! দুনিয়ার সকল লোক ভাগ্যবান—বাপ-মা ভাই-বোন, জাতি-কুল শতেক রকমের পরিচয় তাদের। সাহেবের পরিচয় শুধু-মাত্র সে নিজে। লোকে নাকি মরার পরে বায়ুভূত হয়ে ভাসে, জীবন থাকতেই সাহেব নিরালম্ব হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পচা বলে, তুই না বলিস, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। মহাগুণী তোর বাপ। গুণীর বেটা, নইলে এইটুকু বয়সে এত ক্ষমতা সম্ভবে না। হয় সে হাকিম-দারোগা নয়তো পয়লা নম্বরের বাটপাড়। মাঝামাঝি মানুষ কখনো নয়।

শিকড়বাকড়, লতাপাতার শিক্ষা এর পরে। বনে-বাদারে নিয়ে গিয়ে পচা বাইটা নানা রকমের গাছগুল্ম চেনায়। পচা পেয়েছিল গুরুর কাছ থেকে। তিনিও আবার তাঁর গুরুর কাছ থেকে। এমনি হয়ে আসছে। পুলিস অশেষ চেষ্টা করেও হদিস পায় নি। গুণী জনকয়েকের মাত্র জানা—তাদের পেটে

সাঁড়াশি ঢুকিয়েও কথা বের করা যায় না। এক রকমের পাতা জঙ্গল থেকে তুলে ছায়া-ছায়া জায়গায় শুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে কিছু পাতা খাটের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দাও—যে খাটে মক্কেলরা শুয়েছে। আগুনটা নিভিয়ে দাও এবারে, ধোঁয়া বেরোক; ধোঁয়া তাদের নাকের ভিতরে যাক। মধুর আলস্যে সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, স্নায়ুতন্ত্রীতে রিমঝিম বাজনা বাজে যেন। আরও আছে—সেই পাতার বিড়ি কারিগরের মুখে। দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ কান রয়েছে মক্কেলের নিশ্বাসের ওঠা-নামায়। পাতলা ঘুম বুঝলে বিড়িতে টান দিয়ে পরিমাণ মতো ধোঁয়া ছাড়বে নাকে। সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল, সারাক্ষণ মক্কেল তবু মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে। সাহেব ঠিক এমনিটাই করেছিল জুড়নপুরে আশালতার পাশে শুয়ে।

সিঁধকাঠির দাবি এবার সাহেবের। পচা বলে, কাঠি বুঝি ইচ্ছেই করলেই ধরা যায়! ধরলে কি আর হাত পুড়ে যাচ্ছে—সে কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ সাগরেদের হাতে তুলে দিল, সে কাঠির দাম অনেক। সে কাঠির ঘা যেখানে মারবি, মা-কালীর দয়ায় ঝুরঝুর করে সোনাদানা খসে আসবে। কান দেখেছি তোর সাহেব, হাত দু-খানা একবার পরখ করে দেখতে দে। উতরে যাস তো কাঠির কথা তখন বিবেচনা করা যাবে।

কাঠি অভাবে খন্তা। পচা বলে, খেলতে জানলে কানাকড়িতে খেলা যায় রে বেটা। কাঁচাঘরে ছোটখাট একটু কাজ—খন্তাতেই হয়ে যাবে। গুরুপদ ঢালিকে দিয়ে খোঁজ এনেছি।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, কোন গুরুপদ ?

হ্যারে হ্যাঁ, সেই লোক। সর্দার হয়ে তোদের নিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। পারে না ছেলে ধরতে, ছুটল সে গোখরের পিছনে। সে-ও সাগরেদ আমার, খবর পেয়ে এসেছিল। এই কাজটার খোঁজদারি করেছে, ডেপুটি হয়েও সে সঙ্গে ঘুরবে।

পঞ্চমী তিথি, শুক্লপক্ষ। শেওলা-ভরা মজা দীঘির ধারে ধারে চলেছে পচা আর সাহেব। কেয়ার ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে ঢুকে যায়। ভিতরটা পরিচ্ছন্ন—আজ-কালের মধ্যে সাফসাফাই হয়েছে। সাফাই করে গেছে—আবার কে ?—গুরুপদই। কেয়াবনে সাপ থাকে, সেইটা বড় সুবিধা। সাপে আর চোরে সাঙাত-সম্পর্ক—চাল-চলন একই রকম বলে বোধহয় চোরকে সাপে কিছু বলে না। অথচ সাপের ভয়ে বাইরের লোক কেউ জঙ্গলে ঢুকবে না।

গুরুপদও এসে গেল। কিছু সূর্যের তেল ও মর্তমানকলা এনেছে, উবু

হয়ে বসে তেলে-কলায় চটকাতে লেগে যায়। বাইটা বলে, কাজের আগে তোর গায়ে মাখিয়ে দেবে সাহেব।

গুরুপদর দিকে চেয়ে সাহেব সকৌতুক বলে, তিলকপুরের কাজেও ছিল বটে, কিন্তু এদ্দুর নয়।

পচা বলে, রীতকর্ম এইসব। সকলে সব সময় মানে না। কিন্তু মানা ভালো। মুরুব্বিরা দেখেশুনে মাথা খাটিয়ে তবেই এক-একটা বিধান দিয়ে গেছেন।

কাপড় ছেড়ে ল্যাঙট পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে সাহেব। প্রয়োজনের বেশি এক ইঞ্চি বাড়তি কাপড়চোপড় থাকতে নেই, কোন প্রান্ত কেউ ধরে ফেলে বিপদ ঘটাতে পারে। ডেপুটি গুরুপদরও সেই পোশাক। সাহেবের গায়ে ডলে ডলে সে তেল-কলা মাখাচ্ছে। কেউ চোর ধরে ফেললে সড়াৎ করে পিছলে বেরুবে, রাখতে পারবে না।

তৈরি হয়ে এইবার আকাশ মুখো তাকাচ্ছে। চাঁদটুকু ডুবে গেলেই হয়।

ক'পোতায় ক'খানা ঘর? তার মধ্যে কোন্ ঘরটা পছন্দ? ঘরের কোন্‌খানে?

পাঁচচালা ঘরের কানাচে কাঁঠালতলায় জায়গা ঠিক করেছে। ঝোপঝাপ চারিদিকে, ছায়াান্ধকার—কাজের পক্ষে এত সুন্দর জায়গা হয় না।

খুঁজিয়াল গুরুপদ যাবতীয় খবর মজুত রেখেছে। তবু কিন্তু কারিগর কাজের মুখে নিজে পাকচক্কোর দিয়ে বুঝেসমঝে আসবে। সাহেব টুক করে একটু মাটির ঢিল ছুঁড়ল উঠানে। তারপরে চেলা-কাঠ একখানা। সাড়া নেই। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় একঝাঁক পতপত করে উড়ে গেল কোন্-দিকে। পা টিপে টিপে এবারে ঘরের কাছে বেড়ায় ঘা দিল মৃদু হাতে। বেড়ায় কান রাখল।

পচার কাছে এসে সবিস্ময়ে বলে, সন্ধ্যেরাত্রি—কিন্তু গাঢ় ঘুম শুনে এলাম। কান ভুল করেছে, এমন তো মনে হয় না।

ঘাড় কাত করে পচা সায় দেয়: এমনিই হবে। খাওয়াদাওয়ার ঠিক পরেই এসেছি। ভাত-ঘুম এখন—ঠেসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যায়। বৃষ্টি না খরা, ঠাণ্ডা না গরম, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল—এতসব বিচারের দরকার পড়ে না ভাতঘুমের অবস্থায়। তবে ঘুমের পরমায়ু অল্প, একটু পরেই পাতলা হয়ে আসবে। নতুন কারিগর তোদের এই সময়টা কাজ খানিক দূর এগিয়ে রাখা ভাল। শেষ ওঠানো সময় বুঝে হবে।

হুকুম দিল: লেগে যা সাহেব 'জয় কালী' বলে। কানের কথা অমান্য

করিসনে। রাতের বেলা চোখ ভুল করে বলে কান এই সময়টা বেশি রকম সজাগ।

তিলকপুরে সিঁধের ব্যাপার ছিল না। হাতে-কলমে সিঁধের কাজ এই প্রথম। পচা বাইটা অনতিদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত দেখে যাচ্ছে। কয়েকটা ডাল ভেঙে এনেছে সাহেব, ডাল মাটিতে পেতে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে এনেছে, কেউ বলে দেয়নি। ঠিক এমনিটাই চাই। কাজের আদ্যন্ত ভেবে নিয়ে তবেই সাহেব খন্তা হাতে নিয়েছে।

কাচনি অর্থাৎ ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। বেড়ার নিচে গবরাট (বাঁশের ফালি আড়ভাবে পাতা, যার উপরে বেড়া রয়েছে)। মাটির ডোয়া পোতা। খন্তায় ডোয়ার মাটি খুঁড়ছে ধীরে ধীরে— অত্যন্ত নরম হাতে। ডেপুটি গুরুপদকে নির্দেশ দিয়েছে, দু-হাতে অঞ্জলি পেতে সিঁধের নিচে সে ধরে আছে, মাটি পড়ছে হাতের উপর। অল্পস্বল্প বাইরে যা পড়ছে, সে মাটি আলেগোছে ডাল-পাতায় পড়ে তাতে কোন শব্দ নেই। বাতিল হাঁড়ি একটা যোগাড় করেছে, হাতের মাটিতে হাঁড়ি ভরতি করে সন্তর্পণে দূরে নিয়ে চলেছে। যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে দেখে পচা চমৎকৃত হয়। সার্থক বটে তার শিখানো। উপদেশের কণিকামাত্র অপচয় হয় নি।

সিঁধ কেটে দেয়াল একেবারেই ফাঁক করতে নেই, কিছু বাকি রেখে দেবে। মেটে দেয়াল হলে চার-পাঁচ ইঞ্চির মতো, ইটের গাঁথনি হলে একখানা ইট। এ লাইনের বাঘা বাঘা মুরুব্বিদের এই অভিমত। মক্কেলের গভীর ঘুম দেখে কাজ শুরু করেছিলে, এখন হয়তো সে ঘুম পাতলা। বাইরের আলো হঠাৎ সিঁধের ফাঁকে এসে মানুষটাকে চমকে দিতে পারে। সইয়ে সইয়ে অতএব কাজ।

সাহেবও তাই করছে। খন্তা রেখে বেড়ার এদিক-সেদিক কান পেতে বেড়ায়। ক্ষণকাল তারপরে চুপচাপ বসে আবার যায় বেড়ার ধারে। অর্থাৎ সুবিধের নয়। রোগির নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে নল বসিয়ে ডাক্তার যেমন মুখ বাঁকায়, তেমনি অবস্থা। সিঁধটুকু শেষ করা এবং মাল পাচার করা— সবসুদ্ধ বড়জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু এমন শোনা গেছে, এরই অপেক্ষায় বসে রাত কাবার হয়ে গেল, কাজ বরবাদ। দেয়াল কেটে ফিরে যাওয়া মানে সে মক্কেলের বাড়ি অন্তত বছর খানেকের ভিতর আর আসা চলবে না। আজকেও তাই না ঘটে।

পচার কাছে গিয়ে বলে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন? আপনি চলে যান, আমি আর গুরুপদ থাকি।

পচা বাইটা পুলকিত কণ্ঠে বলে, আমি যাচ্ছি, তোরাও চলে আয়। আজকের মতন হয়ে গেল। ঘরে না-ই ঢুকলি, এমনিতেই বুঝে নিয়েছি

রাত থমথম করছে। ফিরে চলেছে জঙ্গলে সুঁড়িপথে। উচ্ছ্বসিত হয়ে পচা বলে, তোর বাপ বলেছিলাম দারোগা-হাকিম, নয়তো বাটপাড়। ওসব কিচ্ছু নয় সাহেব, এইবারে সঠিক হদিস পেয়েছি।

সাহেব চমকে ওঠে : আজ্ঞে ?

তোর বাপ কচ্ছপ। কচ্ছপের বেটা তুই—গুটগুট করে কেমন হাত চলতে লাগল কচ্ছপের চলনের মতন।

নিজের রসিকতায় পচা বাইটা চাপাহাসি হাসে। বলে, পয়লা দিনেই যা নমুনা দেখালি, তা-বড় তা-বড় কারিগর পাকা হাতেও এমন পারে না।

চলে এমনিই প্রায়ই। হাতে-কলমে কাজ করে ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেওয়া। প্রতি কাজেই গুরুপদ ডেপুটি। পচা বলে দিয়েছে, সেই কোন আমলে আমার সঙ্গে নেমেছিল—চুলই পাকল, আর কিছু হল না। সাহেব ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরবার আগে শিখে নিয়ে যাও কিছু। ওপারে যমের রাজ্যে গিয়ে খেলা দেখিও। পচা তেমন যায় না—কষ্ট বেশি সইবার ক্ষমতা নেই। কাছা-কাছি হলে হঠাৎ কখনো গিয়ে কিছুক্ষণ দেখে-চলে আসে।

একদিন গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, মক্কেলের ঘরে সাহেবকে আটকে ফেলেছে।

কখনো নয়। ঘরের মানুষ জেগে পড়বে, এমনধারা কাজ সাহেব কেন করতে যাবে ? উত্তেজনায় পচা খাড়া হয়ে বসল : তুমি আবার যাও গুরুপদ, ভাল করে খবরাখবর আনো। সাহেবকে আটক করবে, এ কখনো হয় না। হতে পারে—চ্যাংড়া বয়স তো—সাহেবই তাদের নিয়ে খেলাচ্ছে।

কিন্তু খবর সত্যি। সাহেব তার নিজের দোষে আটকা পড়েছে। নিঃসংশয় হয়ে তবেই ঘরে ঢুকেছিল। মাটিতে বিছানা—মশারি টাঙিয়ে স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চা ঘুমেচ্ছে। গুরুপদ খোঁজ এনেছে, দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাকে শাশুড়ির ঘরে দিয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে বউ শোয়। আজ দুপুরে পাট-বিক্রির টাকা পেয়েছে, সে টাকা ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরুতে পারেনি এখনো।

সিঁধ থেকে ঘরে উঠে সকলের আগে দরজার খিল খুলতে হয়। মৃচ্ছকটিকের সময়েও এই নিয়ম। খিল খোলা রইল এই মাত্র—দরকার হলে যাতে দরজার প্রশস্ত পথে পালাতে পারো। দরজা ভেজানোই থাকবে, বাইরের আলো এসে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। সাহেব যাচ্ছিল সেই দরজার দিকে। বাচ্চাটা

গড়িয়ে কখন মশারির বাইরে এসেছে—পা পড়ল গিয়ে বাচ্চার ঘাড়ে। একবার ক্যাঁক করে উঠেই নিশ্চুপ।

কী সর্বনাশ! মুহূর্তে সাহেবের কেমন সব ওলটপালট হয়ে যায়। কাজ ভুলে বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়েছে—বয়স পিছিয়ে গিয়ে সাহেব নিজেই যেন এই অচেনা বাড়ির শিশু। তাকেও খুন করতে গিয়েছিল—হাত দিয়ে গলা টিপে নয়, হয়তো বা এমনিধারা গলার উপর পা চাপিয়ে।

ধকল কাটিয়ে বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। মরেনি তবে। হুঁশ পেয়ে সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নামিয়ে রাখে। মা জেগে পড়েছে: আরে, মশারির বাইরে যে তুলতুল! পুরুষের ব্যস্ত কণ্ঠ: কাঁদে কেন, কামড়াল নাকি কিছুতে? মশারির বাইরে এসে মা বাচ্চা কোলে করে বসেছে। বাপ দেশলাই হাতড়াচ্ছে: বালিশের তলায় রেখেছিলাম যে, গেল কোথা?

একটি লহমা—যত কিছু করণীয় তার ভিতরে। বিছানার ওধারে দরজা—সাহেব যেখানটা এসে পড়েছে। দরজা খুলে উঠানে লাফিয়ে পড়া যায়—তার পরেই দৌড়। কিন্তু ক'টা খিল না-জানি দরজায়, হুড়কো-ছিটকিনি আছে কিনা—এইসব করতে করতেই তো পিছন থেকে জাপটে ধরবে। পুরুষলোকটা কাঠি জ্বেলে প্রদীপ ধরাল। সাহেব আর নেই।

সিঁধের দিকে নজর পড়ে পুরুষ চেঁচিয়ে ওঠে: চোর এসেছে রে—চোর, চোর! ভয় পেয়ে বউটাও হাউ হাউ করে। বাড়ির লোকজন সব উঠে পড়ল, পাড়ার লোক ছুটো-ছুটি করে আসে। বিষম সোরগোল। সিঁধের মুখে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। অন্ধিসন্ধি খুঁজছে।

একজন বলে, চোর বুঝি ঘরের মধ্যে বসে আছে ধরা দেবার জন্য। সিঁধের পথে বেরিয়ে গেছে কখন। বাচ্চা নিয়ে পড়লে তোমরা—অমন অবস্থায় আর কি করবে? চোর সেই ফাঁকে পিঠটান দিয়েছে। জিনিসপত্র কি গেল দেখ এইবারে।

না, যায়নি কিছুই। ছেলের কান্নায় পালাবার দিশা পায় না, ফুরসত পেল কখন? অবোধ বাচ্চাই আজ চোর ঠেকিয়েছে। ক্ষতি-লোকসান যখন হয়নি, চোরের পিছনে ছোটবার তত বেশি গরজ নেই। ছোকরারা এদিক-ওদিক দেখে বেড়াচ্ছে। মাতব্বর মহাশয়রা দাওয়ায় চেপে বসেছেন, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, রকমারি চুরির গল্প হচ্ছে। কোন চোরের নাকি পান্তাভাত ছাড়া অন্য কিছুতে লোভ ছিল না, ভাতের লোভে রান্নাঘরে সিঁধ কেটে ঢুকত। এমনি সব গল্প।

গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ বোধকরি দাওয়ায় জড় হয়েছে, ঘরের ভিতর বউ

একলা। ছেলে এক-একবার ডুকরে ওঠে—প্রদীপ কাছে এনে বউ ঠাহর করে করে দেখছে, দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের মধ্যে নিয়ে। কেন যে সাহেব বোকার মতন দু-হাতে তুলে নিতে গেল—দরজা খুলে অথবা সিঁধের গর্ত দিয়ে দিব্যি ঐ সময়টা বেরিয়ে যেতে পারত। যত গণ্ডগোলের মূলে কাদার মতন প্যাচপেচে বিশ্রী মনটা মা-কালী, ভালোর জন্য সকলের দরবার—আমি কোন ছোট্টবেলা থেকে মন্দ হবার জন্য মাথা-খোড়াখুঁড়ি করছি, সে জিনিসেও কৃপণতা তোমার!

মশারির ভিতরে সাহেব। পুরুষ বেরিয়ে এসে প্রদীপ ধরাচ্ছে, সাহেব তখন ওদিক দিয়ে নিঃসাড়ে ঢুকে গেল। আত্মরক্ষার এ ছাড়া উপায় নেই। সারা ঘর এবং তারপরে সারা বাড়ি চোর খুঁজে বেড়াল, সেই চোর তখন নরম তোষকের বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে জামাইয়ের মতন আরাম করে পড়ে আছে। মশারিটা তুলে দেখবার কারো হুঁশ হল না।

ছেলে কোলে নিয়ে বউ—ছেলে ছাড়া আর কিছুই সে এখন দেখতে পাবে না। সরে পড়বার মহেন্দ্রক্ষণ এই। পুরুষ ফিরে এসে এটা-ওটা দিয়ে সিঁধের মুখ বন্ধ করবে, তারপর দরজা এঁটে ছেলে-বউ নিয়ে শোবে। তিলেক দেরি নয় সাহেব, দিব্যি তো খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছ। এইবার—

সুবিধা আরও হল। দুধ খাইয়ে ছেলে কাঁধের উপর শুইয়ে বউ উঠে পড়ল। পায়চারি করে ঘরের এদিক-ওদিক, গুণাগুণ করে পিঠের উপর থাবা দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ায়। এদিকে যখন পিছন করেছে—সড়াৎ করে সিঁধের গর্তে নেমে পড়ো।

ইঁদুর যেমন ঢুকে যায়, সাপ ঢোকে শেয়াল ঢোকে, মানুষ কেন পারবে না?

তেরো

পরের দিনটা এক পা বেরুলো না সাহেব। পাটোয়ার-বাড়ি শুয়ে বসে কাটায়। বাইটার কাছেও যায় না। মুখ দেখাতেও লজ্জা।

রাত পোহাতে না পোহাতে গুরুপদ এসে হাজির। বলে, যাওনি কেন? তলব পড়েছে। এক রাত্রি না দেখে বৎসহারা গাভীর মতন হাম্বা হাম্বা করছে।

সাহেব সভয়ে প্রশ্ন করে, পরশুর ব্যাপার নিয়ে কথা হল নাকি?

হল বই কি! তোমার জুড়ি সাগরেদ বাইটামশায়ের আর নেই। ছিল না কখনো, হবেও না।

ঈর্ষার জ্বালা গুরুপদর কণ্ঠে। সাহেবের মনে হল বানিয়ে বলছে। বলে, *আটকা পড়েছিলাম, তাতে বাইটা কি বললেন ?*

ইচ্ছে করে করেছিলে। আটক না হলে বেরুনোর খেলাটা দেখাও কি করে ? যেও কিন্তু আজ, তুমি না গেলে আমার উপর দোষ পড়বে।

যেমন ইদানিং হয়ে থাকে—রাত্রে পা টিপে টিপে সাহেব বাইটার ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আবার পচারও যে নিয়ম—খুট করে দরজার খিল খুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে পা দিতেই পচা বলে ওঠে, বাহাদুর বটে তুই ছোঁড়া !

গালির বদলে বাহ্‌বা পেয়ে সাহেব আরও ভেঙে পড়ল : আমার কিছু হবে না ওস্তাদ, জন্ম থেকে অভিশাপ আছে। আপনার সঙ্গে মিথ্যে ঘোরাঘুরি —হুকুম দিয়ে দেন, চলে যাই।

হাসিমুখে অবিচলিত কণ্ঠে পচা বলে, গুরুদক্ষিণা শোধ না করে যাবি কেমন করে ? পাওনার জন্যেই তো ডেকেছি।

শীর্ণ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে পচা তার মাথায় রাখে। বলে, কাঁচা বয়সের তোরা নির্গোলের কাজে সুখ পাসনে, সে জানি আমি। গোলমাল কাটিয়ে বেরিয়েও তো এলি।

সাহেব অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, সে-গোলমাল কেমন করে ঘাড়ে নিলাম, সেটাও তো শুনবেন।

ওস্তাদের কাছে ঢাকাঢাকি নেই। তা হলে বুক-ঢালা আশীর্বাদ মেলে না। ওস্তাদের আশীর্বাদ বিহনে গুণজ্ঞান সমস্ত বিফল।

আদ্যোপান্ত শুনে নিয়ে পচা—দেবে তো এইবার দূর-দূর করে তাড়িয়ে —কী আশ্চর্য, মুখ-ভরা হাসি নিয়ে উল্টে সাহেবের তারিফ করে : এই তো চাইরে ! আমরা হলাম বড় বিদ্যার ব্যাপারি। বুদ্ধির খেলা আমাদের—ডাকাত বেটাদের মতন ভোঁতা কাজকর্ম নয়। বড্ড রক্ষে হয়ে গেছে। বাচ্চাটা যদি মরত, দলের মধ্যে তোর নাম হয়ে যেত খুনে ডাকাত। চিরকালের দাগী হয়ে যেতিস। জেলখানার দাগী হওয়ায় নিন্দের কিছু নেই। এই দাগী হওয়া দলের মধ্যে, নিজের সমাজে। কেউ তখন আর সঙ্গে নিতে চাইত না : অপয়া লোক, কাজ করতে গিয়ে কোন হাঙ্গামা ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই।

সাহেবের মাথার পাষাণ-ভার যেন নেমে গেল। পিঠে এক আদরের থাবা বসিয়ে দিয়ে পচা বলে, সর্বরকমে পরখ হয়ে গেল বাপ আমার। পুরোপুরি লেগে যা এইবার। কাঠি কাঠি করিস, গুরুদক্ষিণা শুধে এবারে কঠিন হুকুম

নিয়ে নে। রাজার অট্টালিকা ফকিরের ডেরা মাছির মতন যথা ইচ্ছা নির্ভয়ে ঢুকে যাবি, বিশ মরদ মিলে চেপে ধরেও গুরুবলে আটকাতে পারবে না।

পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেব বলে, হুকুম হোক, কী রকমের দক্ষিণা—

সাক্ষি থাকো ষড়ানন, সাক্ষি কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী, জীবনপণে সাহেব গুরুঋণ শোধ করবে।

পচা বাইটা বলে, ক্ষেত্তোর পাত্তোর সবাই বলে দিচ্ছি। কুলের মুশল আমার তুই বেটা—মাল এনে যেদিন তুই হাতে দিবি, সকলের বড় বেটা বলে তোকে মেনে নেবো।

বাইটার পা ছুঁয়ে গদগদ কণ্ঠে সাহেব বলে, হুকুমটা হয়ে যাক—

তবু বাইটা ভূমিকা করে যাচ্ছে : বড্ড কঠিন ঠাঁই বাপু। গুরুদক্ষিণা চির-কালই কঠিন হয়—একবারের বেশি তো দিতে যাচ্ছিস নে। আমার যিনি গুরু, তাঁর কি দক্ষিণা দিতে হয়েছিল শুনবি ?

পচা বাইটার গুরুর যিনি গুরু, সেই পিতামহ-গুরুটি বিষম খুঁতখুঁতে। বললেন, মাটির উপরে নরম চলাচলের আমি দাম দিইনি। ওতে পরীক্ষা হয় না।

বাইটার গুরু কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আজ্ঞা করুন।

মাটির উপরে নয়, গাছের মাথায় চড়ে চুরি করে আনবি। মিহি কাজ তাকেই বলে—হাতে-পায়ের উপর পুরোপুরি দখল না হলেও কেউ তা পেরে উঠবে না।

বড় এক জামগাছের তলায় শিষ্যকে নিয়ে উপরমুখো দেখান : মগডালের উপর পাখির বাসা। ঠাহর করে দেখ, বাসায় বসে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। গাছে চড়বি, গাছের মাথায় চলে যাবি, হাত বাড়িয়ে পাখির পেটের নিচে থেকে ডিম পেড়ে নিয়ে আসবি। পাখি টের পাবে না, উড়ে যাবে না। যেমন ছিল, তেমনি ঠিক বসে থাকবে।

সাহেব পরমোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও করব তাই। সেকালের মুরুব্বিরা পেরেছেন তো আমরাই বা কেন পারব না! দিনমানে কাল বাসা খুঁজে রাখব পাখি যেখানে ডিমে বসেছে।

পচা বলে, পাখির ডিমে আমার কী গরজ! ওটা তো কথার কথা। মান ইজ্জতের ব্যাপার—সাগরেদ হয়ে তুই আমার মান রাখবি। তোর কাছে দাবি আমার।

দাবির কথাটা শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্ষেত্র এই বাইটা-বাড়িই। পাত্র অন্য কেউ নয়—সুভদ্রা সুভদ্রা। বউয়ের হাতের চুড় দুটো খুলে এনে দিতে হবে। গয়না দিয়ে শ্বশুর বউ পরিচয় করল, প্রথম উপহারের সেই জিনিস ফেরত চায় আবার।

বলে, ডাক হাঁক করে মুখের উপর বলে দিয়েছে—তুই তো ছিলি একদিন ভাত খাচ্ছিল ঐ দাওয়ায় বসে। বললাম, চুড় কতদিন হাতে রাখতে পারিস দেখে নেবো। রেখেছে তাই, হাত নেড়ে আজও ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। চক্ষু আমার জ্বালা করে সাহেব।

একটুখানি ইতস্তত করে সাহেব বলে, আগেভাবে জানান দেওয়া হয়েছে,—চিঠি ছেড়ে ডাকাতি করতে যায়, এ যেন তেমনি হয়ে গেল খানিকটা।

কাঁচা কাজ করে ফেলেছি, এখন সেটা বুঝি। বয়সের দোষ, মেজাজ ঠিক থাকে না। ভালো গয়না বারো মাস দিনরাত্তির পরে থাকবার কথা নয়, কিন্তু হারামজাদির সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে গেছে, বাক্সয় রেখে সোয়াস্তি পায় না।

অনুতপ্ত বাইটা। গুরুর মুখে সাহেব এসব শুনতে পারে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, হাতে পরে থাকুক আর যা-ই করুক, আপনার মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়েছে, নির্ঘাৎ ও-চুড় চলে আসবে। আমি দায়ী রইলাম।

বাইটার দন্তহীন মাড়ি হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁ হয়ে পড়েঃ জোর তো আমার সেই। শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করি—কোন অঞ্চল থেকে গাঙ-খাল-ঝাঁপিয়ে হঠাৎ তুই এসে পড়লি। আমি যেন নতুন জন্ম পেয়ে গেছি বাপধন। ছোট-বউয়ের গয়না এনে দক্ষিণা শোধ করবি, তোর উপরে আমার হুকুম রইল।

সুভদ্রার নজর সব সময় সাহেব উপর। যখন সে পচা বাইটার কাছে বেড়ার গায়ে দুটি চোখ তাক করে আছে, টের পাওয়া যায়। এবারে সাহেবও নজর রাখছে। যেইমাত্র কোঠাঘরে ঢুকে সুভদ্রা দরজা দেয়, সাহেব সাঁ করে জানলার পাশে এসে বড় বড় মানকচু-পাতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিব্যি এক লুকোচুরি খেলা—বাইরের অন্ধকারে ঠিকমতো জায়গা নিয়ে নির্বিঘ্নে অনেকক্ষণ ধরে নিরিখ করে দেখা চলে। শ্বশুরের শাসানিতে বউটা সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে, ঘরে ঢুকে সকল দিক তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে তবে খিল আঁটবে।

দেখে যাচ্ছে সাহেব রাতের পর রাত। গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিলঃ কাজ হবে না, ওস্তাদকে মিথ্যা আশা দিয়েছে। মজবুত গাঁথনির নতুন দেয়াল কেটে কোঠাঘরে ঢোকা অসম্ভব। একলা একজনের পক্ষে তো বটেই। তার উপরে এই রকম সাবধানী। চুড়জোড়া যেন রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা। শোবার সময় রূপকথার রাক্ষসীর মতোই কৌটোয় পুরে সন্তর্পণে বালিশের তলায় রাখে।

দেখতে দেখতে শেষটা বুদ্ধি খুলে যায়। এমন সোজা কাজ হয় না। কারিগর যেখানে সাহেব এবং মক্কেল সুভদ্রা, সেখানে ভয়ের কি আছে? দৈবাৎ যদি দেখে ফেলে, কথা জোগানোই আছেঃ উঙ্কি তুলবেন তো বসুন বউঠান,

সেইজন্যে এসেছি। তারপরে এটা-ওটা বলে কাটান দেওয়া। মেয়েমানুষ *বোঝাতে কি লাগে!*

গৃহস্থঘরে মেয়ে-বউদের নিয়ম সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজেরা তারপরে গল্পগুজব করে ধীরেসুস্থে অনেকক্ষণ ধরে খায়। সুভদ্রা-বউ আলাদা গোত্রের। ঝড়ের মতন একসময় রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাট্টি বেড়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চলে আসে। নিষ্প্রয়োজনে কথাটি বলে না কারো সঙ্গে।

আজও তেমনি খেয়ে ফিরছে, সাহেব নিঃসাড়ে পিছু নিল। সাহেব যেন ছায়া সুভদ্রার—সামনের দিকে আলো থাকলে পিছনের যে ছায়া পড়ে। সতর্ক বউ দরজায় তালা এঁটে গিয়েছিল, তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কমজোরি হেরিকেন-লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল। এবং রোজ যেমন করে—লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে বেড়াচ্ছে।

ঠিক পিছনে লেপটে আছে সাহেব—ছায়া বই কিছু নয়। ঈশ্বরের ভুলে দুটো চোখই সামনের দিকে—পিঠের উপরে যখন চোখ নেই, একলা মানুষের কাছে লুকিয়ে থাকা শক্ত হবে কেন? সুভদ্রা ঘুরছে, সাহেবও ঠিক-ঠিক ঘোরে তেমনি। ছায়ার সরে বেড়ানোর শব্দ হয় না, সাহেবেরই বা হবে কেন? তা-ই যদি হবে কী ছাই শিখল এত বড় ওস্তাদের কাছে!

নিচু হয়ে সুভদ্রা তক্তাপোশের তলাটা দেখে, ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা কেউ। নেই—পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। সুভদ্রার সঙ্গে সাহেবরও দেখা হয়ে গেল—জায়গা পছন্দসই বটে। অতএব সে-ই ঢুকে পড়ল এবার। একেবারে নিশ্চিন্ত। সুভদ্রাও নিশ্চিন্ত হয়ে দরজায় খিল আঁটে, ছিটকিনি আঁটে, হুড়কো দিয়ে দেয়। দরজার আংটা ধরে টেনে দেখে অনেকবার। চোর না ঢুকতে পারে।

দরজা এঁটে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সুভদ্রা লঘু হচ্ছে। এই রেঃ, তক্তাপোশের তলে সাহেবের বুক ঢিবঢিব করছে। এতক্ষণ যা ভাবেনি। একটা নতুন বিপদ চোখে পড়ে তার। ঘরের মধ্যে সাহেব, সুভদ্রা বোধহয় টের পেয়ে গেছে। যেরকম চতুর, টুক করে দেখে নিয়েছে কখন। সৈন্যের মতো তলোয়ার খুলে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য? সেই মুলতুবি কাজ—বুকের নামাবলীতে কালি ঢেলে ধ্যাবড়া করতে বলবে? নিজের ইচ্ছায় ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, যা খুশি এখন করতে পারে। কপালে সাহেব হাত দিয়ে দেখে, ঘাম ফুটেছে সত্যি সত্যি।

না, শুয়ে পড়ল সুভদ্রা। সর্বরক্ষে রে বাবা! লণ্ঠনের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সুস্থির হয়ে সাহেব এইবার মনের ঘাড়ে কড়া চাবুক কষিয়ে দেয়: এটা কি রকম হল ওহে কারিগরি? সুভদ্রা নারী কি পুরুষ, বুড়ি কি যুবতী, এটা

তোমার জানবার বিষয় নয়। মক্কেল মাত্র—জীবন্ত প্রাণী, এইটুকু খেয়াল রাখতে হচ্ছে কাজের কায়দা ঠিক করবার জন্যে। চুড় দুটো টিনেরবাক্স কিম্বা কাঠের তাকেও থাকতে পারত, না থেকে রয়েছে সুভদ্রা-বউয়ের দুটো হাতে। এইমাত্র তফাত। নজর থাকবে শুধুমাত্র বস্তুর উপরে, তার বাইরে নয়। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মহাভারতে একদিন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পড়েছিল, অবিকল সেই ব্যাপার। নজর যখন শুধুমাত্র গয়নার উপর তার বাইরে আর কিছু দেখছে না—লক্ষ্যভেদ তখনই।

যেমনটি হবার কথা—চুড় খুলে কৌটোয় ভরে সুভদ্রা পরম যত্নে বালিশের নিচে রেখেছে। তক্তাপোশের তলে সাহেব কান পেতে নিশ্বাস শোনে। নিদালি-বিড়ির প্রক্রিয়াও আছে অল্পস্বল্প। অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর অবস্থা যেমন সতর্ক হয়ে বিবেচনা করে। ঠিক সময়টিতে টিপি-টিপি বেরিয়ে লণ্ঠন একেবারে নিভিয়ে দিয়ে দরজার খিল-হুড়কো খুলবে। আজকে আর ভুল নয়—বাইরে পালানোর পথ সকলের আগে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুড় পরতে গিয়ে সুভদ্রা বালিশের নিচে পায় না। কৌটোসুদ্ধ লোপাট। বিছানা হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে খুঁজছে। নেই, নেই। দরজায় তাকিয়ে দেখে খিল-হুড়কো খোলা। আর কি, শুধু এখন কপাল চাপড়ানো! সিঁধও কাটেনি কোন দিকে। ইঁদুর-ছুঁচোর রূপ ধরে নর্মদার ফুটোয় ঢুকেছে নাকি? তা ছাড়া তো পথ দেখা যায় না।

দরজার শিকল তোলা বাইরে থেকে। ঘরের ভিতর আটক করে রেখে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। কাজের এ-ও বুঝি দস্তুর। সুভদ্রা দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছে, অবশেষে বড়বউয়ের কানে গেল।

ওমা, শিকল দিয়ে কে মস্করা করল?

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে: মস্করা দেখছ দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। চুড় চুরি হয়ে গেছে—কৌটো সুদ্ধ।

শিকল খুলে ঘরে এসেছে বড়বউ। মনে-মনে তৃপ্তি। এক নারীর গায়ের গয়না অন্য নারীর চোখে কাঁটার খোঁচা মারে। এই বড়বউও একদিন এ-বাড়ি এসেছিল, শাশুড়ি তখন বেঁচে। শিঙের উপর ঝিলঝিলে পাতের দু-গাছা চুড়ির বেশি জোটেনি। ছোট জায়ের হাতে পাথর-বসানো চুড়—কেননা, সে শিক্ষিত ছেলের বউ। শাশুড়ির অবর্তমানে তখনকার দিনের রোজগেরে শ্বশুর গয়নাখানা নববধূর হাতে নিজে পরিয়ে দিলে।

উৎপাতের শান্তি এতদিনে। দরদটা সেই কারণেই বেশি করে দেখাতে

হয়ঃ সত্যিই গেছে, না তামাসা করছিস ছোট? অনেক দাম যে! সিঁধ নেই, চোর কেমন করে নেবে? মনের ভুলে কোথায় রেখেছিস, খুঁজে দেখ ভাল করে।

সুভদ্রা কাঁদতে কাঁদতে বলে, দরজায় নিজের হাতে খিল দিয়েছি দিদি। ছিটকিনি দিয়েছি, হুড়কো দিয়েছি। সমস্ত খুলে বাইরে থেকে শিকল তুলে পালিয়েছে। আবার তা-ও বলি, শোবার আগে লণ্ঠন ধরে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে নিয়ে তবে দুয়োর বন্ধ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে কি জান দিদি—বলব?

কৌতূহলে মুখ কাছে এনে বড়বউ বলে, কেন বলবি নে? যদি কোন উপায় থাকে, না বললে কেমন করে হবে?

দিব্যি করে বলতে পারি শয়তান বুড়োর কাজ। ঐ মানুষ ছাড়া কেউ নয়। এক মাথা ছিল—তিন-মাথা হয়ে শয়তানি তেদুনো হয়েছে। গুণীন লোক—বাতাস হতে পারে, মাছি হয়েও ঢুকে যেতে পারে। গয়না নিয়ে নেবে—হাঁক-ডাক করে কতদিন থেকে বলে বেড়াচ্ছে। তা-ই করল।

পাগলা হয়ে সুভদ্রা সেই শ্বশুরের কাছে গিয়ে পড়ে। ঝগড়া-ঝাঁটি নয় কথায় বাঁকা সুরও নেই। ঢিব ঢিব করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। প্রণামের শেষ নেই—প্রণামই নয়, মাথা খুঁড়ছে যেন।

মোলায়েম কণ্ঠে পচা বাইটা প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা-জননী?

এমনি। পায়ের ধুলো নিতে নেই বুঝি?

সে তো বটেই। গুরুজনের উপর ভক্তিটা বড় বেশি আমার মায়ের। ধুলো তো সব কুড়িয়েবাড়িয়ে নিলে—কথা কি আছে, এবার বলে ফেল।

শ্বশুরের মুখের দিকে সুভদ্রা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে বিদ্রূপের হাসি। ইচ্ছে করে, বাঘিনীর মতো থাবা মেরে হাসিসুদ্ধ ঐ মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু রাগারাগির দিন আজ নয়। হাহাকারের মতো বলে উঠল, আহ্লাদ করে চূড়জোড়া দিয়েছিলে, সে কোথায় হারিয়ে গেল বাবা। কি হবে?

পচা বলে, বল কি, ভাল জিনিসটা গো! কেমন করে হারাল?

খুঁজে-পেতে এনে দাও বাবা। তোমার অনেক তুকতাক, ইচ্ছে করলেই পার। নইলে তোমার পা ছাড়ব না। লাথি মেরে ঝেড়ে ফেল, আবার এসে ধরব।

হি-হি করে পচা হাসতে লাগলঃ অপয়া জিনিসটা গেছে—ভালই তো, আপদ নেমেছে তোমার গা থেকে। কোল-কাঁখ ভরে আসুক এবার ছা-বাচ্চারা, বড়বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাও। যে নিয়েছে, সে তোমার ভালই করল গো!

মজা দেখছে বুড়ো। বলবেই এমনি। আসাই ভুল এ মানুষের কাছে। ভরসা এখন সুভদ্রার একটি মানুষ—কেউ যদি পারে তো সেই একজন। নিরিবিলি চাই একবার তাকে। সুভদ্রা ছটফট করছে, নিজের খুশিমতো সাহেব বাইটার ঘরে আসবে, ততক্ষণ সবুর মানে না। আসেও ইদানীং মুরারির সঙ্গে ব্যূহরচনা করে, সুভদ্রা যাতে নাগাল না পায়। দিনমানে পাওয়া যাবে না, জানা আছে। রাত্রির অন্ধকারে বউমানুষ একলা বেরিয়ে পড়ল। যেতে হয় তো চলে যাবে, পাটোয়ার-বাড়ি অবধি, সেইখানে আচমকা গ্রেপ্তার করবে।

সাহেবের সেই বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজ। এ জিনিস বরাবর বজায় রেখে যেতে হবে। মোড় ঘুরে দেখে সুভদ্রা বউ। যেন পাতাল ফুঁড়ে সুভদ্রা বউয়ের আবির্ভাব। সাহেবের একখানা হাত মুঠো করে সে জড়িয়ে ধরে: চুড়জোড়া কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। কে নিয়েছে তা-ও জানি।

সাহেব হকচকিয়ে যায়। চোর ধরে হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়েছে। কণ্ঠে জোর নেই, কোনরকমে বলল, কে?

আবার কে? অন্তর্জলীর মুখে এসেও স্বভাব গেল না। নিজে যা আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, তাই আবার করল। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়—তাই আছে ওর কপালে। গুরুজন, মান্য ব্যক্তি—আমি কিছু বলব না। কিন্তু ফিরে জন্মে বাসি বাইটা কুকুর হয়ে আধ-হাত জিভ মেলে রাস্তায় রাস্তায় হা-হা করবে। করতে হবে।—অন্যায়ের এমনি এমনি শোধ যাবে না।

মুখের কাছে মুখ এনে কাতর দুই চোখ মেলে সুভদ্রা বলে, তুমি উদ্ধার করে দাও ঠাকুরপো।

সর্বরক্ষে বাবা, দোষ বাইটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সাহেব সুভদ্রার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: উদ্ধার আমি করব?

কেউ যদি করে দেয়, সে তুমি। আর কাকে বলব? সুভদ্রা কেঁদে পড়ল: বাড়ির মধ্যে সকলের সব আছে, আমার কি আছে বলো? ভাশুরের কথা সেদিন নিজের কানে শুনলে—বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছে, যেদিন ইচ্ছে বাড়ি থেকে দূর-দূর করে তাড়াবে। স্বামী থেকেও নেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে আসছে তো বাড়ি—দেখো কী অবস্থা! ঘরে যেন জল-বিছুটি মারে, ছটফট করবে—কখন পালাই, কখন পালাই। কিছু নেই আমার ভাই—থাকবার মধ্যে গয়না দু-চারখানা। দুদিনের সম্বল। ছেলেপুলে নেই, গয়না নেড়েচেড়ে দিন কাটে। তার মধ্যে সেরা জিনিসটাই চলে গেল আমার।

মুকুন্দ আসছে, নতুন খবর সাহেবের কাছে। বলে, বাড়ি আসছেন ছোড়দা?

আসছে বাগানের আম খেতে। নিজের হাতে পোঁতা কলমের গাছে এবারে আম ফলেছে। এককালে বাগ-বাগিচার শখ ছিল—গাছের উপর বড় দরদ। আর এই যে এক অবলা মেয়েমানুষ, বাপ-মা নেই, ভাই নেই, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—

কি বলতে চেয়েছিল সুভদ্রা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কথা শেষ করতে পারে না। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। দু-চার ফোঁটা সাহেবের হাতের উপর পড়ল।

একটু সামলে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলে, ছুটিছাটায় আসে কখনো-সখনো। কিছু যদি বলতে গিয়েছি—লজ্জার কথা কী বলি ঠাকুরপো, বলতে গেলেই জবাব হল : ভগবানের নাম করো, ক'দিনের তরে জীবন! বর-বউ এক খাটে পাশাপাশি শুয়েছি, তার মধ্যেও ভগবান। সেখানেও পাঠের আসর। বারো মাস বাইরে পড়ে থাকে, সে একরকম—এসে পড়ে আরও উৎপাত বাড়ায়। আসবে-আসবে যত শুনছি, আমার ভয় ধরে যাচ্ছে। শত্রু হাসবে, সেজন্যে আলাদা থাকতে পারিনে। উল্টে এমন দেখাই, ভালবাসায় গলে গলে পড়ছি যেন। হিংসেয় যাতে লোকে জ্বলে-পুড়ে মরে আমার সুখ দেখে।

কী ঝোঁক চেপেছে, সুভদ্রা-বউ অনর্গল বকে যাচ্ছে। সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে শোনে। হঠাৎ এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে সুভদ্রা আগের কথায় চলে যায় : যাকগে ভাই। ও-মানুষের কথা কেন, আমারই বা হ্যাংলামি কিসের? তোমায় যা বললাম—ঘরের বউ যার জন্যে এই রাত্তিরে ছুটে এসেছি, লোকলজ্জার ভয় করিনি। আমার হাতের জিনিসটা—

যে হাতে গিয়ে পড়েছে বোঝেন তো বউঠান, বড্ড কঠিন ঠাঁই।

একটু ভূমিকা। সাহেব আরও বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা কানে না নিয়ে এক কথায় ঘুরে দাঁড়াল। চলে যাবার উপক্রম।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কি হল?

নিশ্বাস ছেড়ে সুভদ্রা বলে, ঠিক কথাই বলেছ ঠাকুরপো। কঠিন ঠাঁই। বিদেশি মানুষ, তোমার আর কী ক্ষমতা! বাইটার সঙ্গে কোনদিন কেউ পারেনি। ওর ছেলের আশা অনেক দিন ছেড়েছি, ওর ঐ গয়নার আশাও ছাড়লাম।

মুকুন্দর কথা বলতে বলতে বউ এখন আলাদা একজন যেন। উদাস কণ্ঠস্বর। এত টান গয়নার উপর—তা-ও বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। অন্ধকার নিঃশব্দ এক-ছায়ামূর্তি ফিরে চলল।

সুভদ্রা জানে না—সাহেবও যাচ্ছে পিছু পিছু। চোখের জল হাতের উপর পড়েছিল—বউয়ের সেই কান্না চামড়া ভেদ করে শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। মিথ্যে তুই লড়াই করে মরিস সাহেব, মন্দ হওয়া তোর ললাটে নেই।

হঠাৎ সাহেব কথা বলে ওঠে—সেই যেমন পচা বাইটাকে বলেছিল : চুড় পাবেন আপনি বউঠান। আমি দায়ী রইলাম।

সুভদ্রা ফিরে তাকাল। সাহেব তখন নেই। ঝোপেঝাড়ে জোনাকির ঝাঁক ঝিকমিক করছে। দেবতার মতন বর দিয়ে সাহেব অদৃশ্য। অপথ-বিপথ ভেঙে তীরের বেগে বিস্তর দূরে গিয়ে পড়েছে। আপন মনে গজরাচ্ছে : ভেবেছ কি বউঠান! চুড়েই শোধ যাচ্ছে না। লোকের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে না বেড়াতে পারো, তাই করে আমি ছাড়ব।

চৌদ্দ

কঠিন ঠাঁই—মিছে বলেনি সাহেব। চুড় কাল রাত্রেই পচার হাতে চলে গেছে। গুরুদক্ষিণা চুকিয়ে দিয়েছে, দিয়ে আর দাঁড়ায় নি। মোটামুটি নিয়মও তাই—কাজ সমাধা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মস্থল থেকে সরে পড়বে। পরে আসতে পার ভাবগতিক ভাল করে বুঝেসমঝে দেখার পর। বাইটার কাছে রোজ রাত্রে আসে—না এলে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে, সেই জন্যে যথারীতি আজও এসে উঠল।

পচাও অপেক্ষায় ছিল। পিঠে চাপড় মেরে বলে, বলিহারি বেটা! তুই আমার মান রাখলি। ছোটবউমা জেনে বসে আছে, কাজ আমারই। অপদার্থ ভাবত আমায় ইদানীং, গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। হারামজাদি আজকে এসে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠোকে। তুই আমার নতুন ইজ্জত এনে দিলি বাবা।

সাহেব বলে, দক্ষিণান্ত হল, আশীর্বাদ দিয়ে দিন। আপনার শিক্ষার নিন্দে হবে, এমন কাজ কখনো যেন না করি—

মাথায় হাত রেখে পচা বাইটা বলে, একদিন তুই আমার অনেক উপর দিয়ে যাবি। একদিন কি বলি, এখনই তাই। ছোটবউমার গায়ের গয়না আনা আর বাঘিনীর কোলের বাচ্চা চুরি করে আনা একই জিনিস।

চুড় রেখেই সাহেব কাল চলে গিয়েছিল। সেই কথা পচা এখন তুলল। বাইরে কেউ ওত পেতে নেই—ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাবার্তা। পচা বলে, ছায়ার সঙ্গে মিলে গিয়ে ছায়ার মতন নড়াচড়া—এক হাত পিছনে থেকেও মানুষটা টের পাচ্ছে না, মানুষ ঘুরছে-ফিরছে তুইও ঠিক-ঠিক সেই পরিমাণ ঘুরছিস—বড় শক্ত কাজ রে বাবা! চলন ষোলআনা রপ্ত না হলে হয় না। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম এনেছিলেন আমার গুরু, চেষ্টা করলে তুইও তা পারিস।

বাইটার পায়ে হাত দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে সাহেব বলে, আনব তাই। চলে যাবার আগে তা-ও দেখিয়ে যাব। আপনি আশীর্বাদ করুন।

আছি নরাধম পাপী মানুষ—শুনিই না দুটো-পাঁচটা ধর্মের কথা। ফাঁকতালে কিছু পুণ্যি হয়ে যাক, পাপের ভার কমুক।

রাত্রিবেলা বাড়ি বাড়ি কান পেতে বেড়ানো সাহেবের কাজ। গুরুর সেই নির্দেশ। শিক্ষার কখনো শেষ হয় না। কারিগরকে অন্তর্জলীতে নামিয়েছে, শ্মশানবন্ধুরা এসে বাঁশ ফাড়ছে, কড়ি-কলসির সংগ্রহ করছে—সেই একদণ্ডের পরমায়ুর মধ্যে হয়তো বা নতুন কিছু শিখে নেওয়া গেল। ইহলোকে কাজে না লাগুক, পরলোকে লাগতে পারে। হাসবেন না, হাসির কিছু নেই—সঠিক খবর কে দিতে পারে, যে সিঁধকাঠি সেই লোকে একেবারে অনাবশ্যক ?

অন্তর্যামী ভগবান আর সিঁধেল চোরে শুধুমাত্র পদ্ধতির তফাত। তিনি এক জায়গায় বসে থেকে দুনিয়ার খবর ধ্যানযোগে জেনে নেন, নড়াচড়া করতে হয় না। চোর এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরে ঘুরে খবর নেয়। দুধাল গাই গোয়ালে ফেরেনি বলে গৃহকর্তার হা-হুতাশ, দু-বিঘে ধান জমির দায়ে নায়েবকে পান খাওয়ানোর শলাপরামর্শ, হাঁদা মেয়েটার মাথা-ঘোরানোর মতলবে বান্টু ছোকরার গদগদ ভাব, মুমূর্ষুর শিয়রে আত্মজনের ফোঁত-ফোঁত করে কান্না, মাথার চতুর্দিকে কম্ফর্টার জড়িয়ে বিনা নিমন্ত্রণে কর্মকর্তার অজান্তে ভোজ খেয়ে আসার বাহাদুরি—এমনি সমস্ত শুনতে হয় নিত্যিদিন। আজকে মুখ বদলানো—উঁহু, কান বদলানো। অধ্যাত্মতত্ত্ব শোনা যাবে নিশিরাত্রে। অনেক কাল পরে বাড়ি এসে যুবতী রমণীর পাশে শুয়ে সংসার মায়াময়, জীবন অনিত্য—এবম্বিধ ভাল ভাল জ্ঞানের কথা।

মুকুন্দ মাস্টার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আশ্বিন মাসে পুজোর সময় এসেছিল, আর এখন এই বৈশাখের শেষে। কলমের গাছে নতুন আম ফলেছে। তাছাড়াও বুড়ো বাপ কবে আছে কবে নেই—এমনিতরো অবস্থা। পাপী বাপ হলেও আসতে হয়। সাহেবও অতএব কানাচের মানকচু-বনের কালাচাঁদ হয়ে কান পেতেছে। চোর না-ই বা বললেন আজকের দিনে—মুকুন্দ হল ছোড়দা, সুভদ্রা বউঠান, দেওর হয়ে পাতান দিয়েছে জানলার পাশে। সুভদ্রা বলেছিল, দুয়ের মাঝখানটায় ভগবান এসে পড়ে নাকি ভণ্ডুল ঘটান, দম্পতির শয্যায় পাঠের আসর বসে যায় ফুলহাটার ইস্কুল-বাড়ির মতো। সত্যি-মিথ্যে জানা যাবে এইবার। ফিসফিসানির একটি কণিকাও কান ফসকে বাদ পড়তে দেবে না।

ঘরে এলো সুভদ্রা। কাপড় ছাড়ল, চুলের বিহুনিটা খুলে দিল। বারাণ্ডায় গিয়ে ঘটির জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আসে একবার। একটি কথা নেই। অন্য দিন একলা শোয়, আজকেও যেন ঠিক তেমনি—ঘরে দ্বিতীয় মানুষ আছে বোঝবার উপায় নেই। বউ মান করেছে, তা ছোড়দা তুমিই বলো না গো মান-ভঞ্জনের একটা-দুটো মধুর বচন। সেই মানুষই বটে! দুই বোবার ঘরবসত, হয়েছে বেশ। কদ্দিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে গেল—ছিনেজোঁক বেরিয়েছে। সাহেবের গায়ে কত গণ্ডা লেগেছে ঠিক কি! মিছামিছি এই ভোগান্তি।

অকস্মাৎ চমকে ওঠে। কথা ফুটেছে মুখে। ভূমিকা মাত্র না করে সুভদ্রা বলে উঠল, লেখাপড়া শিখে ইস্কুলের ঐ পোড়া কাজ নিয়ে আছ কেমন করে তুমি?

দীর্ঘ অদর্শনের পর যুবতী নারীর প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। বলে, ইস্কুলের মুখে নুড়ো জ্বেলে বাড়ি চলে এসো।

মুকুন্দর মৃদুকণ্ঠ: এসে?

হাটবাজার কর। জনমজুর খাটাও।

হাটবাজারে লেখাপড়া লাগে না যদি কিছু লাগে সে ঐ ইস্কুলের কাজেই।

লেখাপড়াও তাহলে চুলোর আগুনে দিয়ে এসো।

জজসাহেবের রায়ের মতন অসঙ্কোচ দ্বিধাহীন। পচা বাইটারও অবিকল এই কথা—দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যাপারে অন্তত শ্বশুরে-বউয়ে মতদ্বৈধ নেই। ছেলে ইস্কুলে পাঠিয়ে ভুল করেছে, পচা শতকণ্ঠে স্বীকার করে। উপায় থাকলে পেটের বিদ্যা উগরে বের করে দিত। সুভদ্রাও সেই কাজে পরমানন্দে যোগ দিত শ্বশুরের সঙ্গে।

বেচারি মুকুন্দর দশা দেখে সাহেবও এখন তাদের সঙ্গে একমত। লেখা-পড়া অতি পাজি জিনিস—মানুষের ভিতরে পদার্থ রাখে না। মিনমিনে মেনি-বিড়াল করে দেয়। মুরারি লেখাপড়ার ধার ধারে না, সে কারণে পুরুষসিংহ হয়ে বিচরণ করে। পান থেকে চুন খসুক তো একটুখানি, হুঙ্কারে বাড়ি সচকিত করবে। স্বামীর আতঙ্কে বড়বউ থরহরি কম্পমান। কম্পনের রীতি-মতো হেতু আছে—এতগুলো সন্তানের জননী এবং বাড়ির গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও মুরারি সর্বসমক্ষে পায়ের চটি খুলে পটাপট ঘা বসিয়ে দেয়, দৃকপাত করে না। আর সেই মুরারির সহোদর ভাই মুকুন্দ আকৈশোর চোখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেও বউয়ের পাশে যেন ফৌজদারি মামলার আসামি।

সুভদ্রা গর্জন করছে: ঝাড়ু মারি তোমার বিদ্যের মুখে। বটঠাকুরের কী লেখাপড়া, কিন্তু তোমার মতন বিদ্বান ভাইকে শতেক বার বেচতে-কিনতে পারেন। জাঁক করে গলা ফাটিয়ে বলেনও তাই—

গলা ভিজে আসে পরক্ষণে। গর্জনের পর বৃষ্টি নামে বুঝি। বলে, বলা-বলির কি, কাজেও তো তাই। আমাদের অংশের জমাজমি নিলামে তুলে কিনে নিয়েছে। কে দেখছে! এর পরে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করা ভাগ্যে আছে আমার।

মুকুন্দ আগের কথাটার জবাব দিল এতক্ষণে: দাদার মাইনে কত জান? আমার অর্ধেকেরও কম। দশ টাকা।

হোক দশ টাকা। দু-হাত ভরে রমারম খরচ করে যাচ্ছেন, দশজনে কত মান্যগণ্য করে।

মুকুন্দ বলে যাচ্ছে, সেই মাইনেও মাসে মাসে নয়—চৈত্র মাসে সালতামামির সময় একেবারে বারো-দশকে এক'শ বিশ টাকা নিয়ে নেন। খুচরো খুচরো নিজেই নিতে চান না।

সুভদ্রা বলে, জমে থাকে। একসঙ্গে ভারী হলে কাজে লাগানো যায়। কী দরকার, মাইনে ছাড়াও কত রকমের রোজগার! তোমার মতন নয় যে গোণাগুণতি পঁচিশের উপর একখানা সিকিও নয়। তা-ও তো শুনি পুরোপুরি দেয় না।

মুকুন্দ বলে, সে রোজগার হল চুরির। কিন্তু হয়েছে কি বল তো—চুরির কাজে তোমার যে বড় ঘৃণা!

সে ঘৃণা এখনো। ওকে চুরি বলে না, উপরি। কেউ তার জন্যে চোর বলে না।

ঘৃণা চুরির উপরে নয় তবে, চোর, নামটার উপরে?

এই কথায় সুভদ্রা ক্ষেপে গেল: শ্বশুর গুরুজন, পায়ে মাথা রেখে শতেকবার প্রণাম করি। তবু সিঁধেল-চোর ছাড়া তিনি কিছু নন। তাঁর বেটা হয়ে তোমার এত শুচিবাই কেন জিজ্ঞাসা করি। বট্‌ঠাকুরের একটা নখের যোগ্যতা তোমার নেই, মুখের শুধু বড় বড় বুকনি।

কণ্ঠ কান্নায় ভারী হয়ে আসে: বড়গিন্নি দেমাকে মটমট করে। ইচ্ছাসুখে খরচ করছে—হবে না কেন? ছেলেপুলের জামা-জুতো এক থাকতে আর কিনে দেয়। ঘরের দুধ আছে, তার উপর নগদ পয়সায় আলাদা দুধ যোগান করেছে। রাতদিন গণ্ডেগণ্ডে গিলিয়ে এমন করেছে, কোন বাচ্চার পেটের অসুখ ছাড়ে না।

আমাদের যা-ই হোক সে ভাবনা নেই। দেবা-দেবী দু-জনা—খরচা কিসের!

কথা ক'টি মুকুন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—আর যাবে কোথা? আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে: ঐ বুঝেই তো ছেলেপুলে এলো না। তারা

দেবতা, আকাশের উপর থেকে দেখতে পায়। আমার কোলে আসবে কি না খেয়ে শুকিয়ে পাকাটি হয়ে মরে যেতে ?

রণ-দুন্দুভি। এর পরে আর না জমে যায় কোথায় ? দ্বৈরথ সমরের কথা পুঁথি-পুরাণে শোনা যায়, সে বোধহয় এই বস্তু। সে এমন, কাঠের পুতুলেরও বুঝি নড়েচড়ে উঠতে হয়। বিদ্যা-শিক্ষা সত্ত্বেও মুকুন্দ একেবারে পুতুল নয়। অসহ্য হয়ে এক সময় তড়াক করে উঠে পড়ল। দরজা খুলছে।

সুভদ্রা হুঙ্কার দিল : যাচ্ছ কোথা শুনি ?

ঢেঁকিশাল কি গোয়ালে—কোন্‌খানে ঠাঁই হয় দেখি। বিস্তর পথ হেঁটে এসেছি, কষ্ট হয়েছে, না ঘুমোলে মারা পড়ব।

খিল-হুড়কো খুলে মুকুন্দ কবাট টেনে দেখে, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

সুভদ্রা বলে, ধাকাধাকি করে কেলেঙ্কারী বাড়িও না। যথেষ্ট হয়েছে, শুয়ে পড়ো এসে।

কেলেঙ্কারির ভয়েই বোধহয় সুভদ্রার গলা অনেকখানি খাদে নেমে এসেছে। বলে, রাগের পুরুষ অনেক রাগ দেখিয়েছ, শোও দিকি এবারে।

দরজায় শিকল দিয়ে গেছে—আবার কে, সাহেব ছাড়া ? লড়াই কতক্ষণ চলে ঠিক-ঠিকানা নেই—শিকল দিয়ে ইতিমধ্যে সে নিত্যকার রোঁদে বেরিয়েছে। থাকুক এক খাঁচায় বন্দী হয়ে। লড়াইটা প্রায় এখন একতরফা, এই বড় ভরসা। সুভদ্রা যতই হোক দুর্বলা নারী, খুব বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে না। সাহেব আবার ঘুরে এসে দেখবে।

রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে গেল, সেই সময় সাহেব পুনশ্চ মানকচু-বনে। কলহ নয়, এখন কথাবার্তা। মুকুন্দর গলা প্রথম কানে আসে : চঞ্চল হয়ো না ভদ্রা, ধর্মপথে থাক, মঙ্গল সুনিশ্চিত।

সুভদ্রা বলে, আছি তো। পোড়া ধর্ম চোখে দেখে কই ? মঙ্গল না ঘোড়ার ডিম ! বয়স চলে যায়, সাধআহ্লাদের পেলাম না কিছু জীবনে।

মুকুন্দ প্রবোধ দেয় : পাবে। সৎকর্মের ফল মিলবেই। এ জীবনে না হল তো পরজন্মে—

সুভদ্রা-বউ ক্ষেপে গিয়ে বলে, আমি পরজন্ম মানি নে—

মুকুন্দ বলে, নাস্তিকের কথা বলছ যে ভদ্রা।

সাহেব শুনে যাচ্ছে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে। চোর হয়ে শুনছে সে—চোরের আর মড়ার কথা বলার উপায় নেই। নয়তো চিৎকার করে বলাধিকারীর কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিত : পরজন্ম মানে যারা গাড়োল—নিতান্ত অপদার্থ যারা। এ জীবনে কিছুই পেলো না তো কোন এক আন্দাজি ভবিষ্যতের আশ্বাস

খোঁজে। কল্পনায় এক সর্বময় বিধাতা বানিয়ে নিজের অক্ষমতার দায় সেই কর্তার উপর চাপিয়ে দেয়।

সুভদ্রা বলছে, ধনদৌলত সুখ-শান্তি যশ-মান সাধুভাবে হবার জো নেই আজকাল।

হতে পারে খানিকটা সত্যি। মুকুন্দর কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে: কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে হাত-পা ছেড়ে যদি বসি, মানুষের উপায় তবে কি রইল ?

উপায়ও বলাধিকারী বলেছেন। কাল আলাদা তো মাপের কাঠিও কেন বদলাবে না ? পাপ-পুণ্য উল্টে-পাল্টে ফেল। সেকালে যেটা পাপ ছিল, আজকের সেটা পুণ্য। পুরানো পুণ্যকে তেমনি ধরে নাও পাপ। যত গোলযোগ চুকেবুকে যাবে।

মোটের উপর সাহেব যা ভেবে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে ঠিক ঠিক তাই। তখনকার ব্যাঘ্র-গর্জন সম্প্রতি বিড়ালের মিউমিউয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচার চলছে। সবুর করো, আরও নামবে। ছুটো প্রাণ মজে গিয়ে সানাইয়ের সুর বেরুবে দেখো। সবুর করো আরও খানিক।

পরমানন্দে সাহেব আবার টহল দিতে বেরুল।

ফিরে এলো ভোররাত্রি তখন, আকাশে শুকতারা জলজ্বল করছে। মৃদু কণ্ঠগুঞ্জন—কান খাড়া করে থাকতে হয় দস্তুরমতো। কী কাণ্ড রে বাবা—পলকমাত্র ঘুমোয় নি। এই যে বলছিলে মাষ্টারমশায়, পথ হেঁটে কষ্ট হয়েছে, ঘুমানোর দরকার। ছি-ছি, নতুন বিয়ের বরবউকে হার মানিয়ে দিলে তোমরা !

মুকুন্দ বলছে, আর বেশি দিন নয়, বাসা করে থাকব ছুজনে। সুবিধা-মতো একটা বাড়ির জোগাড় হলে হয়।

সুভদ্রা চপল কণ্ঠে বলে, যে সে বাড়ি নয়—তেমহলা অট্টালিকা চাই আমার জন্যে। আর গোটাকুড়িক দাস-দাসী। বাড়ি শুধু নয়, দাস-দাসীরও জোগাড় দেখো।

মুকুন্দ বলে, ঠাট্টা করছ ভদ্রা। সঙ্গতি নেই বলে মনে বড় লাগে। তবে পড়ানোয় নামযশ হয়েছে, টুইশানি পাব। ইস্কুলের পঁচিশ টাকার উপর সকাল-সন্ধ্যা ছু-বেলার টুইশানিতে আরও বিশ-পঁচিশ এসে যাবে।

সুভদ্রা গাঢ় স্বরে বলে, না। সারাদিনের খাটনির পর রাত্রে আবার বাড়ি বাড়ি টুইশানি করে বেড়াবে, আমি তা হতে দেবো না। পাঠের আসর বসবে তখন। এক-গাঁ মানুষ জুটিয়ে নয়—সে আসরে আমি একলা। তোমার মুখে ধর্মকথা একা একা শুনব। পঁচিশ টাকা তো বাঁধা আছে, তার উপর পাঁচ-দশ হলে রাজার হালে চলে যাবে। না হলেই বা কি ! ছু-জনের একলা সংসার—খরচটা কিসের ?

পথে এসো বাছাধনেরা! যা চেয়েছিল, ষোলআনাই তবে মিলে। ভোর হয়ে আসে, পাখপাখালি ডাকছে। খুট করে দরজার শিকল খুলে দিয়ে সাহেব উল্লাসে লাফাতে লাফাতে পাটোয়ার-বাড়ির বাসায় চলল এবার। আর কাজ নেই, নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়বে।

ভাবতে ভাল লাগে, কোন এক কৌতুকী দেবতা সকলের অলক্ষ্যে নিশুতি রাতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সৃষ্টিসংসার-জোড়া ছেলেমেয়ে—চোখের জল মুছে হাসি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ঘরে। রাত পোহালে কে কোথায় ধরে ফেলে—তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে ফিরলেন দিনমানে এসে পড়বার আগে।

আজগুবি অলীক ভাবনা আমার! দেবতা তো ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শীতল পদ্মপত্রের শয্যায় আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছেন। এক অভাগিনী গ্রামবধূ এবং ততোধিক অভাগ্য ধার্মিক স্বামীটির জন্য কারো যদি নিশ্বাস পড়ে থাকে—ত্রিলোক-বিধাতা ভগবান নারায়ণ নন তিনি, নিশির কুটুম এক চোর।

শিক্ষানবিশী শেষ। দক্ষিণান্ত হয়ে গেছে, গুরু প্রসন্ন। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম চুরি করে এনে দেখাবে সাহেব—সেটা হল বাহাদুরি, ওস্তাদ বাইটার তাক লাগিয়ে দেওয়া। তার আগে—এখনই সাহেব কাঠির পুরো হকদার।

হুঁকো টানছে পচা বাইটা। জোরে এক সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আজকাল যে-না-সেই কাঠি ধরছে, গুরুর হুকুম নিয়ে ধরে ক-জনা? আমার ওস্তাদ নতুন কাঠি হাতে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বাইটা বলে ডাকলেন। বাপ-পিতামহের বর্ধন গিয়ে বাইটা হলাম সেইক্ষণ থেকে। সারাজন্ম বুক ফুলিয়ে বাইটা পরিচয় দিয়ে এসেছি।

নীতিনিয়ম মেনে ওস্তাদের আশীর্বাদ নিয়ে কাঠি ধরলে অসাধ্যসাধন করা যায়। আজকালকার দিনে কেউ বড মানে না, সেকালে অক্ষরে অক্ষরে মানত। কাঁচা কাজ-কারবার সেইজন্য চতুর্দিকে—চুরি কি ডাকাতি তফাত করা যায় না। সিঁধের গর্তে পা দুটো না ছোঁয়াতেই, এমন তো হামেশাই ঘটে, একগণ্ডা লোক কারিগরের ঘাড়ে চেপে পড়ল! অথবা সারারাত ভূতের খাটনি খেটে কারিগর নিয়ে এলো একটা ফুটো ঘটি আর থান দুই-তিন ছেঁড়া কাপড। সেকালে এমন হত না।

বাইটা বলে, কমসে-কম তিরিশ বছর ঘোরাফেরা করছে ঐ গুরুপদ। ভক্তি আছে খুব—মুখ ফুটে বলতে হয় না, হাঁ করলেই ছুটে এসে পড়ে। কাঠির কথা সে-ও বলে মাঝে মাঝে। আর বাপু, ও জিনিস খাতিরে হয় না—এলেম দেখিয়ে আদায় করতে হয়ঃ গুরুপদকে দিইনি, আপন নাতি বংশীকেও

দিতে পারলাম না। তুই সাহেব ক'দিন এসে নিজের জোরে আদায় করে নিচ্ছিস। হাতে ধরে তোকে দিয়ে দেবো। গুরুপদকে আজ আসতে বলেছি। ছটফট করিসনে, বোস একটু। সে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কাঠির বায়না দিয়ে আসবি।

ফড়ফড় করে তামাক টানে কিছুক্ষণ। হুঁকো থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে, কোন্ মুলুকে কাজ ধরবি, ভেবেছিস কিছু? ডাঙা-রাজ্যে দেশেঘরে ফিরে যাবি, না এখানে?

সাহেব বলে, বলাধিকারী বলে রেখেছেন, কাপ্তেন কেনা মল্লিকের দলে কিয়ে দেবেন।

মল্লিকের নামে বুড়ো ক্ষেপে যায়। আর একদিনের মতন কলকে ছুঁড়ে মারেই বা! বলে, গাধার গাধা ওটা। চোর না ডাকাতও না—দোআঁসলা। কলাকৌশল জানে না, জানে কেবল মারধোর আর খুনোখুনি! মল্লিক আবার কারিগর নাকি! গামছা বোনে, চট বোনে, মলমলে হাত দিতে ভয় পায়। বলুক দেখি কোন্ মিহি কাজটা করেছে জীবনে! যত-কিছু শিখলি, ওর সঙ্গে ঘুরলে সব বরবাদ হয়ে যাবে।

আরও অনেক রাত্রে সাহেব গুরুপদর সঙ্গে সিঁধকাঠির বন্দোবস্তে বেরুল। অনেক দূরের গ্রাম, তিন-চার ক্রোশ তো বটেই। জলে নেমে খালই পার হতে হল তিন-চারটা। পৌঁছুতে রাত্রি প্রায় শেষ।

গ্রামে ঢুকবার আগে থেকেই কানে আওয়াজ আসে—ঠনাঠন, ঠনাঠন। নেহাইর উপর লোহা পিটছে। সন্ধ্যারাত্রে খাওয়া সেরে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে রাত দুপুর থেকেই হাপর জ্বালিয়ে বসেছে! কাজের দস্তুর এই।

নবশাখ কর্মকার-শ্রেণীর এরা নয়। ঢোকরা! দা-কুড়ালও গড়ে—পেটের দায়ে গড়তে হয় বটে, কিন্তু নিরীহ কাজে উৎসাহ নেই। বন্দুক গড়ত এককালে এদের বাপঠাকুর্দারা। দেশি গাদা-বন্দুক ঘরে ঘরে তখন—গুলি হল জালের কাঠি। আর এদেরই কামারশালে বানানো ছররা। ইদানীং পুলিস কড়া হয়ে বিনি-পাশের বন্দুক রাখতে দেয় না। ঘরে ঘরে তল্লাসি করে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, মালিককে জেলে নিয়ে পোরে। কত বন্দুক মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে পুলিসের ভয়ে—সে বন্দুক কোনদিন কাজে লাগানো চলবে না, খদ্দের হলেন তো মাটি থেকে তুলে বেচে দিতে পারে! কিন্তু বন্দুক মানেই তো বিপন্ন—পয়সা খরচা করে আপনিই বা কেন যাবেন বিপদ কিনতে? নতুন বন্দুক গড়া একেবারে অচল, পুরানো ভাল ভাল জিনিস মরচে ধরে লয় পাচ্ছে।

বন্দুক গড়ে না, কিন্তু সে জায়গায় আর এক লাভজনক ব্যবসা জমে উঠেছে। সিঁধকাঠি গড়ানো। মোটামুটি টাকা পাঁচেক নেবে উৎকৃষ্ট একখানা কাঠির জন্য। সিঁধকাঠির অর্ডার আসে—সে ভারি মজার ব্যাপার। চোরে কামারে সাক্ষাৎ নেই—সাক্ষাৎ হওয়া বিধি নয়। রেওয়াজটা চিরকাল ধরে চলে আসছে। এই যেমন কামারশালের পাশ কাটিয়ে সাহেব আর গুরুপদ নিবারণ ঢোকরার নাতি যুধিষ্ঠিরের বাড়ি গিয়ে উঠল। অত্যন্ত চুপিসারে—ঢোকরা-বাড়িতেই যেন এরা সিঁধ কাটিবে। নিয়ম এই। বাড়ি চুপচাপ, যুধিষ্ঠিরের প্রৌঢ় বয়সের নতুন-বউ সাঁঝ লাগতে লাগতে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। দরজার পাশে কুলুঙ্গি আছে দেখুন—ত্রিভুজাকৃতি ছোট্ট ফোকর! তার ভিতরে টাকা রেখে সরে পড়ুন আপনারা। রুপোর কাঁচা-টাকা, কাগজের নোট হলে হবে না। সকালবেলা দরজা খুলে যুধিষ্ঠিরের বউ সেই ফোকরে হাত দেবে সকলের আগে। পেয়ে গেল হয়তো পাঁচ টাকা। অথবা দশ টাকা এক-সঙ্গে—তু-খানা কাঠির জন্য। ঠিক সাতদিনের দিন রাত্রিবেলা আবার এসে দেখবেন, নতুন-তৈরি চকচকে সিঁধকাঠি কুলুঙ্গির নিচে দেয়ালের গায়ে ঠেশান দেওয়া আছে আপনার জন্য। নিয়মের কখনো অন্যথা হবে না। চোরাই লাইনে যারা আছে, সত্যপথে তাদের কাজকারবার। শুধু এক থলেদার ছাড়া—কিছু বাজে লোক ঢুকে পড়ে থলেদার-সমাজের বদনাম করে দিয়েছে।

কাজ চুকিয়ে ফেরার পথে সাহেব ও গুরুপদ কামারশালের অদূরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। চোখ মেলে চেয়ে দেখবারই বস্তু। ফুঁসছে হাপর, টানে টানে আগুন জ্বলে ওঠে। লোহারের কালোকোলো দেহের উপর লাল আগুন ঝিলিক খেলে যায়। প্রধান কারিগর যুধিষ্ঠির ডগমগে লোহা সাঁড়াশি দিয়ে একহাতে নেহাইয়ের উপর ধরেছে, অন্য হাতে ছোট হাতুড়ির ঘায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়নের রূপ দিচ্ছে। আর এক মরদ তু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলে সর্বশক্তিতে ঘা দিচ্ছে, অগ্নিবর্ণ লোহা তারা কেটে ছিটকে ছিটকে পড়ে। আরও কিছুদিন পরে কাঠির জন্য রৈ-রৈ পড়ে যাবে—তুর্গাপূজা অন্তে কাঠি নিয়ে দলে বেরুবে। এত ফরমাস আসবে, মাল জুগিয়ে পারা যাবে না। কাজ তাই এগিয়ে রাখছে। এখন এই অবধি থাকল, টাকা হাতে পেয়ে বস্তুটা একটু আধটু পিটিয়ে উকো ঘষে ঝকঝকে করে দিলে হয়ে যাবে।

কামারশালা আরও কত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঢোকরার নামডাক সকলের বেশি। এই নাম পিতৃপুরুষ থেকে এসেছে, নিবারণ ঢোকরার আমল থেকে। খদ্দেরের অন্ত নেই। মাঝরাত্রি থেকে পহরবেলা অবধি সে নেহাই-হাপরের পাশে। কাজ ছেড়ে স্নান করে ফ্যানসাভাত খেয়ে ঘুমুবে। উঠবে সন্ধ্যার আগে। আরও

একবার স্নান এবং তারপর গুরুভোজন। এতক্ষণে এইবারে একটু ফুরসত। বয়স কাটিয়ে যুধিষ্ঠির নতুন সাঙা করে এনেছে—বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ফষ্টিনষ্টি কামারশালে কাজে বসবার আগ পর্যন্ত।

সাতদিনের দিন—ধৈর্য ধরতে পারে না আর সাহেব, সন্ধ্যা হতে না হতে কাঠি আনতে বেরুল। একা—গুরুপদর প্রয়োজন নেই। সঙ্গে থাকলে তার মন খারাপ হবে। সাঁঝ থেকে সকালের মধ্যে কোন এক সময়ে গেলেই হল। সিঁধ-কাঠি তৈরি হয়ে আছে।

রাজার হাতে রাজদণ্ড উঠেছে যেন। কী আনন্দ, কী আনন্দ! তুনিয়া জুড়ে রাজ্যপাট, তুনিয়ার মানুষ প্রজাপাটক। রাজদণ্ড হাতে যেখানে খুশি চলে যাবে, যে জিনিস ইচ্ছা তুলে নিয়ে আসবে। নিশাকালে নিশুতি রাজ্যের রাজা। দিনমানের রাজারা জাগ্রত মানুষের কাছে খাজনা-ট্যাক্স আদায় করে। এরা আদায়ে আসে সেই সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার পর।

পনের

কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে সাহেব চলেছে, কানে এলো মুকুন্দর গলা। সুর করে মুকুন্দ রামায়ণ পাঠ করছে, ফুলহাটার ইস্কুলবাড়িতে করত যেমন। পথের উপর দাঁড়িয়ে সাহেব শোনে। পাইক-বরকন্দাজগুলোর অবিরত দৌড়-ঝাঁপ এবং ক্ষেতেল প্রজাদের ব্যাপারি ডেকে যে-কোন মূল্যে গোলার ধান ছেড়ে দেওয়া—এই তুটো ব্যাপারে কদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, খোদ মালিক চৌধুরি কর্তার মহালে শুভাগমন হয়েছে। মুরারির এখন নিশ্বাসটা ফেলার ফুরসত নেই। দিনমানে বাড়ি যায় না, রাত্রেও যেতে পারে না সকল দিন। কাছারি-বাড়ি পড়ে থাকে।

চৌধুরি-কর্তা এমনিই ধার্মিক লোক, তার উপর কিস্তির আদায়পত্র আশাতীত রকমের ভাল হওয়ায় ভগবানের উপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছেন। সারাদিনের ঐহিক কাজকর্মে মন পঙ্কিল হয়, সন্ধ্যার পরে কিছু না কিছু সৎপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা। দিন তুই-তিন ভাগবত পাঠ করে গেছেন দূর-গ্রাম থেকে এক অধ্যাপক এসে। হরি-সংকীর্তন কালী-কীর্তন এবং বালক-কীর্তনও হয়ে গেছে। মুরারি তখন ভাইয়ের নাম প্রস্তাব করে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে—বড় সুন্দর পাঠ করে, বড় মিঠে গলা। মুকুন্দকে বলেকয়ে সে-ই এনে বসিয়েছে।

অনেকদিন পরে শুনছে সাহেব। আহা-মরি প্রাণ কেড়ে নেয়। মুকুন্দ আজ বড্ড জমিয়েছে, ফুলহাটার চেয়েও চমৎকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক পারা যায়। উরুতে বাঁধা সিঁধকাটি ঝোপের ভিতর সামাল করে রেখে সে কাছারিবাড়ি ঢুকে পড়ল। নিজের ইচ্ছায় ঢুকছে তা বোধহয় না—পাঠের স্বর টেনেহিঁচড়ে তাকে ভিতরে নিয়ে তুলল।

আসর কোথা? বাইরের লোক একজনও নয়—চৌধুরি-কর্তার সঙ্গে একত্র পাঠ শুনবে আবাদের প্রজাপাটকের মধ্যে এত বড় তাগত কারো নেই। কাছারির লোকজন সব—জন আষ্টেক সর্বসাকুল্যে। জায়গাও অতি সঙ্কীর্ণ। দক্ষিণ দিককার দাওয়াটা তক্তা ও কাঠকুটোয় বোঝাই—কিছু কাঠকুটো সরিয়ে দিয়ে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে সকলে বসেছে। দেওয়ালের গায়ে জলচৌকি পেতে মুকুন্দর বেদি। কেন্দ্রস্থলে চৌধুরী—স্থূলকায় বিশালবপু ব্যক্তি, জায়গার সিকি ভাগ একলাই তিনি দখল নিয়ে বসেছে।

সাহেব সসঙ্কোচে সকলের পিছনে বসল। মুরারি চেয়ে দেখে। এই ছোঁড়াটার হয়ে ভাদ্রবধূ কলহ করেছিল, সে রাগ মনে গাঁথা আছে। ভীম সর্দারকে ইসারা করে দিল, ভীম এসে বলে, নেমে যাও—

কেন?

বাইরের কেউ থাকতে পাবে না, শুধু নিজেরা।

সাহেব শুনছে মুগ্ধ হয়ে। রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলে, আমিও বাইরের নই।

মুকুন্দ তাকিয়ে পড়ল। হাসিমুখ, খুশি হয়েছে শ্রোতার মধ্যে সাহেবকে পেয়ে।

ঘাড় বাঁকিয়ে সাহেব মুকুন্দকে দেখিয়ে বলে, বাইরের মানুষ নই আমি। পাঠ করছেন, উনি আমার ছোড়দা। জিজ্ঞেস করে দেখ।

পাঠের আসন থেকে মুকুন্দ বলে ওঠে, ভক্তমানুষ—থাকুক না!

সামনে মুখ করে চৌধুরি-কর্তা শুনছিলেন। মুখ ফেরালেন তিনি। সাহেবকে দেখে দু-চোখে আর পলক পড়ে না। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। বলেন, কি হয়েছে, কি বলছ তোমরা? ছেলেটা কে?

আত্মসমর্থনে মুরারি তাড়াতাড়ি বলে, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে ঢুকে পড়ল—ওটা ইয়ে। মানে বাজে লোকের ভিড় হয়ে যাচ্ছে—

বলতে যাচ্ছিল, ওটা চোর—। ঠোঁটের উপর চেপে নিল। নিজের বাপ চোর, সেই কথা উঠে পড়তে পারে। মুখে না বললেও মনে মনে কি আর বলবে না? পিতৃ-কলঙ্কের দায়ে নিখরচার দুটো গালিগালাজও করবার জো নেই।

চৌধুরী-কর্তা বলেন, ভাল কথা শুনতে এসেছে, শুনুক না বসে বসে।

আমাদের শোনা তাতে কম হয়ে যাবে নাকি ? বড্ড হিংসুটে বাপু তোমরা, কী রকম জড়সড় হয়ে আছে—এগিয়ে এসো ছোকরা, এইখানটা এসে বোসো।

কর্তা বসেছেন,—অদূরে মুরারি নায়েব—দু-জনের মাঝের জায়গা দেখিয়ে দিলেন সাহেবকে। হাত ধরে টেনে বসালেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ নিহত। তুমুল কান্নাকাটি শবদেহ ঘিরে।

জমেছে খুব, নম্র হয়ে সকলে শুনছে। চৌধুরি-কর্তা এক সময়ে চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে উঠলেন: ক'টা বাজল বল দিকি ?

খাজাঞ্চী সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে: সংক্ষেপে সারো মাষ্টার। কর্তাবাবুর বাঁধা টাইমের খাওয়া। সাড়ে-ন'টায়। নিয়মের মধ্যে আছেন বলেই, বলতে নেই, দেহখানা অটুট রয়েছে।

মুকুন্দ বিপন্ন মুখে তাকাল! আঃ—বলে চৌধুরি-কর্তা খাজাঞ্চীকে নিরস্ত করেন: এ কি তোমার সেহা-করচা—পান খাইয়ে খুশি করল তো বকেয়া-সুদ বাদ দিয়ে হিসাব সংক্ষেপ করে দিলে। চারাগাছ বড় হবে, ফুলফল ধরবে—তার জন্যে সময় দিতে হবে বই কি! চেপে খাটো করা যায় না এ জিনিস। কিন্তু আমি বলি কি মাস্টার—

চৌধুরী-কর্তার রায় শোনবার জন্য মুকুন্দ পাঠ বন্ধ করে তাকাল।

আমি বলছি, ঠাকুর লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন, হনুমান পাঠিয়ে তড়িঘড়ি বিশল্যকরণী এনে প্রাণ পাইয়ে দাও। উঠে বসুন। তক্ষুনি কিছু আর রণে যেতে পারছেন না। শোক-টোক এখনো যাদের বাকি আছে, সেই সময়টা হতে পারবে। আমি এই ফাঁকে দুটো মুখে দিয়ে নেবো।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে মুকুন্দ বলে, যে আজ্ঞে।

কর্তামশায় কারণটাও বুঝিয়ে দিলেন: লক্ষ্মণ মরে রইলেন, সে অবস্থায় কেমন করে খেতে যাই বলো। খাওয়া যায় না, পাপ হয়। প্রাণটা সেজন্য আগে পাইয়ে দিতে বলছি। খাওয়াদাওয়া সেরে পরের কথা শুনব। বড্ড ভাল পাঠ হে তোমার।

মুরারির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজে কটা ?

ঘড়ি তো বেদির উপরে—

চৌধুরী-কর্তাও তাই দেখেছেন। ঘড়ি মুকুন্দর পাশে ছিল, প্রয়োজন মতো সে সময় দেখবে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি ব্যাকুল হয়ে বলে, যে ঘড়িটা আপনি আমায় খেলাত দিলেন। কত দামের জিনিস—টাকার দামে বলছি নে। আপনি হাতে করে দিলেন, সে যে হীরে-জহরতের দাম—

চৌধুরী-কর্তা বলেন, টাকার দামেও ফেলনা নয়। কুক্‌ভাইজার-ঘড়ি, বনেদি জিনিস। জলচৌকির আশেপাশে পড়ে গেল কিনা দেখ।

ঠাকুর লক্ষ্মণ রইলেন আপাতত মৃত অবস্থায়। ঘড়ির জন্য খোঁজ-খোঁজ পড়েছে, তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে। নেই কোথাও।

অপমানে জ্বলছেন চৌধুরী-কর্তা। তাঁর কাছারিবাড়ি তাঁরই চোখের উপর জিনিসটা লোপাট। কিন্তু কণ্ঠস্বরে জ্বালার লেশমাত্র নেই। বলেন, সবাই ভাল-লোক আমরা, চোর কেউ নই। মনের ভুলে নিয়ে নিতে পারি। পারি কেন নিয়েছি নিশ্চয় কেউ না কেউ। সকলে আমরা জামা কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখিয়ে দেব। ঘড়ি থাকলে বেরিয়ে পড়বে। আমি সকলের আগে—

হাঁ-হাঁ করে ওঠে সবাই: সে কী কথা। আপনি কেন, জিনিস তো আপনারই—

ততক্ষণে চৌধুরি-কর্তা উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলে নগ্নগাত্র হয়েছেন। তাই শুধু নয় মুরারির হাতখানা ধরে কোমরের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়ে দিলেন: আমার পকেট নাই, কোমরের গাঁটেও নেই। খুশি তো এবার? এক এক করে সকলে দেখিয়ে দাও।

খাজাঞ্চী উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলছে। মুরারি সাহেবের দিকে কটমট করে চেয়ে বলে, এর পরে তুই—

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে: আজ্ঞে না, আপনি। আপনি নায়েব মানুষ—মনিব মশায়ের পরেই আপনার পালা। উঁচু থেকে ক্রমে নেমে আসবে।

এমনি সময়ে এক কাণ্ড। জলচৌকির বেদি থেকে মুকুন্দ নেমে পড়েছে। দাওয়া থেকে উঠানে নামলে।

ওকি, কোথায় চললে মাস্টার?

হুঁ—হু, যাচ্ছি—অর্থহীন অস্পষ্ট কিছু বলে মুকুন্দ পা চালিয়ে দেয়।

চৌধুরী-কর্তা গর্জন করে ওঠেন: যেতে দিও না, নিয়ে এসো আমার সামনে। শিক্ষিত লোক, ইস্কুলের মাস্টার—ছি-ছি!

খাজঞ্চী বলে, কোন বাপের বেটা, সেটা দেখবেন তো—

এইটুকু বলে ফেলেই জিভ কেটে চুপ হয়ে যায়। নায়েব মুরারি বর্ধনের বাপও যে সেইজন। চৌধুরী-কর্তা সদরে ফিরে গেলে মুরারিই-তো সর্বময়। হঠাৎ কি রকমে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল।

ভীম সর্দার আর মহাদেব সিং দুই বরকন্দাজ দুটো হাত ধরে ফেলে হিড়হিড় করে মুকুন্দকে দাওয়ার উপর তুলল। একটু আগে বেদিতে বসে

তন্ময় হয়ে পাঠ করছিল, চোর হয়ে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! লজ্জা কাছারির নায়েব মুরারীরও। ভাইয়ের পাঠের প্রসঙ্গ কর্তার কাছে সে-ই তুলেছিল। ভাবখানা হল—খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা দেখেছ, ভাইয়ের মুখে পাঠ শোন একদিন। ধর্ম অর্থ দুই বর্গের ধুরন্ধর আমরা দু-ভাই। এর ফলে বুড়ো মনিবের কাছে খাতিরটা বেশি হবে। কিন্তু বরবাদ সমস্ত। হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দর গায়ে সাদা কামিজ, তার উপরে ছিটের হাত-কাটা ফতুয়া। বৈশাখের দিনেও সকলকে একটা-কিছু গায়ে রাখতে হয়েছে চৌধুরি-কর্তার সামনে নিতান্ত খালি গায়ে থাকা চলে না বলেই। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে বোঝা নামাবে, সেই চিন্তা। আর মুকুন্দ মাস্টার দেখ ডবল চাপান দিয়ে এসেছে। ফতুয়ার সবগুলো বোতাম আঁটা। গোড়ায় এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা হয়েছিল একটু। এখন চোখ ঠারছে: বেশি জামা পরে কি এমনি? পরেছে পকেটের দরকারে। ঠাঁইয়ের অভাবে বমাল ফেলে না যেতে হয়।

চৌধুরি-কর্তা বললেন, জামা খুলে ফেল।

মুকুন্দ দুটো হাত ফতুয়ার উপর চেপে ধরে। বোতাম খুলতে দেবে না। কিছুতে না। এর পরে তিল পরিমাণ সংশয় থাকে না। চোরাই ঘড়ি রেখেছে ফতুয়ার নিচে কামিজের বুক-পকেটের ভিতর।

নিজে খুলছে না তো দুই বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন চৌধুরি-কর্তা। মাস্টারি করে, ছেলেপুলে মানুষ করার ব্রত নিয়েছে, মুখে ধর্মের খই ফোটে। দয়ামায়া নেই এই সব ভণ্ডের উপর।

এতগুলি লোকের মধ্যে সাহেবই কেবল ছটফট করছে: কী আশ্চর্য, ছোড়দাকে এরা চোর বানাল! কিছুই জানেন না উনি, কিছু করেননি—

চৌধুরি-কর্তা চোখ পাকিয়ে পড়তে থতমত খেয়ে সাহেব থেমে যায়।

ভীম সর্দার মুকুন্দর হাত দুটো পিছনে নিয়ে সজোরে এঁটে ধরে আছে, মহাদেব পটপট করে ফতুয়ার বোতাম খুলছে। এর পরেই হাত ঢুকিয়ে দেবে সার্টের বুকপকেটে—

হরি, হরি! পকেট নেই যে। পকেট সুদ্ধ খাবলাখানেক কিসে যেন ছিঁড়ে খেয়েছে। জীর্ণ শতছিন্ন কামিজ—উপরে ফতুয়া চাপা থাকায় বোঝা যায় না। ডবল জামা পরার রহস্যটা মালুম হল এবার। শুধু ফতুয়া গায়ে ভদ্রসমাজে বিচরণ চলে না, আবার কামিজের মধ্যভাগ দেখতে দেওয়াও হাস্যকর। গ্রীষ্মের কষ্ট তুচ্ছ করে মানের দায়ে এই ডবল বোঝা চাপানো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্মিত মুরারি বলে, ঘড়িটা দেখছি আমারই পকেটে। কেমন করে এলো?

উড়তে উড়তে ঢুকে পড়েছে। বুড়ো চৌধুরি খিঁচিয়ে উঠলেন : মনের ভুলে নিজে পকেটে পুরে সবসুদ্ধ নাজেহাল করলে। ধার্মিক শিক্ষিত মানুষটাকে ডেকে নিয়ে এসে অপমানের একশেষ করলাম। এমন সুন্দর পাঠ একেবারে মাটি। খাওয়ারও দেরি হল—খাবোই না আজ আমি। উপোস করে অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মুরারি বেকুব হয়ে গিয়ে খাজাঞ্চীকে বলে, ঘড়ি কেমন করে পকেটে আসে বুঝতে পারছিনে! নিজে আমি কখনো তুলিনি, অত ভুলো মন নয় আমার।

অবমানিত মুকুন্দর দু-চোখে টপটপ জল পড়ছে। ফতুয়া হাতে তুলে সাহেব বলে, পরে নাও ছোড়দা। সে-ই পরিয়ে বোতাম সমস্ত এঁটে দিল।

খাজাঞ্চী বলে, অমনধারা কেন করলে মাষ্টার? ছুটে পালালে, জামা খুলতে দেবে না কিছুতে—তাতেই তো সন্দেহ দাঁড়াল।

মুকুন্দর চোখের জল, সাহেবের জামা পরানো—চৌধুরি-কর্তা এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন : এ ছাড়া আর কি করবে? পালানো সামান্য কথা—ছুটে গিয়ে কাছারির পুকুরে ঝাঁপ দিতেও পারত। যাক প্রাণ রোক মান। মানই তো আমাদের জামাকাপড়ে—তার বড় কি আছে? তুমি আমি চোর আমরা সকলেই, কাপড়চোপড় আর ভালো ভালো বুকনির বাহারে রেহাই পেয়ে যাই।

সকলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সাহেব এসে মুকুন্দর হাত ধরল : চলো ছোড়দা—

খাজাঞ্চী বলে ওঠে, পাঠ তো শেষ হয়নি।

চৌধুরী-কর্তা এবারও জবাব দেন : গলা দিয়ে বেরুবে না এখন পাঠ। গলাটা মানুষের কিনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড হলে কথা ছিল না।

কিন্তু লক্ষ্মণ যে মরা অবস্থায় পড়ে রইলেন—

বেঁচে ওঠা ঠাকুরের অদৃষ্টে নেই। আমরাই বাঁচতে দিলাম না। ভারী গলায় চৌধুরি বলতে লাগলেন, ধিক্কার দিচ্ছি আমি নিজেকে। শঠ-তস্কর দেখে দেখে এমন হয়েছে, মানুষ বিশ্বাস করতে পারিনে। চোত-বোশেখে বছর বছর সোনাখালির মহালে আসি। কতকাল ধরে আসছি। মুকুন্দর জীবনের কোন খবর জানতে আমার বাকি নেই। আসল সময়ে তবু তাকে চোর ভেবে বসলাম।

মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন, পাঠ শেষ হতে রাত্রি হবে—শুধু-মুখে যেতে দেবো না বলে ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু কোন্ মুখে তোমায় খেতে বলি! খাবেই বা কেন? চলে যাও তুমি বাবা, আর আটকাব না।

মুকুন্দ আর সাহেব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব বলে, দোষটা আমারই ছোড়-দা, আমার দোষে, তোমার হেনস্থা। খেলা করতে গিয়েছিলাম একটু। বড়দা একদিন বউঠানকে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে শোনাল আমারই কারণে। সেই রাগ পোষা ছিল। ঘড়িটা তুলে মুঠোয় রেখেছিলাম, কায়দা বুঝে তারপর বড়দার পকেটে ফেললাম। অপদস্থ হবে সকলের সামনে। ভেবেছি চৌধুরির ঘড়ি, সামনের উপর জল-চৌকিতে তিনি রেখেছেন। আন্দাজ আমার মিছেও নয়। কিন্তু সে ঘড়ি বড়দাকে বখশিস দিয়েছেন, কেমন করে বুঝব।

নিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বলে, রক্ত কথা বলে, দেখলে তো সাহেব? চোরের বাড়ি বলে পৈতৃক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভাগনে বংশীর কাছে উঠলাম, সেখানেও কানাঘুষো। সব ছেড়ে ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে আছি, যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না। লোকের কিন্তু তবু ভাবতে আটকায় না।

সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলে, ভাববেই তো। নতুন অভিধানে কথার সব মানে পালটে গেছে—বলাধিকারী বলেন। শিক্ষক মানেই গরিব লোক। এ বাজারে গরিব হওয়া মানে মানুষটা এমন অপদার্থ, চোর হবারও ক্ষমতা নেই। চোর ভেবে তো সম্মানই করল তোমায়। তার উপরে সাধু নাম একটা আছে তোমার। সাধু মানেই ভণ্ড।

বর্ধন-বাড়ির উঠান অবধি সাহেব সঙ্গে এলো। মুকুন্দ বাড়ির ভিতর চলে যায়। পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাহেব বাসায় ফিরছে। পচা বাইটার ঘরে আজ আর ঢোকা হল না। সিঁধকাঠি সেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছে, মুকুন্দর সামনে তুলে আনতে পারে নি। দাম দিয়ে কাঠি আনা হয়েছে এইমাত্র, সে কাঠি গুরু পচা বাইটা হাতে তুলে দেবে, আর ষড়ানন ও মা-কালীর দোহাই পেড়ে সাগরেদের বিজয়-কামনা করবে। আজকে আর হল না—নিয়মরীতি কাল এসে সারবে। আসা-যাওয়ার অসুবিধা নেই এখন, দিনে রাত্রে যখন খুশি আসে। বিদায় নেবার আগে যত-কিছু জানবার যত-কিছু শোনবার জেনে-শুনে যাচ্ছে। সুভদ্রা-বউ আর ওত পেতে থাকে না, নিজের সুখ নিয়ে মজে আছে।

ঠিক দুপুরে বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। বাইটা-বাড়ি নিঝুম। যে যার ঘরে দরজা এঁটে পড়েছে। খাওয়ার পরে পচা বাইটাও একটু

তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়েছিল। ঘুম আসে না, তক্ষুনি আবার উঠল। তামাক সেজে নিয়ে চৌকির উপর বেড়া ঠেসান নিয়ে মেজেয় পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসে পড়েছে। কি মনে হল, একটা পা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে দেয় খানিকটা। আলগা মাটি পায়ে ঠেকে, কী ব্যাপার! এবারে হাত ঢুকিয়ে দিল। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে—

হুঁকো ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মতো মাটির মেজেয় বসে পড়ে এক ধাক্কায় চৌকিটা সরিয়ে দেয়। যা ভেবেছে—ইঁদুর নয়, চোর। চোর এসে সর্বনাশ করে গেছে। সুভদ্রার হাতের চুড় কৌটোসুদ্ধ এইখানে মাটির তলে পুঁতেছিল। খালি কৌটো গড়াচ্ছে একপাশে।

স্তম্ভিত হয়ে থাকে, নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হায় রে বাইটা, এত ভোগান্তি ছিল তোমার কপালে! অন্তিম বয়সে অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে পড়ে বিস্তর রকমে নাজেহাল হচ্ছে। কিন্তু এই লাঞ্ছনার সঙ্গে কোনকিছুর তুলনা হয় না।

বাকি দিনটুকু সেই এক জায়গায় একভাবে পচা বসে। মাথায় হাত দিয়ে আছে বসে একা একা। এমন বেঁচে থাকার কি লাভ? যমরাজের উদ্দেশ্যে কেবলই বলছে, পোড়া ঠাকুর, এদিক পানে চোখ তুলে তোমার মহিষটা দাও ছুটিয়ে, উদ্ধার নিয়ে যাও।

কাল দুপুরে সাহেব এসেছিল, অনেকক্ষণ থেকে তারপর কাঠি আনতে চলে গেল। কাঠি নিয়ে রাত্রিবেলা আসবার কথা। দেখা নেই সেই থেকে। পায়নি নাকি কাঠি? এমন হবার কথা নয়। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের কাজের গাফিলতি হতে পারে, যুধিষ্ঠির ঢোকরার হবে না। এই নিয়েও খানিকটা চিন্তা। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, রোজগারের ক্ষমতা পড়ে গিয়ে তারা সব পর হয়ে পড়েছে। সাহেবই এখন আপন মানুষ—দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আপন। প্রতিক্ষণ সাহেবকে ভাবছে। সাহেবের কাছে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। না আসে তো নিজেই তার খোঁজে বেরুবে।

দিনের আলো থাকতে পথ হাঁটতে পারে না। বয়সকালে তবু কিছু পারত, বুড়ো হয়ে এখন একেবারেই না। দিনমানের কড়া রোদে চোখ ঝলসে দেয়, মাটির পথ জলা জায়গা বলে ঠেকে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি খুলে যায়—বাদুড়-পেঁচা-চামচিকের যে দস্তুর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ল। কষ্ট হচ্ছে বিষম। কী আশ্চর্য, পা-দুটো জড়িয়ে আসে। অপমানের আঘাতে একটা দিনের মধ্যেই আধাআধি মৃত্যু হয়েছে যেন। বেড়া থেকে একটা বাঁশির খোঁটা খুলে নিয়ে লাঠির মতন ভর দিয়ে

চলে। বুড়ো বাইটা লাঠি ঠুক-ঠুক করে যাচ্ছে—হায় রে হায়, উড়ন-তুবড়ির মতো যে মানুষ একদিন জলে-ডাঙায় ঝিলিক দিয়ে বেড়িয়েছে।

খানিকটা দূর গিয়ে বড্ড হাঁপ ধরে গেছে। পথের ধারে দূর্বাবন পেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার উপরে। কে মানুষটা আসে? যার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই। সাহেব। সাহেব, তুই এসে গেছিস বাবা? মা-কালীকে ডাকছি, তোকে তিনি এই পথে খেদিয়ে নিয়ে এলেন। আমায় বেশি কষ্ট করতে হল না।

সাহেব বসে পড়ে বাইটার মাথা কোলের উপর তুলে নিল।

তোরই খোঁজে যাচ্ছিলাম রে সাহেব। আজকে আমার বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সাহেব কিছু মুচকি হেসে বলে, কেন ওস্তাদ?

আমি আর বেঁচে নেই এখন. মরে গেছি। নিশ্চয় মরেছি। বুকে একটা ধুকপুকানি থাকলেই বেঁচে থাকা হয় না রে। বাইটা জ্যান্ত থাকলে নজরের সুমুখ দিয়ে কখনো জিনিস পাচার হতে পারত না।

দম নিয়ে পচা আবার বলতে লাগল, মেজের মাটি খুঁড়ে ছোটবউমার সেই গয়না নিয়ে গেছে, তুই যা আমায় গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলি। রাতে আমি ঘুমুইনে, কাজ না থাকলেও ঘুম আসে না। খানিক খানিক চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকি, কিন্তু কুটোগাছটি নড়লে টের পেয়ে যাই। চিরকালের গরব আজ ভেঙে গেল সাহেব।

কেঁদে ফেলবে যেন বুড়ো, গলার স্বর তেমনি। সাহেব বলে, কাজ রাত্রি-বেলা হয়নি ওস্তাদ। তা হলে কানে পড়ে যেত। দিনমানের কাজ—

পচা বাইটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে পড়ে: বলিস কি রে?

সাহেব এক স্বরে বলে যাচ্ছে, চৌকির উপর বসে বেড়া ঠেসান দিয়ে তামাক খান, সেই সময়টা কাজ হয়েছে। এক দিনে নয়, সাত-আট দিন ধরে।

তুই কি করে জানলি? তবে কি—

সগর্বে বুকে থাবা মেরে সাহেব বলে, আপনার মতন গুরু যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার অসাধ্য কি আছে? এটা কেন বোঝেন না, ও-রকম মিহি কাজ এক আপনি নিজে পারেন, আর যদি কেউ পারে সে আপনার সাগরেদ। সৃষ্টিসংসারে এর বাইরে অন্য কেউ পারবে না। একটু একটু করে খোঁড়া হয়েছে সাত-আট দিন ধরে। কাল বিকালে সারা হল। মাল কাপড়ের নিচে নিয়ে চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, ঘুণাক্ষরে আপনি টের পেলেন না ওস্তাদ।

সে মাল একটা দিন ও একটা রাত্রি সাহেব নিজের হেপাজতে রেখেছে।

এমন যে পচা বাইটা, তার মনেও সন্দেহের বাষ্পটুকু আসে নি। এমনধারা পরিপাটি নিখুঁত কাজ—সেকালের কথা জানিনে, একালের ক'টা কারিগর করতে পারে? বাহাদুরি যেটা দেখাবার, হয়ে গেল। গয়না সাহেব আবার পচার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের উপর এই দেখা। আর নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের গড়া নতুন সিঁধকাঠি। পাঠ নেওয়ার কাজ ষোলআনা সারা, বাইটা মশায় এবারে নিজ হাতে কাঠি তুলে দেবেন। শিরে গুরুর আশীর্বাদ আর হাতে গুরুদত্ত সিঁধকাঠি নিয়ে এদেশ সেদেশ চরে বেড়ানো এবার থেকে।

সাহেব বলে, কাঁচা মাটি দেখে ধরলাম, মেজের তলে মাল রয়েছে। ডিম সরানোর কথা হচ্ছিল—ভাবলাম, এ কাজটা বা খাটো কিসে তার চেয়ে? লেগে পড়লাম আপনারই দোহাই পেড়ে। চৌকির উপর বসে আপনি তামাক খান আর গল্প করেন, পায়ের কাছে বসে বসে শুনি আমি। সেই সময় এক হাতে পদসেবা করছি, আর এক হাতে চৌকির নিচে টিপিটিপি খুঁড়ে যাচ্ছি ছুরি দিয়ে। মাটি খুঁড়ি, চলে যাবার সময় আলগা মাটি গর্তে ফেলে ভরাট করে যাই। কাল বিকালে কাজ শেষ, কৌটো পেয়ে গেলাম। তার পরে আর ভরাট করিনি, মাটি ছড়িয়ে রেখে গেলাম যাতে নজরে আসে। নয়তো কত দিনে টের পেতেন, ঠিক কি!

পরাজয়ের দুঃখ ভুলে পচা মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, আমারই আসনের নিচে কাজ, আমি তার ভাঁজটুকু জানলাম না। মরি মরি, হাত হয়েছে বটে একখানা! হাত না পাখির পালক!

সাহেব বলে, খুশি করতে পেরেছি তবে? পাখির বুকের তলা থেকে ডিম আনার সামিল হল কিনা বলুন এবারে ওস্তাদ।

পচা উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, তার অনেক বেশি। আমার কান অনেক খর পাখির চেয়ে।

চুড়জোড়া কাহেব গাঁজিয়ার মধ্যে ভরে কোমরে বেঁধে এনেছে। পচার হাতটা কাপড়ের উপর দিয়ে সেই জায়গায় ঘুরিয়ে দিল। বলে, পায়ে বাঁধা কাঠিও আছে। বাড়ি চলুন, ঘরে গিয়ে এসব বের করব।

যেতে যেতে পচা বলে, গয়না তোরই এখন, আমার কোন দাবি নেই। দক্ষিণা পেয়ে গেছি। রাখতে যদি না পেরে থাকি, সে দোষ আমার। নিজের ক্ষমতায় জিনে নিয়েছিস। বিক্রি কর, দানসত্র করে দে, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেল—যা খুশি করতে পারিস। বলবার কিছু নেই।

চপল কণ্ঠে আবার বলে, জিনিসটা ভাল রেঃ আমি বলি, বিয়ে করে বউয়ের হাতে পরিয়ে দিস। রেখে দে যত্ন করে।

পচা বাইটার পিছনে সাহেব নিঃশব্দে ভাবতে ভাবতে চলেছে। উঠানে পা দিয়ে সুভদ্রা-বউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোঠাঘরের বারান্দায় উপর এদিক পানে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিল সাহেবকে।

সে সুভদ্রা নয় আর এখন। নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। আরও কোন কোন রাত্রে মানকচু-বনে দাঁড়িয়ে সাহেব শুনে এসেছে—স্বামীর সোহাগিনী বউ। সাহেবের সঙ্গে—এবং অনুমান করা যায়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিষ্টি মধুর সম্পর্ক তার।

সুভদ্রা ডাক দিল, একটা কথা শুনে যেও ঠাকুরপো।

সাহেবও উত্তর দেয়ঃ যাচ্ছি বউঠান।

পচার ঘরে ঢুকে পায়ে-বাঁধা সিঁধকাঠি খুলে রাখল। চুড় বের করল কোমরের গাঁজিয়া থেকে। বলে, দানসত্র করবার হুকুমও দিয়েছেন ওস্তাদ, আমি তাই করব। যার গয়না তাকেই দিয়ে আসি। আদর করে আপনিই তো একদিন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি কক্ষনো ফেরত চান নি, জেদ বজায় রাখা নিয়ে কথা। সেটা হয়ে গেছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারে নি। বউঠান জানে, কাজ আপনারই। বড় মিথ্যাও নয়, আপনার কাজটা আমার হাত দিয়ে করালেন। করিয়ে নিয়ে মান বাড়ালেন আমার।

বলতে বলতে সাহেব মলিন মুখে নিশ্বাস ফেলেঃ গয়নাখানার জন্যে বউঠান কান্নাকাটি করলেন, মনটা সেই থেকে কেমন হয়ে আছে। কেমন করে কদ্দিনে আমি যে এই মনের দফা নিকেশ করব! করবই। সোনাখালি আজকে আমার শেষ দিন। এ দিনটায় কারো মনে দুঃখ রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না! কি হুকুম আপনার ওস্তাদ?

ওস্তাদের সায় নিয়ে সাহেব সুভদ্রা-বউয়ের কাছে গেল। বারাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কাছারিবাড়ি গেছে তোমার ছোড়দা। চৌধুরি-কর্তা সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে, দু-দুবার বরকন্দাজ এসে গেছে। আমি মানা করলাম ঃ কক্ষনো না, অমন হেনস্থা যেখানে থুতু ফেলতেও তাদের কাছে যাবে না। দুপুরে বটঠাকুর খেতে এসে বললেন, না গেলে বুড়োমানুষটা বলে দিয়েছে নিজে সে চলে আসবে। এর পরেও গোঁ ধরে থাকলে মনিব চটে যাবে, অন্তত বড়ভাইয়ের মুখ চেয়েও যেতে হবে একটিবার। কি করব ঠাকুরপো—বলে দিলাম, রোদ পড়লে সন্ধ্যার পর যাবে। দেখা দিয়েই চলে আসবে।

অনেকক্ষণ গেছে, এখনো ফেরে না। কখানা লুচি ভেজেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল।

সাহেব দুষ্টামি করে বলে, সেই একদিন নামাবলী মুছবার কথা হয়েছিল, মনে পড়ে বউঠান ?

সুভদ্রা আকাশ থেকে পড়ে : ওমা, কবে ? কিসের নামাবলী ভাই ?

সাহেব মুখ টিপে হেসে বলে, রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা হর-গৌরী—জোড়ায় জোড়ায় যত দেবদেবী আছেন। বুক জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, ছোড়-দা এসে সব মুছে দেবেন—ভুলে গেলেন সমস্ত কথা ?

সুভদ্রা শিউরে উঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলেও ওসব উচ্চারণ করবে না, পাপ হয়। বেশ তো আছেন দেবদেবীরা, আমার বুকখানা জুড়ে আছেন। তোমার ছোড়দা'কে বলব—তার নামটাও লিখে দেবে ঐ সব নামের নিচে।

যে জন্যে সাহেব এসেছে—হাসিমুখে চুড়জোড়া বের করে ধরল : গয়না নিয়ে নিন বউঠান। কথা দিয়েছিলাম—দেখুন, উদ্ধার করে আনলাম। নিন, পরে ফেলুন। ছোড়দা এলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বারাণ্ডার প্রান্তে রেখে দিয়েছে। তুলে নিতে আসছিল সুভদ্রা, এমনি সময় কাছারি-বাড়ির ফেরত মুকুন্দ উঠানে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো সুভদ্রা একছুটে তার কাছে চলে যায় : অত ডাকাডাকি কেন গো ?

মুকুন্দ বলে, ইস্কুলেব কাজ ছাড়িয়ে চৌধুরিকর্তা আমায় নিয়ে যেতে চান। হাত ধরে অনেক করে বললেন। জাপান থেকে শিখে এসে ওঁর ছেলে চিরুনির ফ্যাক্টরি করেছে—ডাইনে-বাঁয়ে চুরি হচ্ছে, সামলাতে পারলে না। ছেলে কাজ বোঝে, কারবার একেবারে বোঝে না। ম্যানেজার করে আমার উপর ঐ দিকটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন।

সুভদ্রা হেসে বসে, তুমিই যেন কত বোঝ ! চিরটা কাল মাস্টারি করছ—

চৌধুরিকর্তা চাচ্ছেন তাই। যারা রয়েছে তারা সব ঝাহু লোক, বড্ড বেশী রকম বোঝে। কম বোঝে এমনি সৎমানুষ চান তিনি। আমার পাঠ শুনে থেতে গিয়েছেন। ম্যানেজারের কোয়ার্টার ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি হাত ধরে বললেন, যে ক'দিন বাঁচি, সন্ধ্যাবেলাটা একটু একটু ভগবৎকথা শুনতে পাবে, সে-ই আমার বড় লাভের ব্যাপার। বুড়োমানুষ নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন।

সাহেব উল্লসিত হয়ে বলে, কারখানার ম্যানেজার আমাদের ছোড়দা, শহরের উপর বাসা ! বউঠানের কত সাধ, বাসা করে দুজনে থাকবেন।

মুকুন্দ বলে, সেইটে জানি বলেই নিমরাজি হয়ে এলাম। দেখা যাক ভাল করে ভেবেচিন্তে যুক্তিপরামর্শ করে—

কিন্তু যে লোকের সাধ মেটাবার জন্য ভাবনাচিন্তা, নিতান্ত উদাসীন ভাব তার যেন, এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুভদ্রা: গিয়েছে সেই কখন। সেখানে এতক্ষণ বকবক করে এলো বাড়ি এসেও তাই। হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে এসো। খাবার দিচ্ছি।

তাড়া খেয়ে মুকুন্দ জলের বালতির দিকে যায়। খাবার দিতে সুভদ্রা রান্নাঘরে ছুটল। সাহেব পিছনে ডাক দেয়: গয়না পড়ে রইল বউঠান। তুলে রেখে দিন।

ও, হ্যাঁ—

মনে পড়ে গেল সুভদ্রার, কয়েক পা ফিরে এসে চুড়জোড়া বাঁ-হাতে তুলে নিল। এত দামের গয়নাখানা—কোঠাঘরে যে সামাল করে রেখে আসবে তা নয়, দুটো আঙুলে ঝুলিয়ে অমনি রান্নাঘরে চলল। কত কষ্ট করে কত রকম কলকৌশল খাটিয়ে জিনিসটা উদ্ধার করে আনা—অকৃতজ্ঞ বউ তার জন্য সাহেবকে একটা মুখের কথা বলল না। মুখের দিকে তাকালই না একবার ভাল করে। বরকে খেতে দিতে হবে, বড় ব্যস্ত এখন।

ক্রোধ হওয়া উচিত, উল্টে হাসির আলোয় সাহেবের মুখ চিকচিক করে। ওস্তাদের হাত থেকে আজকেই সিঁধকাঠি পেয়েছে—কাঠি ধরে ঘরে ঘরে সে নাকি মন্দ করে বেড়াবে। তোমায় দিয়ে তা হবে না সাহেব। কাজ করতে পারা যায়। কিন্তু মন্দ করা বড্ড শক্ত।

ঠিক এই রাত্রে অনেক দূরে কালীঘাটের ফণী আড্ডির বস্তিতে হুলস্থুল কাণ্ড। রাণী গলায়-দড়ি দিয়েছে—পারুলের বড় আদরের মেয়ে রাণী। মাটকোঠার প্রান্তে যেখানটা পারুলের ঘর ছিল, সেখানে এখন দোতলা পাকা-দালান উঠেছে রাণীর জন্য। উপরের এক কুঠুরি, নিচে এক কুঠুরি এবং সিঁড়ি। উপরের ঘর রাণীর, নিচের ঘরে মা পারুল থাকে। রাণীর এখন গা-ভরা গয়না—ছেলেবয়সের মতন ঝুটো গয়না নয়, আসল গিনিসোনার জিনিস। এত সুখ নিয়ে হতচ্ছাড়ি মেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল।

ছাতের কড়িকাঠ অবধি নাগাল পায় না, খাটের উপরে তাই টুল বসিয়েছে। শাড়ির এক প্রান্ত কড়িকাঠে বেঁধে অন্য প্রান্ত গেরো দিয়েছে নিজের গলায়। পায়ের ধাক্কায় টুল উল্টে দিয়ে তারপর ঝুল খেয়ে পড়ল। কাজের যেমন দস্তুর। খবরাখবর নিয়েছে—সরকার বাহাদুর ফাঁসিতে লটকান, সে পদ্ধতিও মোটামুটি এই।

কাজের কিন্তু খুঁত থেকে গিয়েছিল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক মতো হাত পৌঁছয়নি, কড়িকাঠের বাঁধন আলগা রয়ে গেল। রাণী বুঝতে পারেনি সেটা। যেই মাত্র ঝুল খেয়ে পড়া, বাঁধন খুলে ধপ করে সে মেজেয় পড়ে গেল। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে গোঙানি। বিষম গুমট আজকে, হাওয়ার লেশমাত্র নেই। পারুল ঘরে শুতে পারেনি, সিঁড়ির ধারে রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়েছিল। ঘরে না শুয়ে ভাগ্যিস ছিল আজ বাইরে! সশব্দে টুল এবং মানুষ পড়ে যাওয়া, পর মুহূর্তে দম-আটকানো গলায় বীভৎস ঘড়ঘড়ানি—ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে পারুল উপরে ছুটল। জানালা খোলা। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সে আলোয় সঠিক কিছু ঠাহর হচ্ছে না। জানালার গরাদের উপর পারুল মাথাভাঙাভাঙি করছে: রাণী, ওরে রাণী, কি হয়েছে? জবাব দে মা, দোর খোল—

সব ঘরের সকল মানুষ এসে পড়ল। দমাদম লাথি দরজার উপর। খিল ভেঙে পাল্লা খুলে পড়ে। এই আর এক ভুল রাণীর। মরবার তাড়ায় শুধুমাত্র খিল এঁটেছে, হুড়কো দিতে মনে নেই। তা হলে এত সহজে হত না।

আলো কোথা? আলো নিয়ে এসো শিগগির! গলার ফাঁস খোল। খোলা যাচ্ছে না তে কেটে ফেল কাপড়ের ওখানটা—

স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ নয় বটে—কথা-কাটাকাটি, মুখ আঁধার করে বেড়ানো, চোখের জল ফেলা ইদানীং লেগেই আছে মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু এত বড় কাণ্ড করে বসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি পারুল। ভারি চাপা মেয়ে—ভাবে যতখানি, বলে তার অতি সামান্য। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে ফণী আড্ডি মরে গিয়ে মলয়কুমার আঢ্য মাটকোঠার যখন নতুন মালিক হল। সাহেবদের দলের সেই ঝিঙে ছোঁড়াটা মলয়কুমার এখন।

ফণী আড্ডির তিন ছেলে—ঝিঙে সকলের ছোট। প্রথম পক্ষ গত হবার পর ফণী দ্বিতীয় সংসার করেছিল, সে বউয়ের ছেলেপুলে হয়নি। ফণী যতদিন বেঁচে ছিল, বউছেলেরা সামনে আড়ালে শতেক কুচ্ছো করেছে—হাড়কঞ্জুষ মানুষ, নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়, এমনি কত। মরে যাবার পর এখন গদগদ অবস্থা—এমন বিচক্ষণ মানুষ হয় না। এবং চরম আত্মত্যাগী—পুরো মাপের কাপড় পরেনি জীবনে, আটহাতি ধুতি হাঁটুর উপর তুলে ঘুরে বেড়াত, শীত—গ্রীষ্মে একটিমাত্র গলাবন্ধ সুতি-কোট। না খেলে প্রাণরক্ষা হয় না—ঈশ্বরের এই বিদ্‌ঘুটে নিয়মের জন্য যেটুকু নইলে নয় তাই খেয়েছে, বউ-ছেলেদের খাইয়েছে। বয়স হয়ে অনেকের ধর্মে মতি যায়, দানধ্যানে পয়সা নষ্ট করে। ফণী আড্ডি মরে চিতার ছাই হল, কালীঘাটের পীঠস্থানে থাকা সত্ত্বেও মানুষটার

কাছে ধর্ম ঘেঁষতে পারেনি। ফলে হিসাবপত্র করে দেখা গেল, সম্পত্তিও নগদ টাকাকড়ির পাহাড় জমিয়ে গেছে বউ-ছেলেপুলের জন্য।

দ্বিতীয় পক্ষের বউ বোধকরি পুরুত-ঠাকুরের প্ররোচনায় প্রস্তাব করলেন: এত যখন রেখে গেছেন, শ্রাদ্ধটা ঘটা করে হোক। ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয়স্বজন ছাড়াও কালীঘাটের কাঙালি ডেকে লুচি-হালুয়া খাইয়ে দেবো।

বড়ছেলে শিউরে আপত্তি করে ওঠে: ক্ষেপেছ মা—

মৃতে ভুরিভোজনের নিয়ম, ঠাকুরমশায় বললেন। আত্মা তৃপ্তি পায়।

তেমন ছেঁদো আত্মা আমার বাবার নয়। খাওয়ানো দেখলে উল্টে ছটফট করবেন স্বর্গধাম থেকে। চাই কি, ভুত হয়ে নেমে এসে ঘাড় মটকে শোধ নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ অতএব নমো-নমো করে সারা হল। আলিপুরের এক মোক্তার ফণীর ভগ্নিপতি। এক জায়গায় সকলকে ডেকে মোক্তারমশায় বললেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—আজ না হোক, কাল তো হবেই। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগবাঁটোয়ারা করে নাও। আপোষে না করলে পরিণামে লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা—আদালতের আমরাই ভাগাভাগি করে নেবো, তোমাদের ভাগ্যে মূলোর ডাঁটা।

তিনিই মধ্যবর্তী হয়ে বাঁটোয়ারা করতে বসলেন। নগদ টাকার ব্যাপারে হাঙ্গামা নেই, সকলের সমান। সম্পত্তির সাড়ে-তিন ভাগ—তিন ভাগ তিন ছেলের, আধা ভাগটা বিধবার। নিয়ম হল, ছোটজন সকলের আগে পছন্দ করবে। মোক্তার বলেন, কোন্ ভাগটা নিবি রে ঝিঙে, ভেবেচিন্তে দেখ।

ঝিঙে গরম হয়ে বলে, বড় হয়েছি পিশেমশায়, ঝিঙে-ঝিঙে করবেন না। মলয়কুমার—

মোক্তার একগাল হেসে বলেন, বড় বুঝি এক্ষুনি হলি! কালও তো কতবার ঝিঙে বলে ডেকেছি।

বড়ভাই বলে, অতগুলো টাকা নগদ নগদ হাতে এসে গেল, বড় হতে তারপরে কি আর দেরি হয়? কিন্তু তোর পোশাকি নাম তো ষষ্ঠীকুমার, সাত জন্ম ধরে ভাবলেও বাবার মাথায় মলয়কুমার আসত না—

মেজভাই টিপ্পনী কাটে: নতুন সাবালক হয়ে মিষ্টি নাম নিল আর কি পছন্দ করে—

বড়ভাই বলে, তাই বুঝি? মলয়কুমার তবে নিতে গেলি কেন রে, ওর চেয়ে আরও মিষ্টি তো কত আছে! মিছরিকুমার, কিম্বা রসগোল্লাকুমার—

মোটের উপর ঝিঙে বলা চলবে না আর এখন বাবু মলয়কুমার আঢ্য।

টালিগঞ্জের একটা একতলা বাড়ি এবং আদিগঙ্গার তীরবর্তী মাটকোঠার মালিক সে এখন। মালিক হয়ে বস্তিতে আনা-যাওয়া বেড়ে গেছে খুব। আগে আসত ময়লা কাপড়ে খালি পায়ে, এখন সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতো মসমস করে। সেন্টের গন্ধে বাতাস ভরে যায়। পারুল হঠাৎ মা হয়ে গেছে তার—ভক্তিমান পুত্র যখন-তখন মা-মা করে পারুলের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসিরফিসির গুজুরগুজুর দুজনে। ভবিষ্যতের নানা মতলব—মাটকোঠা ভেঙে পাকাকোঠা হবে এখানে—আজেবাজে ঘুণে-খাওয়া ভাড়াটে গুলোকে দূর করে তাড়াবে।

একদিন বলল, তোমার ঘর আর পাশের ঐ জায়গাটুকু রানীর নামে লিখে দেব ভাবছি। ওকে রাজি করাও মা, আমি বলতে গেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

পারুল এতটুকু হয়ে বলে, আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ঐ রকম একগুঁয়ে বাবা, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না—

বড়ঘরের পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা ছোট্ট ঘরটা দেখিয়ে পারুল আবার বলে, বড় হয়ে গেছে তো এখন, ঐ পায়রাখোপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে মনমেজাজ আরও বিগড়ে যায়। সকলের দেখছে কত সাজানোগোছান ঘর—

এই জন্যে? মলয়কুমার দরাজ হয়ে বলে, সোজাসুজি বলতেই তো পারে। মন গুমরে থাকে কেন?

অতএব গোটা বস্তি ভেঙে দিয়ে দালান-কোঠা যেদিন হয় হবে, রাণীর পাকাঘর এখনই চাই। বিবেচক পিতৃদেব নগদ টাকা রেখে গেছেন—হতে অসুবিধাও নেই। মাটির উপরেই বা থাকবে কেন রানী, তার ঘর দোতলায়। নিচের তলায় পারুল, পাশ দিয়ে সিঁড়ি। রানী এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঘরের জানলা দিয়ে মায়ের মন্দির, আদিগঙ্গার পুল দেখা যায়। কত সুখ রানীর!

সেই সুখের ঘরে ক'টা দিন বসবাস করে রানী মরতে গেলে। রাতদুপুরে তোলপাড়।

ষোল

সাহেবকে আরো কয়েকটা দিন সোনাখালি থেকে যেতে হল। সুভদ্রা-বউ ছাড়তে চায় না : ছটফট কর কেন ঠাকুরপো ? বউ যেন তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে, তেমন ভাবখানা তোমার।

মুকুন্দ সেই সঙ্গে যোগ দেয় : আহা, থাকোই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই। যেমন রূপের দেহ, ভিতরেও মনটা তেমনি রূপময়।

আবার দীননাথ পাটোয়ারও বলে, ধানের ক'টা মোটা লেনদেন আছে। এদ্দিন রইলে তো আরও ক'টা দিন থাকো। কাজগুলো সারা করে মাইনে-পত্তোর চুকিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাও বাপধন। ধান নেবে না যখন, মাইনের সঙ্গে এক শলি ধানের দাম ধরে দেবো।

স্ফূর্তির চোটে সত্যি সত্যি নাচতে মন যায়। চলে যাচ্ছে সাহেব। গুরুপদর বাড়িটা একবার হয়ে যাবে, অনেক করে বলেছে। বাড়ি দূরবর্তী নয়, তিন-চার ক্রোশের ভিতরে। বিপদে আছে বেচারি তিলকপুরের সেই ব্যাপারটা নিয়ে। দারোগা বড় জ্বালাতন করেছে। লংকাকাণ্ড কবে হয়ে গেছে, আজও সেই লেজের আগুন নিভল না। সেই সমস্ত কথাবার্তাই হবে। এবং বউয়ের হাতের রান্না ভাত চাট্টি খাইয়ে দেবে বলেছে। অপূর্ব রাঁধে নাকি গুরুপদর বউ।

পথের মাঝখানে হঠাৎ বংশী। ফুলহাটা থেকে বোধহয় হেঁটে হেঁটেই আসছে। বংশী বলে, গুরুপদর কাছে যাচ্ছ তুমি ? বাড়ি যেতে হবে না, এতক্ষণে সে ঘাটে চলে গেছে। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কেমন রহস্যদৃষ্টিতে তাকায় : ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছি। সাহেবকে যদি পাওয়া যেত ! অনেক করে চেয়েছিলাম, মা-কালী তাই মিলিয়ে দিলেন। চলো—

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কোথায় ?

ঘাটে। গুরুপদ সেখানে। আর একজনের সঙ্গে চেনা হবে—ধোনাই মিস্ত্রি। দেখনি তুমি তাকে, কাজের মানুষ।

বংশীর সাজ-পোশাকে বড় বাহার। সাহেব বলে, তুমিই যে সেই বংশী, চিনতে পারিনে। বলি, এ আমাদের সাঙাত বংশী নয়, কোন বড়মানুষের বেটা, বড় দরের লোক বংশীধরবাবু।

বংশী হেসে বলে, নেমন্তন্নে যাচ্ছি, বাবু না হয়ে কি করি ! জাঁকজমকের বিয়ে, আমরা সব বরযাত্রী। গুরুপদ ধোনাই আর আমি তিনজন ছিলাম, তোমায় নিয়ে গণ্ডা পুরল।

সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরেছে। টেনেই নিয়ে যায়। ছাড়ানোর চেষ্টা করে সাহেব বলে, আচ্ছা পাগল ! বিয়েবাড়ি গন্ধে গন্ধে গিয়ে উঠব ? মানুষ আজকাল ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে, ভোরের সময় তক্কেতক্কে থাকে। বিনি-নেমন্তন্নে গিয়ে বসলে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দেবে।

ঘাট অদূরে, দু-পা যেতেই পৌঁছে গেল। সেই লোকটা—ধোনাই মিস্ত্রি, অপেক্ষা করছে। বলে, নৌকো এ ঘাটে পাওয়া গেল না বংশী। গুরুপদ বরুইতলার ঘাটে গেছে। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে—

সাহেব জিজ্ঞাসা করে : নেমন্তন্ন কোথায় বংশী ?

মামুদ আলি মোল্লার ছেলের বিয়ে।

বংশীর সঙ্গে ধোনাই-এর চোখাচোখি হল। বুঝে নিয়ে ধোনাই একগাল হেসে ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয় : গ্রাম মাদুরপলতা। বুড়িভদ্রা থেকে তেথরার খাল নেমে গেছে, সেইখানটা।

সাহেব চমকে ওঠে : ওরে বাবা !

বংশী অভয় দিয়ে বলে, নৌকোয় যাচ্ছি, বাবা বলবার কি হল গো ? বিয়ে বাড়ির রশিখানেক আগে নেমে গুটগুট করে গিয়ে উঠবে।

অতএব বরুইতলার ঘাটে চলেছে। যেতে যেতে কথাবার্তা। ধোনাই মিস্ত্রি বলছে, ভাল অবস্থা করে ফেলেছে মামুদ আলি। নতুন দালান দিচ্ছে। বড়দলের হাটে গিয়ে বিয়ের বাজার করল, হাটবেসাতি দেখে-যত লোকের তাক লেগে যায়।

মিটিমিটি হেসে বংশী বলে, জাতের বায়নাক্কা নেই আমাদের, কে হিন্দু কে মুসলমান বুঝিনে। সব বাড়ি যাই আমরা। আয়োজন ভাল থাকলেই হল, নেমতন্ন লাগে না।

ব্যাপার বুঝতে সাহেবের বাকি নেই। হাসাহাসি চলছে তো চলতে থাকুক তাই এখন। নৌকো পেয়ে ভালই হল—গুরুপদর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফুল-হাটায় বলাধিকারীর কাছে যাবার মতলব। মাদুরপলতার মাঝপথে নেমে গেলে অনেক কম হাঁটতে হবে।

বরুইতলা এসে গেল। দূর থেকে গুরুপদকে দেখা যায়। ঘুরছে ঘাটের এমুড়ো-ওমুড়ো—ঘুরেই বেড়াচ্ছে। মাঝি-দাঁড়ি কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই, চুপচাপ ঘুরছে। এদের দেখে দ্রুতপদে কাছে এলো।

সাহেব পুলকিত স্বরে বলে, ওস্তাদের সঙ্গে কাজকর্ম সারা হয়ে গেল তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। চলে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম গুরুপদ।

গুরুপদর জবাবের আগেই বংশী প্রশ্ন করে: নৌকোর কি হল?

না, এখানেও নেই।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, কোথায় তবে?

নৌকোর ভার গুরুপদর উপরে। সে বলে, আছে, কোথাও না কোথাও। ঠিক বের করে ফেলব। বলি ঘোঁড়া নও তো কেউ। বাবুভেয়ে মানুষও নও। তবে আর কি! দাসপাড়ার ঘাটে যাই এবারে।

ঘোরাঘুরি হল দাসপাড়ার ঘাটে। সেখানেও নেই।

হাঁসখালি গিয়েই দেখা যাক তবে?

সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, নৌকো ঠিক করেছ—সে নৌকো কোথায় থাকবে, মাঝির সঙ্গে বলাকওয়া নেই? হেঁটেই তো এতক্ষণে প্রায় মাদুরপলতায় পৌঁছানো যেত।

কয়েকটা গাঁয়ে আরও কতকগুলো ঘাট ঘুরে মিলল অবশেষে নৌকো। জেলেডিঙি ডাঙার সঙ্গে কাছি-করা—মানুষজন নেই, বোঠে রয়েছে। অর্থাৎ ডিঙি বেঁধে কাছকাছি কোন একখানে গিয়েছে।

সর্বশেষ মানুষ গুরুপদ জোরে ধাক্কা দিয়ে ডিঙি স্রোতের মুখে ফেলল। জল ঝাঁপিয়ে নিজেও উঠে পড়ে। একটা বোঠে নিজে তুলে নিয়ে তাড়া দেয়: হাত-পা কোলে করে রইল সব? বোঠে ধরো, জোরে জোরে মারো—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, রাতদুপুর নেমন্তন্ন, তাড়াতাড়ির কি আছে?

গুরুপদ বলে, না, টিকিয়ে টিকিয়ে চলো তবে। ধরতে পারলে জেলেরা ডাঙায় নামিয়ে নিয়ে পূজো করবে!

সাহেব ভয়ের ভঙ্গি করে বলে, বল কি গো—অ্যাঁ, ভালমানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছি—খাতির করে এমনি নৌকোয় এনে তুললে। তোমার মাতব্বরিতে বড় ভয় গুরুপদ, সেই তিলকপুরের মতন না হয়।

যেমন বিয়ে তার তেমনি মন্তোর। বংশী দাঁত বের করে হাসে: দানধ্যান তীর্থিধম্মের মাঝে তো যাচ্ছিনে যে নৌকোর ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দশের আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেরুব।

গুরুপদ বলে, মবলগ খরচ সামনে। খামোকা কেন টাকা দিয়ে নৌকো-ভাড়া করতে যাই? এক একটা পয়সা এখন বাপের হাড় আমাদের কাছে।

সাঁ-সাঁ করে ডিঙি চলেছে। সাহেব বলে, আমি তোমাদের নেমন্তন্নে যাচ্ছিনে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে যাব, সেখান থেকে হয়তো বা দেশেঘরে

একবার। আবার কবে দেখা হবে—দু-চারটে কথাবার্তার জন্য নৌকোয় উঠেছি। নৌকো ওপারে নিয়ে ধরবে, নেমে চলে যাব।

বংশী ঘাড় নেড়ে বলে, মাইরি আর কি! একবার যখন তুলতে পেরেছি, ছাড়াছাড়ি নেই।

সাহেব কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে যাব তা হলে সেটা তো ঠেকাতে পারছ না।

সাহেবের মনেপ্রাণে আপত্তি। বলাধিকারীকে বলেকয়ে যাবে চলে কালীঘাট। সুধামুখীকে দেখে আসবে। আর রানীকে। মন বড় টেনেছে। কিন্তু সকলের বেশি দরকার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসা। ইষ্টদেবী কালিকা। তার মধ্যে প্রধান হলেন কালীঘাটের দক্ষিণাকালী, আর বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্য-বাসিনী। কাজকর্মে হাত লাগানো কালীক্ষেত্রে পুজো চড়িয়ে আসার পর।

সাহেব বলে, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—এমন হয় না। তৈরি-টৈরি হয়ে আসি আগে—তার পরে।

বংশী মিনতি করে বলে, এইবারটা মান রাখো ভাই সাহেব। বিয়ে-বাড়িটা সেরে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। ধোনাইয়ের সাচ্চা খবর, এক বাড়িতেই কাজ হয়ে যাবে। নইলে প্রাণে মারা পড়ব আমরা।

মামুদ আলির বাড়ি না গেলে এরা মারা পড়বে—জিনিসটা মাথায় ঢোকে না। সাহেব অবাক হয়ে তাকাল।

বংশী বলে চলেছে, বউটা বরাবরই খ্যাচর-খ্যাচর করে। হালফিল আবার ছেলের মা হয়ে পাগলা হয়ে গেছে একেবারে। ছেলেমেয়ে তিন তিনটে গিয়ে ঐ একগুঁড়ো। সেই বাচ্চার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করিয়ে নিল—অসৎ কাজে আর নয়, ভাল হয়ে থাকব। ছিলামও ভাল। কাজের কথা কেউ বলতে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিব্যি আমায় রাখতে দিল না। নেমন্তন্নের নাম করে বউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। সাজ-পোশাকের বোঝা সেইজন্য আরো বেশি করে চাপাতে হল। মোটে যাতে সন্দেহ না হয়।

কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বংশী বলে, জীবনে আর অসৎ পথ মাড়াব না ঠিক করেছিলাম। চাষবাস করব, খেটেখুটে গরিব ভাবে থাকব। হতে দেবে তাই? গরলগাছির দারোগা থানার উপর ডাকিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলে দিল। বয়স হয়েছে, চাকরি ছাড়বে এইবার, দেশের বাড়ি দালানকোঠা তুলে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে। শেষ কামড় সেই বাবদে—আমার নাম ধরেছে এক-শ টাকা। কত কান্নাকাটি করলাম—এক-শ'র একটা টাকা মাপ হল না। চাষবাস করে ফালতু এক-শ কোথায় পাই।

সময়ও সংক্ষেপ—নতুন ফসল ওঠা অবধি সবুর মানবে না। তড়িঘড়ি আদায় দিতে হবে।

খোনাই বলে, আমার নামে দশ। জন-পনেরোর এমনি দশ করে ধরেছে। বংশীর মতন দাগি নই, ধরাছোঁওয়া পাচ্ছে না, সেইজন্য সস্তা। ছিলাম না দাগি, কিন্তু কদ্দিন আর? দাগি না হলে হক-না-হক ট্যাক্স ধরতে পারে না যে!

গুরুপদ বলে, আমারও এক-শ। এক কাজের কাজি বলে বংশীর আর আমার এক অঙ্ক। সেই যে তিলকপুরের গন্ধ আমাদের দু-জনের গায়ে। তুমি বেঁচে গেছ সাহেব, বিদেশি মানুষ বলে তোমার নিশানা পায়নি।

সাহেব আর জেদ করে না। দারোগা নিশানা না পেলেও তিলকপুরের দায়-দায়িত্ব-নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার উপরে বংশীর এই হাত-ধরাধরি ও চোখের জল। তুষ্টুরাম ফাটকে গেছে, বংশী আর গুরুপদর নাম সে-ই নাকি ফাঁস করে দিয়েছে।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, তুষ্টু এমন কাজ করল? তারই জন্যে তো যাওয়া। ঢিল মেরে তার কপাল ফাটানোর শোধ তুলব—মনে মনে আমার ছিল সেই মতলব।

থানায় বংশীকে ডাকিয়ে বুড়ো-দারোগা কথা আদায়ের কায়দাটা খোলাখুলি বলে দিলেন—সন্দেহের কিছু নেই। বাহাদুরি জাহির করে বললেন, চাকরি শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আর বলতে বাধা কি! কতরকম মাথা খেলাতে হয়—তোদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তোদের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের।

তুষ্টুরাম এবং ভিন্ন ভিন্ন কেসের আরও তিন-চারটে আসামি এক লক-আপে। মামুলি কায়দাকানুন করে দেখা হয়েছে—কাজ হল না। তখন দারোগার নিজের আবিষ্কার, অব্যর্থ মুষ্টিযোগ—

রাত্রিবেলা, বাইরের লোকজন একটিও আর থানায় নেই। লক-আপের তালা খুলে সিপাহিসহ দারোগা নিজে এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: চুনের ঘরে নিয়ে যাও ওটাকে।

যার দিকে আঙুল তুললেন, সে মানুষ তুষ্টুরাম নয়। তুষ্টুর চোখের উপরে সেই আসামিকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল।

নাম চুনের ঘর, কিন্তু এক কণিকা চুন নেই। আসামির পেটের ভিতরে কথা আদায় হয় সেখানে। একসময় রেওয়াজ ছিল—চুনের বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে বেঁধে রাখত, নিশ্বাসের সঙ্গে চুন উঠে নাক-মুখ বোঝাই হয়ে যেত। এখন ঢের

বেশি ফলপ্রদ পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেকালের চুনের বস্তা বাঁধা বাতিল। ঘরের কেবল সেই পুরানো নামটা রয়েছে।

হুকুম দিলেন : চুনের ঘরে নিয়ে যন্ত্রআত্তি চালাওগে। নরম হয়ে এলে খবর পাঠিও।

বলে দারোগা সম্ভবত বিশেষ কোন জরুরি কাজে বসে গেলেন। যন্ত্রআত্তি শুরু হয়েছে ওদিকে। সেই যন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ কানে এসে লক-আপের ভিতর তুষ্টুরামের রক্ত হিম হয়ে যায়। দমাদম লাঠি পড়ছে আসামির বেওয়ারিশ দেহটার উপর। লাঠি চার-পাঁচখানা অন্তত—তেমনিধারা আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে বাবা রে, মা রে—প্রাণান্তক চিৎকার। তারপর সমস্ত চুপচাপ। ক্ষণ পরে সিপাহির ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায় : বড়বাবু, নড়েচড়ে না যে—

সে কি রে ?

চটি ফটফট করে ছুটলেন দারোগা চুনের ঘরে : কী সর্বনাশ, একেবারে শেষ করে দিয়েছিস ?

সিপাহি বলে, পাঁচ হাতের কাজ, পাঁচজনে পাঁচ দিক থেকে পিটেছে—সকলে হাতের ওজন রাখতে পারে না। এখন কি হবে, বলুন বড়বাবু।

হবে কচু ! মাকড় মারলে ধোকড় হবে। ঠিক ঠিক মরে থাকে তো কুয়ো-সই করে দে, আবার কি ! ও-মাসেও তো হয়েছিল একটা।

সুস্পষ্ট অবিচল কণ্ঠ—রাত্রির নৈঃশব্দে প্রতিটি শব্দ তুষ্টুরামের কানে আসছে। পরক্ষণেই কুয়োর মধ্যে ঝপ করে একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ।

দারোগার পরবর্তী হুকুম : চোর বেটাকে নিয়ে আয় এবারে। ওটাকেও শেষ করা হোক, কে আবার আদালতের হাঙ্গামায় যাবে !

খুন করার পরেই মানুষের নাকি খুনে পেয়ে যায় কখনো কখনো। ক্রমাগত খুন করে যেতে ইচ্ছে করে। দারোগার তাই হয়েছে। এবারে তুষ্টুরামের পালা।

চুনের ঘরে তুষ্টুরামকে নিয়ে এলো, দুপাশে দুই সিপাহি বজ্রমুষ্টিতে হাত এঁটে ধরেছে।

তিলকপুরে তোর সঙ্গে কে কে ছিল ? বাঁচতে চাস তো বল্ খুলে সমস্ত—

বুড়ো-দারোগা বংশীকে বলেন, আর হেসে খুন হন। অনেক কাল আগেকার আরও এক ঘটনা বললেন তিনি। ঠিক এইরকম ব্যাপার। সদরের নিকটবর্তী পাইকগাছা থানায় তখন তিনি। সদরে বেনামি চিঠি গেল, দারোগা অমুক আসামিকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অপস্তি সাহেব সেই সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। সে লোকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

থানার একটা বড় দাঙ্গার ব্যাপারে সাহেব সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন, পাইকগাছার ঘাটে বোট বেঁধে হঠাৎ নেমে পড়লেন। দারোগাকে বলেন, অমুক গ্রামের অমুক মানুষটাকে খুন করে লাস গুম করেছ তুমি—

দারোগা হাসিমুখে সহজভাবে বললেন, এবেলাটা দয়া করে ঘাটে থাকতে আজ্ঞা হয় হুজুর, বিকালে জবাব দেবো।

জমাদার ঘোড়া নিয়ে ছুটল। গ্রাম থেকে মানুষটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে থানায় এনে হাজির করল।

দারোগা বললেন, এই লোক হুজুর, যাকে আমি খুন করে গাঙে ভাসিয়েছিলাম।

মানুষটা কসম খেয়ে বলে, খুনের কথা কি হুজুর, আমার গায়ে একটা আঙুল ঠেকায় নি কেউ। নির্দোষ বুঝে বড়বাবু একপেট খাইয়ে থানা থেকে ছেড়ে ছিলেন, পরমানন্দে সেই থেকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি।

খলখল করে হেসে বুড়ো-দারোগা এবার বংশীর কাছে রহস্যভেদ করেন: বুঝলে না? বস্তার মধ্যে খড়, চার-পাঁচজনে খড়ের বস্তায় লাঠি পেটাত। চেঁচামেচি কান্নাকাটি করত চৌকিদার একজন—বিস্তর মহলা দিয়ে তাকে শেখানো। তারপরে কুয়োর জলে ভারা জিনিস কিছু ফেলে দেওয়া। যাত্রার পালায় করে, তেমনি জিনিস আর কি!

ধাপ্পায় পড়ে বোকারাম তুষ্টু নাম বলে ফেলেছে, তাকে দোষ দিয়ে আর কি হবে? এইবারে দারোগা এদের সব নিয়ে পড়লেন। তিলকপুরের অপরাধী বংশী ও গুরুপদ মাত্র নয়—গোটা এলাকা ধরে টানাটানি। দশধারা রুজু হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির একশ-দশ ধারা অনুযায়ী মামলা—চলতি কথায় দশধারা। ষোলআনা সাচ্চা আর কটা মানুষ—দায়ে-দরকারে ঘটিটা কি কুড়ালখানা কিম্বা পরের ক্ষেতের কলা-কচু সবাই নিয়ে থাকে। কোন কারণে দারোগা বিগড়াল তো দিল এক দশধারা ঠুকে। অমুক অমুক লোকের রীতি-প্রকৃতি খারাপ, খাওয়া-পরা চালানোর কোন সাধু পন্থা নজরে পড়ে না—এমনিধারা সন্দেহের উপর মামলা। দেশসুদ্ধ মানুষ সাক্ষি। শীতকালে হাকিমরা মফস্বলে বেরোন, মামলার শুনানি সেই সময়—গাঁয়ের উপর কোন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। জগৎবেড় জালে দিল তো সকলকে জড়িয়ে, যে পারে সে তদ্বির করে বেরিয়ে যাক। তদ্বির ঐ দারোগারই কাছে—নোট গুণে এবং টাকা বাজিয়ে তদ্বির করে এসো। যেমন এবারে বংশীর তদ্বির সাব্যস্ত হয়েছে এক-শ টাকা, ধোনাই মিস্ত্রির দশ। তদ্বির সারা হলে আসামির লিষ্টি থেকে

নাম তুলে নেবে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, সাক্ষিদের উল্টোপাল্টা বলিয়ে বেকসুর খালাস আদায় করে আনবে হাকিমের কাছ থেকে। পাকা কোঠা-বাড়ি বানানোর খরচা সামান্য নয়—শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ-ষাটটা নাম জড়াতে হয়েছে এবার।

বোঠে ফেলে বংশী খপ করে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে : মাকালীর দিব্যি করে বলছি, মামলা ঠেকাতে যা লাগে তার উপরে সিকি পয়সার লোভ করব না। পুরো এক-শ টাকাও চাচ্ছি নে আমি। তিন বিঘে ধানজমি আর গাইগরুটার খদ্দের দেখে এসেছি। তাতে অর্ধেক আন্দাজ উঠবে। গুরুপদও ধারকর্য করে কতক জোগাড় করে ফেলেছে। সবসুদ্ধ মোটের উপর শ-দেড়েক হলেই আমাদের হয়ে যাবে। তার উপরে যত কিছু তোমার। এই চুক্তি—মাগুনা খাটাতে যাব কেন বলো।

বংশী বোঠে মারে, আর বিড়বিড় করে দুঃখের কথা শোনায়। গাইগরু বিক্রির বন্দোবস্ত করে এসেছে। আট আনা মূল্যে এইটুকু এক ফুলেবাছুর কিনে অনেক যত্নে এত বড়টা করল। বয়স হয়ে গিয়ে গাবিন হয় না, আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে এইবারে প্রথম বাছুর হল। বংশীর বউ বলে, হয়েছে আমার ব্যাচ্চার কপালে—বাচ্চাছেলে দুধ খাবে বলেই গুরুর দেবতা মাণিকপীর এতকাল বাদে বাছুর দিলেন। ঘরের গাইয়ের দুধ পেয়ে বলতে নেই, ছেলে বেশ ইয়ে মতন হয়েছে। বাচ্চার ভরপেট হয়ে এক-একদিন বাপের পাত অবধি দুধ এসে পড়ে। গাই-বিক্রির কথা বউকে ঘুণাক্ষরে জানানো যাবে না। কৌশলটা সে ভেবে রেখেছে। গাঁয়ের বাইরে কোনখানে গরু বেঁধে আসবে, সন্ধ্যার পর গরুর দড়ি খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে। গরু ফিরছে না—বউ জানবে হারিয়ে গেছে। কার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল, ধরে নিয়ে খোয়াড়ে দিয়েছে। লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজিও হবে কয়েকটা দিন—মনে মনে বংশী সমস্ত ছকে রেখেছে।

গুরুপদ হঠাৎ গর্জে উঠল : ঐ যে থানায় থানায় দারোগা-জমাদার পুষে রেখেছে, ওরাই মানুষকে ভাল থাকতে দেবে না। ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। ওদের বিদায় করুক, চুরি-ছ্যাচড়ামি দেখো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলছ তুমি ঢালির পো ! সরল মানুষ ধোনাই মিস্ত্রি ঘোরপ্যাচের কথা বোঝে না। বলে, দারোগা পোষে তো চোর ঠেকানোর জন্যেই—

গুরুপদ বলে, আর দারোগা চোর পোষে চাকরি ঠেকানোর জন্য। তালুক-গাঁতি কিনবার জন্য, দালান-কোঠা দেবার জন্য। চোরের অনটন পড়ল চাপ দিয়ে ভাল গৃহস্থকে চোর বানিয়ে নেয়।

আঘাটায় ডিঙি বেঁধেছে, গাঁ নিশুতি হবে সেই অপেক্ষায় আছে। আহা-মরি কী চমৎকার রাত্রি! কৃষ্ণপক্ষ, তার উপর মেঘ থমথম করছে আকাশে। কোন দিকে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। গরমকালে হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা পড়ে যায়, তেমনি রাত্রি কাজকর্মের পক্ষে প্রশস্ত। মানুষ শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়বে। সে বড় গাঢ় ঘুম—মরণের দোসর। এমনি রাত্রে যে কারিগর ঘরে বসে থাকে, ওস্তাদের শাপশাপান্ত আছে: সেই অপদার্থ কাঠি ফেলে কলম ধরে কেন বাবু হয়ে যায় না?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে গায়ে। ধোনাই মিস্ত্রি সকলকে মক্কেলের বাড়ি হাজির করে দিল। মামুদ আলি লোকটা সত্যি পয়সা করেছে। চাষীর হাতে পয়সা এলে পর পর চার লক্ষণে প্রকাশ পাবে। উৎকৃষ্ট হালবলদ সর্বাগ্রে—সে এমন, কাজ ফেলে মাঠের যত চাষী আসবে বলদের গায়ে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতে। বলদ হল তো ঘোড়া—হেঁটে বেড়ানো পোষাচ্ছে না আর তখন, ঘোড়ার পিঠে গমনাগমন। ঘোড়ার পরে বউ—একটা সকলেরই থাকে, কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বিয়ে বা নিকে করে যাও যতগুলো সম্ভব। এবং সর্বশেষ পাকাদালান। মামুদ আলির চার দফাই হয়ে গেল। দালান দিয়েছে—একতলায় শেষ নয়, ছাদের উপরে দোতলার ঘর। সম্পূর্ণ হয়নি, দরজা-জানলা ও পলস্তারার কাজ বাকি। হতে হতে বিয়ে এসে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ এখন দিনকতক। সিঁড়ি বাইরের দিকে, তারও ইটগুলো মাত্র বসানো হয়েছে। উঠতে পারা যায় এই পর্যন্ত। ধোনাই মিস্ত্রি গাঁথনির কাজে জোগাড় দিত, বাড়ির অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।

বংশী অবাক হয়ে বলে, কী বিয়েবাড়ি রে বাবা! দেড় পহর হতে না হতে আলো নেভানো। ভেবেছিলাম, কতক্ষণ না নজর ধরে বসে থাকতে হয়।

ধোনাই বলে ছেলের বিয়ে যে! দুপুরবেলা বর নিয়ে সব মেয়ের বাড়ি রওনা হয়ে গেছে। বউ এসে পড়বার পর তখনই এবাড়ি বাজনা-বাদ্যি হৈ-হল্লা খানাপিনা। অঢেল আয়োজন করেছে, পাঁচ-সাত গাঁয়ের স্বজাত ভিনজাত আত্মীয় কুটুম্ব সকলের নেমন্তন্ন।

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে: রাতের কুটুম আমাদের ভোজ সকল কুটুম্বের আগে—

ভাঁড়ার উপরের ঘরে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে সেখানে এনে রেখেছে। ওস্তাদ বলেন, আগে বেরুনো, পরে ঢোকা। মানে হল, ঢোকবার আগে বেরুনোর বন্দোবস্তটা নিখুঁত হয় যেন। দোতলায় উঠবার নামে তা-বড় তা-বড় কাড়িগরও আঁতকে ওঠে। কিন্তু সাহেব বেপরোয়া—অন্তত আজকের

এই দিনটা। সাঙাতের কথায় এসেছে—তাদেরই কাজ। বংশীর আবার এ-কথাতেও আপত্তি : আমাদের কাজ হল কিসে ? কাজটা বুড়ো-দারোগার—তাঁরই দালানকোঠা হবে। ধরতে পারলে নিয়ে তুলবে তাঁরই কাছে তো—তিনি কি আর বিবেচনা করবেন না ?

কিন্তু হলে হবে কি—সিঁড়ির উপর মানুষ শুয়ে আছে আড় হয়ে। তাতে কি ডরায় ! 'চলনে বিড়াল, সরে পড়ায় সাপ'। ছুটো সিঁড়ি বাদ দিয়ে পুনশ্চ একজন। তাকেও পার হল। আরও কিছু গিয়ে চাতালের উপর একগাদা মানুষ পাশাপাশি। কাজের বাড়ি মানুষ অনেক জমেছে। বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জায়গার অভাবে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়েবে। এত ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব—হনুমান না হলে হয় না। বেকুব হয়ে ফিরতে হল। খানিক দূরে এসে দেখে ধোনাই মিস্ত্রি নেই। যায় কোথা ধোনাইটা আচমকা এমন দল ছেড়ে ?

বৃষ্টি তেমনি লেগেছে। টিপটিপ করে পড়ছিল—মুষলধারে এলো। ভিজে জবজবে। অনতিদূরে গোয়ালবাড়ি কাদের। একদৌড়ে ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

বংশী সাহেবের গা টেপে : ভিতরে মানুষ।

গোয়াল লোকে যেমন-তেমন করে ঘেরে, গরু না বেরুলেই হল। মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল দিয়ে গেছে। আগুন গনগন করছে। সেই আগুন ঘিরে বসে ক'জনে হাত-পা সেঁকছে।

হেন ক্ষেত্রে টিপি টিপি সরে পড়া উচিত। কিন্তু সাহেবকে বজ্জাতি-বুদ্ধিতে পেয়ে বসল—হাঁক দিয়ে ওঠে : কারা ওখানে ?

বংশী সন্ত্রস্ত হয়ে হাত টানছে পালাবার জন্য। সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যে নেয় না।

কি করো তোমরা ?

মিনমিনে গলায় জবাব আসে : খোলাট পাহারা দিচ্ছি।

সত্যি বটে, গোয়ালের ওদিকটায় গোলা, ধান তোলার খোলাট। গলার স্বর আরও চড়িয়ে সাহেব ধমক দেয় : কে পাঠাল তোমাদের পাহারা দিতে ? এসো, এদিকে চলে এসো, দেখে নিই—

লোকগুলো একলাফে উঠে পড়ে দৌড়।

সাহেব হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, দেখলে, আমি কেমন বুঝতে পারি। আমরাই মজা করে হাত-পা সেঁকি এবার। বাদলা রাতে ওরাও কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

বংশী তিক্তস্বরে বলে, বেরিয়েছে ও দারোগার ঠেলায়—আমি দিব্যি করে বলতে পারি। এলাকা জুড়ে জাল বেড় দিয়েছে। মুখ ঢেকে পালাল, নয়তো

ঠিক চেনা মানুষ বেরুত। একই দশধারা মামলার আসামী। ঘাটটা নাম জড়িয়েছে, কেউ কি বাদ আছে এবারে ?

গনগনে আগুন দেখে গুরুপদর তামাকের পিপাসা পেয়ে গেছে। বলে, কলকে-তামাক পেলে ছু-টান টেনে নিতাম, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে গো—

ডিঙিতে ফিরে দেখল, ধোনাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। গুরুপদ সর্বাগ্রে নারিকেলখোসার হুড়ি পাকাতে লেগে যায়। তামাক টেনে চাঙ্গা না হয়ে বোঠেয় সে হাত দিচ্ছে না।

বংশী ধোনাইকে প্রশ্ন করে : ডুব মেরেছিলে কোথা ?

বোঠের গায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে ধোনাই বলে, চিল পড়লে কুটোগাছটি না নিয়ে ওঠে না। সেই নিয়ম আমার, খালি হাতে ফিরিনে।

একটা চটের থলি পা দিয়ে ঠেলে দিল। হাত ঢুকাল বংশী—আর দু-জন পরমাগ্রহে চেয়ে রয়েছে। বেরুচ্ছে একে একে হাত-করাত, বাটালি, রেঁদা, আগর, সরকালি—মামুদ আলির নতুন দালানে ছুতোরমিস্ত্রি কাজ করে, কাজের শেষে যন্ত্রপাতি থলি ভরে রেখে যায়। পুরানো ক্ষয়া জিনিষ, রোজ রোজ ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মতন কিছু নয়। অন্য বমাল না পেয়ে ঐ ছুতোরের থলিতে ধোনাই-এর নজর গিয়ে পড়ল।

খান দুই বাঁক এগিয়ে ধোনাই আবার এক কাণ্ড করে। পাশখালির মোহানায় জেলেডিঙি বাঁধা। ভাঁটা লাগলে জাল ধরবে, ততক্ষণ জেলেরা সুখ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হেসো-দা দিয়ে ধোনাই কাছিতে দিল পোঁচ। বনবন করে নৌকো পাক খাচ্ছে, লোকগুলো তবু জাগে না। চৈত্রের গাজনে চড়ক-গাছে ঘুরছে, তেমনি একটা কিছু ভাবছে হয়তো। গুড়োর উপর বেউটিজাল—জালগাছি তুলে নিয়ে ধোনাই জেলেডিঙিতে সজোরে ধাক্কা দিল। চলে যাক মাঝ-গাঙের দুরন্ত টানে। এখন জেগে পড়লেও ঐ টান কাটিয়ে পিছু নিতে পারবে না।

সাহেব রাগ করে ওঠে : জাল ওদের ভাতভিত্তি, সেই জিনিস নিয়ে নিলে তুমি ?

ধোনাই হি-হি করে হাসে : বেঁচেবর্তে সুভালাভালি ঘরে ফিরলে তবে তো ভাত ! সে আর হচ্ছে না। ডুবে মরবে দ'য়ে পড়ে, ডুবে গিয়ে তবে যদি ঘুম ভাঙে !

হুঁকো চলছে হাতে হাতে। দু-চার টান টেনে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে নেবার গরজ। ধোনাই সাহেবের দিকে হাত বাড়ায় : আমায় দাও—

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে সাহেব তার দিকে দিল: হুঁকো পাবে না, ছোটজাত তুমি—

সাহেব জাত-জাত করছে—আর দু-জন অবাক হয়ে গেছে। সেই সাহেব, একদিন যে তুষ্টু ডোমকে হিড়-হিড় করে দাওয়ার উপর তুলেছিল। গুরুপদ বলে কাজের মধ্যে জাত-বেজাতী কী আবার! ও জিনিস গাঁয়ে ধরে ফেলে এসেছি। ঘরে ফিরে গেরস্ত-মানুষ হয়ে কোঁপর-দালালি করব—সেই সময় তুলে নেবো।

সাহেব বলে, জাত কাজের মধ্যেও আছে। গরিব মেরে ছ্যাঁচড়া কাজকর্ম—সেই দিকে ধোনাই মিস্ত্রির ঝোঁক। ছুতোরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে আনল, জেলের জাল নিল। আমরা চোর, ধোনাই ছিঁচকে। ঘটিচোর বাটিচোর সেই দলের। হুঁকো দিলে জল মরে যাবে, জল বদলে ফেলতে হবে।

কলকে স্পর্শ করে না ধোনাই। দুঃখ পেয়েছে, মুখ ফিরিয়ে ঝপাঝপ বোঠে মারছে। বংশী তার হয়ে বলে উঠে: বেশ করেছে ধোনাই। গরিব না মেরে লাখপতি কোটিপতি পাই কোথা এখন? মামুদ আলিকে মনে করে এলাম, সে লোক তো কেঁসে গেল। খালি হাতে ফেরার চেয়ে পাঁচটা টাকাও যদি আসে, খানিক তবু এগোল। তোমার নিজের কিছু নয়—ফাঁকে ফাঁকে আছ, দয়া করতে এসেছ, আমাদের দায়টা কেমন করে তুমি বুঝবে?

আগের কথার খেই ধরে বংশী আবার বলছে, পাঁচ টাকা না হয়ে পাঁচ সিকে হলেই বা কে দেয়? এক-একটা দিন চলে যায় মাথায় যেন একটা করে মুগুরের ঘা দিয়ে। মাথার উপর দশধারা যদি না ঝুলত, হীরামাণিক মাঠে পড়ে শুকোলেও বাচ্চা ফেলে ঘর থেকে বেরুতাম না। কী বলব সাহেব—কুটুম্ববাড়ি গিয়েও এখন ফালুক-ফালুক করি। চুল আঁচড়াতে চিরুনি দিয়েছে, সেটাও পকেটে ফেললাম। এক-শ টাকার কোন না এক আনার পয়সা উশুল হয়ে আসবে।

মা-কালীকে কাতর হয়ে ডাকছে: চলনসই একটা ঘর জুটিয়ে দাও মাগো। তারপর কে আর কাক-চিলের মতন ঠোকর দিয়ে দিয়ে বেড়ায়! আর দশটা গৃহস্থের মতো আমরাও বাড়ি গিয়ে উঠল।

চোর-ডাকাত-ঠগীর ইষ্টদেবী কালিকা-ঠাকরুন নিজে নাকি অদর্শন থেকে ভক্তদলের কাজকর্মের চালনা করেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারে দেবীর চাড় দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রাত পেয়ে তিনিই বা ঘুমিয়ে পড়লেন!

আরও কয়েকটা জায়গায় নামল তারা ডিঙি থেকে। আশায় আশায় এগিয়ে যায়। এক উঠানে পা দিয়েছে কি, সাহেবের পিঠে যেন চাবুক পড়ে।

এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো—। হাতের কাছে যাকে পেল, তাকেও টেনে বের করে আনে।

সকলে হকচকিয়ে গেছে। বংশী বলে, ভয় পেলে কেন সাহেব?

গৃহস্থ জেগে পড়লে টের পেতে মজা।

সে তো সব গৃহস্থ রে। কে কবে আমাদের ফুলচন্দন দিয়ে ডাকাডাকি করে?

সাহেব বলে, এরা তাই করত। আসতে আজ্ঞা হয় চোরমশায়রা। এসেই যখন পড়েছেন, দান করে যান কিছু।

কথা বড় মিছা নয়। বড়লোক ক'জন—দুনিয়াই তো এরা সব। দিনমানে দশের মাঝে অত বোঝা যায় না—বুঝতে দেয় না মানুষে, ঢেকেঢুকে সেরে-সামলে বেড়ায়। রাত্রিবেলা আপন জনদের ভিতর খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ কথাবার্তা অসাবধান—নিরাবরণ। ঈশ্বরের খবর জানি নে, কিন্তু চোরের কাছে আসল অবস্থা চাপা থাকে না।

গাঙে-খালে অকারণ ঘুরে ঘুরে মন ভারী সকলের। সাহেবই কেবল হাসিখুশি। তার কিছু খারাপ লাগছে না। এক সময় বলে উঠল, হারুন-অল-রশিদ ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তাঁরই মতন হল। উজির-নাজির নিয়ে ছদ্মবেশে সারারাত ঘুরে প্রজাপাটকের খবর নিতেন। আমাদেরও তাই কিনা, বলো ভেবে? এই যত দেখছি, প্রজাপাটক আমাদের। দিনমানে ভিন্ন রাজা—রাত্তির নিশুতি হলে মুলুক জুড়ে আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। যেখানে খুশি যাই—ত্যাঁদোড় প্রজারা নিজের ইচ্ছেয় দেবে না তো রাজকর ইচ্ছে মতো নিজের হাতে তুলে নিয়ে আসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে, যত প্রজা এই দেখে এলাম—নিতে পারা গেল না তো দিয়ে আসাই উচিত। শুধুই নিলে রাজার রাজত্ব থাকে না, দিতে হয় অবস্থাবিশেষে। ভাল ভাল মুরুব্বি চোর দিতেন সেকালে। অপহারবর্মনের কথা ওঠে—চুরি করতেন তিনি গরিবকে ধনী, আর ধনীকে গরিব করবার জন্য। এক রকমের গুঁটিখেলা আর কি—ফাঁকি দিয়ে চিৎ-গুঁটিকে উপুড় আর উপুড়-গুঁটিকে চিৎ করা।

সাহেবের রঙ্গরসে কারো কান নেই, নিজের ঝোঁকে সে বকবক করছে। আবার বিপদ, ক্ষিদে পেয়ে গেছে বিষম। ক্ষিদের দোষ নেই—জোয়ানপুরুষ, মরা নাড়ি কোনটার নয়। কোন্ দুপুরে চাট্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে—এক মামুদ আলির বাড়ি হয়েই ফিরবার কথা, ক্ষিধে ঠেকাবার উপায় ভেবে আসেনি। এখন যত ভাবছে, পেটের মধ্যে তত দাউদাউ করে ওঠে? ধোনাই মিস্ত্রি খাওয়ার

গল্প করে : রাতের কাজে বেরিয়ে কাদের রান্নাঘরে ঢুকে এক খোরা পান্তা মেরে দিয়ে এসেছিল একবার। পান্তাভাত আর কাসুন্দি।

গুরুপদ চটে উঠল : সাহেব ঠিক বলেছে, সত্যি তুই ছোটজাত। নজর নিচু। সেই রান্নাঘরে ঢুকলি, খেয়েও এলি। পান্তাভাত তবে কি জন্য খাবি, পোলোয়া-কালিয়া খেয়ে এলি নে কেন হতচ্ছাড়া ?

ধোনাই অবাক হয়ে বলে, পোলোয়া-কালিয়া রেঁধে রাখে বুঝি—খেয়ে এসে তার গল্প করব ?

সাহেব হাসতে লাগল : না খেয়েও গল্প হয় রে ধোনাই। পোলোয়া খায় তো বাবুভেয়েরা। মুখের গল্পে আমাদের সুখ।

গুরুপদ সাহেবের সুরে দোহার দেয় : সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার—সত্যি বই মিথ্যে মুখে আসে না! নজর ছোট, ঐ যা বললাম। গল্পের খাওয়া—তা-ও পান্তার উপর উঠতে পারে না।

বংশীও আসরে নামে। পোলাও না হোক,—পাঁচ-সাতখানা তরকারি এবং পিঠেপায়সে চতুর্দিকে সাজানো বাড়া-ভাত সে খেয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি খেয়েছে, বানানো কথা নয়।

শিবপূজা বলে আছে এক ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা বনের ধারে গলবস্ত্র হয়ে শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। তারপরে থালায় ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন সাজিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে গৃহস্থ শুয়ে পড়ে। বনের শিয়াল চুপিসারে এসে খেয়ে যায়। পুঁথিপত্রে চোর-পূজোর এমনি কোন বিধান থাকত যদি! না থাকুক, বংশীই শিয়াল হয়ে সেবার শিবাভোগ খেয়ে এসেছিল।

গাঙ ছেড়ে ডিঙি খালে ঢুকে পড়েছে। সরু জলপথ—এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর বোধন-তলার নিচে দিয়ে। গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষ এপার ওপারে দিব্যি গল্পগুজব করতে পারে। চুপ, একটি কথা নয়! বোঠে খুব নরম হাতে ধরো এবার—

পালাকীর্তন একবাড়ি—এত রাত্রেও চলছে। উঠানে পাল খাটিয়ে হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে, খাল থেকে নজরে পড়ে। বোঠে ফেলে সাহেব উঠে দাঁড়ায়, ডিঙি লাগাতে বলে। না লাগালে ডাঙায় লাফ দিয়ে পড়বে, এমনিতরো ভাব।

ধোনাই বলে, এই দেখ। পেটে বাপান্ত করছে—ঠাকুরের নামে কি খিদে মরবে ?

বংশী সাহেবের পক্ষে : চলোই না—শুনে আসি। কান পচে যাবে না।

বেয়ে বেয়ে শুধু হাতই ব্যথা—ক্ষিধে না মরুক, জিরানো যাবে তো একটুখানি।

বলে, ছোটমামা সাহেবকে বলত ভক্ত মানুষ। রোখ যখন চেপেছে, ঠেকানো যাবে না। তবে একটি কথা, লেপটে থেকো না সাহেব—একটু শুনেই চলে আসবে।

কিন্তু উল্টো বুঝেছ সাহেবকে। গলা বাড়িয়ে আসরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে সাহেব অন্য দিকে পা চালায়। কত বাড়ির কত উঠানে গেল। হারুন-অল-রশিদের নগর-পরিক্রমা। এক-একটা ঘর ধরে চক্কোর দিল কত সময়। মাটিতে পা ছোঁয় না যেন, মাটির পরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এরা তিনজন পিছনে—দূরে দূরে। সমস্ত পাড়াটাই ঘোরা হয়ে গেল। কাঠির কাজ আজ নয়। গুরুর হাতের কাঠি বউনির মুখে যন্ত্রতন্ত্র বের করা চলবে না। হাতের মাথায় যা আসবে, তাই কেবল তুলে নেওয়া। রাই কুড়িয়ে বেল—সে রাইয়ের একটি দানাই বা মেলে কই?

তবু সাহেব খুশি। নিকানো-আঙিনা ঘরদুয়ার গোয়াল-ঢেঁকিশালা ঘুরে ঘুরে দেখে—দিনমানের মানুষ যেখানে সংসার-ধর্ম করে, ছেলেপুলেরা খেলা-ধুলা করে, মেয়েরা ব্রতনিয়ম করে, বিয়েথাওয়া অন্নপ্রাশন কথকতা হয় যেখানে। দেবতার পীঠস্থানের মতো পুণ্যময় আশ্চর্য জায়গা—দেখে কিছুতে সাহেবের আশ মেটে না।

এক সময় বংশীর কানে কানে বলে, এ গাঁয়ের মানুষগুলো হুঁশিয়ার খুব—পুণ্যি করতে গিয়েছে ষোলআনা সামাল হয়ে। ঘরে ঘরে তালা, তালার চাবি আঁচলে গিঁট দিয়ে তবে বসে হরিনাম শুনছে। পাহারার মানুষও রেখে এসেছে কেউ কেউ। তোমরা দেখনি, আমি দেখে এড়িয়ে এসেছি।

বংশী বিরস মুখে বলে, আমাদের যাত্রাটাই অপয়া। চলো নৌকোয় ফিরি—

যে উঠানে গাওনা হচ্ছে, সর্বশেষ এবার সেই বাড়ির ভিতর ঢুকল। সামনের ঘরটা খোলা। এরাই অসাবধান—বাড়ির উপর গাঁয়ের তাবৎ মানুষ, সেই সাহসে বোধহয়। সাহেব আর বংশী ঘরে ঢুকে গেল। অন্য দুজন বাইরের পাহারায়।

ধামা-ঝুড়ি ডালা-কুলো যত আজেবাজে জিনিস। বড়ির হাঁড়ি, আমসত্তর হাঁড়ি, আমসির ভাঁড়। মাচার উপরে উঠে পড়ল। তোষক-বালিশ-লেপ গাদা করা—কী বাহারের বিছানা মরি-মরি! সাহেব সেই যখন শ্মশানে শয়নঘর বানিয়েছিল, মড়ার সঙ্গে এমনি বস্তু দেখতে পেত।

বিছানা উল্টেপাল্টে টিনের পোর্টম্যান্টো পাওয়া গেল। চাবি-আঁটা। এই

তবে আসল বস্তু—নজরে না পড়ে সেজন্য বালিশ ঢেকে দিয়েছে। একটু চাড় দিতে পুরানো বাক্সর পতরের জোড় খুলে গেল। ধোপদুরস্ত কাপড়ে ঠাসা—দামি দামি বেনারসিও। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই'—ছেঁড়া বিছানা দেখে তুত্তোর বলে চলে যায়নি ভাগ্যিস।

কত বড় আঁচল রে বাবা, কত শ' টাকা না জানি দাম! সাহেব বলে, এ শাড়িটা বিক্রি করা হবে না, বউকে দিও বংশী। খুশি হবে।

বংশী আঁতকে উঠল: সর্বনাশ, জেরা করে করে সব বের করে ফেলবে, আস্ত রাখবে না আমায়। বিক্রি কেন হবে, তুমি রেখে দাও সাহেব। তোমার বউ এলে পরাবে।

কৌতূহলে এরই মধ্যে একটু ভাঁজ খুলল। বউকে পরানোর বস্তুই বটে! ছিঁড়ে জাল-জাল হয়ে গেছে, বিঘত পরিমাণ আস্ত নেই। সলতে পাকানোর ন্যাকড়া অথবা গোবর নিকানোর ন্যাতা ছাড়া অন্য কাজে আসবে না। ছেঁড়া কাপড়গুলো এমন যত্নে কেন রাখা, অতিসঞ্চয়ী গৃহস্থই শুধু বলতে পারে। বেনারসি ফ্যাসফ্যাস করে ছিঁড়ে সাহেব শতেক ফালি করে। যত আক্রোশের শোধ তুলছে শাড়ির উপর।

স্ত্রী-কণ্ঠে কোন দিয়ে বলে উঠল: কারা ওখানে?

সাহেব চেপে থাকতে পারে না। গলায় বিকৃত আওয়াজ তুলে বলে, ছেঁড়া ত্যানা কার জন্যে পুঁজি করে রেখেছ? এই বেনারসি পরে শ্মশানে যাবার বুঝি সাধ?

এর পরেই তো চেঁচিয়ে ওঠে, এবং আসর ভেঙে মানুষের হৈ-হৈ করে পড়বার কথা। হয়ে থাকবে তাই। সাহেবরা কিছু জানে না, ডিঙি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সতের

সকাল হল।

হারুন-অল-রসিদ ও তস্য উজির-নাজিরগণ রাতভোর রাজ্য দর্শন করে ঘুরেছেন। রাজকর সেই ছুতোরের যন্ত্রপাতি ও জেলের জাল—তার উপরে আর ওঠেনি। তবে ক্ষিধের ব্যবস্থা যা-হোক কিছু হয়েছিল বটে। কুকুরের অনুগ্রহে। মানুষ নয়, কুকুর।

কুকুর সে-বাড়ি একটা নয়, বোধকরি এক গণ্ডা দেড় গণ্ডা। যেই পা দিয়েছে, চতুর্দিকে থেকে গ-গ করে এসে পড়ল। দৌড়, দৌড়। কুকুরগুলোও তাড়া করেছে। সর্বনেশে কাণ্ড। মুরুব্বিরা এইজন্য মাথা-ভাঙাভাঙি করেন : যথোচিত বন্দোবস্ত বিনা কখনো কেউ কাজে না নেমে। গোঁয়ার্তুমিতে নিজের আখের নষ্ট এবং বৃত্তির বদনাম। সেই ব্যাপারই হতে যাচ্ছিল কাল রাত্রে।

কুকুরের তাড়ায় উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে। গ্রাম ছেড়ে মাঠে পড়ল। ঝোপঝাড় পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল। সন্ধান করতে না পেরে কুকুর আরও খানিক ডাকাডাকি করে ফিরল। তারপরেও অনেকক্ষণ এরা নিঃসাড়।

ঢোকবার সময় ঠাহর হয়নি—ভয় কেটে গিয়ে দেখে, আখের ঝাড়ের ভিতর ঢুকেছে। কুকুরকে তখন উপকারী বলে মনে হয়। ক্ষিধেয় ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিল, কুকুরই আখের ক্ষেতে তাড়িয়ে তুলে দিল। ঘেউ ঘেউ করছিল, এবারে তার মানে পাওয়া যায় : চক্ষুহীন মুর্খের দল, খাদ্য বুঝি লোকের রান্নাঘর ছাড়া থাকতে নেই ? কত খাবি, প্রাণভরে খেয়ে নে।

আখ ভেঙে ভেঙে দেদার খেয়েছে। এক জিনিসে ক্ষিধে-তেষ্টা উভয়ের শান্তি।

রাত্রি গিয়ে এবারে দিনমান। গোনে ছুটে চলেছে ডিঙি। চার মরদে আয়োজন করে বেরিয়েছে—কাজের ষোলআনা সমাধা না হওয়া অবধি এ ডিঙির মুখ ফেরাবে না। অর্থাৎ দারোগার টাকা পুরোপুরি যতক্ষণ না আসছে। বংশীদের হয়ে গিয়ে টাকা বাড়তি থাকে তো অন্য যারা ভিন্ন দল হয়ে বেরিয়েছে, তাদেরও দিয়ে দেবে। দশধারা যাতে অঙ্কুরেই বিনাশ পায়।

দিগ্বিজয়-যাত্রার মনোভাব : মারো বোঠে—শাবাস। জোরে মারে, আরও জোরে—। বোঠে মারা নয়, যেন বিয়ের বরণ করা হচ্ছে। কী গো মরদ-মশায়রা—

ধোনাই কাতর স্বরে বলে, উপোসি থেকে কত আর হবে?

ভাতের বদলে একটা আস্ত পাহাড় গলাধঃকরণ করলেও এদের উপোস। সাহেব গান ধরে বসল অকস্মাৎ। গানে পুত্রশোক ভোলায়, ভাতের শোক যাবে না? কালীঘাটের বস্তির ঘরে ঘরে এই সব গান উঠত। মুক্ত গাঙের উপর সাহেব আজ ক্ষণে ক্ষণে গলা ছেড়ে দিচ্ছে:

কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ,
জল আনতে যাচ্ছ একা, সঙ্গে নাইক কেউ।
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, কাঁদতে হবে অবশেষে,
কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগবে প্রেমের ঢেউ।

গান হাসিহল্লা হেনক্ষেত্রে ভালই। স্ফূর্তিবাজ চারটে ছোঁড়া চলেছে—লোকে ভাববে। খারাপ অভিসন্ধি থাকলে এমন হৈ-হৈ করে না। চুপিসাড়ে যায়।

বেলা চড়ে যেতে পেটে আবার সোরগোল উঠল। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষিধে দিয়ে বিধাতা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছেন। নয়তো ভাবনার কী ছিল। বংশী একটুখানি ভেবে বলে, টেনে চলো দিকি। বাবুপুকুরে কুটুম্ব আছে, ধর্মদাস গরাই। সম্পর্কে মামাতো শালা। অতিথি হইগে, খাতির না করে পারবে না।

ধোনাই বলে, বাবুপুকুর কি এখানে! হাতে-পায়ে খিল ধরে বোঠের মুঠো আলগা হয়ে আসছে। পেটে কিছু না পড়লে আমি বাপু শুয়ে পড়ব।

সকলের মনের কথাই মোটামুটি এই। গুরুপদ প্রস্তাব করে: বমাল কিছু ছেড়ে দেওয়া যাক। খোরাকি খরচার মতন। খালিপেটে খাটা যায় না।

এদের মাল হাটে-বাজারে নেওয়া যাবে না। সংসারে খারাপ মানুষ আছে তো কিছু কিছু, মাথা-গরম ধর্মধ্বজী মানুষ—হল্লা তুলে তারা ধরিয়ে দিতে পারে এ মালের জন্য আলাদা মানুষ—থলেদার বলে তাদের। থলেদার ফলাও কাজ-কর্ম ধরলে তখন মহাজন। জগবন্ধু বলাধিকারী যেমন। গুরুপদর চেনা এক থলেদার কাছাকাছি থাকে—নবনী ধাড়া। নবনীকান্তের চোটার কারবার। নিকারিরা মাছের ডালি মাথায় বয়ে হাটে হাটে বিক্রি করে—টাকা প্রতি দৈনিক এক আনা সুদে নবনী মূলধনের যোগান দেয়। সেইটে প্রকাশ্য, তদুপরি এই গুপ্ত লেনদেন।

ডিঙিতে রইল সাহেব আর বংশী, গুরুপদ ধোনাইকে নিয়ে চলল। ধোনাইর কাঁধে বেউটিজাল, গুরুপদর হাতে চটের থলি। বাড়ির কাছাকাছি বটে, তাই বলে কি ঘাটের উপর? হাঁটতে হাঁটতে বেলা মাথার উপর এলো। তবু ভাগ্য, নবনীকান্ত বাড়ি আছে, সুদ আদায়ে বেরিয়ে পড়েনি। চোটার সুদ দিন-কে-দিন তুলে নিতে হয়।

গুরুপদবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? আমি যে পয়সা দিই সে বুঝি ঘষা? বাজারে চলে না?

গুরুপদ আমতা-আমতা করে বলে, কাজকর্ম নেই—খালি হাতে এসে কি হবে?

চেহারায় তো তেলটি-ফুলটি। চাকরি-বাকরি নিয়েছ—লাট সাহেব যারা গিয়েছিল, সেই চাকরিটা নাকি?

হেসে ওঠে নবনী হি-হি করে। বলে, ঘরে মুড়কি আছে—খাবে?

অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু নৌকোর দুজনকে ফেলে খাওয়া চলবে না। এ-ও দলের নিয়ম। গুরুপদ বলে, দাও চাট্টি। এখানে খাব না, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাই।

নবনীকান্ত বলে, কি এনেছ, দিয়ে দাও। দেখেশুনে রেখে আসি।

থলির মালপত্র বের করে। নবনী এক নজর দেখেই মুখস্থর মতো দাম বলে যায়, করাত সাত আনা, আগর আট আনা, বাটালি চার আনা, রেঁদা পাঁচ আনা, একুনে দাঁড়াল গিয়ে—

গুরুপদ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কোহিনূর হীরে আনলেও আনার মধ্যে থাকবে। তোমার কাছে কখনো টাকা পুরতে দেখলাম না ধাড়ার পো। হাতকরাত বাজারে একখানা কিনতে যাও—কম-সে-কম সাত-আট টাকা। হোক পুরানো, তা বলে কি—

নবনী তাড়াতাড়ি বলে, পুরো টাকাই দিতাম আমি। কিন্তু করাতের তিনটে দাঁত যে ভাঙা। তিন আনা হিসাবে তিন-তিরিক্কে ন-আনা বাদ দিয়ে দেখ, এবারে কত দাঁড়ায়।

ধোনাই মিস্ত্রির কাঁধের জালের দিকে আঙুল তুলে বলে, দেখি, হাত দাও—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, টাকা কেন—তারও উপরে দেওয়া যেত। পাঁচ সিকে অবধি উঠে যেতাম। কতগুলো ঘর ছেঁড়া, চেয়ে দেখ। ঘর পিছু দুটো করে পয়সা হলেও পাঁচ-ছ' আনা বাদ চলে যাবে।

ধোনাই এক টানে জাল ছিনিয়ে আবার কাঁধে তুলল: যা নিয়েছ, একটা বেলার খোরাকি হবে। জাল থাকুক, গাঙে-খালে মাছ মারব।

নবনীকান্তও এবার অতিশয় কড়া। বলে, নিতে হয় তো জাল সুদ্ধ নিয়ে নেবো। কখনো বাতিল লোহা নিয়ে পয়সা গুণে দেবো, এত বোকা পাওনি। বয়স হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিয়েছি এসব কাজকর্ম। ধর্মপথে থেকে চেটোর সুদ যা দু-চার পয়সা আসে, তাতেই পেট চলে যায়।

থলিসুদ্ধ ঠেলে দিয়ে নবনী উঠে পড়ল। অন্দরের দিকে হাঁক দিয়ে ওঠে : তেল পাঠিয়ে দাও গো। বেলা হয়ে গেছে, চান করে ফেলি।

অর্থাৎ কথাবার্তার শেষ। রাজি থাক মাল দিয়ে মূল্য নাও, নয় তো উঠে পড়ো এইবার।

গুরুপদ বিশুষ্ক মুখে বলে, নিয়ে নাও। গরজ বুঝেছ, আর কি রক্ষে রাখবে তুমি! যা দিচ্ছ, সে-ও তো অনেক দয়া।

আজেবাজে মন্তব্য কানে না নিয়ে নবনী বলে একুনে তা হলে কত দাঁড়াল, জুড়ে গেঁথে বলো।

গুরুপদ বলে, দাম ধরেছ তুমি। জুড়তে হয় ভাঙতে হয় তুমিই করো সব। যা দেবার দাও, বিদায় হয়ে যাই।

টাকা ও রেজগিতে নবনী দাম দিয়ে দেয়। গুরুপদ তাকিয়েও দেখে না, মুঠো করে নিয়ে গামছার কোণে বাঁধল।

নবনী বলে, গণে নিলে না?

জবাব ধোনাই মিস্ত্রি দিল : বেশী দেবার পাত্তর তুমি নও। কম হলে তো বলবে, সেইটেই উচিত দাম।

সাঙাত বড্ড রেগেছে গো! টেনে টেনে নবনী বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা তোমাদের। দাম নিয়ে তো পগার পার—আমি শালা মরি এবারে। মাল ঘরে রেখে সোয়াস্তি নেই, কোন ফিকিরে কোথায় পাচার করি। থানায় টের পেলে নির্দোষী আমারই হাতে-দড়ি পড়বে।

পথে এসে ধোনাই বোমার মতো ফেটে পড়ে : যা মুখ দিয়ে বেরুল, তাই ফলিয়ে দাও হে মা-কালী। হাতে-দড়ি দিয়ে বেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাক। চার চারটে মানুষ সারারাত তল্লাট চষে বেড়ালাম, মোট বওয়ার মজুরিটাও দিল না গো!

গুরুপদ বলে, দূর দূর, কাজের নিকুচি করেছে! যত বাটপাড় মিলে ভাগাভাগি করে নেয়, আমাদের কপালে কাঁচকলা! ঘেন্নায় সিঁধকাঠি গাঙে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা হবে কি করে—পেটের জ্বালা, পোড়ারমুখো সিপাই-দারোগার জ্বালা—

মুড়কি পেটে পড়ে এখন আলস্য লাগছে।

ভাত রান্না হাঙ্গামার কাজ। চাল-ডাল নুন-মশলা কেনো, কাঠকুটো কুড়োও উনুন ধরাও, জল ঢালো, ফ্যান গালো—হরেক রকমের প্রক্রিয়া। প্রায় এক দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

ধোনাই মিস্ত্রিই এবারে বলছে, বাবুপুকুর দশক্রোশ বিশক্রোশ নয় গো—দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব। বংশীর শালা-কুটুম্বর বাড়ি, যা একখানা খাতির পাওয়া যাবে—

গুরুপদ জোগান দেয়ঃ এয়ারবন্ধু নিয়ে বোনাই এসে হাজির। হাত-পা ধুয়ে বসতে না বসতেই তো জলখাবার একপ্রস্থ—

ধোনাই বলে, কুটুম্বদের পথের কষ্ট হয়েছে—সন্ধ্যেটা গড়িয়ে যেতেই অমনি থালায় ভাত, চতুর্দিকে দশখানা তরকারি সাজানো—

রোসো—। বংশী বিড়বিড় করে হিসাব করছিল। ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, সন্ধ্যের পরেই কি করে হয়! শনিবার তো আজ—বাবুপুকুরের হাটবার—হাটের ভালো মাছটা না খাইয়ে ছাড়বে? তার উপরে ধর্মদাস এই সেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে এককাঁড়ি পণের টাকা পেয়েছে—

কুটুম্ববাড়ি পৌঁছে উল্টোটাই শোনা যায়। নিতান্ত দায়ে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া। বংশীদের হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে তামাক সেজে এনে ধর্মদাস সবিস্তারে আলাপ-সালাপ করছে। বড় দুর্দিন এবারে। অন্য বছর গোলা ভরতি হয়ে বাড়তি ধান আউড়িতে রাখতে হয়, এবারে ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে নোনাজল ঢুকে সমস্ত বরবাদ। খোরাকি ধানের অভাবেই সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিল, অন্তত আর দুটো বছর রেখে খানিকটা সেয়ানা করতে পারলে পণের টাকা ডবল হয়ে যেত।

এরই মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করেঃ যাওয়া হচ্ছে কোন্‌দিকে কুটুম্বমশায়রা?

জবাব ঠিক করাই আছে। বংশী বলে, যাওয়া নয়—ফেরা হচ্ছে। দক্ষিণের আবাদে ধান কাটতে গিয়েছিলাম।

খিক-খিক করে হাসি ওদিকে উঠানের ছাঁচতলায়। মানুষটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। ঐ মানুষ এখানে জানলে ভুলেও বাবুপুকুরের ছায়া মাড়াত না। দফাদার রতনমাণিক। চৌকিদার আট-দশ জনের মাথার উপর এক একটি দফাদার থাকে। কিন্তু শুধু দফাদারে রতনমাণিকের পরিচয় হয় না। ইচ্ছে করলেই যেন সে হাতে মাথা কাটতে পারে, এমনিতরো ভাব। তলোয়ার লাগে না, এবং সেজন্য কারো কাছে সে কৈফিতের ভাগীও নয়।

হেসে উঠে রতনমানিক বলে, ধান কাটতে কোন মুলুকে যাওয়া হয়েছিল বংশীধর? ধান কেমন উঠল? বলি দায়দেনা সব মিটে যাবে তো?

দফাদার সেই গরলগাছি থানার এলাকার, যেখানে থেকে বুড়ো দারোগা দশধারার প্যাঁচ কষছে। সমস্ত জানে সে, আবরু রেখে প্রশ্নটা করল। বংশীও শুকমুখে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে। আবার এই সময় ধর্মদাসের ছোট ভাই দুটো—কেষ্টদাস

আর রামদাস বাড়ি ফিরল—তারাও এসে কাছে দাঁড়ায়। কি কেলেঙ্কারি ঘটে এইবারে সকলের সামনে।

রতনমাণিকই কিন্তু ঠেকিয়ে দিল। ধর্মদাসের হাত ধরে টেনে বলে : চলো বেয়াই মশায়, হাটে এর পরে কিছু থাকবে না। কথাবার্তা থাক এখন—পালিয়ে যাচ্ছে না কেউ, সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হতে পারবে।

খবরটা জানা ছিল না, এই রতনের ছেলের সঙ্গেই ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নতুন কুটুম্ব এলে হাটে যাবে, দশগাঁয়ের মানুষের মধ্যে দু-হাতে খরচপত্র করে সচ্ছলতা দেখাবে, গৃহস্থ মানা করবে কিন্তু কানে নেবে না—এইসব হল দস্তুর। হাট ভেঙে যাবার আশঙ্কায় দুই বেয়াই হনহন করে বেরুল।

বংশী বেজার মুখে বলে, ও বেটা এসে জুটেছে—হাটের পথে পুটপুট করে আমাদের কুলের কথা বলবে। কুটুম্বর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, সরে পড়ি এই ফাঁকে।

বসে ছিল ধোনাই মিস্ত্রি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাদুরে।

কী হল ধোনাই?

ভাতের চেহারাই ভুলে গেছি বাবা। এক পেট ঠেসে তারপর যা বলো রাজি আছি। খাওয়ার ডাক এলে উঠব, তার আগে কপিকলে বেঁধেও কেউ উঠাতে পারবে না।

গুরুপদরও সেই কথা : মুখ দেখতে না পার বংশী, কোঁচার খুঁট খুলে ঘোমটা ঢেকে বসে থাকো। গুরুমশায়কে গুরু বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাক্তার বলে—কারো কিছু হয় না, চোর বললে আমাদেরই বা লজ্জা কেন হবে?

মোটের উপর ভাত এরা খাবেই ধর্মদাসের বাড়ি। না খেয়ে নড়বে না। নিরিবিলি পেয়ে কাজকর্মের কথা হয়। কালকের রাতটা মিছা খাটনিতে গেল। আন্দাজি কাজের রকম এই। জুয়োখেলার মতন—প্রায়ই লাগে না, বিপদের ঝুঁকি পদে পদে। মুরুব্বিরা তাই পই-পই করে মানা করেন। ভাল কাজ লাগাবার আগে অনেকদিন ধরে তোড়জোড় করতে হয়। উৎকৃষ্ট খুঁজিয়াল চাই—যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-বাড়ি সে-বাড়ি খোঁজখবর নেবে, ভাব জমাবে লোকের সঙ্গে।

গুরুপদ ও ধোনাই মিস্ত্রি লাইনের পুরানো লোক—দুজন দুই পারে চুঁড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু নৌকো বাওয়া রান্নাবান্না কাজের কারিগরি—এত সমস্ত বাকি দুজনে হয় না। ডিঙিখানা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন এদেশ-সেদেশে ছোটাবার বাসনা—বাড়তি মানুষ জুটিয়ে নাও তাহলে।

হাটুরে দুজনে হাট করে ফিরে এলো। বেসাতি রান্নাঘরের পৈঠায় নামিয়ে রতনমাণিক চেঁচামেচি করে: বংশী, ঘুমুলে নাকি তোমরা?

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সাড়া দিলে যদি আবার সেই আগের সুরের কথা আরম্ভ করে দেয়! ধর্মদাসের ভাই কেষ্টদাস কথায় কথায় ইতিমধ্যে বলেছে, রাতটুকু পোহালেই রতনমাণিক চলে যাচ্ছে, সরকারি মানুষের বসে বসে কুটুম্ব-ভাতা খাবার সময় নেই। অতএব যেমন-তেমন ভাবে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া।

কত জিনিস কেনাকাটা করলাম, একবার চোখে দেখবে না তোমরা? ডাকতে ডাকতে রতনমাণিক কাছে চলে এসেছে। বেসাতির জিনিস না দেখিয়ে যেন সোয়াস্তি নেই। বলে, নলেন-পাটালি পেয়ে গেলাম। ভারি, কতদিন পরে একসঙ্গে এত জনে মিলেছি—দুধ পাটালি খাওয়া যাবে আমোদ করে। আর এক নতুন জিনিস—ফুলকপি। খুলনা থেকে এক দোকানদার নিয়ে এসেছিল, ডবল দাম ধরে দিয়ে তার কাছ থেকে কিনলাম।

ভালবাসায় গদগদ অবস্থা। বংশী অবাক হয়ে দেখছে। নিজ এলাকার মধ্যে যে দফাদারকে দেখে, এখানকার রতনমাণিক সে মানুষ নয়। কথাবার্তার ধরন, এমন কি কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা। ধর্মদাসও তটস্থ হয়ে আছে—আদর-যত্নের তিল পরিমাণ ত্রুটি না ঘটে। হাট থেকে ফিরে এসে খাতিরটা আরও যেন বেড়েছে। ধর্মদাস তো এই—ভাই দুটোও মুকিয়ে আছে। হাঁ করতেই কেষ্টদাস দৌড়ে পান-জল এনে দেয়, রামদাস কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে সমারোহ করে রান্নাবান্না হচ্ছে—ছ্যাঁকছোক আওয়াজ, ফোড়নের গন্ধ। হেসে ধর্মদাস বলে, এক হল কটুম্বের বাড়িতে গেলে সুখ, আর হল কুটুম্ব বাড়ি এলে সুখ। শাকটা মাছটা তোমরা খাবে, আমরাও বাদ পড়ব না। ক'টা দিন সেইজন্যে আটকে রাখব, 'খাবো' বললেই ছাড় পাবে না।

কাল রাতে ও আজ দুপুরে ভাত জোটেনি—একবেলায় এখন তিন বেলার শোধ তুলে নিল। বৈঠকঘরে তোষক-বালিশ-চাদর এসে পড়েছে—চারজনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। বিছানাপত্র সমস্ত দিয়ে বাড়ির লোকে সুনিশ্চিত শুধু-মাদুরে গড়াচ্ছে। আরামে চোখও বুঁজেছে—

রতনমাণিক ভিতর-বাড়ি শুয়ে ছিল, পা টিপে টিপে সে এসে হাজির: ঘুমুলে নাকি বংশী-ভাই? দুটো কথা বলবার জন্য সেই কখন থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি। বড়বাবু আবার আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাড়ি-ছাড়া তুমি। কোথায় গিয়েছ, বউও সঠিক কিছু বলতে পারে না।

বংশী বলে, বলেকয়ে সময় নিয়েই তো এলাম। তবু বড়বাবুর সোয়াস্তি নেই। তাগাদার পর তাগাদা।

রতনমাণিক হেসে বলে, জলের তলের মাছ আর পরের হাতের ধন মুঠোয় না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি কিসের! কিন্তু সেজন্য নয়। একটা জিনিস বড়বাবু হুঁশ করিয়ে দিতে বললেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও কিছু বলবার আছে—

বংশী আগের কথা ধরে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, আমাদের কি জমিদারি তালুকদারি আছে যে ইচ্ছে মতন সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো দিয়ে দেবো? রোজগারপত্তরে বেরিয়েছি। বললে, বাড়িছাড়া আমি—ঘেন্নায় সব ছেড়েছুড়ে বাড়িই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই তোমরা? যা-কিছু পাবো নৈবিদ্যি সাজিয়ে তোমার বড়বাবুকে নিবেদন করে আসতে হবে।

রতনমাণিক প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েঃ কথাই তো আমার তাই। শুধু বড়বাবুতে ফল হবে না। দুর্গা বলো কালী বলো সকল বড়-ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে ষষ্ঠীপুজো। ষষ্ঠীর নৈবিদ্যি বাদ না পড়ে, খেয়াল রেখো ভাই।

ঠাণ্ডা করবার জন্য বংশীকে রতনমাণিক বোঝাচ্ছেঃ ভগবান হাত দিয়েছেন পা দিয়েছেন কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি কেন বসে থাকতে যাবে? দু-হাতে কাজ করে যাও যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে। তবে হ্যাঁ, বিচার-বিবেচনা থাকবে নিশ্চয় কাজের। বিবেচনায় ভুল করেই তোমরা ফ্যাসাদে পড়ে যাও।

গরলগাছি আর ঝিনুকপোতা দুই থানার পাশাপাশি এলাকা। রতনমাণিকের স্বার্থ গরলগাছি নিয়ে। কণ্ঠে তার ক্রমশ ধমকের সুর এসে গেলঃ দশধারার জন্য বড়বাবুকে দুষে বেড়াও, কিন্তু তোমরাই তো করাচ্ছ তাঁকে দিয়ে। না করে উপায় নেই, এমনি অবস্থায় এনে ফেলেছে। নজর-খাটো কতকগুলো হুটকো ছোঁড়া কাজের জায়গা চিনে রেখেছে শুধু গরলগাছির এলাকাটুকু। এর বাইরে যেন দুনিয়া নেই। বদনাম হয় গরলগাছির, ঝিনুকপোতা বগল বাজিয়ে বেড়ায়। সদর থেকে হুড়ো এলে বড়বাবু তখন আর চোখ বুজে থাকেন কি করে?

বংশী ক্লান্ত স্বরে বলে, বলছি দফাদার ভাই, জো-সো করে এবারটা ছাড়ান করে দাও। কোন তালে আর নেই, গরলাছি ঝিনুকপোতা কোনদিকে জীবনে পা বাড়াব না।

রতনমাণিক গালে হাত দিয়ে বলে, এই দেখ—বললাম এক কথা, তুমি বুঝলে উল্টো? গরলগাছিতে বিস্তর হয়ে গেছে, সকলে এবারে ঝিনুকপোতা ধরো। ঝিনুকপোতার দর্প চূর্ণ করে দাও। এই জিনিসটা হুঁশ করিয়ে দিতে বড়বাবু আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। তোমরা সব তার আগেই বেরিয়ে পড়েছ।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর কথাবার্তা। পুলিশ আর চোর—পক্ষ হল দুটো। হামেশাই পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। যত-কিছু গণ্ডগোল যথোচিত বুঝসমঝের অভাবে। ভোরবেলা রতনমাণিক চলে যাচ্ছে বংশীদের ডেকে তুলে জনে-জনের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই হলেও লোকে এত দূর করে না।

আরও খানিক বেলা হলে গৃহকর্তা ধর্মদাস কোথা থেকে খাসিছাগল টানতে টানতে এনে জিওলগাছে বাঁধল। বলে, চলে যাবে--মাইরি আর কি! সরকারি মানুষ বেহাই মশায়কে ছাড়লাম বলে তোমাদেরও? এবেলা তো কিছুতে নয়। খাসি দিয়ে দুপুরবেলা চাট্টি সেবা হোক, তারপরে দেখা যাবে।

এতক্ষণ সশব্দে হচ্ছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর নেমে গিয়ে শোনা যায় কি না যায়। গলা খাঁকারি দিয়ে ধর্মদাস বলে, একটা কথা বলি ভায়ারা। শোন, সকলকেই বলছি। ক্ষেতখামারের কাজ মিটে গিয়ে ভাই দুটো বসে আছে। তোমরা সাথী করে ওদের নিয়ে যাও। বড্ড ধরেছে।

বংশী বলে, এখন কোথা নিয়ে যাব? কাজ অন্তে ঘরে ফিরছি তো আমরা।

ধর্মদাস ফিক করে হাসল: কালা নই, কানাও নই ভায়া। নিজের চোখ দিয়ে দেখি, নিজের কানে শুনি? যেটুকু যা বাকি ছিল, বেহাই মশায় খুলে বলল। ধাপ্পা দাও কেন?

ব্যাপার সমস্ত ফাঁস হয়ে গেছে। বংশী তবু কিছু ইতস্তত করে: এত বড় মানী গৃহস্থ তোমরা। কাজটা তো ভাল নয়—

নির্বিকার ধর্মদাস বলে, ভাল কি মন্দ কে জানতে যাচ্ছে! ঘরে ঘরে দেখগে এই। কলিযুগ তবে আর বলছে কেন! তা-না না-না করো কেন, সত্যি গুণের ভাই ওরা আমার। নয়তো বলতে যেতাম না। কেষ্টদাসের আবার বড় মধুর গানের গলা—সে গানে মানুষ কোন্ ছার, বনের পশু অবধি মজে যায়। কিন্তু মজলে কি হবে, পয়সা তো দেবে না সে বাবদ।

চার সাঙাতে সলাপরামর্শ হল। বিধি-মতন কাজ করতে হলে মানুষ তো দরকারই। ছোকরা দুটো লাইনে একেবারে নতুন—কিন্তু কাজ করতে করতেই শিখবে মানুষে। আপাতত দায়িত্বের কাজ নয়, বোঠে মারা থেকে শুরু। ডিঙি বাইবে, আর চোখ মেলে কাজ দেখবে। ডাঙায় নেমে বড়জোর পাহারায় দাঁড়াতে পারে দায়ে-দরকারে। মায়ের নাম স্মরণ করে চলুক তবে কেষ্টদাস আর রামদাস।

ছ-জন নিয়ে দলটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দে এবার নাবালে নেমে যাওয়া যায়। সেখানে গহিন নদী, ঘোর তুফান। কিন্তু ফসলে ভরা মাঠ—যার মানে হল গৃহস্থর গোলায় ধান, বাক্সে টাকা। কাজকর্মের বড় সুন্দর ক্ষেত্র—লোক-মুখে শোনা আছে।

দূরের পথ, কিছু বন্দোবস্ত সেরে নেবার দরকার তাড়াতাড়ি। বাঁশ ফেড়ে ডিঙির উপর চালি করে নিল শোওয়া-বসার সুবিধার জন্য। দরমার ছই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তালিতুলি দিয়ে নিল। অস্ত্র নেওয়া হল হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া যায়—রামদা লেজা সাবল লাঠি ছোরা। কাঠি তো অঙ্গের সাথী। কেষ্টদাস তার গোপীযন্ত্রটা নিয়েছে। পাপের ভারবোঝা যখন বেশি বেশি লাগবে, কৃষ্ণকথা গেয়ে বোঝা খানিক হালকা করে নেবে। হঠাৎ কি মনে হল—বোষ্টমপাড়ায় গিয়ে কণ্ঠী জোগাড় করে নিয়ে এলো একজোড়া।

সাহেব হেসে বলে, তা বেশ হল, কাঠি-সাবল-লেজার মতো এ জিনিসও সরঞ্জাম কাজের।

রাতদুপুরে ডিঙিতে উঠে পড়ল। শেষরাত্রে জো এসে গেলে রওনা। জ্যোৎস্না উঠে গেল, গাছপালার মাথা ঝিকমিক করছে। আজকে ক্ষতি নেই, আকাশের চাঁদ আরও কয়েকটা দিন এই রকম জ্বালাবে। তারপরে অমাবস্যা, পুরো অন্ধকার। পেঁচা ডেকে উঠল কোনদিকে। প্রথম বোঠে জলে পড়ল—ঝপ! বোঠের পর বোঠে—ঝপাঝপ ঝপাঝপ। স্রোতের আগে আগে ছুটেছে ডিঙি।

সকালবেলা গুরুপদ আর ধোনাই দুজনে দু-পারে নেমে গেল। হেঁটে হেঁটে খোঁজদারি করে বেড়াক। সন্ধ্যার পর ফিরবে নৌকোয়। দরকার পড়লে দিনমানে ফিরতেও বাধা নেই। কোন পথ ধরে নৌকোর চলাচল, কোন্‌খানে চাপান দেওয়া—আগের রাত্রে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দোহাই ষড়ানন ঠাকুর, দোহাই মা নিশিকালী, মুখ রেখো এবারে।

গোন-বেগোনের বাছবিচার নেই, ডিঙি চলবে। উজান মুখে টান কাটিয়ে এগুনো যাচ্ছে না, বোঠে মেরে হাত ব্যথা—গুণের দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পড়ুক ওরা দু-ভাই। জলজঙ্গল কাঁটা-কাদা বুঝিনে—যতক্ষণ দিনের আলো তার মধ্যে থামাথামি নেই।

গাজি বদর-বদর!

আঠারো

ডাঙার মানুষ জলে জলে ভাসছে। হল কত দিন? কে জানে, পাঁজিপুঁথি ধরে কে হিসাব করতে গেছে? দিন-কুড়িক হতে পারে। এক মাস হলেও অবাক হবার নেই। বংশীর তো মনে হচ্ছে এক বছর। বাচ্চাছেলের জন্য মন টানছে। বংশীর এক খুড়তুতো ভাইকে বাদাবনে বাঘে তাড়া করেছিল। জলে ঝাঁপ দিল সে প্রাণ বাঁচাতে। বংশীরও ঠিক তাই। তিন-তিনটে মারা গিয়ে ঐ বাচ্চা, কিন্তু কোলে-কাঁখে নিয়ে ঘরবসত করবার জো নেই। বাঘ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে, ডাঙায় উঠলে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘ নয়, বাঘের বেশি—গরলগাছির বুড়ো-দারোগা।

গাঙ-খাল গাঁ-গ্রাম কত ঘুরল। দুই তীরে দুই ভগ্নদূত ছুটোছুটি করে খবর খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়। নাকে-মুখে যা-হোক দুটো গুঁজে তারপর কাজে বেরুনো। গৃহস্থের অজ্ঞাতে কুটুম্বর দল উঠানে ঘরকানাচে নানান অন্ধি-সন্ধিতে চোঁক-চোঁক করে বেড়ায়। যাত্রা খারাপ, কিছুতে কিছু হচ্ছে না! খোরাকি খরচাটা কোন রকমে ওঠে, এই পর্যন্ত।

শখ করে কাজে ছুটি নিয়ে নিল হয়তো কোন একদিন। অজানা গাঁয়ের হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করে বেড়াল। কোন বাড়ি যাত্রাগান খুব জমেছে—চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে গান শুনতে বসল। দলটার মধ্যে সবচেয়ে স্ফূর্তি সাহেবের। কাজকারবার না হোক, প্রাণ ভরে দেখাশোনা হয়ে যাচ্ছে। রকমারি মানুষজন দেখছে, মাঠঘাট বনজঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছে। পোড়ামাটি শহুরে জায়গায় ছেলেবয়স কাটিয়ে এসেছে, যা দেখে সবই যেন তাজ্জব লাগে। বংশী আর গুরুপদ চটে যায়। পরের দায়ে এসেছে কিনা, দায়টা নিজের হলে আহা-ওহো করে স্বভাবের শোভা দেখবার পুলক হত না।

শিক্ষাটা নতুন করে হল, যথানিয়ম বিধিব্যবস্থা ছাড়া কাজ হয় না। মুরুব্বিদের কঠিন নিষেধ অকারণ নয়। কপাল ভাল তাই বড় রকমের বিপদ আসেনি, কিন্তু অপদস্থ হতে হয়েছে অনেক। সিঁধ কেটে দেখা গেল বিশাল ছাপাবাক্স গর্তের সমস্ত মুখটা জুড়ে। বাক্সর উপর মানুষ শুয়ে আছে, সে হাঁক দিয়ে উঠল: খসখস করে কি? কে ওখানে? বুদ্ধি করে বংশী কিচমিচ করে ইঁদুর ডাকল। ঘুমের মধ্যে বিরক্তি ভরে মানুষটা বলে, দেখাচ্ছি কাল

মজা, জাঁতিকল পাতব। ইঁদুর হয়ে বেঁচে এলো, নয়তো ভোগান্তি ছিল সেদিন। আর এক রাত্রে আয়োজন করে পাকা দেওয়াল কাটতে গেছে, যন্ত্র ফিরে ফিরে আসে—যেন লোহার পিঠে লোহার ঘা পড়েছে। কী ব্যাপার? সাবধানী গৃহকর্তা জানালার নিচে—চোরের যেখানটা সিঁধ খোঁড়ার সম্ভাবনা—চুনসুরকির বদলে মাটি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। মাটি অর্থাৎ সিমেণ্ট। নাও, হল তো—হিমরাত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবার ডিঙিতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। বিচক্ষণ খুঁজিয়াল থাকলে এমন হয় না। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো মানুষ ফুলহাটার উপর—তাঁকে একটিবার বলে দেখলে না কেন বংশী? এক মাস দু-মাস এমন কি বছরও ঘুরে যায় ক্ষুদিরামের এক-একখানা কাজ গড়ে তুলতে। গড়াপেটা সারা করে কারিগরকে জানান দিয়ে দেয়, কারিগর নিশ্চিন্তে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে চুরি রীতিমত এক শিল্পকর্ম। সকালবেলা পড়শিরা এসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কানে শুনে দূর-দূরন্তরের মানুষ দেখবার জন্যে ছোটে। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর পরিশ্রম যার পিছনে, তার বড় মর্যাদা। সে আপনি মহৎকর্মে প্রয়োগ করুন, আর চোরাই কাজে লাগান। আর এরা যা করছে—ছিঃ! কাজই তো নয়, জুয়াখেলা।

দিন যায়, শেষটা মরীয়া হয়ে উঠল। লাইনের যত-কিছু নীতি-নিয়ম ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। সাহেব সকলের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। ওস্তাদের ছাড়পত্র নিয়ে প্রথম যাত্রায় বেকুব হয়ে ফিরবে না কিছুতেই নয়। আরও একটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—নতুন ছোঁড়া জুটোর একটি—কেষ্টদাস। কালে কালে সে সাহেবেরই দোসর হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত—এমনি সব ভাইদের নাম। আরও একটি আছে—অনন্ত। গুরুপদর খবর: সাকুল্যে কতকগুলো ভাই, সঠিক বলা যাবে না, একটা দিনে এর বেশি হয় না।

অনন্তর বয়স কম, এই বছর তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড়। হাকিমের পেস্কার। যে হাকিমকে নিয়ে কাজকর্ম, রোজগারের হিসাবে অনন্ত বারকয়েক কিনে ফলতে পারে তাঁকে। গায়ের জামায় ফরমায়েস দিয়ে পাঁচ ছ'টা পকেট বানাতে হয়, মামুলি তিন পকেটে কুলায় না। কোর্টে যাবার সময় ফাঁকা পকেট, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় রেজগির ভারে পকেটগুলো ছিঁড়ে পড়বার দাখিল। আইন-আদালতের জন্মকাল থেকে অলিখিত নিয়ম চলে আসছে কোন্ কাজের কি প্রকার তদ্বির। বাঁ-হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে বাড়ানোই রয়েছে—পয়সা-দুয়ানি সিকি-আধুলি পড়া মাত্র মুঠো

হয়ে পকেটে ঢুকে পলকের মধ্যে আবার পূর্বস্থানে। যন্ত্রবৎ এই প্রক্রিয়া সমস্তটা দিন। হাকিম মুখ একটু বাড়ালেই সমস্ত নজরে পড়ে যাবে। ছেলেরা আড়াল করে তামাক খায়—হুঁকোর ফড়ফড়ানি কানে আসে, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে নেই। এ-ও তেমনি ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঈর্ষা ও অনুতাপের বশে মুখ গুঁজে থাকেন হাকিমমহাশয়ঃ হায় রে, বাঁধামাইনের হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার হলাম না কেন যাবতীয় লেখাপড়া কর্মনাশার জলে দিয়ে?

এ হেন পেস্কারের চাকরি অনন্তর। খুলনা থেকে কাল বাড়ি এসেছে কদিনের ছুটিতে। বাদার ইজারা নিয়েছে বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত, বন কাটার জন্য জনমজুর লাগিয়েছে। শহর থেকে অনন্তই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, টাকাকড়ির দায়ও তার উপরে।

গুরুপদ খোঁজ এনে দিল। ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে ডিঙির চালিতে সে শুয়ে পড়েছে। আর রইল রামদাস। দুজনকে ডিঙিতে রেখে কালী-নাম স্মরণ করে অন্যেরা বেরিয়ে পড়ল। পথ বাতলে দিয়েছে গুরুপদ—সেই পথে অদৃশ্য রূপে মা-জননী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। কাজের সময় সিঁধকাঠিতে ভর করো মা, কাঠি হবে বজ্রের মতন। সিঁধের মুখে কুবেরের ভাণ্ডার জড় করে রেখো মা—

কী যেন ঠাণ্ডা মতন পায়ের উপর। সাপ? না, কোলাব্যাং একটা। লাফ দিয়ে এসে পড়ল, আবার চলে গেল। কুঠির দীঘিতে সোলমাছ ধরতে গিয়ে সাপই পায়ে উঠেছিল। সাপে ছোবল দিলেও এ সময়টা হুল্লোড় করবার জো নেই, নিঃশব্দে ধীর পায়ে সরে যেতে হবে। রান্নাঘরের কানাচে কাচনির বেড়ায় চোখ রেখেছে সাহেব আর বংশী। কানে শুনছে ভিতরের কথা, চোখে দেখছে ভিতরের মানুষ।

বড় সংসার এক গাদা মেয়েলোক। গিন্নি যাকে বলা যায়, বয়স হলেও বেশ হাসি-খুশি মানুষটা।

নতুন-বউকেও ভাত দিয়ে দাও নমি। বাবুদের দাওয়ায় ঠাঁই হচ্ছে, নতুন-বউ ঘরের মধ্যে বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিক।

নতুন-বউ সলজ্জে বলে, না দিদি, আগে খাব কেন? তোমরা যখন খাবে তখন। সকলে একসঙ্গে।

[সাহেব বলছে, নাও না খেয়ে বাপু, বড়র কথা শুনতে হয় আর কষ্ট দিও না। শীতটা বড্ড পড়েছে। খেয়ে নিয়ে এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

বলছে সাহেব মনে মনে, ঘর-কানাচের ঝোপজঙ্গলে দাঁড়িয়ে।]

সেই বড়-জা হেসে নতুন-বউকে বলে, তোমার যে ভাই কাল থেকে চাকরি

চলছে—আপিসের হাজরে। ছোটবাবু চারদিনের জন্যে এসেছে—মিনিটের দাম হাজার হাজার, ঘণ্টার দাম লাখ।

নমি মেয়েটা বলে, অঙ্কে ভুল হয়ে গেল কিন্তু বড়বউদি—

একি ধারাপাতের অঙ্ক যে পাঁচ দুনো দশ ছয় দুনো বারো হতেই হবে। ঐ বয়সে এদের অঙ্ক আলাদা—

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে নমির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল।

নমি বিধবা। আহা, ন্যাড়া হাত—নরুনপাড় ধুতি পরেন।

সেই ছোটবাবুই বুঝি ঘরে ঢুকল। ছোটবাবু অর্থাৎ অনন্ত। সকলের অলক্ষ্যে নতুন বউয়ের দিকে চোরা চউনি হানা—মানুষটা অনন্ত না হয়ে পারে না।

বড়বউ বলে, দাওয়ায় পিঁড়ি পড়েছে ঠাকুরপো। সকলকে ডেকেডুকে নিয়ে খেতে বোসোগে। রাত করো না, যাও।

ফিক করে হেসে বলে, ভাবনা নেই ভাই, নতুনকেও খাইয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত পুলকিত কণ্ঠে নিস্পৃহ ভাব দেখায়ঃ ভারি মাথাব্যথা কি না তোমার নতুনের জন্যে! গিয়েই তো পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

বটে! কাল রাত্রে বাড়িশুদ্ধ লোক ঘুমুতে পারিনে। তুমি একলাই তবে বকবক করছিলে?

[ঘর-কানাচে সাহেব মনে মনে গরম হচ্ছে। দেওর-ভাজে ন্যাকা-ন্যাকা কথাবার্তা কতক্ষণ চালাবে শুনি? মশাও জো পেয়ে গেছে—মজা করে রক্ত খাচ্ছে, চাপড়টা দেবার উপায় নেই।]

অনন্ত বলছে, নমিতাকে নার্স ট্রেনিং-এ ঢোকালে কেমন হয় বড়উবদি? হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে খাতির আছে। তাঁকে ধরেছি, হয়ে যেতে পারে। দাদাদের বললাম, কারো অমত নেই। তোমরা কি বলো শুনি এবার। নার্স হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয় একটা।

নিজেই নমিতা গোলযোগ করে ওঠে সকলের আগেঃ আমি যাব না; কক্ষনো না। হাসপাতাল অনাচারের রাজ্যি, ম্লেচ্ছ কাণ্ডবাণ্ড সেখানে।

বড়বউ বোঝাতে যায়ঃ তুমি নিজে ভাল থাকলেই হল ঠাকুরঝি। অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাচবিচার চলে না আজকালকার দিনে।

অনন্ত বলছে, এখনই পনর টাকা করে পাবি। পাশ করলেই হাসপাতালে নিয়ে নেবে, মাইনে সঙ্গে সঙ্গে ডবল। তিরিশটাকা। তুই যা চালাকচতুর, পাশ করতে একটুও আটকাবে না।

বড়বউ চোখ বড় বড় করে বলে, তিরিশ টাকা—ওমা, সে যে এককাঁড়ি টাকা। ভেবে দেখ নমি, ইচ্ছাসুখ খরচপত্তর করবে, কারো কথার তলে থাকতে হবে না—

অনন্ত বলে, তিরিশেই শেষ নাকি, বাড়বে না মাইনে? তার উপরে প্রাইভেট প্রাকটিশ—

ঘাড় নেড়ে নমিতা ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি যাব না। মেয়েলোকে খারাপ হয়ে যায় বাইরের কাজে বেরিয়ে—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে: লাথি-ঝাঁটা মেরে যদি তাড়িয়ে দাও বউদি, পরের বাড়ি যখন ধান ভেনে বাসন মেজে আমার একবেলার ভাতের জোগাড় করে নেবো। তবু আমি বাপের গা ছেড়ে নড়ব না।

বড়বউ মরমে মরে গিয়ে বলে, ছি-ছি এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কেমন করে ঠাকুরঝি? তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে বলা। ঘরবাড়ি তোমাদের—তোমাদের ভাইবোনের। পরের মেয়ে আমরা—তাড়াতে হয়, আমাদেরই তাড়িয়ে দেবে।

ভাল জ্বালা হল দেখছি! সাহেব রাগে গরগর করছে: বলি, মশা কি ঘরের ভিতরের পথ চেনে না, বাইরের যত উৎপাত? ভবিষ্যৎ মুলতুবি রেখে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় এবারে। ঘুমিয়ে পড়—

বড়বউ ক্ষুব্ধ স্বরে অনন্তকে বলে, হে ক'টা দিন বাড়ি আছি ঠাকুরপো, নমির কথা কক্ষনো মুখের আগায় আনবে না। খেতে বোসোগে যাও, ভাত নিয়ে যাচ্ছি।

যাবার মুখে অনন্ত খোঁচা দিয়ে বলল, নাঃ ঘেন্না ধরালি নমি। ব্যবস্থা একটা হতে যাচ্ছিল—কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?

কপালের দুঃখ তুমি কি শোনাচ্ছ ছোড়দা, অহরহ বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। দুঃখের কপাল না হলে মায়ের পেটের বোনকে সরানোর জন্য তোমরাই বা অজুহাত খুঁজে বেড়াবে কেন?

নমিতা হাউহাউ করে কেঁদে পড়ল। বেকুব হয়ে অনন্ত পালাবার দিশা পায় না।

আরও খানিক পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পুরুষরা খেতে বসেছে। বড়বউ মেজবউ পরিবেশন করছে। নমিতা জল পুরে গ্লাস এনে দেয়, নুন দেয় থালার পাশে পাশে। বাড়িতে একপাল বিড়াল—থালার বস্তু থাবা বাড়িয়ে টেনে খায়। বিড়াল তাড়ানো একটা বড় কাজ নমিতার। জোর-জবরদস্তি করে নতুন-বউকেও ওদিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে বড়বউ বলে, ঠাকুরঝি, তুমি কি খাবে ?

নমিতা হেসে হেসে বলছে, হীরের ভাত সোনার ডালনা রূপোর চচ্চড়ি—

বউবউ ঢোক গিয়ে বলে, কত রকমের রান্নাবান্না—বলছিলাম, তুমি কি দুটো মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকবে ?

নমিতা বলে, সে-ও তো অনাচার। তোমাদের জেদে পড়ে করতে হয়। ভাতে আর মুড়িতে তফাত কতটুকু ? চাল সিদ্ধ না হয়ে চাল ভাজা।

বড়বউ ভয়ে ভয়ে বলে, দিন দিন শুকিয়ে সলতে হয়ে যাচ্ছো। আয়না ধরে দেখ না তো—তা হলে টের পেতে। ভাতে মুড়িতে তফাত যদি না থাকে, দুটি দুটি ভাতই না হয়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নমিতা গর্জন করে উঠে : দু-বেলা ভাত খাব বিধবা হয়ে ? জীবনে এই হল—মরণ হয়ে পরের জন্মে ভাল থাকব, তাও হতে দেবে না তোমরা ?

বড়বউ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভারি আমার বিধবা রে ! উনিশ বছরের এক-ফোঁটা মেয়ে—আমার ভোলার চেয়েও দু-বছরের ছোট। সাত ছেলের মা সত্তর-বছরের রাঁড়ি কতজনা মাছ-মাংস খেয়ে দফা সারছে, উনি বিধবাগিরি ফলাতে এসেছেন ! রাখো ওসব।

গলা খাটো করে বলে, তোমার মেজপিসিমা মাছ খেতেন। বউ হয়ে এসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। গুরুজনের নামে মিছে কথা বলি তো মুখে যেন আমার পোকা পড়ে।

নমিতা হাহাকার করে উঠল যেন : বোলো না বড় বউদি, তোমার পায়ে পড়ি—কানে শুনলেও মহাপাপ। যার যা খুশি করুক, মরে গেলেও আমার দ্বারা অনাচার হবে না। আবার যদি বলেছ, মুড়িও খাব না কিন্তু, ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ব।

বিরক্ত হয়ে সাহেব উঠে পড়ল। কথাবার্তা ও আহারাদি চলতে থাকুক, ততক্ষণে আর একটা চক্কোর দিয়ে আসবে। বেড়ার গায়ে বংশী একা রইল।

ধোনাই মিস্ত্রি কেষ্টদাস পাহারাদার—ধোনাই বাড়ির সীমানায় পগারের পাশে, কেষ্টদাস খানিকটা দূরে। এক সাংঘাতিক খবর বলল ধোনাই। মুখে কাপড়-ঢাকা লোক এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এইমাত্র বাড়ি ঢুকে গেল।

চোর তাতে সন্দেহ কি ! শীতকালে থানায় থানায় এখন দশধারার তোড়-জোড়। এ কাজে মুনাফা দুদিক দিয়ে—যশ, অর্থ দুরকমেই। চোর ছ্যাঁচোড় জালে ঘিরছে বলে উপরওয়ালা বাহবা দিচ্ছে, লিষ্টির নাম কাটানোর জন্য নিচের থেকেও তদ্বির আসছে। ঐ মানুষের হতে পারে, তাদেরই মতন দায়গ্রস্ত চোর একটি।

ধোনাই হতাশ ভাবে বলে, কাজ নেই, বংশীকে নিয়ে এসো সাহেব, চলে যাওয়া যাক।

সাহেব বলে, অনন্ত গাঙ্গুলির বাক্সভরা টাকা—গায়ের অর্ধেক রক্ত মশার পেটে দিয়ে খালি হাতে ফিরব?

সে দুঃখ ধোনাইয়েরও। সাহেব প্রশ্ন করে, গেল কোন দিকে লোকটা?

হাত দিয়ে দিক নির্দেশ করে ধোনাই বলে, পলক ফেলতে না ফেলতে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল! আমাদের চেয়ে ঢের ঢের পাকা। ভালরকম খোঁজদারি ঐ কারিগরের পিছনে।

কি ভেবে সাহেব ঘর-কানাচে বংশীর কাছে যায় না, পা টিপে টিপে সেই চোরের পথে চলল।

বেড়ার গায়ে বংশী মগ্ন হয়ে আছে। নতুন-বউ মুখে না না—করে, আর গোগ্রাসে খেয়ে যায়, খাওয়া সেরে সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে। পুরুষদেরও শেষ। অন্য বউরা খাচ্ছে এবার। নমিতা পাথরবাটিতে মুড়ি-গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকখানি দূরে বসেছে।

[ওরে বাবা, কত খায় মেয়েলোকে! চটপট সেরে নাও মা-লক্ষ্মীরা। রাত পোহায়ে যায়, আমাদের কাজকর্ম কখন হবে এর পরে?]

হয় কি করে তাড়াতাড়ি! এর কথা তার কথা, এই বাড়িতেই নতুন-বউয়ের বেশরম কাণ্ডবাণ্ড। পাড়াপড়শির বিবিধ কেচ্ছাকাহিনী। মুখ তো একখানা বই নয়—সেই মুখে খাবে না রসের ঝর্ণা ঝরাবে? বিধাতার উচিত ছিল, মেয়েলোকের মাথার চতুর্দিকে গোটা পাঁচ-সাত মুখ বসিয়ে দেওয়া। তবে সামাল দিতে পারত।

আর শুদ্ধাচারিণী নমিতাসুন্দরীর ভাবখানা দেখ। মুড়ি চিবাতে চিবাতে অকৃত্রিম আনন্দ উদ্ভাসিত বদনে রসের গল্প শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ কী যেন হল তার—গল্পের ভিতর দিয়ে অনাচার লেগে যাচ্ছে, তাই বোধহয় খেয়াল হল এতক্ষণে। দু-চার মুঠো গালে ফেলে তড়াক করে সে উঠে পড়ল। একেবারে নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে সশব্দে দুয়ার এঁটে দেয়। অনাচার তেড়ে এসে ধরে না ফেলে।

বংশী সেইভাবে বসে রয়েছে, হয়তো বা ভুলেই গেছে কাজের কথা। সাহেব এসেছে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—খেয়াল করতে পারেনি। সাহেব হাত ধরে টানল তো বলে, রোসো না—

ফিসফিস করে উল্লসিত মুখে বলে, ভাল ঘরের মেয়েছেলেদের কথাবার্তা

শুনে নাও একটু। ধান ভেনে আর বাসন মেজে মেজে আমাদের মেয়েলোকের রসকষ কিছু থাকে না।

রাতদুপুরে নিরিবিলি খেতে খেতে মেয়ে-বউদের দুরন্ত আসর। ফুলহাটায় মুকুন্দ মাস্টারের আসর নয়—বউয়ের তাড়নায় কুইনিন গেলার মতো বংশী যেখানে বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসে আসত। এ জায়গা থেকে টেনে বের করতে সাহেবকে অনেক বেগ পেতে হল।

দুপুর রাতের ঐ যে নতুন আগন্তুক—চোর না হয়ে কিন্তু পুলিসও হতে পারে। খুব সম্ভব তাই। সাহেবদের খবর কোনরকমে জানতে পেরে ওত পেতেছে। এই বাড়ি কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না আর এখন।

সাহেবকে বংশী বলে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে? নৌকোয় চলো।

তোমরা যেতে লাগো। ঘুমোবার জন্যে কি রাত? ঘুরে ঘুরে খানিকটা দেখেশুনে যাই।

কেষ্টদাসকে ডেকে বলে, থাকবি নাকি রে আমার সঙ্গে?

কেষ্টদাস আনন্দে গলে যায়।

অন্য দু-জন চলে গেলে কেষ্টদাসকে সাহেব ফিসফিস করে বলে, ধোনাই যেখানটা ছিল, সেইখানে চলে যা তুই। পাহারায় থাকবি। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

রহস্যময় সাহেবের চালচলন। মনে মনে কোন এক মতলব ছকেছে। সাঁ করে সে দালানের পাশে চলে গেল। একটা জানলায় কান পাতল। অনেকক্ষণ ধরে আছে, নিশ্বাসটাও বুঝি পড়ে না। একসময় অবশেষে টিপিটিপি সরে এসে—বনতুলসির ঝাড় কতকগুলো, তার ভিতরে বসে পড়ল।

আরো কতক্ষণ কাটল। যে ঘরে সাহেব কান পেতেছিল, তারই একটা দরজা নিঃসাড়ে খুলে গেল একটুখানি। হতেই হবে—এরই জন্য সাহেব ঝোপের ভিতর অপেক্ষায় আছে। মাথায় আলোয়ান-জড়ানো মানুষটা বেরিয়ে আসে। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে অতি, সন্তর্পণে পা ফেলছে। সেই আগন্তুক—ধোনাই মিস্ত্রি এরই কথা বলছিল। আসছে এদিকেই।

হাঁটনা দেখে যে না সে-ই বলবে চোর। সাহেব টিপিটিপি পিছু নিল। সুযোগ বুঝে আচমকা এক ধাক্কা। ঝুপ করে বসে পড়ল মানুষটা—সকলের আগে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে। হাতে সম্পূর্ণ ঢাকে না তো মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—

ছেড়ে দাও বাবা, আর আসব না।

লক্ষ্মীবাবুকে ডেকে তুলি আগে। হাঁক দিয়ে পাড়াপড়শি জড় করি। ছেড়ে দিতে বলে তো তখন সে কথা।

জোড় করে উল্টে ফেলেছে। ফুলবাবু—কোঁচানো ধুতি, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবি, চুলে ফুলেল তেল।

কান মলছি নাক মলছি বাবা, এমন কর্ম আর হবে না। কেঁদে ফেলল মানুষটা। বলে, কে বাবা তুমি ?

লক্ষ্মীবাবুর বন-কাটা মানুষ। বেলদার। বাড়িতে চোর হাঁটাহাঁটি করছে, আমায় তাই পাহারায় বসিয়েছে।

আমি চোর নই। দেখতে তো পাচ্ছ—চোরের মতো লাগে আমায় ?

সাহেব বলে, সে বিচার লক্ষ্মীবাবুর কাছে। ডেকে তুলি বাবুকে। বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এসে পড়ুক—বলি, নিজের ইচ্ছেয় উঠবে, না রদ্দা মেরে তুলতে হবে ?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের সামনে আধুলি বের করে ধরল : পানটান খেও ভাই। আমি এবারে আসি—

দাঁতে দাঁতে রেখে সাহেব চাপা তর্জন করে : গন্ধমাদন নিয়ে তো চলেছ, আমার পানের বেলা আধুলি ?

বলা নেই কওয়া নেই, লোকটার লম্বা ঝুল-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলি বের করে ফেলল। রুমালে বাঁধা গয়না।

লোকটা ব্যাকুল হয়ে ছিনিয়ে নিতে যায় : অবলা বেওয়া মানুষের জিনিস—দায়ে পড়ে খবর পাঠিয়েছিল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। হাতের আংটি খুলে দিচ্ছি—আমার নিজের জিনিস। এই নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধন।

ততক্ষণে অপর পকেট হাতড়ে বেরুল—নোট ভেবেছিল সাহেব, তা নয়—চিঠি একখানা। খামের চিঠি।

সাহেব বলে, অবলার প্রেমপত্তোর কখনো বুঝি পকেট-ছাড়া করো না ? দলিল তোমার, কাজ হাসিলের অস্তোর—উঁ ?

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে : এ সব কি বলো তুমি ?

না জেনে কি বলছি ? আরও বলছি, কলকাতায় পালানোর জন্য ফুসলানি দিচ্ছ অবলা বেওয়া মানুষকে।

গলা কেঁপে যায় সাহেবের। বলল, শখ একদিন মিটে যাবে। তখন তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে—আদিগঙ্গায়, নয়তো বড়-গঙ্গায়।

লোকটা বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সাহেব বলছে, আড়িডর বস্তি নয়তো সোনাগাছি।

দেহে যেন দৈত্য ভর করে বসল হঠাৎ। পা ছুঁড়ে সজোরে লাথি দেয়। ছাড়া পেয়ে লোকটা কৃতকৃতার্থ, একছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী হয়েছে সাহেবের—আশার অতীত লাভ, হাতের মুঠোয় এত দামের জিনিস, তবু কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেষ্টদাসের কাছে এসেও একটি কথা বলে না, হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

চলেছে। খালের ঘাটে ডিঙি—পা চলেছে সেইদিকে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, দেশলাই আছে কেষ্টদাস? ধরা দিকি।

কেষ্টদাস দেশলাই আর দুটো বিড়ি বের করল। একটা বিড়ি সাহেবের হাতে দেয়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে সাহেব বলে, কাঠি ধরাতে বললাম, বিড়ি কে তোর কাছে চেয়েছে?

কাঠি ধরিয়ে সেই চিঠি বের করে। প্রেমের চিঠি—পড়ার আগে জানলায় কান রেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। ডাকের চিঠি নয়, কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। প্রেমরসে কী পরিমাণ হাবুডুবু খেলে মেয়েলোক হয়েও এমন মরীয়া হয়ে ওঠে!

গোটা গোটা অক্ষর—সুধামুখীর ঠিক এমনি লেখার ছাঁদ। সুধামুখী প্রথম বয়সে এক লম্পটকে এমনি লিখত—হতে পারে, দুই যুগ পরে তারই একখানা হাতে এসে পড়ল। সাংঘাতিক চিঠি—অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তখন হয়তো মিনমিন করে বলা যায়। কিন্তু ধীরেসুস্থে কলমের অক্ষরে আসে কেমন করে এই সব কথা?

আসতে পারে মাথা একেবারে যখন বিগড়ে যায়। জীবনে হঠাৎ এক এক মুহূর্ত আসে, মানুষ তখন দুরন্ত পাগল। আর যাই হোক, হাসাহাসি কিম্বা লাঠালাঠি কোরো না পাগল নিয়ে। পারো তো চোখের জল ফেলো।

তুই যেতে লাগ কেষ্টদাস। ডিঙি ছাড়বার আগেই আমি গিয়ে পড়ব।

কেষ্টদাস বলে, একলা কেন? থাকি না আমি সঙ্গে—

কথার উপরে কথা! খুব যে আস্পর্ধা এই ক'দিনের মধ্যে।

তাড়া থেকে কেষ্টদাস এতটুকু হয়ে গেল। সাহেবই তাকে সকলের বেশি টানে। কাজে নিষ্ফল হয়ে মেজাজ তার এখন বিগড়ে আছে।

আবার সাহেব গাঙ্গুলি-বাড়ি ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়: টুক-টুক-টুক। সে মানুষটা যখন ঘরে ঢোকে, কায়দাটা অলক্ষ্যে দেখে নিয়েছে। টুক-টুক-টুক তিনবার, একটুখানি থেমে আবার টুক-টুক-টুক—

দরজা খুলে গেল। ফিসফিস করে প্রশ্ন: ফিরে এলে যে বড়?

সাহেব আলাদা রকম গলায় বলে, তুমিই তো টেনে আনলে। পিদিমটা জ্বালো একবার দেখি—

এমনি স্বরে হুবহু এই কথাগুলোই একটু আগে হয়ে গেছে—আলো জেলে মুখটুকু দেখে নিয়ে সেই পুরুষের কণ্ঠ গদগদ হল। সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি কথা শুনেছে। কলকাতা গিয়ে একখানা ঘর নিয়ে দুয়ের অভিন্ন হয়ে থাকবার পরামর্শ। পরামর্শ পাকা হয়ে গিয়ে তারপর প্রদীপ ধরে ক'খানা গয়না রুমালে বেঁধে ফেলা কলকাতার বন্দোবস্তের জন্য। ব্যাপার দেখে তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের বুঝতে বাকি থাকে না, অতিশয় গভীর এই প্রেম—ছিপে মাছ ধরার মতন সেই গভীর থেকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি দীর্ঘকাল ধরে টেনে টেনে তোলা হচ্ছে।

সাহেব বলছে, ছুটে এলাম তোমায় দেখব বলে—

আবার দেখবে কি? এতক্ষণ ধরে এই তো এত হয়ে গেল!

সোহাগে নমিতা গলে গলে যাচ্ছে। মুখ না দেখা যাক, কথার স্বরে বোঝা যায়।

দরজা খুলে বিছানার উপর নমিতা আলসে গড়িয়ে পড়েছে।

হচ্ছে গো, হচ্ছে। সবুর সয় না মোটে তোমার!

শিয়রে পিলসুজ, তোষকের নিচে দেশলাই। আলো জ্বালতে জ্বালতে নমিতা বলে, কী মানুষ রে বাবা! এই তো গেলে—ভয়ডর একটু যদি থাকে!

কথা শেষ হয় না, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে পড়ে। মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। ছোরা উঁচিয়ে ডাকাত গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আলো পড়ে ছোরা চকচক করে উঠল।

ভয় সাহেবেরও। সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে, আলনা থেকে চাদর তুলে নমিতার উপর ছুঁড়ে দেয়: গায়ে দাও আগে। একটি শব্দ করেছ কি কুচ করে মুণ্ড কেটে নিয়ে চলে যাব। এই কর্ম অনেক করা আছে। তুমি তো পুঁচকে মেয়েমানুষ, কত কত জোয়ানমরদ সাবাড় করেছি।

নমিতা কেঁদে পড়ে: ধর্মবাপ তুমি আমার—

সন্তানের মরশুম পড়ে গেছে আজকের যাত্রায়। ঐ লোকটাও বাপ বলেছিল, 'বাবা—' বলে দে ছুট। ছেলে আর মেয়ে—কী গুণেরই সন্তান দুটি! নমিতা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়া দিল: চোপ! কি আছে তোমার, বের করে দাও—

কিচ্ছু নেই। মিছে কথা বলছি নে। বাক্সর চাবি দিচ্ছি, খুলে দেখ। আড়াই টাকা কি এগারো সিকে আছে কৌটোর মধ্যে। নিয়ে নাও সমস্ত, নিয়ে চলে যাও।

গয়নাপত্তোর ?

বিধবা মানুষের গয়না কী থাকবে বাবা। চাবি দিয়েছি—সত্যি কি মিথ্যে, দেখ খুঁজে তন্নতন্ন করে।

খোঁজাখুঁজি কি—গোটা বাক্স উপুড় করে জিনিসপত্র ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু পুরানো কাপড়চোপড় ছাড়া সত্যিই নেই আর কিছু।

সাহেব ফিকফিক করে হাসে, কী দুষ্টামিতে পেয়ে গেল হঠাৎ। বলে, মাল না থাক, মানুষটা তুমি রয়েছ খাটখানা জুড়ে। পুণ্যের শরীর, আচারবিচার নিয়ে আছ—

বাক্সের জিনিসপত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যি সত্যি সে আলুথালু নমিতার দিকে এগোয়ঃ দেখ তাকিয়ে একবার। চেহারাখানা পছন্দর নয়—বলো না গো !

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নমিতা। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, তা বটে, সেয়ানা চোর সে জিনিসও নিয়ে নিয়েছে—কিচ্ছু ফেলে যায়নি। রজনীকান্ত নয় সে জন—প্রাণকান্ত।

চিঠির উপরে নাম পেয়ে গেছে, সেই নাম বলল। রাগে রাগে সেই চিঠি ও গয়নার পুঁটুলি তুলে ধরে দেখায়ঃ তোমার রজনীকান্ত দিয়ে গেছে—

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। নমিতা উঠে পড়ে যেন উন্মাদ হয়ে সাহেবের পা ধরতে যায়। থরথর করে কাঁপছে। বড় বড় দুটো চোখে ধারা গড়ায়।

দিয়ে দাও ধর্মবাপ আমার। গয়না না দেবে তো চিঠিটা আমায় দাও।

ততক্ষণে সাহেব উধাও। বাড়ির বাইরে অনেকটা দূর চলে গেছে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ—দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। নমিতার কান্নার চেহারা চোখের উপরে ভাসছে। দুশ্চারিণীর স্বল্পাবরণ দেহটার উপর কেমন যেন সুধামুখীর ছায়া পড়েছে। মায়ে-খেদানো সাহেবের মা হয়ে যে সুধামুখী একদিন নদীর কাদা থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নমিতার মধ্যে সেই মা-সুধামুখী।

পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার গাঙ্গুলিবাড়ি। কেষ্টদাসকে সরিয়ে দিয়েছে —দরজায় টোকা দিয়ে বেকুব হয় না কি হয়, কায়দাটা আগেভাগে দেখাতে চায়নি। সরে গিয়েছে ভাগ্যিস, নয়তো এই গয়নার পুঁটলি ফেরত দেওয়া চাউর হয়ে যেত, দলের মধ্যে নিন্দেমন্দ ও ঝগড়াঝাটি হত। ফেরত দিতে যাচ্ছে নমিতার ঘরে নয়, অনন্ত গাঙ্গুলি যে ঘরে শুয়েছে সেখানে—বন্ধ দরজার চৌকাঠের উপর। পুঁটলি রাখল, আর ঐ চিঠি। উড়েটুড়ে যাবে সেই শঙ্কায় ইটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল চিঠির উপর। সকালবেলা অনন্ত দোর খুলে বাইরে এসে দেখতে পাবে—পড়বে চিঠি খুলে, বিমুগ্ধ হতভাগী মেয়েটার সামান্য সম্বল গয়না ক'খানা খুলেপেড়ে রাখবে। তারপরে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে গিয়ে খুলনার

হাসপাতালে নার্সগিরিতে ঢোকাবে। এবং রজনীকান্তের খোঁজ করে উত্তম-মধ্যম দেবে। হোক না হোক, ভাবতে দোষ কিসের? দামি মাল মুঠোয় পেয়ে বোকার মত ফেলে দিয়ে গেলাম—কিন্তু নতুন একটা সুধামুখী আশাভঙ্গ হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, তার মজাটাই বা মন্দ কি! ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটা সুধামুখী তবু কম হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে জুড়নপুরের আশালতার গয়নায় দশধারার দায় মিটে যাবার পর বংশীর কাছে চুপি চুপি সাহেব এই দিনের গল্প করেছিল। বেহিসাবি দুঃসাহসিক কাজ—যে মুরুব্বির কানে যাবে শতকণ্ঠে তিনি ধিক ধিক করবেন। মানা রয়েছে: নষ্ট মেয়েমানুষ যে-বাড়ি এবং লুচ্চো পুরুষের যেখানে আনাগোনা, কদাপি সেখানে যাবে না। হীরেমাণিক পড়ে থাকলেও না। সাহেব ঢুকল কিনা সেই লম্পটের ভেক ধরে। রঙ্গরসিকতাও হল—

সাহেব দুঃখ করে বলছে, দু-মুখো সাপ দেখেছ বংশী, মানুষও তেমনি সব দু-মুখো। বাইরে দেখতে একটা মুখ, পেটে পেটে দুটো। অনাচারের ভয়ে শহরে নার্স হতে যাবে না, আসল কারণ বৃন্দাবন-লীলায় তা হলে ভণ্ডুল ঘটে যায়। লীলাটা নির্ঝঞ্ঝাটে জমবে বলেই কলকাতা পালাচ্ছে। তাই দেখ, এক গলার নলি দিয়ে কেমন দু-রকম কথা বেরোয়। রান্নাঘরে ভাই-ভাজদের সঙ্গে একরকম, শোবার ঘরে পিরীতের জনের সঙ্গে অন্য। এক মুখওয়ালা দেখলাম কাজলীবালা একটি, শুনেছি বলাধিকারীর ব্রাহ্মণী ছেলের আর একজন। ক'জন এমন আছেন, আঙুলে গণা যায়। ওঁরা নিতান্তই একা—একঘরে হয়ে থেকে সারাজীবন দুঃখই পেয়ে যান।

সমস্ত শুনে বংশীও দোষ দেয়: শেষরক্ষা যখন করেছিলে নিয়মকানুনের কথা আমি ধরব না। কিন্তু চোর হয়ে তুমি যে পুলিশের কাজ করলে সাহেব। গাঙ্গুলিবাড়ির জবর চোরটাকে ধরিয়ে দিয়ে এলে।

বংশী বলে কি—যে শুনবে সেই-ই বলবে এমনি। চোরের কুলের কলঙ্ক। পুলিশের কাজ যদি বলতে হয়, এই একবারে তার শেষ নয়। কতবার হয়েছে জীবনে। আপনা-আপনি কেমন হয়ে যায়—জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও সাহেব রোধ করতে পারে না। একবার তো রীতিমতো রোমহর্ষক কাণ্ড—কুমির-চোর ধরা। পুলিশের বাপের সাধ্য ছিল না, সাহেব গিয়ে পড়ে সেই চোর ধরল।

উনিশ

চোরের কাজ নিশাকালে। নিশির কুটুম তাই বলে। দিনমানে যারা করে, তারা চোর নয়, ছিঁচকে। চোরের সমাজে অন্ত্যজ। দায়ে পড়ে এবারে এদের বাছ-বিচার নেই। দিন চলে যাচ্ছে—দারোগার দাবী না মেটালে জুড়ে দেবে দশধারায়। একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। দারোগা তখন নিজে কোমর বেঁধে লাগলেও সহজ হবে না।

যত দিন যায় মরীয়া হয়ে উঠছে ততই। এক দুপুরে দেখা যায়, ধোনাই মিস্ত্রি নদীর কূল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত তুলে ডিঙি থামিয়ে কাদা-জল ভেঙে সে উঠে পড়ল। খবর আছে, খবর আছে! কলাবুনিয়ায় ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুমশায় ধনী-মানী গৃহস্থ। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—রাবণের গোষ্ঠীবিশেষ। অবস্থা ভাল হলেও বাড়িতে দালানকোঠার হাঙ্গামা নেই, মেটেঘর। কতদিকে কত ঘর, গণে পারা যাবে না। গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। রাত্রিবেলা কাজকর্মের নিয়ম, কিন্তু সে নিয়ম এ বাড়ি চলবে না। যা-কিছু দিনমানে। জোয়ান-পুরুষ জন কুড়িক অন্তত, সবাই এখন ভুঁইক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ফিরবে। এক কুড়ি দৈত্যসম মানুষ ঘরে আর দাওয়ায় পড়ে ভোঁস ভোঁস করে কামারের হাপরের মতো নিশ্বাস ছাড়ছে—আওয়াজ কানে শুনেই চোরের হৃৎকম্প লাগে, কাজকর্ম হবে কেমন করে সেই অবস্থায়? ফিরে পালাবে সেই উপায়ও নেই, গোলকধাঁধাঁর মতো অন্ধকার আনাচে-কানাচে শতেক বার পাক খেয়ে মরবে। অতএব যা-কিছু সেরে ফেলতে হবে সূর্যিঠাকুর পাটে বসবার আগে, মরদেরা ঘরে না ফিরতে। কি করবে দেখ এবার সকলে ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে। সাহেব, তুমিই তো একটা দিনমানের খবর চেয়েছিল—খবর নিয়ে তাই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

সাহেব বলে, শুনতে পেলি, ওরে কেষ্টদাস?

গোপীযন্ত্র হাতে কেষ্টদাস সঙ্গে সঙ্গে ছাইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। কণ্ঠী এনেছে মুঠোয় করে, সাহেব তার গলায় বেড় দিয়ে বেঁধে দেয়। নৌকোয় বসে বসে দুজনে রকমারি মতলব করে, তারই একটা খাটিয়ে দেখবে এখন।

ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি ঢুকে বোষ্টমঠাকুর তান ছাড়ল: হরি বলো মনরসনা—ওরে তুই বাঁচবি ক'দিন? ভিক্ষে পাই চাট্টি মা-ঠাকরুন—

ঠাকুরদাসের স্ত্রী বড়গিন্নি রে-রে করে ওঠেন : বাড়িতে অসুখবিসুখ, ভিক্ষে দেওয়া যাবে না বাবাঠাকুর। ভিক্ষে দেয় লোকে সকালবেলা, সন্ধ্যোয় এসে ভিক্ষে চায় এমন তো শুনিনি রে বাবা। এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে একেবারে তুলসিতলায় এসেছে। ওরে ভোলা—

মাহিন্দার ডাকছেন হাঁকিয়ে দেবার জন্যে। নিরুদ্বিগ্ন কেষ্টদাস ততক্ষণে তুলসিমঞ্চের সামনে নিকানো আঙিনার উপর বসে পড়ে গোপীযন্ত্রে গাবগুবাগুব আওয়াজ তুলে চক্ষু বুঁজে পদাবলী-কীর্তন ধরল একখানা। আহা-মরি গলাখানা, প্রাণ কেড়ে নেয়।

কোথায় সন্ধ্যা, বিকালবেলা সবে এখন। গিন্নিবান্নি বউমেয়ে ছেলেপুলে যে যেখানে ছিল একে-দুয়ে এসে জুটছে। গা ধোওয়া, জল আনা, গরুর ফ্যান দেওয়া, বাসন-মাজা, বাচ্চাদের খাওয়ানো-ধোয়ানো—এসময়কার যাবতীয় কাজ বন্ধ। সুরের লহরী খেলে যাচ্ছে কিশোর বাবাজীর কণ্ঠে। পর পর তিনখানা হয়ে গেল—গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন আর রাই-উন্মাদিনী—ফরমাস তবু থামে না : আর একখানা হোক বাবাজী।

বড়গিন্নিই এখন সকলকে সামলাচ্ছেন : হবে বই কি, আবার হবে। জিরোতে দে একটুখানি তোরা। সেবা কিছু হবে না বাবাঠাকুর ? বাবাঠাকুর না বলে বাছাঠাকুর বলতে ইচ্ছে করে। খই-চিড়ে-নারকোলসন্দেশ আছে—দেবো ?

বাবাজি কেষ্টদাস ঘাড় নাড়ে : দিনমানে একহারী মা-ঠাকরুন। ঠাকুর কিছু মুখে ঠেকাব। আমি বলি, আজেবাজে খেয়ে ক্ষিধে মারব না—যদি দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বড়গিন্নি লুফে নিয়ে বলেন, তাই হবে গো বাবা। ভাত, ডাল আর একখানা তরকারি। শেষ পাতে একটু গব্যও দিতে পারব—ঘরের গাইয়ের দুধ, গাছের সবরিকলা, ছাঁচবাতাসা—

অত হাঙ্গামায় কে যাচ্ছে মা-জননী ? গরিব মানুষ—দু-বেলা চাট্টি আলুনি ভাত জুটলে বর্তে যাই—

বড়গিন্নি নাছোড়বান্দা : অন্যখানে কি খাও বাবাজী, সে আমরা দেখতে যাইনে। গৃহস্থবাড়ির উপর আধ-উপোসি পড়ে থাকতে কেন দেবো ?

সে যা হয় হবে—সন্ধ্যেটা আগে পার হয়ে যাক। গানও হবে, অনেক হবে। বিশ্রামের মধ্যে কেষ্টদাস ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিজের কথা। হাটে এসে এক বৈরাগীর আখড়ায় গানে মজে গিয়েছিল। গানে বসলে আর হুঁশ থাকে না। সঙ্গীরা খুঁজেপেতে না পেয়ে নৌকা ছেড়ে চলে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে সে এখন। পয়সাকড়ি শূন্য, তা বলে ভাবনার কি ! রাধাবল্লভের

সংসার—মুখে দুটি অন্ন, রাতের একটু আশ্রয় তিনিই জুটিয়ে দেবেন। না হয় না-ই দিলেন—গাছের তলায় নামগানে বসব, কোন দিক দিয়ে রাত পোহায়ে যাবে টেরই পাবো না।

হতে হতে অনেক পুরানো কথা—পথে-ঘাটে দিন কাটানো ও রাত পোহানোর নানান বিচিত্র কাহিনী। গানের গলা শুধু নয়, গল্প বাঁধাতেও জানে বটে কেষ্টদাস। গল্প করে, আর সতর্ক চোখে বারম্বার ঠাহর করে দেখে, বাড়ির সকলে এসে জুটেছে তো এই জায়গায়—একটা কেউ ছিটকে পড়ে নেই কোনদিকে? টেনে রাখতে হবে আরও খানিকক্ষণ। গল্পে হোক, গানে হোক, হাতে দড়ি পড়ার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকবে এখানটা। শুনছে সকলে তাজ্জব হয়ে। কেষ্টদাস দেখে নিয়েছে, সাঁ করে একজন অনতিদূরের চৌকিঘরে ঢুকে পড়ল। কে আবার—সাহেব ছাড়া অন্ত কেউ নয়।

কুটোগাছটা নড়লে যে আওয়াজ, সাহেবের চলাচলে সেটুকু নেই। পা ফেলে চলে না, মাটির গায়ে যেন ভেসে ভেসে বেড়ায়। সিঁধের কাজে নারাজ এবারের যাত্রায়। বলে, ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছ, সে জিনিস কি আদাড়ে-আস্তাকুড়ে বের করব? তার জন্যে চাই ভাল ক্ষেত্র, উত্তম বন্দোবস্ত। এখানে বিনা সরঞ্জামে যদ্দুর যা হাতড়ে নেওয়া যায়।

সেই মতলব নিয়ে এসেছে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি।

চৌরিঘরে ঢুকে গিয়ে সাহেব পিছন-দরজা খুলে দিল। ক্ষিপ্র হাতে কাজ চলছে। গল্পের জোর আলগা হয়ে আসে বুঝে দরাজ গলায় গান জুড়ল আবার নিমাই-সন্ন্যাস। বড় মোক্ষম পালা। শচীমাতার দুঃখে চোখের জলে ভাসবে না, এতদূর পাষাণহৃদয় অন্তত স্ত্রীলোকের মধ্যে নেই।

গান শেষ করে পশ্চিম-আকাশে মুখ তুলে কেষ্টদাস বলে, এইবারে মা-ঠাকরুনরা একটিবার ছেড়ে দেবেন। পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে জপটা সেরে আসি। এসে উনুন ধরাব। ভালই হল। কর্তারা সব এর মধ্যে এসে যাবেন। নামগান তাঁরাও শুনবেন দু-একখানা।

পুকুরঘাটের নাম করে কেষ্টদাস ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে বলে, কষে বাও এবারে। গান গেয়ে গল্প করে বিস্তর খাটনি খেটে এসেছে, তা বলে উত্তেজনার মুখে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকতে পারে না। গোপীযন্ত্র ফেলে নিজেও বোঠে তুলে নিল। যা কিছু লভ্য হল, নিয়েথুয়ে দৌড় দাও এবারে। নৌকো নিয়ে দৌড়।

খান দুই বাঁক পার হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত কেষ্টদাস বলে, পড়ল কিছু জালে?

সবাই নিজেদের লোক, ঠারেঠোরে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সহজ ভাবের কথা মুখে আসে না। বলছে, মাছটাছ হল কিছু?

সাহেবের সঙ্গে ডেপুটি ছিল বংশী, পাহারাদার ধোনাই। রামদাস নৌকোর পাহারায় ছিল। গুরুপদ নেই, থাকবার কথাও নয়, ওপারের দিকটা খোঁজদারি করে বেড়াচ্ছে। বংশীই ঘাড় কাত করে কেষ্টদাসের কথার জবাব দেয়: হ্যা—

সাহেব দেমাক করে বলে, পানা তুলে পুকুর তুই সাফসাফাই করে দিলি, আমি লোকটা খেওন ফেললাম, মাছ হবে না কি রকম!

তার মানে, বিস্তর জায়গায় বেকুব হয়ে এসে এইবারটা হয়েছে। পুলকিত কেষ্টদাস প্রশ্ন করে, রুই-কাতলা?

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, মনে তো লয় ভাই—

সাহেব বলে, রুই হোক, কাতলা হোক, একটাই। একের বেশি দুই নয়। পাটার চালি উঁচু করে দেখ্।

দেখে নেয় কেষ্টদাস বস্তুটা। মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স—তিন জায়গায় তালা ঝুলছে। খোলা সহজ হবে না, ভাঙতে হবে।

বংশী বলে, কাপড়চোপড় বাসনকোসন আরও কত কি ছিল, সেসব আমরা ছুঁতে যাইনি। এই এক জিনিস বয়ে আনতেই তিন তিনটে মরদ হিমসিম খেয়ে গেলাম—অন্য দিকে চোখ মেলে কি করব?

বাক্সের ভিতরটা না দেখা পর্যন্ত মনে কারো সোয়াস্তি নেই। কিন্তু আপাতত হয়ে উঠছে না। কাটাখালির মুখে সন্ধ্যার পর ডিঙি বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—গুরুপদ ওপারের খবরাখবর নিয়ে এসে গেছে সেখানে এতক্ষণ। পথের মাঝে এই কাজটা পড়ে দেরি করিয়ে দিল। তাড়িয়ে চলো ভাইসব দেরি হয়ে গেছে। গুরুপদকে তুলে নিয়ে তারপর কোন নিরালা ঠাঁই খুঁজে তবে বাক্স খোলা।

বাঁক ঘুরে যেতে জোর পিঠেন বাতাস। গাঙেও টান খুব। বড় আরামের যাওয়া এবারে—বোঠে জলের উপর ছুঁয়ে আছে, তরতর করে ডিঙি ছুটছে। নিম্ন কণ্ঠে গল্পগুজব করে সকলে, তামাক খায়। মনের স্ফূর্তিতে নাচতে ইচ্ছে করে।

বাক্সের ভিতরে কি, ধোনাই আর বংশীতে তাই নিয়ে তর্ক। ধোনাই বলে, লোহালক্কড়—কুড়াল-কোদাল, দা-বঁটি। ঐটুকু এক বাক্স আনতে জীবন বেরিয়ে গেছে। লোহা ছাড়া এমন হয় না।

বংশী বলে, পাথরের জিনিস নয় কেন? শিল-নোড়া, জাঁতা—

সাহেবের কানে পড়তে সে ধমক দিয়ে উঠল: আচ্ছা ছোট মন তোমাদের! আন্দাজই যখন, সোনাদানা মনে আসে না কেন? লোহা বলো, পাথর বলো সোনার চেয়ে ভারী কি আছে?

রামদাস তামাক খাচ্ছিল। হুঁকো থেকে মুখ তুলে বলে, তিন তিনটে তালা লাগিয়েছে—ঠিকই তো, পাথর-লোহা তালা দিয়ে রাখতে যাবে কেন? বাক্স সোনায় ভরা, খোলা হলে তখন দেখবে।

সাহেব হেসে আরও একপদ চড়িয়ে দেয়: শুধু সোনা কেন, সেই সঙ্গে মণি-মুক্তো থাকতে দোষ কি?

বংশী বলে, দারোগা মুন্সি জমাদার সকলকে একবাঁট দু-বাঁট করে সোনা দিয়ে দেবো। দিয়ে খত লিখিয়ে নেবো, কারো নামে কোনদিন দশধারা মামলা না গাঁথে। থানাওয়ালাদের খুশি করে তারপর নিজেরা এক একতাল হাতে নিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। ইহজন্মে আর কাঠি ছোঁব না। উঠানের বাইরেই যাব না মোটে, ছেলে কাঁধে করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।

মহানন্দে আগড়ুম-বাগড়ুম বকে চলেছে। রামদাস হুঁকো এগিয়ে ধরে বংশীর দিকে: তামাক খাও বংশী

বংশী হাতও বাড়িয়েছে নেবার জন্য। ঠকাস করে হুঁকো-কলকে পড়ে যায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তামাক মাথায় উঠে গেছে এখন—কালো একটা রেখা ছুটে আসছে না? দেখ তো, দেখ দিকি ঠাহর করে—ধনুক থেকে যেন তীর ছুঁড়ে দিয়েছে, এমনি বেগে আসছে। কাঁপা গলায় বংশী বলে, দেখ না—ঐ দেখ—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, গাঙের উপর সোজাসুজি বেয়ে পারা যাবে না, ধরে ফেলবে এক্ষুনি—

হতে পারে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর লোক। অথবা পিটেল। পেট্রোল-পুলিশ নৌকো এবং মোটরলঞ্চ নিয়ে জলপথ পাহারা দিয়ে বেড়ায়—চলতি নাম পিটেল। ফাঁকা নদীতে পিটেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরে সরু খাল একটা নজরে আসে। খালে ঢুকে পড়ে গা-ঢাকা দেওয়া—সেই একমাত্র উপায়। নতুন আমদানি হলেও কেষ্টদাসের এমন কিছু নয়—কিন্তু রামদাসের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তারও চেয়ে বেশি বংশীর। বমাল সমেত পেয়ে গেলে কত বছর ঠেসে দেবে, ঠিকঠিকানা নেই। বউকে বলে এসেছে কুটুমবাড়ি চললাম—এখন যে কুটুম্বর বাড়ি পাকাপাকি ঘরবসতের গতিক। আবার যেদিন বাড়ি যাবে, বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেছে তখন। বাপ বলে চিনবে না। পরিচয় দিলে তখনও চোর বাপকে চিনতে চাইবে না।

এত কথা লহমার মধ্যে মনে খেলে যায়। সেই পিছনের বস্তুটা জলের উপর একটা কালো কৌটার মতো দেখাচ্ছিল—এইবারে পুরোপুরি নৌকো

হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপ-নৌকো—বাইচ খেলায় যে বস্তু নামায়। বাতাসের আগে চলে। একটি লহমা—খালের মধ্যে ঢুকে পড়তে যেটুকু দেরি। হতে পারে, ছিপনৌকো তাদের ঠাহর করতে পারেনি, যেমন আসছে সোজা গাঙ ধরে বেরিয়ে যাবে। আশা করা যাক এমনি—আশা একটা তো চাই।

খালে ঢুকতে গিয়ে—কী সর্বনাশ! দুই প্রকাণ্ড ভাউলে-নৌকো দুই দিকে বেঁধে রেখেছে। জল-পুলিশের এই কায়দা—বাহিরে-গাঙে তাড়া করে খালে এনে ঢোকায়। ডিঙি যেই মাত্র ঢুকে যাবে, দুদিকেই দুই ভাউলে আড়াআড়ি হয়ে সরু খালের মুখে আটকাবে। বনের হাতি তাড়িয়ে-তুড়িয়ে খেদায় ঢুকিয়ে যেমন মুখ আটকে দেয়। এমনিতরো কাজে মার্কামারা সরকারি সাদা-বোটের কদাচিৎ ব্যবহার। বুঝতে পেরে মানুষ তো সতর্ক হয়ে যাবে। সাধারণ নৌকো ভাড়া করে পিটেল ওত পেতে থাকে, যেমন এই ভাউলে দুটো। পিছু নেয়—সে-ও সাধারণ নৌকো ছুটিয়ে। যেমন ঐ ছিপনৌকো। মাঝিমাল্লার সাজে যারা রয়েছে, জাঁদরেল পুলিশের লোক তারা। লোক-দেখানো দাঁড় টানে হাল বায়, পাশে গুলি-ভরা বন্দুক। দরকার হলে মুহূর্তে নিজমূর্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠবে।

চোখাচোখি নিজেদের মধ্যে। মতলব ঠিক হয়ে গেছে। ছুটছিল ডিঙি, গতি থামিয়ে দিল। বোটে সবগুলো জলের উপর তুলে ধরেছে—নৌকো চলে কি না চলে। কাড়ালের দিকে ছইয়ের অন্তরালে বাক্সটা তুলে ধরে নামিয়ে দিল গহিন গাঙের জলে।

বমাল লোপাট—আর এখন কি করতে পারিস? বংশী আর ধোনাই মিস্ত্রি দাগি দুটো লোক আছে বটে ডিঙিতে—কিন্তু তাদের কি অন্য কাজকর্ম থাকতে নেই? হাটবাজারে কিংবা আত্মীয়-কুটুম্বর গাঁয়ে যেতে পারে না? ঠিক করাই তো আছে—ধান কাটতে গিয়েছিলাম দক্ষিণের নাবালে; কাজকর্ম শেষ, হেলতে দুলতে এবার ঘরে ফিরছি। লেজা-সড়কির কথা যদি বলো—বাঘকুমিরের মুখে পড়ি না চোরডাকাতের হাতে পড়ি, আপদবিপদের জন্য রাখতে হয় দু-একখানা। সবাই রাখে।

খালে না ঢুকে বড়-গাঙ ধরেই চলল। বমাল ফেলে হালকা হয়েছে, আর এখন কিসের ভয়? পিছনের ছিপ ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে, সাহেব একনজরে সেদিকে তাকিয়ে। কান খাড়া।

বাক্সর শোক ধোনাই ভুলতে পারছে না। নৌকোয় নামানোর সময় হাত ছেঁচে গিয়েছে, ফুলে উঠেছে ক'টা আঙুল। একবার সে আঙুলের দিকে তাকায়, একবার অতল জলের দিকে। আর বিড়বিড় করে কেষ্টদাসের সঙ্গে

দুঃখ করে। এমনি সময় সাহেব বংশীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, শোন দিকি ভাল করে। কি শুনতে পাও ?

মনে হয় বটে, ছিপের মানুষ কাছাকাছি হয়ে বোঠে মারার কায়দা বদলেছে। বোঠের মুখে যেন কথা বলতে চায়—যার নাম চোরসংজ্ঞা। ঠিকমতো হচ্ছে না। হতে পারে কাঁচা-হাতের চেষ্টা।

বংশীর এক বাচ্চা মারা গেলে চিন্তায় পুড়িয়ে গাঙের জলে দিয়েছিল। আজকের এই বাক্স-বিসর্জনের ব্যাপারটা সেদিনের মতোই সে নিঃশব্দে চোখ মেলে দেখেছে। এতক্ষণে হায়-হায় করে উঠল : মিছামিছি গেল জিনিসটা। ভাল করে চেয়ে দেখলে না, পাগল হয়ে উঠলে যেন তোমরা।

ধোনাই বলে উঠল, সোনা বেচে পয়সার পাহাড় হত রে! গোলায় যদি রাখতাম, গোলা ভরতি হয়ে যেত। অ্যাঁ, কেষ্টদাস ?

কেষ্টদাসকে সালিশ মানল। বাক্স ফেলার প্রধান উদ্যোগী সাহেব—তার দিকে কেষ্টদাস একবার তাকায়। লজ্জা পেয়ে হাসছে সাহেব মৃদু মৃদু। কেষ্টদাস উল্টো কথা বলে : সোনা না ঘোড়ার ডিম! অতগুলো বউয়ের কারো গায়ে সোনার গয়না দেখতে পেলাম না। সোনা কখনো কুণ্ডুরা চোখে দেখেছে! শিলনোড়া দা-কুড়ুল এই সব। বাক্স খুলে দেখে আমরাই তো ফেলে দিতাম, একটু আগে না হয় ফেলা হয়ে গেছে।

ধোনাই গরম হয়ে বলে, কী করে বুঝলি তুই ? শিলনোড়া বয়ে আনতে গেছি—আমাদের কোন আন্দাজ নেই, আমরা বোকা ?

কেষ্টদাস হেসে উঠে বলে, এইরকম তুমিও বুঝে রাখ না। মন ঠাণ্ডা হবে।

ছিপ আরও কাছে এসে গেছে। এখন আর সন্দেহমাত্র নেই। সাহেব প্রবোধ দিয়ে বলে, মুশড়ে গেলে যে তোমরা! রাজার ভাণ্ডার একটা, চোরের ভাণ্ডার রাজ্য জুড়ে। বাক্স গেছে, সিন্দুক এসে পড়বে দেখো। ধনসম্পত্তি যতদিন লোকের ঘরে আছে, আমাদেরও আছে। শুধু এনে ফেলার অপেক্ষা।

বংশীর পিঠে এক থাবা ঝেড়ে দিয়ে চাঙ্গা করে : বেরিয়েছি যখন, তোমার দশধারা ঠেকাবোই। গুরুর দেওয়া সরঞ্জাম আমার গায়ে, সেই জিনিস ছুঁয়ে কিরে করছি। কালনাগ-সাপের মাথার মণি যদি খুলে আনতে হয়, তাই নিয়ে আসব তোমার কাজে।

যে কথা বলল, সত্যি সত্যি করেও ছিল তাই। সদ্য বিয়ের বউ আশালতার গায়ের কাছে শুয়ে একটা-একটা করে গয়না খুলে আনল। মন্ত্র পড়ে কালনাগের মাথার মণি নিয়ে আসা এর চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

ছিপ এখন একেবারে কাছে। হঠাৎ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে : কারা যাও তোমরা? মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলে, মজা করি একটু।

ছিপনৌকো থেকে মিনমিনে গলার জবাব আসে : ব্যাপারি—

কোন্ জায়গার ব্যাপারি? কি নাম? কিসের বাণিজ্য? সারবন্দি খাড়া হয়ে সব দাঁড়াও।

ডিঙির সাঙাতদের ফিসফিস করে বলে, ওরা চোর—আমরাই যেন পিটেল-পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরে যাচ্ছি।

ছিপ নৌকোর বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শলাপরামর্শ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। হুকুম-মাফিক কেউ উঠে দাঁড়ায় না।

চাপা গলায় বংশী তর্জন করে : অবাক কাণ্ড, এই সময়টা রঙ্গরস লাগল তোমার! এত বড় লোকসানও মান লাগে না, কী মানুষ তুমি বলো দিকি—যোগীঋষি না কাঠপাথর?

সাহেব একমুখ হাসি নিয়ে ছিপের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দেয় : হল কি তোমাদের, কথা কানে যায় না বুঝি?

দাঁড়িয়ে পড়ত তারা ঠিকই, কিন্তু বংশী মজাটা পুরোপুরি হতে দিল না। এ রকম হাসিমস্করা বড় বিপজ্জনক। তুমি আজ করলে, ওরাও কোনদিন অন্য কারো সঙ্গে করবে। রীতিনিয়ম তো উঠে যাবে এমনি হলে। তাড়াতাড়ি বোঠে তুলে নিয়ে বংশী জলে বাড়ি দেয়। গাবতলির হাটের নিচে সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন করেছিল। এ কাজে বংশীর জুড়ি নেই।

বাড়ির পর বাড়ি। টেলিগ্রাম-যন্ত্রের টরে-টক্কার মধ্যে কথা—জলে বোঠে মেরে মাচ্ছিমাল্লাও তেমনি কথার চালান দেয়। ঝিমিয়ে-পড়া ছিপ মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল। তরতর করে ডিঙির পাশে এসে গায়ে গায়ে লাগায়। পরিচয় হয়ে গেল, ভাইয়ে ভাইয়ে একেবারে গলাগলি এখন।

নিতান্ত উপমার কথাও নয়। বংশী আর চাঁদমিঞা একই দলে কাজ করে এসেছে। গোড়ার দিকে চাঁদমিঞার রাগ যে না হয়েছিল এমন নয়। পুরানো সাঙাত পেয়ে ভুলে গেল। পান-তামাকের লেনদের এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। দশরকম সুখ-দুঃখের কথাবার্তা। খালের মুখের জোড়া-ভাউলের বৃত্তান্তও চাঁদমিঞার কাছে পাওয়া গেল। ব্যাপারি-নৌকো সত্যি সত্যি। হাটে হাটে মাল গস্ত করে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন গাবতলির হাট থেকে-চাঁদমিঞা নজর ধরে আছে, ফাঁকায় পেলে একটু মোচড় দিয়ে দেখবে। কিন্তু হল না, হবার উপায় নেই—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে চাঁদমিঞা বলে, এই আজ বিকেলেই পিটেলের নৌকো দেখলাম। ওরা এবার বড্ড লেগেছে। পুলিসের দিকে এক চোখ এক

কান আর মক্কেলের দিকে একচোখ এক কান—ভাগাভাগি করে কাজকর্ম হয় কখনো? দূর, দূর! কারিগর না হতে গিয়ে পুলিস হতাম, অনেক ছিল ভাল। অনেক বেশি রোজগার।

একটা গাঙের মুখে এসে চাঁদমিঞা ডাইনে ঘুরল। এরা ছুটেছে কাটাখালি মুখো।

কাটাখালিতে গুরুপদ সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষায় আছে। কাজের কিছু নয় মক্কেলের খবরাখবর নেই, শুধু-শুধু হয়রানি। তার উপরে হোঁচট খেয়ে সে ভূঁইয়ের আল থেকে কাঁটাবনে পড়েছিল, গণ্ডা দশেক কাঁটা ফুটে আছে পায়ে। মন মেজাজ তিরিক্ষি। বাক্স ফেলার বৃত্তান্ত শুনে এই মারে তো এই মারে। বলে, বিধাতাপুরুষ হামেশাই মানুষকে দেয় না, জন্মের মধ্যে একবার হয়তো দিল। হাতের লক্ষ্মী বিসর্জন দিয়ে এলে, আমি বাপু নেই আর তোমাদের সঙ্গে। অপয়া তোমার সব। তিলকপুরে সেবারে জান নিয়ে কোন গতিকে ফিরেছিলাম—এবারে আরও সাংঘাতিক হবে, বুঝতে পারছি।

মক্কেলের অভাবে রাত্রে বেরুনো হল না। কাটাখালি খেজুরবনের পাশে চাপান দিয়ে রইল। গুরুপদ একটি কথা বলল না কারো সঙ্গে, শেষরাত্রে নেমে বাড়ির পথে হাঁটল।

কেষ্টদাস বলে, যাকগে, বয়ে গেল। বুড়োবয়সে কষ্ট করে পারে না, ঘরেও মনটা টেনেছে—তাই একটা ছুতো।

কিন্তু প্রধান উদ্যোগী বংশীও মিইয়ে গেছে। লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি আর নয়। মুনাফা নেই—বরঞ্চ পিটেল—পুলিসের যা খবর, বিপদ আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। দশধারার মামলা কাঁধে ঝুলছিল, দিন সংক্ষেপ হয়ে এখন মাথায় পড়েছে। মরীয়া হয়ে একবারের সর্বশেষ চেষ্টা। ফুলহাটায় যাই চলো, বলাধিকারী মশায়ের শরণ নিইগে। তিনি ছাড়া সুরাহা হবে না। বলাধিকারী থাকবেন মাথার উপরে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য হবে খুঁজিয়াল। ক্ষুদিরামকে ধরে পড়ব গিয়ে, দায় জানাব। দয়া আছে মানুষটার। দয়ার চেয়ে বড়—দুঃসাহসের কাজে নামবার ঝোঁক। এখনো—এই বয়সে।

বলাধিকারী ডাকলেন, এরা কি বলছে শুনে যান একটু ভটচাজমশায় বড্ড ধরাপাড়া করছে।

ডাকাডাকিতে ক্ষুদিরাম এলো। বংশীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, টহলদারি শেষ হল—বেগ মিটেছে তো ভাল করে? রাত পোহাতে তা হলে কাকের ডাকই লাগে, পেঁচার ডাকে হয় না কি বলো?

অতএব দলের ভিতরের আজেবাজে কথাবার্তাগুলোও ক্ষুদিরাম জেনে বসে আছে। হাতের পাতায় বিধাতাপুরুষের হিজিবিজি গড়গড় করে পড়ে যায়—ও-মানুষের সঙ্গে কে পারবে ? কান পেতে শুনতে হয় না, মুখে তাকিয়েই সে বোঝে।

গুরুপদর উপর রাগটা বেশি। ক্ষুদিরাম বলে, ডাকো একবার ঢালির পো'কে। এখন সে কী বলে শোনা যাক।

নেই, কেটে পড়েছে। কাতর হয়ে বংশী বলে, দায় উদ্ধার করতেই হবে ভটচাজমশায়। পাদপদ্মে এসে পড়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

সত্যি সত্যি পা চেপে ধরতে যায়। দু-পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, এক্ষুনি তার কি ! তোমাদের দায় বলে ক্ষেত্তোরখানা অমনি তো আকাশ থেকে পড়ছে না। খুঁজেপেতে দেখব, সময় লাগবে।

জগবন্ধু বল্যাধিকারী, দেখা যায়, এদের পক্ষেই আছেন। তিনি সুপারিশ করেন : রাখুন দিকি ! আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো নখের আগায় নিয়ে ঘোরেন ; তাদের খবর টপাটপ বলে দেন। এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে যেমন-তেমন একখানা ক্ষেত্তোরের খোঁজে আপানার এক যুগ বারো বছর লাগবে ! ঘেন্নার কথা আর বলবেন না, হাসবে লোকে।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষুদিরাম চোখ বুঁজে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখস্থ করার মতো বলে যায়, নবগ্রাম সেনদের বাড়ি। কাজখানা আজকেই নামানো চলে। উঁহু, আজ ঠিক হবে না। সেনদের সাবেকি দালান-কোঠা—দেয়াল কমপক্ষে আড়াই হাত পুরু। দেয়াল কাটতেই রাত কাবার। কোন দরকার নেই, সবুর করো পাঁচটা সাতটা দিন। মক্কেল জুড়নপুরে ফিরে যাক। মেটে-ঘর সেখানে—দোঁআশলা মাটি। একটু একটু জল ছিটালে মাটি মাখনের মতো আপনি গলে আসবে।

সগর্বে বলাধিকারী সকলের দিকে চেয়ে বলেন, দেখ, আমি কি মিথ্যে বলেছি ? অথচ দু-তিন মাসের মধ্যে ভটচাজমশায় গাঁয়ের বাইরে যাননি। না, তারও বেশি, কালীপূজার পর থেকেই তো বেরোননি।

ধোনাই মিস্ত্রি অবাক হয়ে বলে, মুলুকের খবরও গণেপড়ে বলে দিলে ?

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরামই তখন রহস্যভেদ করে : না হে বাপু। আমি কিছু গণতে যায়নি, মক্কেলরা গণাতে এসেছিল।

গণাতে এসেছিল এক মেয়েওয়ালা। পাত্র নবগ্রাম সেনবাড়ি শঙ্করানন্দ। প্রথম পক্ষ গত হতে না হতে ভাগাড়ে গরু মরলে কাক-শকুনের যেমন হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে।

কোষ্ঠি হাতে করে এক কন্যাপক্ষ উপস্থিত : সেনরা পাজিপুঁথি বড্ড মানে। রাজযোটক হলে এক পয়সা পণ লাগবে না। আপনি ব্যবস্থা করে দিন সামুদ্রিকাচার্য মশায়।

ক্ষুদিরাম বলে, পাত্রের কুষ্ঠিও নিয়ে আসুন। না মিলিয়ে যোটক-বিচার কেমন করে হবে?

দেবে না, ঘুঘু আছে সেদিক দিয়ে। পাত্রের কুষ্ঠি তারা হাতে রেখে দিয়েছে। যা-কিছু এই-কনের কুষ্ঠি থেকেই। সেই জন্যেই তো আসা আপনার কাছে। কুষ্ঠিটা মেরামত করে পুরানো তুলট-কাগজে লিখে দেবেন—পাত্রের কুষ্ঠি যেমনই হোক, রাজযোটক হয়ে দাঁড়ায় যেন।

ক্ষুদিরামের মুখ দেখে কি বুঝল কে জানে। জোর দিয়ে বলে, কেন হবে না? রানী ভবানী, সুরেন বাড়ুয্যে চাই কি আকবর বাদশা—গোটাকয়েক দিকপাল মানুষের ছক থেকে জুড়েতেড়ে বসিয়ে দিন। কনের কুষ্ঠি দেখে ছেলেওয়ালারা হাঁ হয়ে যাবে, লগ্নপত্তোর করতে সবুর সইবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কালোকুৎসিৎ চেহারা, দুটো গজদন্ত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, চুলও পেকেছে দু-চারটে। কিন্তু হলে হবে কি—শঙ্করানন্দ সেনবাড়ির ছেলে। আর এক মস্ত কথা, আগের বউ সন্তান রেখে যায়নি, অঢেল গয়না রেখে গেছে আপাদমস্তক পরেও যা শেষ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে দিল: কুষ্ঠি জাল করা আমার দ্বারা হবে না।

জাল কেন বলেন? অরক্ষণীয়া মেয়ে কাঁধে—যাতে নামাতে পারি, তার জন্য এদিক-সেদিক খানিকটা মেরামত করে দেওয়া। করে তো সবাই।

তার কাছে যান।

কাজটা যে নিখুঁত চাই। সেনরা বড্ড ঘড়েল, ধরে না ফেলে। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা হয় না। যে রকম দক্ষিণায় পোষায়, তার জন্য আটকাবে না।

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয়: চলে যান, এক্ষুনি—

যেতে যেতে কন্যার পিতা কটু মন্তব্য করে: কী আমার ধর্মঠাকুর রে! কলি তরাতে এসেছেন—আরও যদি না জানতাম!

ক্ষুদিরাম নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, আমি লোকটা মেকি। কিন্তু সামান্য একটু বিদ্যে নিয়ে আছি, জেনেশুনে তার মধ্যে ভেজাল ঢোকাতে পারব না।

এই মানুষটির সঙ্গেই ক'দিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল। কৌতুহলী ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে: কুষ্ঠি মেরামত হল আপনার?

এখন হয়ে কি হবে! আপনার জন্যেই তো মশায়! মর্মান্তিক ক্রোধে ক্ষুদিরামের উপর সে খিঁচিয়ে উঠল: আপনাকে না পেয়ে খুলনায় জ্যোতি-ভূষণমশায় অবধি ধাওয়া করতে হল। ফিরে এসে শুনি, জুড়নপুরের এক মেয়ের জন্য এর মধ্যে গেঁথে ফেলে দিয়েছে। লগ্নপত্তোর দিনক্ষণ নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন সারা।

বিয়ের তারিখ এগারোই—সেই লোকের কাছেই শুনেছিল। কর গুণে ক্ষুদিরাম এবার হিসাব করেছ: আর আজকে হল ষোলই। পাচ দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কনে এখন শ্বশুরবাড়ি—নবগ্রামে। বিয়ের যাত্রায় কদ্দিন আর থাকবে? আরও চারটে পাঁচটা দিন ধরো। তারপরে মকেল জুড়নপুর যাবে। কাজ সেইখানে।

বংশী আবদারের স্বরে বলে, খোঁজ দিয়েই হল না। আপনাকে যেতে হবে ভটচাজমশায়, সাথেসঙ্গে থাকবেন। শিরে-সংক্রান্তি আমাদের, তড়িঘড়ি ভালো কাজ নামাতেই হবে একখানা।

ক্ষুদিরাম লুফে নিয়ে বলে, যাবোই তো। জবর কাজ--হাজারে একটা আসে এমন। ঘরে বসে থাকতে মনই বা মানবে কেন? কিন্তু কারিগরের বুকে বল আছে তো? ঢলঢলে ছুঁড়ি, ভরভরন্ত যৌবন— তার ঘরে ঢুকে গয়না নিয়ে আসা।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে ওঠে, ওস্তাদের যে দিব্যি দেওয়া—

ক্ষুদিরাম মুখ ঘুরিয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, তোমাদের নয়, আমি সাহেবকে বলছি। ঘর নয় সে টাকশাল। রূপো-তামা নয়, শুধুই সোনা। বিয়ের কনের গা থেকে সোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসা।

সাহেব জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে। বংশী শিউরে উঠে বলে, ডবকা মেয়ের গায়ে হাত!

সাহেব মৃদু মন্তব্য করে: বিয়ে হয়েছে সে মেয়ের, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তো অর্ধেক-বুড়ি।

বলাধিকারী এতক্ষণে এইবার বললেন, কায়দাটা হল, বরের মতন টুক করে সেই মেয়ের পাশে শুয়ে পড়বে। মন তুলবে না গা কাঁপবে না—বড্ড কঠিন কাজ। ধরো, ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে তোমায় গায়ের উপর টানল—

অবহেলায় ভাবে সাহেব বলে, দীঘির পাড়ে কালকেউটে পায়ে উঠেছিল। তাতেও গা কাঁপল না, মেয়েমানুষে কি হবে?

বলাধিকারী বলেন, জেগে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। ও বয়সের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

সাহেব বলে, বাইটা মশায়ের ব্যবস্থা আছে। নিদালি-পাতা—বড় মোক্ষম জিনিস। পাতার বিড়িও মুখে নেবো। সকলের উপরে এই আমার রয়েছে—

হাত দুটো তুলে ধরে দু-হাতের আঙুল সগর্বে সঞ্চালন করে: দশ আঙুলে এই আমার দশ-দশটা কিঙ্কর। আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। এ জিনিসও ওস্তাদের কাছে পাওয়া। পরখ হোক না বলাধিকারী মশায়, শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ওস্তাদের উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সাহেব হাঁটুর কাপড় সরিয়ে পায়ে-বাঁধা কাঠিতে হাত ঠেকায়। বলে ওস্তাদ হাত তুলে দিয়েছেন, শক্ত কাজেই এ জিনিসের বউনি। আশীর্বাদ করুন বলাধিকারীমশায়, জিনে এসে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো।

কুড়ি

কাজের মতো কাজ একখানা—আশালতার গায়ের গয়না খুলে আনা: আগে যেসব হয়েছে তার কোনটি কাজ নয়, খেলা—কাজের নিয়মকানুন না মেনে ছুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কোন একখানে। সিঁধকাঠি যদি হয় রাজদণ্ড, রাজদণ্ড হাতে সাহেবের প্রথম প্রবেশ জুড়নপুরে আশালতার ঘরে। সিঁধের কাজও এই প্রথম।

কাজে নেমেই জয়জয়কার। বলাধিকারী শতকণ্ঠে তারিপ করছেন। তা-বড় তা-বড় পুরানো কারিগরের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেছে। হিংসা সকলের: ছোকরা-মানুষ লাইনে এসেই কী তাজ্জব দেখাল! যারা এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলল, তারাও এমন জিনিস ভাবতে পারে না। বিশ্বাসই করে না অনেকে। বলে, হতে পারে না, বাজে কথা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত হৈ-হৈ, সে কেমন ঝিম-ধরা হয়ে আছে। যুবতী নারীর গায়ে বিষ, সে রাত্রে বিষের ছোঁয়া লাগল। জলুনির সেই থেকে বিরাম নেই। বুঝি যৌবনের জলুনি। ছুতো করে সাহেব জুড়নপুর গেল—রাতে যে মক্কেল মাত্র, দিনমানে নারীর রূপে দেখবে তাকে। গিয়ে আবার নতুন গোলমাল—রেলের কামরার সেই মা-জননী, সর্বনাশ তাঁদেরই করে এসেছে। সবিস্তারে মা গয়না-চুরির কথা বলতে লাগলেন: রাজরানীর সাজে তারা বউ পাঠাল—ভাববে, বাপের বাড়ির লোক অভাবে পড়ে গয়না বেচে খেয়েছে। সেই

মুহূর্তে এক মতলব আসে সাহেবের মনে: বলাধিকারীর ব্যবস্থায় গয়না এতক্ষণে গলে টাকা হয়ে গেছে। আবার এক রাত্রে এই বাড়ি এসে চুরি করে নগদ টাকা রেখে গেলে কেমন হয়? চোর মানুষের কাজ হরণ করে নেওয়া। সাহেব উল্টো ভাবছে: দিয়ে যাবে টাকা এখানে এসে। দশকুমার-চরিতের রাজপুত্র অপহারবর্মণ যা করতেন—

সে কাহিনীও বলাধিকারীর কাছে শোনা। চম্পা শহরে বিস্তর ধনী। কৃপণের জাসু তারা, হাতে জল গলে না। অপহারবর্মণের রোখ চাপল: ধন-ঐশ্বর্য নিতান্তই নশ্বর, ধনের অহঙ্কার অবিধেয়—এই সত্য প্রমাণ করে দেবেন তিনি। মুখের যুক্তিতে নয়, কাজে খাটিয়ে। রাজপুত্র যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, চৌরকলার অনুশীলনে ঘুঘু-চোরও তেমনি। ধনীর টাকাকড়ি চুরি করে ভিক্ষুকদের দিলেন। পাশা উল্টে গেল—ভিক্ষুকরাই ধনী এখন, আগের দিনের ধনীজন ভিক্ষাপাত্র হাতে আগের দিনের ভিক্ষুকদের কাছে যায়। অপহারবর্মণ মজা দেখেন।

সাহেবও করবে তাই—বড়লোকের বাক্স টাকা অভাবীদের ঘরে পৌঁছে দেবে। এবং আশালতার মায়ের ঘরে সকলের আগে দু-চার বাক্স।

জুড়নপুর থেকে সাহেব ফুলহাটা ফিরছে উলুখড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে। লোকে দেখে নিরীহ খড়—আঁটির ভিতরে লেজা-সড়কি-কাঠি। সারাপথ তখন এইসব চিন্তা: টাকা রেখে আসব চুপিসারে নিশিরাত্রে গিয়ে। টাকা হলেই গয়না—আশালতার হাতে কঙ্কণ উঠবে আবার, গলায় নেকলেস। সর্বঅঙ্গ গয়না পরে যুবতী মেয়ে আরও কত ঝকমক করবে।

ফুলহাটা এসে সুধামুখীর চিঠি। সুধামুখী গলা ফাটিয়ে 'সাহেব' 'সাহেব' করে ডাকছে যেন চিঠির লেখায়। সেই এক সময়ে লণ্ঠন হাতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যেমন ডেকে বেড়াত। চিঠিতে সুধামুখী টাকা চায়নি, তবু কিন্তু সাহেব বখরার টাকা-আনা সমস্ত তার নামে পাঠিয়ে এলো। নতুন বাসা ভাড়া নিচ্ছে যাচ্ছে—বিস্তর খরচ যে তার এখন। বাসা নেবে বরানগরের দিকে, ফণী আড্ডির বস্তির মানুষ যে জায়গার হদিস পাবে না। গণ্ডা গণ্ডা কনে দেখে বেড়াচ্ছে—কত রূপের কত ঢঙের সব কনে—সাহেবকে পেলেই কনে একটা পছন্দ করে ঘরে এনে তোলে। সে ঘরে বুঝি গোলপাতার ছাউনি আশালতাদের মতো, সে বাড়ির উঠানে লাউয়ের মাচা, সে উঠানের পাশে ডোবার কলমিঝাড়ের মধ্যে পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়ায়।

সাহেবের কাজ দেখে ক্ষুদিরামের নতুন উৎসাহ। নিজে উদ্যোগ করে বার কয়েক ইতিমধ্যে বাইরে চক্কোর দিয়ে এলো। ভাল ভাল সব খবর। একটা

ছুটো তার মধ্যে বাছাই করে ভাল দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক। পয় যাচ্ছে এ সময়টা, যা করতে হয় এখনই।

সাহেবের কিন্তু স্ফূর্তি নেই। চুপচাপ শুনে যায়। চাপাচাপি করো তো 'হুঁ' দিয়ে সরে পড়ল।

কেষ্টদাসও মেতে গিয়েছে। বাবুপুকুর থেকে ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে এসে পড়ে। বলে, জলে দাঁড়িয়ে ধান কেটে কেটে হাত-পা সব হেজে গিয়েছিল, কাজে এসে বেঁচেছি। মটকায় চড়তে বলো, গাঙ ঝাঁপ্রাতে বলো, কিছুতে আমি পিছপাও নই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

সাহেব হাঁকিয়ে দেয়: নিত্যি নিত্যি কেন এসে জ্বালাতন করিস? সময় হলে খবর পাবি।

বলাধিকারী একদিন বললেন, জল-পুলিস বড্ড লেগেছে। জলের কাজ বাদ দিয়ে ডাঙার কাজ ধর্। ডাঙার মানুষ দু-চারখানা খেল দেখে নিক। উচিতও বটে। গাঙ-খাল নেই বলেই সে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! আবার ডাঙায় যখন কড়াকড়ি হবে, জলে নেমে পড়বি। হতে হতে মরশুম এসে যাবে, কেনা মল্লিকের দলে ভিড়ে যাবি তখন।

আবার বলেন, যে দরের কাজকর্ম তোর, দলে গিয়ে নতুন আর কি শিখবি? দু-এক মরশুম তবু ঘুরে আসা ভালো। বহুজন নিয়ে মিলেমিশে কাজকর্ম—সে-ও একটা দেখবার বস্তু বইকি!

বংশী এসে এসে তাগাদা দেয়: বেরিয়ে পড়া যাক সাহেব-ভাই। পায়ে হেঁটে ডাঙায় ডাঙায় ঘুরব। ভটচাজ বলছিল গুণরাজকাটি গাঁয়ের কথা। খুন-খুনে এক বুড়োমানুষ যক্ষির মতো রাজার ভাণ্ডার আগলে আছে—

সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে: এত যে দিব্যিদিশেলা, দায় মিটলে ঘরের বার হবো না। দায় মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার উসখুস করো কেন? তোমার বউকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে বলাধিকারীর দুই পায়ে হাত রাখল: আমি চলে যাচ্ছি—

কোথায়?

কালীঘাটে মন টেনেছে।

সে কি, পাকাপাকি চললি—আর আসবিনে?

সাহেব বলে, তা-ও হতে পারে। এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

বলাধিকারী বিমর্ষ হলেন: কিন্তু তোর বিদ্যে তো শহরে-বাজারে খাটাবার নয়। শহরে হল তাল-পাশা খেলার মতো—দু-পাঁচ হাত জায়গার মধ্যে একঘণ্টা

দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তুই যে দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ডাঙা-ডহর গাঁ-গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াবি।

সাহেব চুপ করে আছে।

মৃদু হেসে বলাধিকারী এবার বলেন, মনটা টানলে কে, সেই কোন রানী বুঝি ?

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে, মা—

কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী। বলাধিকারীর হাত দুটো আপনি কপালে উঠে যায় : বেশ বেশ ! কাজে নেমে মায়ের পাদবন্দনা করবি, এই তো উচিত। মা তোর মঙ্গল করুন। আবার আসিস।

সাহেব বলে, চিঠি যার কাছ থেকে এসেছে—সুধামুখী দাসী। আমার সেই মায়ের কাছে যাচ্ছি।

মা যে নেই তোর ?

সাহেব গাঢ় স্বরে বলল, মা না থাকলে এত বড়টা হলাম কি করে ? মা ছাড়া কে এমন আনচান করে চিঠি লেখে ?

চাকরিতে আছি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। টাকা পাঠাচ্ছি। নতুন বাসার বায়না দিতে হয় তো দিও—।

আর কি, দুঃখের দিনের শেষ ! পোস্টকার্ডের এই চিঠি তার প্রমাণ। ইংরেজি ঠিকানা, ভিতরের লেখাটা সাহেবেরই। চিঠি সুধামুখী আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। ভাবের জন—পুরুষ হোক, মেয়ে হোক—পেলেই গিঁঠ খুলে চিঠি বের করে : পড়ো দিকি কি লিখেছে, আমি ঠিক ঠাহর করতে পারি নে।

যাকে পড়তে দিয়েছে সে হয়তো বলল, কেন, দিব্যি তো পরিষ্কার লেখা। পড়তে পারছ না কেন ? লিখতে পড়তে তো জানো তুমি।

জানতাম। অনভ্যাসে এখন ভুল হয়ে যায়। চোখেরও জোর নেই তেমন। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না ?

সে লোক হয়তো সাহেবের বৃত্তান্ত কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করল, কে লিখেছে ?

ছেলে—চাকরে ছেলে আবার। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনছি, এর পর নাতিপুতি আসবে। বলছি তো তাই—চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেলেই বা কি !

সাহেব চাকরি করছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে—লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। জানুক সর্বজনে। শত্রু হিংসায় জ্বলুক। চিঠি পড়িয়ে পড়িয়ে সুধামুখী সৌভাগ্য জাহির করে বেড়ায়।

সেই চাকরে ছেলের আসলে কোন লাটসাহেবের চাকরি, বুঝতে সেটা বাকি নেই। মা-ছেলের সম্বন্ধ যখন, মায়ের মন আপনা-আপনি সব টের পায়। তার উপরে নফরকেষ্ট—ভালমানুষ ঐ লোকের কাছে হুমকি দিয়ে কথা বের করা কঠিন নয়। বড় দুঃসময় যাচ্ছে নফরা হতভাগার—একলা পড়ে গিয়ে রোজগারপত্তর বন্ধ। অতএব আবার সে ভাল হবার চেষ্টায় লেগেছে, নিমাইকেষ্টর বাসায় যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল সে পথেও—নিমাইয়ের শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, কথার তেমন ধার-ভার নেই। তবু চেষ্টা হচ্ছে চাকরির। আপাতত নফরার তাঁতের মাকুর দশা। হাওড়ার বাসায় আছে, খরচার জন্য চাপাচাপি করলে কালীঘাট সরে পড়ল। সুধামুখীই বা কাঁহাতক খাওয়াতে পারে? পুনশ্চ হাওড়ায়। এই চলেছে। সাহেব এলে সুধামুখী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নফরার এই পরিণাম। নতুন বাসায় যাবার দিন সাহেবও গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভাল হবে সাহেব, গৃহস্থ মানুষ হবে।

বিগ্রহের জায়গাটুকু ধোয়ামোছা করতে করতে সুধামুখী একলাই পাগলের মতো বকবক করে: ও ননীচোরা ঠাকুর, তুমি যা আমার সাহেবও ঠিক তাই। আমি যে কী করি! চোর তোমরা দু-জনেই। চোরের মা আমি।

সংসারের লোভে জীবনভোর সে আকুলিবিকুলি করেছে। বর মরে গেল—তারপরে যে এলো, সেই মানুষ বিষ খাবার ব্যবস্থা দিল। বিষ না খেয়েই মারা পড়ল সুধামুখী।

উঁহু, মরেছে কোথা? ভেবেছিল মরে গেছে, কিন্তু সহজ নয় মরা জিনিসটা। প্রাণের ধুকধুকানি কিছুতে থামতে চায় না। এক পাগল আসত সুধামুখীদের বেলেঘাটার পাড়ায়। কী রকম তার বদ্ধ বিশ্বাস, মরবে না কিছুতে। জনে জনের কাছে কান্নাকাটি করত: কী সর্বনাশ, চিরকাল আমায় বেঁচে থাকতে হবে! কলির শেষ পৃথিবী লয় হবে আমি তবু থেকে যাব। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে ধর্না দিত: কি খেয়ে কেমন করে মরতে পারি বলে দাও। পাগলের কথায় লোকে হাসাহাসি করত। ডাকত: ও পাগল, শোন, আমি মরার কায়দা বলে দেবো। তার আগে এই চালের বস্তাটা আমার বাড়ি পৌঁছে দাও দিকি। মরবার লোভে পাগল তাই করত। সেই গতিক সকলের। বুঝতে পারিনে তাই—নইলে পাগলের মতোই আতঙ্ক হবার কথা। দেখ না, ঠাণ্ডাবাবুর সেই আমের অঙ্কুর কত বড় হয়ে ডালে ডালে এবার আম ফলেছে। এ নিয়তি সর্বজীবের—বেঁচে থাকবার জন্য ছটফটানি। একটু আলোর রেখা পেলে সেইদিকে মুখ বাড়ায়।

গোপাল, তুমি আমার ঘর-জোড়া হয়ে আছে। সাহেব আমার বুক-জোড়া।

সে আবার ঘরে আসবে, চিঠি লিখেছে। ভয় করে, রেশারেশি না হয় দু-ভায়ে। বাইরে তার নিন্দে, কিন্তু আসলে সে ভালো মানুষ। দেবতার মতন মানুষ।

সাহেবের চিঠির পরে সুধামুখীর তিলেক সোয়াস্তি নেই। ঘোর বেগে আবার পাত্রী দেখতে লেগেছে। কুমারী মেয়ে চোখে পড়লেই সাহেবের পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে দেখে।

ফুটফুটে এক মেয়ে ঘাটে দেখল একদিন। সঙ্গে বর্ষীয়সী বিধবা। বিধবা গঙ্গাস্নান করছে, মেয়েটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সুধামুখী পুঁথি পড়ার মতো করে দেখে। আহা, লক্ষ্মীঠাকরুণটি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নাম কী তোমার মা ?

মেয়েটা বলল, সুশীলা।

সুশীলা—কি ? কোন জাত, পদবি কী তোমাদের মা ?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটা বলে, কায়স্থ—

সুধামুখী ভাবে : অকাট্য প্রমাণ সহ একজনে, ধরো উদয় হল সাহেবের বাপ হয়ে। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা, এবং সেই লোক জাতে কায়স্থ। সুশীলার বাপের কাছে সাহেবের বাপ চলে যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে : ছেলের এই চেহারা, রোজগারপত্তর এই, বাড়ির অবস্থা এই রকম—নগদে গয়নায় কত দেবেন বলুন ? মেয়ে ভাল আপনার, কমসম করেই নেওয়া যাবে।

ক'দিন পরে আর একটা মেয়ে চোখে ধরল। মুখের গড়ন বোধকরি আগের সেই সুশীলার চেয়েও ভালো। মুখের হাসি আরও ভালো—আহা-হা, কী সুন্দর হাসিটুকু !

কি নাম তোমার মা ? কোন্ জাত ?

জাতে সুবর্ণবণিক।

সাহেবের বাপ অতএব কায়স্থ না হয়ে সুবর্ণবণিকই হোক তবে। ঠিকঠাক একজন বাপ না থাকায় এই বড় সুবিধা। যে মেয়েটা সবচেয়ে পছন্দসই, তার জাতকুল মিলিয়ে বাপ হোক না কেন সাহেবের !

আদিগঙ্গার কিনারে ফণী আড্ডির বদলে এখন মলয়কুমারের বস্তি। আর দুদিন পরেই তো রাণী-মলয়ের বস্তি আইনসম্মত ভাবে। নতুন নতুন সব বাসিন্দা—পুরানোর মধ্যে রাণী-পারুল তো থাকবেই, আর আছে সুধামুখী সে-ই যাই যাই করছে। যেতে হত অনেক আগেই, না গিয়ে উপায় ছিল না—শুধু গলাখানির জোরে আছে। ঠাকুরের ভজন ও কীর্তন গেয়ে গেয়ে সে

গলার আরও যেন বাহার খুলছে। এইটুকু না থাকলে ঘর ছেড়ে দিয়ে কবে এদ্দিন গৃহস্থবাড়ি বাসন-মাজার কাজ ধরত। অথবা মন্দিরের বাইরে কাঙালিদের মধ্যে গামছা পেড়ে ঠাঁই নিত। এ লাইনে বয়স হয়ে যাবার পরে যা দস্তুর।

কিন্তু গান শুনবার লোকও দিনকে দিন কমে এসে শূন্যে দাঁড়ানোর গতিক। নতুন বাঁধুনির গান চলে আজকাল, নতুন সুর, নতুন ঢঙ। এমনও হয়েছে, সুধামুখী তদ্গত হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, হাসছে শ্রোতাদের কেউ কেউ। একবার দেখেছিল, একজনে কানে হাত চাপা দিয়েছে —গান তবু শেষ করতে হল পেটের দায়ে। গান শোনার লোক এখন দাঁড়িয়েছে বুড়ো আধ-বুড়ো কয়েকটি লোক। পুরানো দিনের সেই আংটিবাবুকেও কিছুকাল থেকে আবার দেখা যাচ্ছে। চোখ বুঁজে নিঃশব্দে বসে শোনেন, গান শেষ হয়ে গেলেও নিবিষ্ট হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। অবশেষে কথা ফোটে: মরি মরি! মুরলীধর নিজে তোমার কণ্ঠে ভর করেন, ঐশীশক্তি ছাড়া এমন হয় না। একালে আসল গুণীর তো আদর নেই। বন্দোবস্তের ঢাকীরা জয়ঢাক পেটাতে লাগে, কান বাঁচানোর দায়ে লোকে তখন 'বাহাবা' 'বাহাবা' করে।

এমনি সব বলে বালিশের তলে কিছু রেখে দিয়ে আংটিবাবু পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আগেও এই করতেন, সুধামুখীর হাতে হাতে কোনদিন কিছু দেননি। কিন্তু আগে যা রেখে যেতেন, ইদানীং তার সিকিও নয়। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, চেহারা ও পোশাকআশাকে বোঝা যায়। আঙুলে আংটি অবশ্য বারো ভজনই—নয়তো আর আংটিবাবু কিসের? কম দিচ্ছেন বলে সুধামুখীর ক্ষোভ নেই—টাকার দিকে যা কমতি, প্রশংসায় তার অনেক বেশী পুষিয়ে দেন। এঁরা এই কয়েকজন গত হলে একেবারে নিখরচায় গাইতে চাইলেও তো শোনবার মানুষ জোটানো যাবে না।

কপাল খুলল হঠাৎ একদিন—সারা জন্মে যা কখনো ঘটেনি। মুজরার বায়না দিতে এলো। তদ্বির আংটিবাবুরই—যে লোক এসেছে, তার কাছে সবিস্তারে শোনা যায়। কত দয়া মানুষটির! বিদ্রূপ করে ঢাক পেটানোর কথা বলেছিলেন, সেই কাজ নিজেই করেছেন সুধামুখীর জন্য। জলসা পাতিপুকুরের এক বাগানে। বিরাট ব্যাপার, নামজাদা গুণীরা সব আছেন, যাঁরা শুনবেন তাঁরাও রীতিমত সমঝদার। দশ টাকা এখন দিয়ে যাচ্ছে, আর চল্লিশ সেইদিন। এবং আংটিবাবু নিঃসংশয়, শিরোপাও বিস্তর মিলবে। সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ। একবার নাম পড়ে গেলে বায়না নিয়ে তখন কূল পাওয়া যায় না। টাকার অঙ্কটাও এক লাফে দুনো তেদুনো। দেদার কুড়িয়ে যাও। টাকার অনেক দরকার—সাহেবের বিয়ে, নতুন বাসায় সংসার গোছানো।

যত দিন ঘনিয়ে আসে, ভয়ে কাঁপে। ভাল না মন্দ করলেন আংটিবাবু কে জানে ? মেতে গিয়েছে সুধামুখী, সর্বক্ষণ গানের তালিম। একমাত্র শ্রোতা ঠাকুর গোপাল। কেমন লাগল বলো গোপাল ? জীবনে একবার এই দিন পেলায় মানে মানে যেন ফিরতে পারি। কাল তো শুনেছ আর আজ শুনলে—কোনটা ভাল দুয়ের মধ্যে ?

মাটির দেহ গোপালের, সেই রক্ষা। অহোরাত্রি গান শুনে শুনে নয়তো কানে তালা ধরে যেত। পুরানো বেনারসি শাড়ি রিপু করিয়ে কাচিয়ে এনে রেখেছে সুধামুখী। গয়না নতুন করে আমরুলপাম ঘষেছে। দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মোটরগাড়ি গলির মোড়ে রেখে সুধামুখীকে তুলে নিতে এলো—সেই লোকটাই এসেছে, যে এসে বায়নার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে, এ যেন আলাদা সুধামুখী। গায়ের রং একেবারে বিপরীত। বয়সটা অবধি বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে নিয়েছে। মুক্তোর সিঁথিপাটি কপালে নাকে টানা-দেওয়া নথ, কানে ঝুমকো, দু-বাহুনে মোটা অনন্ত, কোমরে বিছাহার, গলায় সাতনরি। সাজসজ্জা ও গয়নাগাঁটিতে ঝলমল করছে। ভেক নইলে ভিখ মেলে না—আংটিবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন, ওই লোকও বার বার বলেছিল। উপদেশ সুধামুখী অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছে। অত বড় আসরে বসবার মতো চেহারা দাঁড় করতে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে আজ সমস্তটা দিন।

নিষ্পলক খানিকক্ষণ তাকিয়ে লোকটা ফিক করে হেসে ফেলে : মাসি, তুমি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে সকলের।

মুশকিল হল, নফরকেষ্টটা জর হয়ে বিকালবেলা এসে পড়েছে। জরে আইঢাই করছে। শিয়রের কাছে এক কলসি জল আর গেলাস রেখে সুধামুখী বলে, তেষ্টা পেলে খেও। পারুলকে বলে যাচ্ছি, খবর নেবে। খাওয়াদাওয়া নেই যখন দোরে খিল দিয়ে দাও। এক্ষুনি। আমি এসে খুলে দিও। দেড়টা দুটোর মধ্যে এসে যাচ্ছি, কি বলেন বাবু ?

লোকটা বলে, অত কেন হবে ! খুব বেশি তো এগারোটা। বাছা বাছা ভদ্দোরলোক—হৈ-হুল্লোড়ের মানুষ কেউ নয়।

সর্বশেষে সুধামুখী গোপালের কাছে বিদায় নেয় : গোপাল, আসি তবে বাবা। আজকের রাতটুকুন একলা তুমি। তোমার বড়ভাই আসছে—সে আমার বড়ঠাকুর। রক্তমাংসে ছেলে যে অমন সুন্দর হয়, সে তুমি না দেখলে বুঝবে না।

বিড়বিড় করে আবার বলে, লোকে কি বলবে—নয়তো কোলে করে নিয়ে

যেতাম আমার ঠাকুর। অদর্শনে সঙ্গে তুমি থেকো, একা আমার ভয় করবে। এখানে এই যেমন, সেখানেও সামনের উপর থাকবে তুমি। চোখ বুঁজে যেন দেখতে পাই। তুমি থাকলে তবে আমার ভরসা।

রাত কেটে গেল, সুধামুখী ফেরে না। পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনও দেখা নেই। নফরকেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পারুলকে ডেকে বলল। দুপুর গড়িয়ে যায়, কষ্টেসৃষ্টে তখন বিছানা থেকে উঠে ঐ পারুলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় খবর লিখিয়ে দিয়ে এলো।

দিন কেটে গিয়ে আবার সন্ধ্যা। পুলিস এলো চারজন। বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা ভিতর দিকে গিয়ে এক পোড়ো বাগানের ভিতর স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া গেছে। লাস সনাক্ত হয়নি, মর্গে নিয়ে রেখেছে। দেখে যাও তোমাদের মানুষ কি না।

পারুল আর্তনাদ করে ওঠে: নিশ্চয় দিদি। সেই হতভাগী ছাড়া অন্য কেউ নয়। ভালোঘরের মেয়ে—গত জন্মের মহাপাতকে নরকবাস করছিল। নরকপুরী ছাড়বার জন্য ছটফট করত, এতদিনে পেরেছে। একেবারে চলে গেল।

সন্ধ্যায় সাজ-সাজ এখন ঘরে ঘরে। ভিড় করে এসে মেয়েরা সব শোনো। কেউ হায়-হায় করে, কেউ বা প্রবোধ দেয়: দিদি হতে যাবে কেন, দেখ গিয়ে অন্য কেউ। যা-হোক কিছু বলে দ্রুত যে যার ঘরে চলে যায়। অসম্ভব কিসে, আশ্চর্য হবার কি আছে? নিয়েছে অস্বাভাবিক উদ্ভট জীবিকা—মৃত্যু স্বভাবের নিয়মে না-ই যদি আসে, সে নালিশ কে শুনতে পাবে?

ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এলো পুলিসের তরফ থেকে। শাড়ির উপরে ছিটের চাদর জড়িয়ে পারুল বেরিয়ে এলো। সে যাবে। নফরকেষ্টও ধুঁকতে ধুঁকতে পারুলের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। রানীও চলল সেই মোড় অবধি। পারুল বলে, তুই কেন আবার, ছেলেমানুষ তুই কি দেখতে যাবি? চলে যা মা, রাস্তার উপর দাঁড়াবিনে এখন। মলয় কখন এসে যাবে, সে রাগ করবে।

রানী নিরুত্তরে বাড়ি ফেরে। দোতলায় নিজের ঘরে যায় না। সুধামুখীর ঘরের সামনে অন্ধকার নির্জন দাওয়ায় অনেক রাত্রি অবধি একাকী বসে রইল।

লাস ঘরের বারাণ্ডার উপর কাপড়-ঢাকা রয়েছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুধামুখীই বটে। মুদ্রিত চোখ। গলায় কোপ মেরেছিল আচমকা পিছন দিক থেকে। পুলিশের একজন নিরিখ করে দেখে তাই বললেন।

বললেন, চিঠি নিয়ে লোক গিয়েছিল, সেই চিঠি খুঁজে বের করতে হবে। তাতে

যদি কিছু হদিস মেলে। আংটি নাম কারো হয় না। পুরানো যাতায়াত বলছ—আসল নামটা কেউ কোনোদিন জিজ্ঞাসা করো নি?

পারুল বলে, খাঁটি নাম আমাদের কাছে কেউ বলে না। মেকি নাম বানিয়ে বলবে, কী হবে শুনে? চেহারায় চিনতে পারব। আর এক নিশানা বলতে পারি, বাবুর দু-হাতে এক গাদা আংটি।

আংটি কী আর আঙুলে রেখেছে? বাগানের মধ্যে কতকগুলো আংটি পাওয়া গেল। মজাটা হল, সবগুলোই মেকি। সোনা নয়, গিল্টি। হীরে নয়, কাচ। ঝকমকিয়ে তোদের কাছে পশার জমাতো।

একটুখানি চিন্তা করে তিনি আবার বলেন, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিছু জানিস? কিম্বা প্রণয়ের রেশারেশি? পুরানো জানাশোনার মধ্যে খুনখারাপি—উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

পারুল বলে, দিদির এক-গা গয়না ছিল। চেয়ে দেখুন হাত-গলা নাক-কান এখন সব ন্যাড়া। গয়নার লোভে মেরেছে।

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, সে-ও মেকি হুজুর। আমি কিনে দিয়েছিলাম। গিল্টি পরে ঠসক করে বেড়াত। ব্যবসাই এই। মানুষটা কিন্তু মেকি ছিল না।

এরই দিন দশেক পরে সাহেব এসে উপস্থিত। ফিরল কতদিন পরে কত অঞ্চল ঘুরে। পারুল দেখতে পেয়ে উঠানের উপর এসে কেঁদে পড়েঃ সাহেব এসেছিল—ক'টা দিন আগে আসতে পারলি নে? ওদিকে নয়। কেউ নেই ওঘরে, তালা দেওয়া। তালা দিয়ে নফরকেষ্ট সেই বেরিয়েছে, আর আসেনি। জানিস নি কিছু? আমার ঘরে আয় বাবা—

আঁচলে বারম্বার চোখে মোছে, আবার ভরে যায়। বলে, সংসারের দুয়োরে চিরদিন দিদি মাথা ঠুকে ঠুকে গেল, দুয়োর খুলল না। আমায় সব বলত, আমার মতন কেউ তাকে জানে না।

সাহেব পাষাণমূর্তির মতো শুনছে। কান্না দেখে তারও চোখে জল। চিরকেলে প্যাচপেচে মন—এ মনের কিছুতে শাসন হল না। এতক্ষণে রানী দেখেছে, তরতর করে নেমে এসে সে হাত জড়িয়ে ধরল। মায়ের দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, তেতেপুড়ে এলো, থাম তুমি এখন মা। উপরে চলো সাহেব-দা, হাত-পা ধুয়ে জিরোবে।

শুনতে কিছুই আর বাকি নেই। চোখের জল পড়ো-পড়ো, ঠিক সেই সময়টা রানী এসে পড়ল। হঠাৎ কী রকম হয়ে যায়, খল-খল করে সাহেব হেসে ওঠে। বলে, জানিস রানী, কষ্টিপাথর নিয়ে ঠিক ওরা গয়না কষতে

গিয়েছিল। পাথরে দাগ ওঠে না। কী বেকুব, কী বেকুব! নিজের গাল চড়াচ্ছিল বোধহয়—কী বলিস, অ্যাঁ?

রানী ব্যাকুল হয়ে হাত চাপা দেয় সাহেবের মুখে: থাক, থাক—আমার ঘরে চলো। কাঁদতে হবে না, হাসতেও হবে না তোমার।

একুশ

উপরের ঘরে রানী খাটের উপর ধবধবে বিছানায় নিয়ে বসাল। বলে, কদ্দুর থেকে কত কষ্ট করে এলে সাহেব-দা। খেয়েদেয়ে সারা বেলাটা গড়াও।

জানালাগুলো খুলে দিল। ছত্রাকার আমগাছ। সেই এককোঁটা অঙ্কুর বড় হয়ে আজ আকাশ ঢেকেছে—দোতলার উপর বসে সেটা আরও ভাল বোঝা যায়। থোলো থোলো গুঁটির ভারে ডাল বুঝি ভেঙে পড়ে। আর, ও-পাশের জানালায় একবার দেখ না তাকিয়ে। গঙ্গা। ভরা জোয়ার এখন গঙ্গায়, কানায় কানায় জল।

রানী চোখ বড় বড় করে বলে, তবু তো গুঁটি কত ঝরে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো পাঁচিলের ওদিক থেকে ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা পাঁচিলে উঠে ডাল ঝাঁকায়। অন্যের কথা বলি কেন, আমিই কি কম? জানলার গায়ের এই ডালখানায় পাতা দেখবার জো ছিল না। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব শেষ করেছি। নুন আর লঙ্কা দিয়ে কাঁচাআম খেতে বড় মজা।

হাসে একটু রানী। হাসলে দুই গালের উপর ছোট্ট দুটি টোল পড়ে, সুন্দর দেখায়। বলে, সেই সময় তোমার কথা বড্ড মনে হত সাহেব-দা। কোন্ দেশে কোথায় আছে—গাছে প্রথম ফল ধরল, তুমি দেখলে না। ভাবতাম, পাকাবার আগে যেন এসে পড়। হল তাই সত্যি সত্যি। আমি খাটিয়ে দেখেছি সাহেব-দা, খুব একমনে যদি কিছু চাও ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

না—। ঝাঁকি দিয়ে সাহেব ঘাড় তুলে তাকাল রানীর দিকে। তুমি পাও রানী, তাই বলে সকলে নয়। মা তো চেয়েছিল আমায় কাছে কাছে রাখবে, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে, ছেলে-বউ নিয়ে সংসারের গিন্নী হয়ে থাকবে। বিধাতার কাছে মাথা কুটে কুটে চেয়েছে—চিরকাল ধরে ঐ তার সাধ। কিন্তু কী পেয়ে গেল তার জীবনে?

গর্জন করে উঠল যেন অলক্ষ্য ক্রূর ভাগ্যনিয়ন্তার উপর। চিড়িয়াখানার

খাঁচার বাঘ যেমন গরাদের বাইরে থেকে উত্যক্তকারী নিরাপদ মানুষের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে। সর্বনাশ, রানীর এতক্ষণের এত সব বুকনি বৃথা? সুধা-মুখীর প্রসঙ্গ আবার না ওঠে, একথা-সেকথায় রানী ভুলিয়েভালিয়ে রাখছিল। ছোট শিশুকে নিয়ে মা যেমন করে। সাহেবকে এখন যেন অসহায় শিশুর বেশি ভাবতে পারছে না।

চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব ঐশ্বর্য দেখছিল। লঘুকণ্ঠে এবার বলে, ঝকঝকে এমন কোঠাঘর খাটপালঙ্ক গয়নাগাঁটি একমনে চেয়েছিলে তুমি রাণী, ঠিক তাই পেয়ে গেছ। তাই বলে কি সকলে? তোমার এই বয়সে কটা দিনের মধ্যে কার এত ভাগ্য খোলে বলো! জন্ম থেকে মাটকোঠার ঘরে—দেখেছি তোমাদের তো কম নয়।

ঘুরে এসে কথাটা তারই উপর পড়বে, রানী ভাবতে পারেনি। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জোরে জোরে ঘাড় দুলিয়ে সমস্ত মেনে নিল। বলে, বয়সের কথা কি বলো সাহেব-দা, ভাগ্য আমার কি আজ নতুন খুলছে? কতটুকু তখন—তুমিই মন্তোর শিখিয়ে দিলে, ইচ্ছা-বর পেয়ে গেলাম আমি। যেটা ইচ্ছা করব, তক্ষুনি তাই পেয়ে যাই। মা-কালী জোগাচ্ছেন। চুলের ফিতে কাঁটা, গন্ধতেল—জোগাতে জোগাতে দেবীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে যায় সাহেবের ঠোঁটে। বলে, মা-কালীকে দিয়ে শেষটা পায়ের জুতো বইয়ে ছাড়লে রানী, তুমি কম পাষাণ্ডী!

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: আচমকা তুমি-তুমি শুরু করলে কি জন্যে বলো তো? যেন আমি কেষ্টবিষ্টু মানুষ। আগের মতো তুইতোকারি করবে তো করো, নয় তো আমি চলে যাচ্ছি। কান জ্বালা করে।

রাণীর মুখে চেয়ে একটু হেসে সাহেব আগের কথার জের ধরে বলে, তোর গয়না চুরি করেছিলাম রানী, লাইনে সেই আমার হাতে খড়ি। তোর কানের ইছদি-মাকড়ি। ঝুটো গয়না, দাম পুরো টাকাও নয়। হলে হবে কি—ছোট্ট মানুষের সাধের জিনিসটা নিয়ে আমার উপর অভিশাপ লেগে গেল। চোর আমি সেইদিন থেকে।

চোর না আরো-কিছু! ভ্রূভঙ্গি করে রানী সাহেবের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়। বলে, চুরি করলে বটে সাহেব দা, কিন্তু চোর হতে পারো নি। হয়ে গেলে দেবতা। সত্যযুগের মতন জাগ্রতা দেবতা—চাইতে না চাইতে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ। এ কালের মতন কালা-দেবতা কানা-দেবতা নয়।

সাহেব বলে, জাগ্রত দেবতা কী নাকালটাই হলেন জুতো চুরি করতে গিয়ে? প্রাণ যাবার দাখিল। তোর আবদার কুলোতে গিয়ে কী করেছি আর না করেছি রানী। কারো কাছে সে-সব বলবার কথা নয়, ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

মুচকি মুচকি হাসে রানী। দেমাক করে বলে, বোঝ ক্ষমতা। এঘরে-ওঘরে এখন সব নতুন মেয়ে, তারা হিংসায় জ্বলে। বলছিল, মালিকবাবুকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও, তাজ্জব কাণ্ডবাণ্ড তোমার। মনে মনে হাসি আমি—ওরাই নতুন দেখছে, আমার কাছে নতুন-কিছু নয়। খাটপালঙ্ক কোঠাঘর গয়নাগাঁটি খোঁটা দিলে, কিন্তু সেই একফোঁটা বয়সে তুমিই তো অভ্যাস ধরিয়ে দিয়েছ সাহেব-দা। যা-কিছু চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে।

সমস্ত দিন সাহেব পড়ে আছে। কতকাল পরে আরামের একটু নিশ্চিন্ত বিছানা পেল। নিচে পারুলের ঘরে রানী। পা টিপে টিপে এসেছে দু-একবার, দরকার সেরে তক্ষুনি আবার চলে গেছে। সাহেবকে ডাকে নি। বিভোর হয়ে সে ঘুমোচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। আহা ঘুমাক।

সন্ধ্যার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কে যেন চাপা গলায় 'রানী' 'রানী' করে ডাকছে বাইরে থেকে, মানুষটা ঘরে আসে নি। সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। আলো দিয়ে গেছে ঘরে, জোর কমানো। তাই তো, কাজকর্মের সময় ওদের! তাড়াতাড়ি জামা গায়ে চড়াচ্ছে, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়বে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এই বাড়িতেই ছিল, শিশুকাল থেকে এই তো বরাবর করে এসেছে। অভ্যাস আছে।

'রানী' 'রানী' করছে—নিচের ঘর থেকে ছুটে এসে রানী লোকটাকে ধরল। বিরক্ত স্বরে বলে, ভাই এসেছে আমার—বলে দিলাম তো। মায়ের এক বোনের ছেলে। সংসারধর্ম থাকতে নেই বুঝি আমাদের, মানুষ নই আমি? আজকের দিনটা ছাড়ো।

লোকটা এর পর কি বলল, শোনা যায় না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। অনতিপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে রানী ঘরে উঁকি দেয়। সাহেব বেরিয়ে যায় তো দু-হাতে দুই পাল্লা ধরে পথ আটকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ স্বরে সাহেব বলে, রাত হয়ে গেছে, টের পাই নি। রোজগারপত্তর আজ তোর চুলোয় গেল। সরে যা, পথ ছাড়।

রীতিমত লড়াইয়ের ভঙ্গি মেয়েটার। বলে, এক পা নেমেছে তো মাথা খুঁড়ে মরব আমি। সিঁড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। জানো, তা পারি।

গলায় দড়ি দিয়েছিলাম শোন নি, দরকার হলে আবার তেমনি পারব। সেবারে হেরে এসেছি বলে বারবার হারব না। দয়া হবে নিশ্চয় যমরাজের।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। সুধামুখীর পরেও আছে তবে পথ আটকানোর মানুষ! রানীর রাগ দেখে হাসে মিটিমিটি। বলে, জামা-জুতো পরে মাথায় টেড়ি কেটে তৈরি হয়েছি যে। জামা খুলব না, টেড়িও ভাঙব না। কটা রাত তোর তো গেছেই—চল্ তা হলে দুজনে যাই। মা-কালী দর্শন করে আসি। কালীঘাট এসে সকলের আগে মা-কালী দর্শনের কথা। আমাদের লাইনের তাই নিয়ম, না করলে দোষঘাট হয়। আমি তা মানি নি—মা-কালীর আগে মা দর্শন করতে এসেছিলাম।

আমি যাব, রোস একটুখানি—। রানী ঝলকিত হয়ে উঠল। বলে, মায়ের আরতি কতদিন দেখিনি সাহেব-দা। নর্মদার পাঁকে ডুবে থাকি সে সময়টা মন্দিরে যাই কেমন করে? আজকে যখন ছুটি করে দিলে তুমিই সঙ্গে করে নেবে।

নিচের ঘরে সাহেব গিয়ে বসল। পারুল শতকণ্ঠে মলয়কুমারের ঐশ্বর্য ও দরাজ মেজাজের কথা বলছে। মলয়কুমার অর্থাৎ ঝিঙে। এমনি সময় রানী নেমে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কী সাজ সেজেছে মরি মরি! পলক পড়ে না চোখে। সাহেব বলে, শুধু রানী ডাকলে মানাবে না রে! মহারানী—রাজরাজেশ্বরী। কত সুন্দর হয়েছিস তুই, কী জৌলুষ! সাজগোজ করে এলি—রূপ তাই বেশি করে মালুম হচ্ছে।

উঠান পার হয়ে গলিতে পড়েছে তখন। রানীর মুখে ছলাৎ করে রক্ত নেমে এলো। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, পা চালিয়ে চলো সাহেব-দা, কুচ্ছো করতে হবে না ইনিয়ে-বিনিয়ে।

সাহেব বলে, তোর গোলাপফুলের মুখ রাঙা হয়ে একেবারে রক্তজবা হয়ে উঠল রে! সত্যি রানী, অপরূপ হয়েছিস তুই। ডিগডিগ করে বেড়াতিস, তখন কি জানি একদিন এমনি হয়ে উঠবি!

রানী এবার ঝগড়া করে: রাঙা হয় রাগে—তোমার মুখেও এই সমস্ত শুনে। নিত্যিদিন কতজনাই বলে থাকে, তুমি কেন তাদের দলে হবে সাহেব-দা? তুমি বলছ—তখন মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হোক, ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে বড্ড ভিড়। সেই একবয়সে কত ঘোরাঘুরি করত এইসব জায়গায়। ভিড় ঠেলে চলেছে। লোকে তাকিয়ে দেখে।

সাহেব কানের কাছে মুখ নিয়ে রানী বলে, কি ভাবছে ওরা সব, বলো তো—

নিরীহভাবে সাহেব বলে, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—আবার কি!

রানী খিলখিল করে হাসেঃ কী বোকা তুমি সাহেব-দা! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তোমায় আমায় কী সম্পর্ক ভাবছে ওরা বলো—

ভাবছে, চাকর সঙ্গে নিয়ে কোন্ মহারানী যাচ্ছেন। মা-কালী দর্শনের পর দোকানের কেনাকাটা হবে, চাকর বয়ে নিয়ে আসবে।

যাও—। রাগ করে রানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্যায়টা কি বলেছি! তোর ঝলমলে সাজগোজ গা-ভরা গয়না, তার পাশে আমার এই আধ-ময়লা ছেঁড়া কামিজ তালি দেওয়া জুতো—লোকে অন্য কি ভাবতে পারে?

রানী বলে, যে রূপ নিয়ে এসেছ সাহেব-দা, সাজগোজ যে লজ্জা পেয়ে যায় তোমার গায়ে উঠতে। বিধাতা আমাদের বঞ্চিত করেছে, নিজের হাতে তাই পূরণ করি। তোমায় চাকর ভাববে, হায় আমার কপাল!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, ওরা যা ভাবছে, তাই তো সত্যি সত্যি হবার কথা ছিল। নজর করেছ বোধ হয়—ভিড় কাটাতে কতবার আমি তোমার গায়ের উপর পড়লাম। দেখিয়ে—ইচ্ছে করেই। মানুষ কাছাকাছি হলেই তোমার দিকে এলিয়ে পড়েছি। যা হতে পারল না, কোনদিন আর হবে না, একটুখানি আমি সেই সাধ মিটিয়ে নিলাম। দেখুক লোকে—গৃহস্থঘরের আর দশটা ছেলে-বউর মতো আমরাও যেন একজোড়া। আমার এই হ্যাংলাপনায় রাগ করো না সাহেব-দা। পথের পাশে ঐ যত কাঙালি দেখছ, ছেঁড়া ন্যাকড়া সামনে বিছিয়ে বসে আছে—আমি ওদেরই একটি।

দু-হাতে মুখ ঢাকল রানী। বলে ফেলে লজ্জা হল? কিম্বা বুঝি জল এসে গেছে চোখে। এত দুঃখকষ্ট দিয়েও বিধাতার যেন তৃপ্তি নেই, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে দুঃখ আরও শাণিত করে দেন।

মন্দিরের আরতি দেখে তারপরেও একজুটি হয়ে বেড়াচ্ছে দু-জনা। ফিরতে মন নেই, ঘরসংসার-পালানো একজোড়া ছেলেমেয়ে। ঘুরে ঘুরে তারপরে পাড়ার ঘাটের চাতালে এসে বসল। নির্জন, আবছা অন্ধকার।

সাহেব বলে, মনে পড়ে রানী, এই চাতালে বসে বসে বসে নৌকো দেখতাম। তুইও এসে বসতিস। ভাঁটির দেশের কথা শুনতাম মাঝিমাল্লার মুখে। কপাল গুণে তারপর সেই দেশেই গিয়ে পড়তে হল।

রানী কি ভাবছিল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেই সেই এসেছ সাহেব-দা, আগে কেন এলে না।

সাহেব বলে, সেই তো দুঃখ আমার ভাই। দুনিয়ায় লক্ষকোটি মানুষ, কিন্তু

ভালবাসার মানুষ একটি-দুটি। দুটো হপ্তা আগেও যদি আসতাম। মা চলে যাবার আগে।

রানী বলে, তারও আগে সাহেব-দা, আমি মরে যাবার আগে।

হেঁয়ালির মতন লাগে। রানীই আবার বলছে, শাড়ি গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিলাম। গিঁঠ খুলে গেল, তবু আমার বাঁচা হল না। মরে গিয়ে পেত্নিশাকচুন্নি হয়ে বেড়াই। যে রানী তখন দেখতে, সে আর নেই। আজকে সব বলি সাহেব-দা, অনেক কেঁদেছি তোমার জন্যে। 'সাহেব-দা' 'সাহেব-দা' কত ডেকেছি। কত রাত গেছে, সারাক্ষণ ছটফট করেছি। তার পরে মরে গেলাম। সাজসজ্জা আমি চাইনি সাহেব-দা, জ্যান্ত থাকতে চেয়েছিলাম। এখানে ডাকলে নাকি ইচ্ছের জিনিস পাওয়া যায়—ছাই, ছাই! সেই মিথ্যে আমিই আবার নিজের মুখে বললাম! মিথ্যের পেশা নিয়েছি কিনা, মিথ্যে বলে যেতে বাধে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, তুমি যদি থাকতে সাহেব-দা, একচোট ঝগড়া করা যেত সুধা-মাসিমার সঙ্গে। কনে খুঁজে খুঁজে হয়রান, সকলকে বলতেন ভাল মেয়ের জন্য। আর একটা যে মেয়ে একই বাড়িতে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তার দিকে চোখ পড়ে না। পিদ্দিমের নিচে অন্ধকার। কেন তা-ও শোনি। এমন মেয়ে চাই কুলেশীলে রূপে-গুণে কোন বিচারে যার খুঁত বেরুবে না। কিন্তু ছেলেটাই বা কি—জাতে বুঝি সে নৈকষ্যকুলীন, পেশায় বুঝি টুলোপণ্ডিত?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তাপ। সাহেব সায় দিয়ে বলে, ঠিকই তো! কিন্তু ঝগড়াটা আমার জন্য আটকে রইল কেন? করলেই তো হত।

গালে হাত দিয়ে রানী বলে, ওমা নিজের বিয়ের কথা মেয়েয় বুঝি বলতে পারে! বলাতাম তোমায় দিয়ে। আমাদের ছোট্টবেলায় বর-বউ বলে কি জন্য ওরা ক্ষেপাত! তোমায় দলে পেলে দাবি ঠিক আদায় করে ছাড়তাম। তা হলে আমি কি মরতাম সাহেব-দা, না সুধা-মাসির অমনধারা বেঘোরে প্রাণ যেত? ছেলের-বউ আর সংসার নিয়েই মজে থাকতেন, জলসার নাম করে খুনেরা তাঁকে ফাঁদে নিয়ে ফেলতে পারত না।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনল। তার পরেও কী ভাবে একটুখানি। বলে উঠল, দু-জনে কি সংসার হয় না রানী? কপালে নেই, মা আমার চোখে দেখতে পাবে না। আমরাই গিয়ে ঘর বাঁধিগে।

ছিঃ! রানী ঘাড় নাড়ল: হয় না সাহেব-দা। বোলো না ও-কথা, শুনলেও পাপ। কাক-চিলে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে, সে জিনিষে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।

সাহেব বলে, কে বলে দেবতা? মিথ্যে কথা। মিথ্যে বদনাম দিবিনে রানী, মানা করছি।

চোখের জলের মধ্যে হেসে রানী বলে, দেবতা তুমি আজ হয়েছ! আমার ছেলেবয়সের বিধাতাপুরুষ তুমি। চোখ পাকিয়ে যতই হুঙ্কার দাও, সে আসন কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই তোমার।

অধীর কণ্ঠে সাহেব বলে, দেবতা আমি নই, চোর। লোকে ঘেন্না করে, পুলিশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। চোরের সেরা চোর—একালের চোর-চক্রবর্তী।

রানী বলে, আমি মানিনে—

চোর-চক্রবর্তী রাজার পালঙ্ক থেকে রাজরানী চুরি করে নিয়েছিল। ঝিঙের খাট থেকে তোকেও চুরি করব, মানিস কি না দেখা যাবে তখন।

করবে? করো না তাই সাহেব দা—

কৌতূহলে মেতে উঠল রানী সেই সব দিনের ছেলেমানুষ রানীর মতন। মেকি ইহুদি-মাকড়ি নয়—পাথর-বসানো দামী ইয়ারিং দুটো ঘাটের ক্ষীণ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝলমলিয়ে ওঠে। বলতে হল চোর-চক্রবর্তীর গল্প—ঘুমন্ত রাজরানীকে চুরি করে নিয়ে চিঁড়েকুটির ঘরে শুইয়ে দেওয়া। ছোট্ট খুকীর মতো রাণী হাততালি দিয়ে ওঠে: পারো যদি, ক্ষমতা বুঝব তোমার সাহেব-দা। চোর বলো যা বলো ঘাড় হেঁট করে তখন মেনে নেবো। করো দিকি তাই। কালীমন্দিরের পিছনে বটতলায় কুটে-বুড়ি একটা বসে থাকে, এনে শুইয়ে দেবে ঝিঙের পাশে। সকালবেলা ঝিঙে দেখে আঁতকে উঠবে।

সাহেব হেসে বলে, কুটে-বুড়ি না হয় রইল, কিন্তু তোমায় কোথা যেতে হবে ভাবতে পারো? এই শহর, দোতলার সাজানো কোঠাঘর, গদির পালঙ্ক থেকে চোর-চক্রবর্তী নিয়ে চলল কত গাঙ-খাল গাঁ-গ্রাম বিল-মাঠ পার হয়ে ভাঁটির দেশে—জঙ্গলের পাশে ছোট্ট কুড়েঘর বাঁধল। কুমির রোদ পোহায় চরের উপর, সন্ধ্যার পর বাঘ হামলা দেয়, চোত-বোশেখের ঝড়বাতাস যখন-তখন ঘরের খুঁটি ধরে ঝাঁকায়। জলের সমুদ্দুর চারিদিকে, সে জলের একফোঁটা মুখে দেবার উপায় নেই। কলসিতে চাল থেকেও হয়তো বা রান্না হল না মিঠাজলের অভাবে—

রানী আকুল হয়ে বলে, অমন করে লোভ দেখিয়ো না সাহেব-দা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, লোভ কি বলিস রে! আমি তো ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পাস না, কী দুঃসাহসী মেয়ে তুই!

জবাবে রানী একটি কথাও না বলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। অন্ধকারে যেন চাপা কান্নার আওয়াজ।

রানীর পিঠের উপর হাতখানা রেখে মৃদুস্বরে সাহেব ডাকল: রানী— সাড়া মেলে না।

কী আমি বললাম তোকে! এই হাসিস, এই কাঁদিস, হয়েছে কি তোর শুনি?

মুখ তুলে রানী যেন হাহাকার করে উঠল: ভাড়াটে-ঘরের মেয়েগুলো হিংসা করে—কিন্তু কী আমি পেলাম, বলো তো সাহেব-দা। খাট আর কোঠা-ঘর আর গয়নাগাঁটি আর আঁস্তাকুড়ের ময়লা আর উনুনের ছাই? এই নিয়ে তুমিও আমায় খোঁটা দিলে। কিন্তু একটা ভিখারি মেয়ের যা আছে, তা-ও যে আমার নেই। আমার বয়সের কত মেয়ে মন্দিরে দেখলে। শাশুড়ি-ননদ জা-জাউলিরা সঙ্গে করে এনেছে। কিম্বা বরকে নিয়ে একলা চলে এসেছে, কোলে হয়তো দুধের বাচ্চাটা। চোখের সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল— আমি কখনো ওদের একজন হতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রানী। পাড়ার ঘাটে একটাও মানুষ নেই—রানী আর সাহেব। হঠাৎ সাহেবের কিরকম হয়ে যায়—জুড়নপুরের যুবতী নারীর গায়ের বিষ নিয়ে এসেছিল, তাই বুঝি দপ করে দেহে-মনে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। গভীর আলিঙ্গনে রানীকে সে বুকের মধ্যে তুলে ধরল।

রানী বোধ করি আচ্ছন্ন হয়েছিল লহমার জন্যে। সম্বিত পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে: ছিঃ সাহেব-দা, তুমি এই?

ভর্ৎসনা সাহেব গায়ে মাখে না। অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, দেবতা বানাবিনে আমায়, খবরদার! আমি মানুষ।

ততক্ষণে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত রানী উঠে পড়েছে। কাঁপছে সর্বদেহে থরথর করে: ছি-ছি।

উদ্যত ফণা সাপের মতন সাহেব গর্জায়: কেন, তোমায় তো পয়সা ফেলে কেনা যায়। যে না সে-ই কেনে। ঝিঙে কিনেছে, আমি কিনতে পারিনে? কত টাকা দাম তোমার?

সাহেব যেন পাগল হয়ে গেছে। পকেটে টাকাপয়সা নোট যা ছিল, মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়। বাঁধানো চাতালে ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, কত? দাম কত তোমার শুনি?

রানী কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ল। বলে, রাগ কোরো না সাহেব-দা তুমি যে আপন আমার, পথের খদ্দেরে যা করে আপন লোকে কেন তা করবে?

ঢিবঢিব করে মাথাটা কোটে। মুখ তুলল, দু-গালে মেয়ের ধারা নেমেছে। রাগ গিয়ে সাহেবের অনুতাপ আছে। আর লজ্জা। চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। বলতে হয়, তাই যেন অবশেষে বলে, কে আমি তোর রানী, কিসে আপন হলাম?

শুনতে চাও? বর—ছোটবেলায় যা সবাই বলত। তুমি বর, কলঙ্কিনী বউ আমি তোমার। আমায় ঘেন্না করো। ঝাঁটা মারো তো পিঠ পেতে দেবো, আদর আমি কেমন করে সইব?

ঢং ঢং করে ওপারের জেলখানার পেটাঘড়িতে ঘন্টার পর ঘণ্টা বাজে। বেজেই চলেছে—বোধকরি বারোটা। উঠে দাঁড়িয়ে রানী সাহেবের হাত ধরল: চলো বাড়ি যাই। যা তোমার হকের দাবি, চোরের মতন তাই চুরি করে নেবে, খদ্দের হয়ে পয়সা দিয়ে কিনবে, এ আমার সহ্য হয় না সাহেব-দা।

বাড়িতে পারুলের ঘরে ছোটখাটো এক কুরুক্ষেত্র। উঠানে পা দিতেই বীররস কানে এসে গেল। রানী ফিসফিস করে বলে, ঝিঙে এসে পড়েছে। তুমি এসেছ টের পেয়ে গেছে কেমন করে। অনেক করে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ছুটি বাতিল।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝিঙে দ্রুত বেরিয়ে এলো। কটমট করে একনজর সাহেবের দিকে চেয়ে রানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল। একবার রানী তাকিয়েছে বুঝি নিচের দিকে—হেঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। সাহেবের শৈশবের পরমবন্ধু ঝিঙে, এত দিনের পরে দেখা—যা-কিছু মোলাকাত একবার ঐ চোখের দৃষ্টি হেনেই সারা করে গেল।

পারুল সজল চোখে ডাকে: ঘরে আয় বাবা সাহেব। আমাদের খোয়ারটা দেখলি? মলয়কুমার ক্ষেপে গেছে। মলয়কুমার না কচুপড়া—সেই ঝিঙে শয়তানটা। বাপের টাকা পেয়ে কপালের শিং গজিয়েছে, কথায় কথায় ঢুঁশ মারতে আসে। সন্ধ্যেবেলা রানী বলেকয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মদ করে আবার এসেছে। হেনস্থা আছে আজ আমার রানীর কপালে।

সাহেব বলে, দু-চারটে কথা আমার কানে গেছে, তোমাদের যেন গরু ছাগলের মতো পুষছে। ঘাড় ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু দেখলাম, বড্ড আপন মানুষ তোমাদের। বিস্তর কষ্টে নিজেকে সামলেছি।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল: একদলের মানুষ ছিলাম, দেখাসাক্ষাৎ না করে কি ছাড়ব? বেরুবে তো সকালবেলা—তোমাদের বাড়িতে কিছু নয়,

পিছন পিছন গিয়ে পথের উপরে ধরে জিভখানা একটানে উপড়ে নেবো। নিয়ে বরঞ্চ সেই জিভ দেখিয়ে যাব তোমাদের।

শিউরে উঠে পারুল না-না—করে উঠল। লাঞ্ছনার জ্বালা নিভে গিয়ে এখন ভয়। বলে, না রে সাহেব, ঝগড়াঝাটি করতে যাসনে। দেখা করেও কাজ নেই ওর সঙ্গে।

সাহেব বলে, ভয় কিসের মাসি? দুনিয়ার উপর কি আছে আমার শুনি, কে-ই বা আছে? যাদের কিছু নেই, তাদের ভয়ও নেই। আমার সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ক্ষতি তোর নয় বাবা, রানীর। বাড়িটা করে দিয়েছে। দলিল লেখাপড়া হয়েছে—এখনো সই হয় নি, রেজেষ্ট্রী করে দেয়নি। পড়শি তো কখনো অন্যের ভাল দেখতে পারে না—সকলে কান ভাঙানি দিচ্ছে। এই যে তোর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিল—ঠিক কেউ খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়তো টের পাবে কেমন করে?

খেতে দিয়েছে সাহেবকে। তার মধ্যে পারুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, থাকবি দিনকতক, না যে-দেশে ছিলি সেখানেই ফিরে যাবি?

সাহেব তো পা বাড়িয়েই আছে—রাত কতক্ষণে পোহায়, সেই অপেক্ষা। মুখে উল্টো কথা বলে মজা করে। ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ মাসি, এমন শহর-জায়গা ছেড়ে নোনা রাজ্যে কে মরতে যায়! কাঁধে শনি চেপে আমায় তাড়িয়ে বের করেছিল। ভোগান্তি অনেক হয়েছে, আর নয়।

যেমনটা ভেবেছে ঠিক তাই। পারুলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে তবু হাসির ভাব করে বলে, নিজের জায়গা তোর। এসে পড়েছিস তো থাক যে কটা দিন ভাল লাগে। আমি বলি, দিদিই যখন নেই বস্তিতে কেন পড়ে থাকতে যাবি? জায়গার এমন মহিমা, সাধু-পরমহংস থাকলেও বদমায়েস বলে নাম পড়ে যায়। ভালো পাড়ার কত ঘরবাড়ি রয়েছে, বড়রাস্তার উপর ভালো ভালো সব হোটেল—

সাহেব নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে তোমার চাবির থোলোটা একবার দাও মাসি—

কেন রে?

আমাদের ঘরটায় তালা দিয়ে গেছে, কোন একটা চাবি যদি খেটে যায়। নয় তো তালাই ভাঙব। ঘর যখন রয়েছে, হোটেল খুঁজতে যাই কেন?

পারুল মরমে মরে যায়: আমি কি তাই বললাম রে, এই বুঝলি শেষটা? তালা খুলতে হয় যা করতে হয়, এক্ষুনি তার কি? ঐ দেখ, রানী মাদুর-বালিশ

পেতে রেখে গেছে, তোকে উপরের ঘরে দিয়ে এইখানে আমার ঘরে সে শুত। ঝিঙে এসে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে পারুল বলে, এইটুকু বাচ্চা থেকে এত বড়টা হলি চোখের উপর। কপালে হল না—আমি তো ছেলে করে নিতে চেয়েছিলাম। এমন খাসা ঘর থাকতে আমিই কি তোকে বাইরে ছাড়তাম? কিন্তু ঐ যে-কথা বললি তুই—গোয়াল করে দিয়ে গরুর মতন রেখেছে আমাদের। দলিলটা ভালোয় ভালোই হয়ে যাক, জবাব তারপরে। সেদিন তোকেই লাগবে বাবা। জিভে অনেক বিষ ছড়িয়েছে, সত্যি সত্যি জিভ উপড়ে শোধ দিবি। এই ক'টা দিন চেপেচুপে থাক—তা ছাড়া উপায় নেই।

পরম দার্শনিক তত্ত্ব পারুলের মুখেঃ বুঝে দেখ,, মানুষের বলশক্তি রূপ-যৌবন দু-দিনের, কিন্তু ঘরবাড়ি বিষয়আশয় চিরকালের। দিদির হাতে-গাঁটে যদি জোর থাকত, জলসার নামে অমন ছুটে পড়ত না। আমার কপালেও একদিন তাই হবে যদি না আখের গুছিয়ে চলি। আমার রানীরও তাই।

সাহেব তখন বলে, ভোরে চলে যাচ্ছি মাসি। এ-বাড়ি বলে নয়, কালীঘাটেই থাকব না।

পারুল আন্তরিক দুঃখে বলল, কালীঘাট ছাড়তে তো বলিনি বাবা। কাছাকাছি থাকলে এক-আধ দিন তবু চোখের দেখা দেখতে পাবো। এই পাড়া ছাড়া কি জায়গা নেই, এই ছাড়া কি বাড়ি নেই, ঝিঙেটার সামনাসামনি না গেলেই হল। দৈবাৎ যদি দেখা হয়, রানীকে আর আমাকে আচ্ছা করে গালমন্দ করবি। বলবি যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ভালই হবে আমার রানীর।

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, রক্ষে করো মাসি। তোমাদের কালীক্ষেত্র ঠাকুর-দেবতার জায়গা—মা-কালীর আশেপাশে ঊনকোটি দেবতা। আমাকেও এক দেবতা বানানোর রোখ পড়েছে, মানুষ থাকতে দেবে না। এত দেবতার ভিতরে ভিড় বাড়িয়ে কি হবে? কালীঘাটে নয়, কলকাতা শহরেই আর নয়। সাহেব বলে যে ছিল, সেই মানুষটা মরে গেছে। ঝিঙেকে তাই বোলো।

পারুলের নিচের ঘরে রানীর পাতা মাদুরে শুয়েছে সাহেব। এক ঘুমের পর উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরোয়। পারুল জানতে পারে না—জানবে তো ওস্তাদের কাছে কোন্ ছাই শিখেছে এতদিন ধরে? দোতলার বন্ধদ্বার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে মনে মনে বলে, চললাম ভাই রানী। আমি মরে গেছি—পারুল-মাসি ঝিঙেকে বলবে। তুইও তাই

সত্যি বলে জেনে রাখ। তোর ঘরবাড়ি হোক, সুখশান্তি হোক। কাল রাত্রের মতো চোখে যেন আর কখনো জল না পড়ে।

চোখ বুঝি ভিজে আসে। কড়া হয়ে মনের উপর চোখ রাঙায়ঃ খবরদার!

নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে লম্বা উঠানের ফালি পার হয়ে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়ল। 'চলনে বিড়াল'—সারি সারি খুপরিঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় না।

গলির শেষে বড়রাস্তায় না গিয়ে উল্টো দিকের আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে আদিগঙ্গার কিনারে পড়ে। বড়রাস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। কনস্টেবলরা এসময়টা যদিচ চোখ বুঁজে বুঁজে পাহারা দেয়, তা হলেও দুর্জনের মুখোমুখি হবার কি দরকার?

ঘরবাড়ির বাধা পেয়ে গঙ্গার গর্ভ দিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে পায়ে মাটি বসে যায়। আবছা অন্ধকার। জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে। পায়ের কাছে জল থলথল করে। একদিন বা দু-দিন বয়সের শিশুকে এই নদীস্রোতে বোঁটা-ছেঁড়া পাতার মতন কে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বড় হয়েও ভাসছে। রানী ও অন্যদের সঙ্গে কুমির-কুমির খেলত, উঠানটুক হত নদী—ঠিক তেমনি ডাঙার নদীতেই সাহেব জীবনভোর ভেসে ভেসে চলল। পায়ে মাটি পেল না।

একটা ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। খিলখিল খিলখিল তরঙ্গিত হাসি—হাসি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। যে কণ্ঠের হাসি, সে মেয়ে ঠিক যুবতী আর রূপবতী। আশালতা আর রানীর দোসর। চোখে না-ই বা দেখি, রূপসী না হলে হাসি এত মিষ্টি হয় না। অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি না ঘুমিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে গলাগলি শুয়ে সেই মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। ঘরে ঘরে কত জনা এমনি—কত পুরুষ কত মেয়ে গায়ে-গায়ে এক হয়ে আছে!

মনকে তাড়া দেয়ঃ খবরদার, খবরদার! দ্রুত পা চালিয়ে দেরিটুকু পুষিয়ে নেয়। সবজি গাড়ি ধরবে কালীঘাট স্টেশনে গিয়ে। শেষরাত্রে গাঁ-গ্রাম থেকে মাছ ও শাকসবজি বয়ে এনে হাজির করে, শহরের মানুষ চক্ষু মুছে বাজারে গিয়ে যত টাটকা জিনিস পায়। নাম সেইজন্যে সবজি গাড়ি। ঐ ট্রেনে শিয়ালদা—পিঠ পিঠ আবার খুলনার ট্রেন। শহর আজ যেন চাবুক উঁচিয়ে সাহেবকে তাড়া করেছে।

তারার ঝিকিমিকি আকাশে। অনেক দূরে অস্পষ্ট কালীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল। হাতজোড় করে সাহেব কপালে ঠেকায়ঃ যাচ্ছি মা, আর আসব না।

আর্তনাদ শুনে হঠাৎ চমক লাগল। মহাশ্মশান—সেই শ্মশানে কে-একজন

মাথা কুটে কুটে কাঁদছে : ওগো তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে থাকব কেমন করে ? কত রাত্রি কাটিয়েছে এইখানে, এমন কত কান্না শুনেছে ! সুধামুখীকে লাসঘর থেকে এই শ্মশানে এনে দাহ করেছিল। গরিব নফরকেষ্ট ধারধোর করে এবং নিজের সামান্য সম্বল খরচ করে সুধামুখীর শেষ-কাজ করেছে, তাতে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। মন্দির উদ্দেশ করে যা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলো আবার সাহেবের মুখে এসে যায় : চলে যাচ্ছি মাগো—

ঘরগৃহস্থালীর আনাচকানাচ দিয়ে মানুষের হাসিকান্নার পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে সাহেব ছুটেছে। তারপরে ট্রেন। দিনমান এখন রোদ চড়ে উঠেছে। দু-পাশের জীবনযাত্রা সড়াক-সড়াক করে অন্তরালে চলে যায়। মাঠে লাঙল চষছে। মাল বোঝাই গরুর-গাড়ি চলেছে কাঁচা-রাস্তায়। ঘাটে চান করছে বউঝিরা। খোলা আটচালার পাঠশালে পড়ুয়ার দল। সাহেব এদের কেউ নয়, চোখে দেখে যায় শুধু। দেখলই কেবল সারা জীবন—নিশিকুটুম্ব রয়ে গেল, দিনমানের কুটুম্ব কখনো কারো হল না।

বাইশ

সেই প্রথমবার সাহেব খুলনার ঘাট থেকে বলাধিকারীর নৌকোয় গিয়েছিল। সে রকম মহাশয়-মানুষ প্রতিবারে মেলে না। সস্তায় শেয়ারের নৌকোও ঘাটে নেই। না-ই বা থাকল, ভাবনার কি ? বিবেচক ভগবান পা পা দিয়ে রেখেছেন। একখানা নয়, দু-দুখানা। হেঁটে চলো সেই ভগবানের পৃথিবী দেখতে দেখতে। অসুবিধা যাওয়ার ব্যাপারে নয়—গিয়ে উঠবে কোনখানে সেই হল ভাবনা।

হাঁটতে হাঁটতে দিন-পাঁচ-ছয় পরে গুরুপদর বাড়ি।

সাহেব হঠাৎ কোথা থেকে ?

গুরুপদ বেজার হয়ে আছে। একসঙ্গে দুনিয়া চষে বেড়িয়ে মুনাফার কাজ জড়নপুরের দিনেই সে ফাঁক পড়ে গেল। দোষ তার নিজের। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, অন্যের ভালো দেখে বুক চড়বড় করে না এমন নিরেট বুক কার ?

হঠাৎ কি মনে করে সাহেব ?

সেই যে নেমন্তন্ন করেছিলে বাইটা-বাড়ি থাকবার সময়—

ভালোই তো, বড় আহ্লাদের কথা। বিপদ হল, ঢেঁকিতে বউয়ের হাত ছেঁচে গিয়েছে। সে আবার ডানহাতটা—বাঁ-হাত হলে বলতাম, চুলোয় যাকগে। রান্নাবান্না বিনে সংসার আমার অচল।

আসল কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না। তবু ভয় দেখাবার জন্য সাহেব বেশি করে বলে, ভালো রাঁধতে পারি গুরুপদ ভাই। যদ্দিন হাত না সারছে, আমিই তা হলে থেকে যাই।

ঘরের মধ্যে গুরুপদর বউ, সেখান থেকে সে করকর করে ওঠে: হাত ছেঁচে গিয়ে কোন্ কাজটার কসুর হচ্ছে শুনি? পুরুষের কাজ চাল এনে দেওয়া, আমার কাজ পিণ্ডি সেদ্ধ করা। ওর কাজ ও করুক, আমারটা না হলে তখন যেন বলতে আসে।

অতএব সেই গোড়া থেকেই ধরতে হবে। চাল আনা থেকে। হোক তবে তাই। ধামা নিয়ে আমার সঙ্গে চলো গুরুপদ।

ভানকিরা ধান ভেনে চাল বিক্রি করে। এক ভানকির কাছ থেকে চাল কিনে চালের ধামা গুরুপদর হাতে দিয়ে সাহেব হনহন করে চলে যায়।

চললে আবার কোথা?

সাহেব বলে, তোমার বউ যখন রাঁধতে পারবে, আর আমায় কি দরকার? আমি সোনাখালি যাই। বেলা হয়নি, দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব।

শোননি বুঝি? সোনাখালির সে সোনা নেই। ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ল গুরুপদর: বাইটা চলে গেলেন। বিদ্যের পাহাড়। কী তুমি দেমাক করো সাহেব—পেয়েছ সেই পাহাড়ের পাথর দু-চার টুকরো। আমাদের তা-ও নয়। সব বিদ্যে কাঁধে বয়ে নিয়ে গেলেন। স্বর্গ-নরক যেখানেই যান, সে জায়গায় এখন সামাল-সামাল পড়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেব: বলো কি গুরুপদ, কি হয়েছিল?

নাড়ি ফেটেই গেলেন। রোগ জিজ্ঞাসা করলে বলব, খাওয়া। আমরা সব না খেয়ে মরি, পচা খেয়ে মরলেন।

মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে শোনা গেল। বাড়িতে যজ্ঞি, মুরারির ছোট ছেলেটার অন্নপ্রাশন। ভিয়ান হয়েছে—ময়রা রসগোল্লা বানিয়ে চিনির রসে ফেলে চলে গেছে। বুড়ো বাইটার ভয়ে ভাঁড়ারঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা। কিন্তু ও-মানুষ যদি ইচ্ছে করে, ত্রিভুবনের মধ্যে কে ঠেকাবে? রসগোল্লা রস সমেত সাপটেছে। পেটে গিয়ে সেই জিনিস ফুলতে লাগল। গুরুপদর স্থির বিশ্বাস, পেটের ভিতরের নাড়ি ফেটে গিয়েছিল। ট্যাপামাছের মুখে ফুঁ দিয়ে ছেলেরা যেমন পেট ফাটায়।

তবে আর কি, সোনাখালিরও সম্পর্ক শেষ। স্রোতে ভাসছে সাহেব—তৃণগুচ্ছ মুঠোয় ধরে একটু জিরিয়ে নেয়, তার মধ্যে আবার একটা ছিঁড়ল।

ডাইনে সোনাখালির পথ ধরেছিল, ঘুরে বাঁয়ের দিকে মোড় নিল। এ পথ ফুলহাটার। বলাধিকারী আর বংশীর কি গতিক, দেখা যাক গিয়ে।

সেখানে খবর ভালো। ফুলহাটায় পা দিয়ে কুঠিবাড়ির কাছে বংশীর সঙ্গে দেখা। আস্ত কলাগাছ কাঁধে নিয়ে চলেছে, কুচিকুচি করে কেটে গরুর জাবনায় দেবে। ঘোর সংসারী বংশী। সাহেবকে ধরে এই টানাটানি : চলো, আমাদের বাড়ি থাকবে। বউ তোমার কথা বলে—

সাহেব শিহরণের ভঙ্গি করে বলে, ওরে বাবা! যা দারোগা-বউ তোমার, ঠেঙানি দেবে কায়দার মধ্যে পেলে।

যদিচ রঙ্গরসিকতা, বউদের নিন্দায় মর্মাহত হয়ে বংশী বলে, গিয়ে দেখই না ঠেঙানি দেয়—না আসন পেতে পা ধোবার জল দেয়, পান-তামাক দেয়, ভাতব্যঞ্জন দেয়।

বংশীর সুখসৌভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে সাহেব যাচ্ছে। দশধারার বিপদ গেছে, যথোচিত বন্দোবস্ত পেয়ে বুড়ো-দারোগা বংশীর নাম তুলে নিয়েছে আসামির লিষ্টি থেকে। বউ-ছেলে, গরু-বাছুর, জমি-জিরেত ছাড়া কিছু সে জানে না। জানবেও না আর এ জীবনে। সাহেব হতেই সমস্ত, বউ অহরহ সেকথা বলে। দেখা হলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। গুরুঠাকুরের মতো আদরযত্ন করবে, দেখতে পাবে।

শতকণ্ঠে বউয়ের গুণগান। কানে শোনে সাহেব, আর বংশীকে দেখতে দেখতে যায়। ক্ষমতা আছে সত্যিই বউয়ের—বংশীর চেহারায় রীতিমতন চিকন আভা। দিনরাত এত খাটনি খাটে, তথাপি যেন ভুঁড়ির লক্ষণ। শুকনো কাঠে কুসুম-মঞ্জরী।

কিন্তু বংশীর বাড়ির দিকে না গিয়ে সাহেব সোজাসুজি চলল।

কি হল?

তোমার কথা শুনে ভয় ধরে গেল বংশী। তোমার নিজের দশাও চোখে দেখছি।

দশাটা মন্দ কি দেখলে?

সাহেব বলে, মন্দ নয়—ভালো। বাগে পেলে তোমার বউ আমাকেই ভালো বানিয়ে দেবে।

বংশী বলে, ভালো হওয়াই তো ভালো রে—

সাহেব রেগে যায় : কষ্ট করে এতসব শিখলাম কেন তবে? কু-ডাক ডেকো

না বংশী মন্দ আমি হবোই। আলবৎ হবো—চেষ্টায় কী না হয়! কে আছে আমার, ভালো হবার কী দায় পড়েছে, কোন দুঃখে আমি ভালো হতে যাব?

হনহন করে সোজা একেবারে বলাধিকারীর বাড়ি।

এসে গেছিস, ভাবছিলাম তোরই কথা। সাহেবের কানের কাছে হাসি-হাসি মুখ এনে বলাধিকারী সুখবর দিলেন: নতুন মরসুম এইবার, নতুন কাজ-কর্মের বিলি-ব্যবস্থা। কাপ্তেন কেনা মল্লিক এর মধ্যে একদিন এখানে এসে হাজির। মানুষটা গুণের কদর জানে, মুখের গল্প শুনেই লাফিয়ে উঠল: কোথায় সে সাহেব, খবর করে এনে দিন।

বলছেন, দুদিনেই কাপ্তেনের সুনজরে পড়বি তুই। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি, কোন বেটা রুখতে পারবে না। নতুন মানুষ বলে এবারে না-ই হল, আগামী সন থেকে কোন একটা দলের সর্দারি দিয়ে দেবে। মজা করে এখন খাওয়া-দাওয়া কর, ঘুমো। মরসুম পড়ে গেলে তখন ছুটোছুটির অন্ত থাকবে না।

কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। ধুরন্ধর কাপ্তেন বেচা মল্লিক ছিল, তারই কনিষ্ঠ। কাপ্তেন তো কতই আছে কত জায়গায়, কিন্তু কেনারাম দ্বিতীয় নেই। এলাহি কাজকারবার। বউ চার-চারটে। পুরো বর্ষাকালটা বাড়ি থেকে চার বউয়ের সঙ্গে একত্র সংসার। দুর্গাপূজা অন্তে বিজয়া দশমীর পরের দিন দশেরা —কাজের সূচনা ঐ দিন।

রাতদুপুরে কেনারামের বাড়ি বহু লোকের মীটিং। মীটিং বলে না এরা, পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পাকা ব্যবস্থা করে দেবে, তার পরেই শুভদিন দেখে নানান দল ও দলে ভাগ হয়ে বিষয়কর্মে বেরুনো। কেনারামের বুড়ি-মা এখনো বেঁচে —মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজেও সে বেরোয়। পানসি নিয়ে গাঙে খালে ঘুরে সকলের তদ্বির-তদারক করে বেড়ায়। বড়বউ বাদে অন্য তিন বউয়ের কোন একটা অন্তত থাকবে নৌকোয়। বড়বউ গিন্নিমানুষ—সে বাড়ি না থাকলে সংসার অচল। বড়বউয়ের যাওয়া কখনো সম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত জমজমাট। মনে তো হয়, অতিশয় অমায়িক মানুষ কেনারাম। সকলের কথা শুনছে, হেসে কথাবার্তা বলছে সকলের সঙ্গে। অথচ কাজের দরকারে এই কেনারাম নাকি নিজ দলের কারিগর ঈশ্বর মান্নার মুণ্ডু কেটে নিয়ে সরে পড়েছিল। মন টলেনি, হাত কাঁপে নি। খোদ পচা বাইটা বলেছিল সাহেবকে, গল্প অতএব মিথ্যা হতে পারে না।

চারখানা গাঁয়ের বাছা বাছা মরদের জমায়েত। মেয়েলোকও আছে—যারা

বেরিয়ে পড়বে, তাদেরই ঘরের কিছু মেয়েছেলে। এবং মেয়েলোক এলে কোলের বাচ্চাও ফেলে আসবে না—বাচ্চারাও পঞ্চায়েতের জরুরি বৈঠকে। কারা সব যাবে, রোজগারের ভাগ-বাঁটোয়ারা কেমন হবে এবারে, কোন লোকের কি রকম অংশ—মরসুমের মুখে যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা করে বেরুতে হয়। পরিণামে যাতে কথা-কথান্তর না হয়, গণ্ডগোল না বাধে। অনেক দলে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম সব দলের একরকম নয়। ভাগের সেইজন্যে রকমফের।

প্রতি দলে ওস্তাদ একজন করে। কাজের যাবতীয় বুঝসমঝ তার কাছে—সিঁধ কাটা, মাল সরানো, লাঠি বা লেজা চালানো, যেমন যেটির প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কায়দায় চলাচল—সাপের মতন বুকে হেঁটে, কিম্বা বাঘের মতন হামলা দিয়ে? সাধারণ নিয়মের যে ভাগ তার উপরে একটা বিশেষ ভাগ সেই লোকটার নামে—যাকে বলে ওস্তাদ-ভাগ। সকল কাজেই ওস্তাদ যে হাজির থাকবে, এমন নিয়ম নয়। ওস্তাদ বিহনে সর্দার তখন দলের কর্তা। প্রেসিডেন্ট গরহাজির হলে ভাইস-প্রেসিডেন্টকে চেয়ারে বসায়, তেমনি আর কি! সর্দারেরও বিশেষ ভাগ একটা—পরিমানে, অবশ্য অনেক কম ওস্তাদ-ভাগের চেয়ে। বড় বড় দলে আবার জমাদার বলে পদ থাকে সর্দারের উপরে। অ্যাডিসন্যাল বা অতিরিক্ত ওস্তাদ। আছে মহাজন। সে মানুষ ঘরে বসে থাকে, এক পা-ও বাইরে যায় না, কিন্তু দায়দায়িত্ব কাঁধে বিস্তর। কাপ্তেন কেনা মল্লিকের এত প্রতিপত্তি বলাধিকারীমহাশয়ের মতন বিচক্ষণ মহাজন পৃষ্ঠপোষক আছেন বলেই। দলের মানুষ যতদিন না ফিরছে, বাড়ির দরকার মতন মহাজন টাকাটা সিকেটা জুগিয়ে যাবে। মরদ ফিরে এলে হিসাবপত্র হবে। সুদ লাগে না—কিন্তু মহাজনি ভাগ আছে, সুদের উপর দিয়ে যায় সেটা। আর আছে খুঁজিয়াল—যারা খোঁজখবর এনে দেয়। অর্থাৎ স্পাই। এ কাজে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের জুড়ি নেই। নিতান্ত খাতির-উপরোধ ছাড়া এখন আর বেরোয় না। কিন্তু বয়স হয়ে গেলেও ক্ষমতা পুরোদস্তুর বজায় আছে। বেরুল তো একখানা দু-খানা তাজ্জব কাজ গেঁথে আনবে—সে কাজের চেহারা দেখে হাল আমলের তরুণ খুঁজিয়ালদের চক্ষু কপালে উঠে যায়।

নানান ধরনের ভাগিদার। পঞ্চায়েত বছর বছর সকলের হিস্যা ঠিক করে দেয়। মরসুমের সুবিধা অসুবিধা নিয়েও রকমারি বিবেচনা। কেউ হয়তো মারা পড়ল বিভুঁয়ে—রোগপীড়ায় মরতে পারে অথবা খুনজখম হয়ে। তেমন ক্ষেত্রে বাড়ির লোকের প্রাপ্য কি? খুনজখমে বেশি পাওনা—মরেই যদি, জর-জ্বালা-ওঠায় না মরে যেন খুন হয়ে মরে, মনে মনে প্রতিজনের এই বাসনা। যে

বাড়ি দ্বিতীয় পুরুষ নেই—মানুষটা বেরিয়ে গেলে গুচ্ছের মেয়েমানুষ পড়ে থাকবে, সে বাড়ির মেয়েমানুষই পঞ্চায়েতে চলে এসেছে পাওনাগণ্ডার কথা স্বকর্ণে শুনে যাবে বলে।

বাছা বাছা মরদ নিয়ে পঞ্চায়েত, কিন্তু খবর ইতরভদ্র সকলের জানা। রটনা একটা চালু করা আছে—মরদেরা নাবালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আর কতক যাচ্ছে নাকি ব্যাপার-বাণিজ্যে—নৌকোয় যাবে তারা। কেনারাম মল্লিক চলেছে নিজের আবাদ তদারকি কাজে—ক্ষেতের ধান খোলাটে তুলে পাইকারদের মেপে দিয়ে নগদ তঙ্কা গনে নিয়ে ফিরবে। থানা দূরবর্তী, পুরো বেলার পথ। তা বলে কৈলাস থেকে ভোলানাথ নেমে এসে দারোগা হয়ে বসেন নি—দেশসুদ্ধ মানুষ জানে, তিনিই বা না জানবেন কেন? ধান কাটার কথা শুনে দারোগা মুখ টিপে হাসেন অন্তরঙ্গ মহলে : কাটবে তো কিছু বটেই—ক্ষেতের ধান না হল, ঘরের দেয়াল।

ব্যস, মুখের ঐ মন্তব্যেই শেষ। এলাকার ভিতরে চুরিচামারি হবার শঙ্কা নেই। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা কেনা মল্লিকের জায়গায় ঢুঁ মারতে আসবে? দারোগা সেটা নিঃসংশয়ে জেনেবুঝে আছেন, তাবৎ গ্রামবাসীও জানে। তার উপরে কেনারাম অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি—অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী যার যেমন প্রাপ্য ঘরে বসেই ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন। চুপচাপ থেকে লাভ বই লোকসান নেই কারো পক্ষে।

উল্টে বাইরের কত গ্রাম এসে কেনারামের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে, কী দোষে তারা বছরের পর বছর বাদ পড়ে থাকবে, তাদের নিয়েও আলাদা দল গড়া হোক। কিন্তু এলাকা বাড়াতে কেনারাম রাজি নয় : তামাম মুলুক জুড়ে নিয়ে সামাল দেব কেমন করে? কেনারাম ছাড়া কি কাপ্তেন নেই? অন্যদের ধরো গিয়ে।

হালফিল কয়েকটা মরসুম ডোকরাদের গ্রাম থেকেও ধরাধরি চলছে। ডোকরা—যারা সিঁধকাঠি লেজা-সড়কি বানানোর ওস্তাদ। এবারের পঞ্চায়েতে —চোখে দেখেও বিশ্বাস হবার কথা নয়—সকলের বড় কারিগর যুধিষ্ঠির নিজে এসে উপস্থিত।

কেনা মল্লিক অবাক হয়ে বলে, তুমি এর মধ্যে কেন? রাতদিন খাটনি খেটেও খদ্দের সামাল দিয়ে পারো না—তোমার কোন অভাবটা আছে শুনি?

যুধিষ্ঠির বলে, পয়সাকড়ির অভাব নয় মহারাজ। মরসুম লেগে গেলে আমার সব খদ্দের তো বেরিয়ে পড়বে, কাজকর্মেরই অভাব এইবার। সেইজন্যে আসতে হল। এখন গৃহস্থের দা-কুড়াল গড়ানো, আর নয়তো হাত-পা কোলে করে বসে থাকা। কোনটাই আমি পারিনে।

তার হাতের গড়া কাঠি নিয়ে নলের মানুষ দেশদেশান্তর বেরিয়ে চলল, যুধিষ্ঠির ডোকরার মন উড়ু-উড়ু। দা-কুড়াল ইত্যাদি গড়বার জন্য আছেন কর্মকার-মশায়েরা। ভালো জাত তাঁরা নবশাখের অন্তর্গত। বিদ্যে শিখে তাঁদের কতজনা শহরে গিয়ে দালান-কোঠা দিচ্ছেন। ঘরব্যাভারি দা-কুড়ালের কাজ যুধিষ্ঠিরও চেষ্টা করে দেখেছে। গত বছর দেখেছে, তার আগেও দেখেছে অনেক। এই কাজে হাপর টানতে গিয়ে সর্বদেহ ঝিমিয়ে আসে কেমন। নেহাই-এর উপর তপ্তলোহা পিটতে লক্ষ্য ভুল হয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক বাড়ি পড়ে। পিটতে পিটতে অন্যমনস্ক হয়: তারই হাতের যন্ত্র নিয়ে কত কারিগর রাজভাণ্ডার পলকে উজাড় করে আনছে, তার অস্ত্র হাতে করে নিঃশঙ্কে কত জনে পায়তারা কষে বেড়াচ্ছে এই নিশিরাত্রে, আর সে এখানে চালাঘরে বসে বসে শ্বাসরোগীর নিশ্বাসের মতো একটানা হাপরের আওয়াজ শোনে। হঠাৎ খেয়াল হয়, হাপর টানা বন্ধ হয়ে গেছে কখন, কাঠকয়লার আগুন নিভে গেছে। আবার নতুন করে ধরাতে মন যায় না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা।

তাই সে কেনা মল্লিকের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল: মহারাজ, আমার হাতেরও একখানা কাজ পরখ করতে আজ্ঞা হোক। দিয়ে দেখুন একটিবার। গরপছন্দ হলে আয়েন্দা সন আর কিছু বলব না। লোহাই পিটে যাব, দা-কুড়ুল বঁটি-খন্তা গড়াব।

কেনা মল্লিক বলে, হাতের কাজ তো হরবখত দেখাচ্ছ। মুলুক-জোড়া তোমার কাঠির নাম। তোমার গড়া কাঠি হাতে তুললে সাধুমহান্তেরও হাত সুড়সুড় করে। কার ঘরের দেয়াল কাটি, এই তখন মনের অবস্থা।

বলতে বলতে মল্লিক হেসে ফেলে: এত দেখাচ্ছ, আবার কোন গুণ পরখ করতে বলো এর উপরে?

যুধিষ্ঠির বলে, কাঠি গড়ে দিই—সে কাঠি ধরতেও পারি মহারাজ। হুকুম হয়ে যাক, আমিও বেরিয়ে পড়ি নলের সঙ্গে। বিনি কাজে ঘরে থাকা যায় না।

যুধিষ্ঠির সম্প্রতি নতুন এক নম্বর সাঙা করেছে। ব্যাপারটা কেনা মল্লিক জানে। বলল, কাজ না থাকাই তো ভাল। সাঙার বউর সঙ্গে বসে বসে ফষ্টিনষ্টি করবে।

এই ডোকরা জাত হিন্দু কি মুসলমান, বলা কঠিন। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে নাম, কালীপূজা করে। কিন্তু সাঙা চলে এদের মধ্যে, মরার পর কবর দেয়।

কেনা মল্লিক পঞ্চায়েতের সর্বদিক নজর ঘুরিয়ে বলে, কথা শোন ডোকরার পো'র। কাজ নেই বলে নতুন বউ ঘরে ফেলে বেরিয়ে পড়বে।

যুধিষ্ঠির বলে, আমি যাব, আর বউ বুঝি ঘরে পড়ে থাকবে? সে যাচ্ছে তিলেসোনার জগদ্ধাত্রীপুজোর মেলায়। আমার বেরুনো তো তারই ঠেলায়। চৌপহর খিচখিচ করে: চালের নিচে বসে বারোমাস ঠুকঠুক করবে বাইরের কাজ ধরবে না—এ কেমনধারা পুরুষমানুষ!

তখন মালুম হল। যুধিষ্ঠিরের যাওয়া নিজের ইচ্ছেয় ততটা নয়—সাঙার বউ তাড়িয়ে তুলছে। আগের বউগুলো ভদ্রপাড়ার বউঝি'র মতো—ঘরে থেকে রাঁধাবাড়া ও সংসারধর্ম করে আসছে। বুড়োবয়সের সোহাগী বউ তাতে রাজী নয়—চিরকালের জাতব্যবসা ধরবে। সে হল ভিড়ের মধ্যে পকেট মারা এবং দিনে রাত্রে অন্য দশরকমের অভব্য রোজগার। ডোকরা মেয়েদের স্বভাবগত ক্ষমতা, মা-ঠাকুরমা হতে চলে আসছে—শিখে নিতে হয় না কিছু।

পঞ্চায়েতের কাজ এক রাত্রে মিটল না। পরের রাত্রেও বসতে হয়। বেরুনো কালী-নিরঞ্জনের পরের দিন। খড়ি পেতে আচার্যি ঠাকুর দিন সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে বিরিঞ্চি-মন্দির বলে একটা জায়গা—বিরিঞ্চি বা কোন নামেরই বিগ্রহ নেই সেখানে। মন্দিরও নেই—পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের স্তূপ, দেয়ালের তিনটে দিকের খানিকটা মাত্র খাড়া। রাবিশ সরিয়ে সেখানে ভাঙা-চোরা বেদি বের করেছে, কালী-প্রতিমার স্থাপনা সেই বেদির উপর।

পুজো নিশিরাত্রে—কালীপুজোর যেমন যেমন বিধি। পাঁঠাবলি অনেক-গুলো, তার সঙ্গে মহিষও একটা। সে এক কাণ্ড! সন্ধ্যে থেকে মহিষটার শিঙে আর ঠ্যাঙে দড়ি টানা দিয়ে শুইয়ে ফেলে দুই মরদ গলার দুই দিকে ঘি মালিশ করছে। মালিশে চামড়া নরম হয়। অত বড় জীবটা এক কোপে কাটতে হবে, কোপে দুখণ্ড না হলে সর্বনাশ—সেজন্য বিস্তর রকম তদ্বির। সকলের উপরে অবশ্য দেবীর করুণা। তাঁর ইচ্ছা না হলে বাধা পড়ে যাবে, মেলেতুকে যত ধারই থাকুক আর কামার যতই বলবান হোক।

বলিদান সমাধার আগে পর্যন্ত কেনা মল্লিকের সোয়াস্তি নেই। প্রতিমার সামনে করযোড়ে অবিরাম মা-মা—করছে। চার বউ তার ডাইনে বাঁয়ে। তারপর উল্লাসের চিৎকার: নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে, তুষ্ট হয়ে দেবী বলি গ্রহণ করেছেন। পূর্ণসিদ্ধি। রক্তজবা নিয়ে কাপ্তেন নিজে এবার অঞ্জলি দিল।

পুজো শেষ। পুরুত এবং বাইরের যারা ছিল, বিদায় হয়ে গেল। পুজার যাবতীয় উপকরণ সরিয়ে নিয়ে গেছে। আসল কাজ এইবারে। শুধুমাত্র নিজেদের লোক ক'টি। তক্ষক ডেকে উঠল অরণ্যের কোনখানে। বারকয়েক ডেকে ডেকে থেমে যায়। একেবারে নিঃশব্দে, গাছের পাতাটি পড়লে কানে

পাওয়া যাবে এবার। মস্তবড় মাটির প্রদীপ জ্বলছে দেবীপ্রতিমার সামনে। বাতাসে আলো কাঁপে—চারটে সলতে একসঙ্গে ধরানো, সেইজন্য নিভে যায় না। কাঁপছে আলো ঘন ডাল-পাতার উপর। নিরেট অন্ধকারের গায়ে বাঘের মতন ডোরা কেটে যাচ্ছে। আলো পড়ছে বলির রক্তস্রোতের উপর। নিরুদ্ধশ্বাস থমথমে ভাব চতুর্দিকে।

কাপ্তেন কেনা মল্লিক হাঁক দিয়ে উঠল : সামনে চলে এসো তোমরা।

আবছা আবছা এতক্ষণ দু-পাঁচটিকে দেখা যাচ্ছিল। তারা এগিয়ে এলো। তারপর আরও সব আসতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একসঙ্গে এত মানুষ ছিল অন্ধকারে! গাছগাছালি আর গায়ের রঙে অন্ধকারের মধ্যে এক হয়ে মিলে ছিল।

এগিয়ে এসে মানুষ বলির রক্ত আঙুলে চুবিয়ে কোঁটা দেয় কপালে। প্রতিমার পদতলে হাত রেখে মন্ত্রের মতো বলে যায়, এক-দল আর এক-দিল। দলের খবর বাইরে যাবে না, গলা কাটলেও কথা বেরুবে না।

প্রসাদী পাঁঠার পাকশাক ওখানেই। ফুতিফাতি সারারাত্রি ধরে। সকাল-বেলা চোখ লাল করে সব ঘরে ফেরে। সারাদিন ঘুমোয়।

সন্ধ্যার কিছু আগে যাত্রা—আচার্যি ঠাকুর ঘণ্টা-মিনিট ধরে বলে দিয়েছেন। সাহেবও একটা দলের সঙ্গে। কালীঘাটের সম্পর্ক চুকিয়ে-বুকিয়ে এসে ভাঁটি অঞ্চলের দল বেঁধে এই ভেসে পড়ল। নদীর ভাঁটায় থোপা থোপা কেউটেফেনা ভেসে যায়, তেমনি।

কাক ডেকে উঠল না? ডালে বসে কাক ডাকছে। দলের সর্দার পিছিয়ে ছিল, উৎসাহে ছুটে চলে আসে। সাহেবকে সামনে পেয়ে বলে, দেখ দিকি, পুকুর যেন ঐখানে। সেই রকম মনে হয়।

সাহেব এগিয়ে দেখে বলল, পুকুর কোথা? ডোবা একটা—

জল আছে, তা হলেই হল।

পুকুর-ধারে গাছের উপর কাক ডাকা ভারি সুলক্ষণ। স্ফূর্তি সকলের। সর্দার বলে, জল রয়েছে তখন পুকুর ছাড়া কী! জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের জন্য দীঘি কেটে ঘাট বাঁধিয়ে কে দিচ্ছে! কাক ডাকছে, কাজের বড্ড জুত এবারে।

আর একবার কাক দেখার ঘটনা পুরানো কারিগরের মনে এসে যায়। কাপ্তেন নিজেই সেবার একটা দলের সর্দার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর মাল্লাকে বলল, গাছটা জলের ধারে কিনা দেখে এসো। জলে ঠিকই—একটা মহিষ কাদাজলে

অর্ধেক গা ডুবিয়ে আরামে পড়ে আছে। জলে ও ডাঙায় মেকো-কাঁকড়া কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বর পাড়ের কাছে গিয়েছে, আর কাক সেই সময়টা একটা কাঁকড়া ঠোঁটে নিয়ে মহিষের পিঠে বসল। সাংঘাতিক দৃশ্য। নিঃসন্দেহ এরই ফলে ঈশ্বর হেন পাকা সিঁধেলকে সিঁধের ভিতর জাপটে ধরল। এবং পরিণামে প্রাণ গেল গুণী মানুষটার।

পরে যখন আচার্যি ঠাকুরের কানে ঈশ্বরের এই বৃত্তান্ত গেল, তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন : জলের ধারে কাক ডাকল—কানে শুনে নিলে, ঐ পর্যন্ত। সেই কাক উড়ে কোথায় বসে—কী দরকার ছিল তাকিয়ে দেখবার! দেখতে গিয়েই সর্বনাশ। মহিষ শুয়োর বা মড়ার উপর কাক বসেছে—চোখে দেখে সেই চক্ষু শতেকবার গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেললেও দুর্ভোগ এড়ানো যাবে না। শাস্ত্রে এই রকম বলে।

সেই ঠেকে শিখল। কাকের দিকে চোখ তুলে না চেয়ে দলের মানুষ দ্রুত এগিয়ে যায়। চলেছে। খাল পার হতে ভোর হয়ে এলো। ওপারে চৌমাথা একটি—নানান দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। চৌমাথার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল—চোর পথের কোন্‌টা ধরে যাবার হুকুম আসে দেখ। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভাবে।

থুতু ফেলে সর্দার বাঁ-দিককার পথে। উন্মত্ত কালী, বাঁয়ের পথ ধরি কিনা বলো।

বেদীর সম্মতি থাকলে শিয়াল ডেকে উঠবে জঙ্গলের কোনখানে। সেই সঙ্কেত। চুপচাপ কান পেতে আছে।

অপেক্ষায় কাটে কিছুক্ষণ। সাড়া আসে না। সর্দার ব্যাকুল হয়ে বলে, যাবো কোন্ দিকে, ঠিকঠাক বলে দাও। ঝুলিয়ে রেখো না। কানা-খোঁড়া বেওয়া-বিধবা বাচ্চা-বুড়ো বিস্তর পুষ্যি। ঘরবাড়ি ফেলে যাচ্ছে মরদেরা, বাড়ির লোকের খাওয়াপরা আছে। মুখ ঘুরিয়ে থাকলে হবে না মা-জননী। বলে দাও, বলে দাও—

থুতু ফেলে এবারে ডানদিকে। নিঃশব্দ। নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না কারো। শিয়াল ডেকে উঠল। অনতি পরে। হয়েছে, হয়েছে—মিলে গেছে হুকুম।

ফুর্তিতে যাত্রা এবার। চোরা-যাত্রা। দক্ষিণে অর্থাৎ আরও নাবালে নেমে চলল এই দল। নানান দল এমনি নানা দিকে—দেশ-দেশান্তর বিজয়ের সৈন্যবাহিনী যেন। সেনাপতি মা-কালী। অলক্ষ্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, হুকুম-হাকাম যত কিছু তিনিই দিচ্ছেন। সর্দার একজন উপলক্ষ মাত্র। অনাচার অনিয়ম না ঘটে, সতর্ক থেকো। ধনদৌলতের পাহাড় নিয়ে ঘরের মানুষ ঠিক ফিরে আসবে।

তেইশ

চোর-যাত্রা। এ যাত্রার বিরাম হল না সাহেব-চোরের জীবনে। বুড়ো হয়ে এক সময় জবুথবু হয়ে পড়ল সাহেব—সোনাখালি এসে গুরু পচা বাইটাকে যে অবস্থায় দেখেছিল। সেই বয়সকালের কথা ভাবে বসে বসে, ছোঁড়াদের কাছে সে আমলের গল্প করে। ঘরবাড়ি পথঘাট গাঙখাল নিয়ে বিশাল ভাঁটিঅঞ্চল যেন মাঠ একখানা, সেই মাঠের উপর খেলা করে করেই জীবন কাটিয়ে দিল। কাজের এমন নামডাক—সাহেব নিজে কিন্তু খেলার বেশি ভাবতে চায় না। খুব বেশি তো কাজ-কাজ খেলা।

বংশীর বাড়ি একটা আস্তানা, দায়ে-বেদায়ে সাহেব সেখানে এসে ওঠে, বংশীর বউ আদর-যত্ন করে। বাইরের দিকে আলাদা চালাঘর বেঁধে দিয়েছে তার জন্য। সঞ্চয় একটি পয়সাও নেই। নাকি অভিশাপ আছে চোরের সুখ-সম্পত্তি দালানকোঠা হতে পারবে না। অভিশাপটা সাহেবের বেলা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সে জন্য দোষের ভাগী যদি কাউকে করতে হয়, সে সাহেব নিজে। হাতে পয়সা এলেই ছটফট করে। পয়সা যেন পোকা হয়ে কামড়ায়। চিরটি কাল ধরে এই চলল। কোন্ উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরিণী অজানা মায়ের কাছ থেকেই বুঝি উত্তরাধিকার।

পয়লা মরশুম শেষ করে ফিরল—সেইবারের এক ঘটনা বলি। শুনলে হাসি-মস্করা করবে লোকে, বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বংশীর চালাঘরে এসে আছে। কাজকর্ম মাঝামাঝি রকমের, কিন্তু নামযশ নিয়ে এসেছে খুব। পচা বাইটার শিক্ষা আর বলাধিকারীর আশীর্বাদ ষোলআনা সার্থক। হিসাবপত্র হয়ে ইতিমধ্যেই বখরার টাকাপয়সা এসে পড়ল। এইবারে মহাবিপদ। নামযশ থাকুক, এবং আরও বৃদ্ধি হোক, কিন্তু টাকা নিয়ে এখন কি উপায়? বংশীর বউ কক্ষনো এ জিনিস ছোঁবে না—মনের মতন করে সংসার গড়ে তুলেছে, তার উপরে পাপের দাগ লেগে যাবে। সুধামুখী নেই, নফরকেষ্টও নেই। টাকা পাঠিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হবে, দুনিয়ার উপর এমন একটা নাম খুঁজে পায় না।

আষাঢ় মাস। বর্ষাটা চেপে পড়েছে আজ ক'দিন। এমনি সময় বাবুপুকুরের কেষ্টদাস ভিজতে ভিজতে সাহেবের চালাঘরে এসে উঠল। সম্পর্কে বংশীর শালা—সেই সুবাদে কুটুম্ববাড়ি বেড়াতে এসেছে। বর্ষাকালে

ক্ষেতখামারের কাজ বন্ধ, এই সময়টা কুটুম্ববাড়ি ঘোরা ভাঁটিঅঞ্চলের রেওয়াজ। কুটুম্বে কুটুম্বে অনেক সময় পথের উপর ঠোকাঠুকি হয়। অর্থাৎ আমি যার বাড়ি চলেছি, সেই কুটুম্ব আবার আমার বাড়ি মুখো রওনা হয়ে পড়েছে—আমিও কুটুম্ব তার বটে। কুটুম্বপ্রীতির কারণ উভয়ত একই—আমার ঘরে তণ্ডুলাভাব, তার ঘরেও তাই। দেখা হয় উভয় মুখে একই প্রকার অমায়িক হাসি : ফুরসত পেলাম তো খবরাখবর নিতে বেরিয়েছি। হাসি মুখের উপরে, কিন্তু বুকের নিচে ধড়াস-ধড়াস করছে : মিষ্টালাপ পথে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল চালানো যাবে না—দু-জনের মধ্যে কে এখন ঘরমুখো ফেরে সঙ্গে কুটুম্বমানুষটি নিয়ে ?

কেষ্টদাসের অবশ্য এ ব্যাপার নয়। মা-লক্ষ্মী এবারটা অফুরন্ত ঢেলেছেন, ধান এখনো গোলার আধাআধি। আসল গোলমালটা নিজের মনের মধ্যে। আর সেই আগের কেষ্টদাস নেই—যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, ভাঁটার খালে মাছ ধরে খেতে তার ঘৃণা লাগে। লাঙলের মুঠোয় হাত ছোঁয়ালেই রি-রি করে হাত জ্বালা করে এখন কেষ্টদাসের। ভাইয়েদের চাপাচাপিতে ধান রোয়াটা যা হোক করে হয়েছে। কাটবার মুখে আবার না ক্ষেতে নামতে হয়, সেইজন্য ফুলহাটা এসেছে। এবং কুটুম্বর কাছে না গিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে সাহেবের চালাঘরে।

এ মরসুমে ছাড়ছিনে সাহেব ভাই, তোমার পিছন ধরে চলে যাব।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিয়ে দিল। বলে, একটা খোঁজদারি করে আয় দিকি কেমন পারিস। জুড়নপুরে সেই আমাদের পুরানো মক্কেলবাড়ি—

কেষ্টদাস অবাক হয়ে বলে, এক বাড়ি দু'বার যাওয়ার নাকি নিয়ম নেই ?

সগর্বে সাহেব বলে, আমার ভিন্ন নিয়ম। যুবতী নারী কারিগরে কেউটে-সাপের মতো এড়িয়ে চলে, ওঝা হয়ে সাপ আমি বশ করে ফেললাম।

দিন চারেক পরে কেষ্টদাস ঘুরে এলো। খবর ভাল নয়। পঙ্গু বুড়োকর্তা কার্তিক মাসে দেহ রেখেছেন। বাপ মরে ষোলআনা কর্তা হওয়ার পর মধুসূদন সংসারের কুটোগাছটি ভাঙে না। অহোরাত্রি অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। গন্ধ একটু পেলে হল—পাড়ায় হোক, গ্রামে হোক, এমনকি ভিন্ন গ্রামে হলেও ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়বে। কলিযুগ ঘুচিয়ে দুনিয়ায় সত্যযুগ না এনে ছাড়াছাড়ি নেই। ফলে গোটা পাঁচ-সাত ফৌজদারি মামলার আসামি ইতি-মধ্যেই, এবং সংসার একেবারে অচল। বাগানের আম-কাঁঠালগাছ ও বাঁশ বিক্রি কোনরকমে চলছে। মা তাই নিয়ে কি বলতে গিয়েছিলেন। তুমুল হয়ে উঠল, গর্ভধারিণী সম্পর্কে নানা বিচিত্র বিশেষণ প্রয়োগ হতে থাকল। শান্তিলতা মায়ের পক্ষ হয়ে লড়তে গেল তো মধুসূদন রামদা নিয়ে তাড়া করল—কেটেই ফেলবে তাকে। মা-বোন যতই হোক ন্যায়-ধর্মের চেয়ে আপন নয়। যায় যাক পরিবার-

পরিজন, জমি-জিরেত, আওলাত-পশার—ধর্মটা বজায় থাকুক। মা তখন সোমত্ত মেয়ে শান্তিলতাকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। জীবনে আর এমন ছেলের ভাত খাবেন না। পাড়াপড়শি সকলের কাছে কেঁদে বলে গেলেন।

সাহেব গুম হয়ে শুনল। জুড়নপুরের ঘরের দাওয়ায় জামাই-ভোগ খেতে বসেছিল—তারই ক'টা দিন মাত্র আগে সেই ঘরেই সিঁধ কেটে গিয়েছে। মা-ঠাকরুন সর্বনাশের ঘটনা সব বললেন : বড়লোক কুটুম্ব-গা-ভরা গয়নায় বউকে রাজরানী সাজিয়ে পাঠিয়েছে—তারা ভাববে, গরিব বাপ-ভাই গয়না বেচে খেয়েছে অভাবে পড়ে। শুনে কষ্ট হয়, বমাল ফেরত দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গয়না তো গলে টাকা হয়ে গেছে তখন। সে টাকাও সুকর্মে খরচ হল—বংশী ও অন্য পাঁচজনার কাজে। আজকে খানিকটা ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু মা-ঠাকরুনকে পাওয়া যাবে কোথা? এই এক মজা দেখা যায়, যার নাম মনে পড়ে সেজন নাগালের বাইরে। টাকা জলে ফেলে ভারমুক্ত হতে হবে হয়তো বা শেষ পর্যন্ত।

আশালতার কিছু খবর নিলে কেষ্টদাস?—বাড়ির সেই বড়মেয়েটা?

কেষ্টদাস বলে, নবগ্রামে বরের ঘর করছে।

এটা অবশ্য জানা-ই। সোমত্ত বউ বাপের বাড়ি ফেলে রাখবে তো শঙ্করানন্দ সেই দ্বিতীয় পক্ষ করতে গেল কেন?

কিন্তু তার বেশিও আছে। কেষ্টদাস ঘুরে ঘুরে নানাসূত্রে খবর জোগাড় করেছে। গয়না-চুরি নিয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড। কাঁচা-বাড়িতে চুরি হয়ে যায়, সেজন্য জুড়নপুরে তারা আর বউ পাঠাবে না। গয়না খুলে রেখেও পাঠানো চলে না। কমপক্ষে সেরখানেক সোনা গায়ে পরে বেড়াবে, নইলে আর সেন-বাড়ির বউ কিসের! অর্থাৎ মা-ঠাকরুন সাহেবকে যা বলেছিলেন, বর্ণে বর্ণে তাই তাই খেটেছে। সন্দেহ করেছে গরিব কুটুম্বদের।

কেষ্টদাস বলে, দালানকোঠা যদি সেখানে হয়, তবেই নাকি বউ জুড়নপুরে পাঠাবে। সে আর হয়েছে! কাঁচা ভিটেয় চাল ক'খানা ক'দিন খাড়া থাকে, তাই দেখ। বুঝলে সাহেব-দা, বাড়ির লক্ষ্মী হলেন গিন্নিমা। ক'মাস তো গেছেন, এরই মধ্যে সব যেন উড়েপুড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকে এইকথা বলতে লাগল। নিজের চোখেও দেখলাম। লক্ষ্মীমন্ত গেরস্থালি দেখে এসেছি, আজকে হতচ্ছাড়া চেহারা।

খুঁজিয়ালের এ হেন খবরে কারিগরের তো হাত-পা ছেড়ে বসে পড়বার কথা। সাহেবের উল্টে রোখ চড়ে যায় : মধু-বেটার ফের ঘর কাটব। চল কেষ্টদাস,

তুই আর আমি, বেশি লোকের গরজ নেই।

বংশী কাজের মধ্যে নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে—পরামর্শের মধ্যে বসে বসে শোনে। সে বলে উঠল, ঘর কেটে কষ্ট করতে যাব কেন? তোমার কাজ তো জানলা দিয়েও হবে।

মিটিমিটি হেসে কথাটা বিশদ করে দেয়: দয়ার মানুষ তুমি—দুঃখকষ্ট দেখে উল্টে মক্কেলকেই তো দিয়ে আসবে। সে কাজ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেও তো হতে পারবে। তা মন্দ হবে না—মাকে দেবার জন্য ছোঁকছোঁক করছিলে, মায়ের বদলে ছেলের পাবে।

দয়ার মানুষ না আরো কিছু! কী শত্রুতা তোমার সঙ্গে বংশী, বদনাম কেন রটাচ্ছ শুনি?

বলেই ধ্বক করে সাহেবের মনে পড়ে যায়, রটনা নয়—মা-ঠাকরুনের মুখে দুঃখের কথা শুনে এসে বংশীকে সে নিজেই বলেছিল সে-বাড়ি কিছু দিয়ে আসা যায় কিনা? সেই ছেঁদো কথা হতভাগা বংশী মনে গেথে রেখেছে।

চটেমটে উঠে সাহেব বলে, মাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, ছোটবোনকে কাটিতে যায়—সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে নচ্ছার মানুষটার কান দুটো আমি কেটে আনব।

বংশী এবার উচ্চহাসি হেসে উঠল: তা পারো তুমি, কান কাটারই সম্বন্ধ সে মানুষের সঙ্গে।

কেষ্টদাস বলে, কি রকম—কি রকম?

বংশী বলে, তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, ঠিক তাই। শালা-ভগ্নিপতি। তোমার আমি কান মলতে পারি—কান কেটে নিলেও সম্পর্কে বাধে না। সাহেবে আর মধুবাবুতেও তাই। বোনাই হয়ে শুয়েছিল যে বোনের খাটে। একটা রাতের হলেও সম্পর্ক কিছু থেকে যাই বইকি।

সাহেবকে বলে, কান কোন্ কায়দায় কাটিবে ভেবেছ কিছু সাহেব-ভাই? বোনের বেলা তো বর হয়েছিলে। সিঁধ কেটে এবারে তুমি বউ সেজে মধুর কোলের মধ্যে শুয়ে পড়বে। আদর-সোহাগ করতে করতে অজান্তে দেবে কানে পোঁচ বসিয়ে।

কেষ্টদাস হি-হি করে হাসে। সাহেব বলে, হাসিস কেন রে? পুরুষেরা কানকাটার চেয়ে মেয়েমানুষের গা থেকে গয়না খোলা অনেক বেশি শক্ত। তা-ই পেরে এসেছি। গাঙে চান করতে করতে কামটে পা কেটে নেয়। মানুষটা ডাঙায় উঠে খোঁজে, পা কোথায় গেল আর একটা? কামটের যেমন দাঁত, আমার তেমনি হল হাত। সকালবেলা উঠে মধু হাত বুলিয়ে দেখবে, কান

কোথা গেল আমার ?

পরের দিন গাবতলির হাট। হাটুরে মানুষ হয়ে সাহেব আর কেষ্টদাস শেয়ারের নৌকোয় উঠে পড়ল। গাবতলি নেমে সেখান থেকে হাঁটনা।

বিড়ি-দেশলাই কিনতে কেষ্টদাস হাটের ভিতর গেছে, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সাহেব অপেক্ষা করছে। এমনি সময় এক কাণ্ড।

অন্ধ নাচার বাবা, একটা আধেলা দিয়ে যাও, ভগবান ভাল করবেন, দাও বাবা আধেলা—গাছতলায় এক ভিখারির একটানা আর্তনাদ। কানে তালা ধরিয়ে দেয়, শান্তিতে একটু দাঁড়ানোর জো নেই। সাহেব চলে যায় সেখানে।

আধেলা কেন, গোটা পয়সা দেবো। কোন্ পা-খানা খুঁড়িয়ে হাঁটি, সেইটে যদি তুমি বলতে পারো।

একদম দেখতে পাইনে বাবা—

পুরো আনি যদি দিই ?

এত বড় লোভনীয় প্রস্তাবে যখন দৃষ্টি খোলে না, লোকটা অন্ধ সত্যিই। এই সব গাঁ-গ্রামের লোক শহরের ফেরেব্বাজি তেমন বোঝে না। মুঠো ভরে সাহেব পয়সা নয়, আনিও নয়—নোট দিয়ে দিল তার হাতে।

গামছায় জড়িয়ে নিয়ে চলে যা।

অন্ধ বলে, কী দিলে বাবা ?

সাহেব গর্জন করে উঠল : পালা বলছি এখান থেকে। আর কোনদিন দেখি তো গলা কেটে দু-খণ্ড করব। খুনে-ডাকাত আমি।

ভয়ে ভয়ে লোকটা উঠে পড়ল। আজেবাজে কাগজ ভেবেছে। নিয়ে গিয়ে অন্য কাউকে দেখাবে। ধোঁকা দিয়ে সেই লোক গাপ করতে পারে। করে করবে—অন্ধটাই বা কী এখন আপন লোক ? আপন লোক অভাবে জলে ফেলে দিলেও ক্ষতি ছিল না।—ধরে নেওয়া যাক তাই।

বিড়ি কিনে কেষ্টদাস ফিরল। ট্যাঁকের বোঝা হালকা হয়ে সাহেব এখন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

কেষ্টদাস বলে, জুড়নপুর ওদিকে তো নয়—

সাহেব বলে, ভেবে দেখলাম মধু যা মানুষ, কান কাটলে তার আরও গরব বাড়বে। হাটের মানুষ মেরে কপাল ফাটিয়ে দিল, সেই কপালের ফুটো দেখিয়ে বলে জয়পতাকা। কান কাটলে কাটা-কান গলায় ঝুলিয়ে হয়তো বলবে মেডেল। কাজ নেই, নবগ্রামের সেন-বাড়ি যাওয়া যাক। ভদ্রলোক তারা, ভাল মুনাফা হবে।

কেষ্টদাস থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে : সেখানে তো যাইনি সাহেব-দা।

যেতে বলোনি। শোনা আছে, মস্ত বাড়ি, কাজ বড্ড শক্ত।

সাহেব বলে, সেকালে রাজরাজড়ারা দুর্গ বানাত, সেই কায়দায় বাড়ি। যাইনি আমিও। ক্ষুদিরাম ভটচাজ জানে না হেন জায়গা নেই। তার কাছে শুনেছিলাম একদিন। মস্ত বাড়িতেই তো কাজের জুত—মক্কেলের ডর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়।

সাহেবের কণ্ঠে সহসা যেন আগুন ধরে যায়ঃ শঙ্করানন্দ সেনের ঘরে ঢুকে দেখিয়ে আসব, গয়না পরিয়ে বউ পাকা-দালানে নিজের পাশে রাখলেও সে গয়না থাকে না। গরিব কুটুম্বদের চোর অপবাদ দিয়েছে, সে পাপের ভোগান্তি হওয়া চাই।

কেষ্টদাসের দিকে চেয়ে বলে, বড় বাড়ি বলে ভয় করে তো ফিরে যা তুই। কাজ আমি একলাও পারি।

এক একখানা কাজ নামানো সহজ নয়। পিছনে অনেক দিনের খাটনি, বিস্তর সাধনা। নিপাট ভালমানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করছে—চোখজোড়া আর কানজোড়া কিন্তু উঁচানো—একগণ্ডা সুঁচাল তীরের মতো। রাতের পর রাত মক্কেলের আনাচে-কানাচে। চোর দেখছে সকলকে, টের পাচ্ছে সকলের কথা—তার কথা কেউ জানতে পারে না। চোরও তাই অন্তর্যামী—অন্তরীক্ষবাসী অলক্ষ্য দেবতার সঙ্গে তফাত বড় বেশি নেই।

বুড়ো বয়সে অথর্ব হয়ে পড়ে সাহেব-চোর এই বয়সকালের কথা ভাবত। রোজগারের মন কোন কালেই নয়—যেন এক রকমের খেলা। পিতৃলোকের দিন নাকি গোটা কৃষ্ণপক্ষটা, রাত্রি শুক্লপক্ষ। দেবলোকের দিন শীতের ছয়মাস, বাকি ছয়মাস রাত্রি। সাহেবের দিনরাত্রিও তেমনি উল্টোপাল্টা। অন্য মানুষের যখন রাত্রি, তার সেই সময়টা দিনমান। কাজ বলো, আর খেলাই বলো সাহেব তখন বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়েছে পেঁচা। বাদুড় ও চামচিকে, সাপ, বাঘ। এবং অনুমান করা যায় ভূত-প্রেতরাও। আকাশে আলো ফুটে যেইমাত্র মানুষজন আড়মোড়া ভাঙছে, তাড়াতাড়ি আবার কোটরে ঢুকে যায়। সন্ধ্যার আগে আর উদ্দেশ নেই।

নবগ্রামে এত আক্রোশভরে গিয়ে সেদিন যা হল, সে এক খেলাই। সাবেকি অট্টালিকা সেনদের। জানলা নেই—আলো আসবার জন্য ছাতের কাছাকাছি ঘুলঘুলি এক একটা। যত বেঁটে মানুষই হও, সাধ্য কি দরজা দিয়ে খাড়া হয়ে ঢুকবে—ঘাড় নোয়াতেই হবে। কবাটের তক্তা বিঘতখানেক পুরু, গায়ে গায়ে গুলপেরেক বসানো। কুড়াল মারলেও কোপ বসবে না, কুড়াল ফিরে আসবে। ডাকাতের ভয়ে সেকালের বড়লোকেরা এমনি ঘরবাড়ি বানাত।

বাড়িটা যখন অটুট অভগ্ন ছিল—ডাকাত বলে কি, একটা ইঁদুর-আরশুলা অবধি ঢুকতে পারত না।

এখন আর চকমিলানো আঁটোসাটো বাড়ি নয়। বাইরের দেয়াল কতক আপনি ভেঙে পড়েছে, কতক বা শরিকেরা নিজ নিজ সুবিধা মতন ভেঙে বাড়ির মুখ এদিক-সেদিক বের করে নিয়েছে। একটা বাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গোটা দশেকে দাঁড়িয়েছে।

গোড়ার কয়েকটা দিন খোঁজদারিতে গেল। কেষ্টদাসের গানের গলা এখানেও খুব কাজ দিয়েছে। বাইরের উঠানে বোধনপিড়িতে বসে বিনা ভূমিকায় সে রামপ্রসাদী গান ধরল একটা। একটু পরে দাসী গোছের একজন এসে ডাকে: বাড়ির ভিতর এসো বাছা, মায়েরা সব শুনতে চাচ্ছেন। প্রত্যাশাও ঠিক এই। সেনবাড়ির অন্তঃপুরের সবগুলো স্ত্রীলোকই বোধহয় কেষ্টদাসের চতুর্দিকে। আশালতার বর্ণনা দিয়েছে সাহেব, কোনজন আশালতা বুঝতে আটকায় না। কপালক্রমে আশালতার শোবার ঘরটা চোখের সামনেই—খোলা দরজায় ভিতর দেখা যাচ্ছে। কোন্ পাশে খাট, কোথায় বাক্স, পেঁটরা, কোন্ দিকটা একেবারে খালি। একখানা কালীকীর্তনেই এতদূরে এগিয়ে দিল। মায়ের দয়া বিনে এমন হয় না, বন্দোবস্ত মা-ই সব করে দিলেন।

সেন-বাড়ির দেয়ালে কাটির ঘা বোধকরি এই প্রথম। বাইটামশায় হাতে তুলে দিয়েছে, সেই পবিত্র সিঁধকাঠি। কাঠির গুণে এবং মা-কালীর দয়ায় পুরানো ইট ধুলোর মতন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়েছে। মাখনে গড়া এক পাহাড় —তার ভিতরে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে যেন। পাহাড়ই সত্যি—সারা রাত্রি কেটে কেটেও বুঝি দেয়ালের অন্ত মিলবে না। মালিনীর ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে সুন্দর বিদ্যার ঘরে গেল—তেমনি দীর্ঘ সিঁধ। তবে বসবার জায়গাটা বড় পছন্দসই, দেয়ালের গা অবধি ভাঁটকালসুন্দের নিবিড় জঙ্গল। সারা রাত্রি কেন, সারা বছর ধরে কেটে গেলেও কেউ উঁকি দিয়ে দেখবে না। কেটে যাচ্ছে সাহেব। কেষ্টদাস দু-হাতে ইটের গুঁড়ো সরিয়ে সরিয়ে স্তূপাকার করছে।

ভিতরের মানুষের হালচাল না বুঝে সিঁধের মুখ খুলবে না—মুরুব্বি-মশায়রা বলেন। সে মুরুব্বি সেনবাড়ি দেখেন নি। জানলা-দরজার বিচিত্র বন্দোবস্তে কারিগর এখানে অসহায়। নিশ্চিন্ত ঘরের ভিতরে কামানের লড়াই হতে থাকলেও বাইরে মালুম হবে না। মরীয়া হয়ে সাহেব ওধারে একটু ফোকর বের করে গর্তে মাথা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে রইল।

আছে তো আছে-ই। কী এত শুনছে কে জানে, নড়াচড়া নেই—হার্টফেল করে মানুষ হঠাৎ মারা পড়ে, তেমনি কোন ব্যাপার নয় তো? অবশেষে

অনেকক্ষণ পরে মাথা বের করল। কেষ্টদাসকে বলে, ভবকা বউ আর বুড়ো বয়ে বহুৎ-আচ্ছা জমিয়েছে। ঝগড়াঝাটি এবারে।

কত গণ্ডা জোঁক গায়ে লেগেছে, দিনমানে বোঝা যাবে। অন্ধকারে সাহেবের মুখ দেখা যায় না—কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিরক্তি নেই, স্ফূর্তির ভাব। স্বামী-স্ত্রী দুজনে নিশিরাত্রি অবধি না ঘুমিয়ে বকবক করে কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে সাহেবকে যেন কৃত-কৃতার্থ করেছে।

আবার অনেকক্ষণ পরে—ঘড়ির ঘণ্টা-মিনিট ধরে কে বলবে—কিন্তু সে অনেকক্ষণ। কান পেতে আবার একটু শুনে কাঠির দুটো-একটা ঘায়ে সিঁধ শেষ করে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। ডেপুটি কেষ্টদাস ছুটে গিয়ে দরজার সামনে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। দরজা খুলে কারিগরে মাল পাচার করবে এইবার, মাল নিয়ে সে সরে পড়বে।

কোথায়! সিঁধের পথেই সাহেব তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। কেষ্টদাসের হাত ধরে টেনে বলে, চল্। আজ হবে না, জেগে রয়েছে।

আজকে ফিরে যাচ্ছি, কাল এসে আবার হবে—তেমন ব্যাপার এসব কাজে হয় না। যাওয়া তো একেবারে চুকিয়েবুকিয়ে চলে যাওয়া। জাগ্রত মানুষের ঘরে ঢুকে বেকুব হয়ে বেরিয়ে আসা—এমন কাঁচা-ভুল শিক্ষানবিশ চোরেও তো করবে না!

কেষ্টদাস ধমকের স্বরে বলে, কী ঘোড়ার ডিম তবে অতক্ষণ ধরে শুনলে?

সাহেব হি-হি করে হাসে। আসল কথা খুলে বলা যায় না। কী করবে—ঠিক কাজের সময়টা খেলায় পেয়ে বসল যে হঠাৎ! ঘরে দুটো মানুষ—আশালতা আর শঙ্করানন্দ। দু-জনেই ঘুমিয়ে। তার আগে বেশ একচোট বচসা হয়েছে। ওটা কিছু নয়—প্রণয়ের বাড়াবাড়ি অবস্থায় হয় এমনি। আখ পিষলে তবেই মিষ্টি রস বের হয়। নিজের ঘর না-ই হল, পরের ঘরে ঘুরে ঘুরে সাহেব শিখেছে—সংসারী দশজনার চেয়ে বেশি শিক্ষা তার। বচসা করে আশালতা খাট ছেড়ে মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পুরুষের শাস্তি এর উপর আর হয় না। অভাগা শঙ্করানন্দ অনেকক্ষণ খাটের বিছানায় আইঢাই করেছে, ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাসও ছুঁড়েছে যুবতী বউকে তাক করে। বড় কঠিন মেয়ে, কিছুতে ঘায়েল হল না, উল্টে সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণে পরাস্ত শঙ্করানন্দ কি করবে—পুরুষমানুষ হয়ে মেজেয় নেমে পড়ে কেমন করে? সে যেন একেবারে দন্তে তৃণ ধারণ করার ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। অগত্যা সে-ও ঘুমাল। সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছে—ভালরকম বুঝে নিয়ে তবে সাহেব ঘরে ঢুকল।

রোখে রোখে ঢুকে পড়েছিল। জুড়নপুরে তোমাদের বউয়ের গয়না

চোরই নিয়ে নিয়েছে, দুর্গের মতো শক্ত ইমারতেও সে চোর ঠেকানো যায় না। হাতেনাতে দেখিয়ে যাবে সেই জেদ নিয়ে এসেছিল সাহেব। অলক্ষ্যের মা-চামুণ্ডাও যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন—স্বামীর পাশ ছেড়ে আশালতা শুয়েছে এসে ঠিক সিঁধের গায়ে। ঘুমের মধ্যে একখানা হাত এসে পড়ে গর্তের কিনারায়। হাত নয় গো, স্বর্ণলতা—হাত বেড় দিয়ে থোপায় থোপায় স্বর্ণফুল ফুটে আছে। চুড়ির গোছা ঝিনমিন বাজে নড়াচড়ায়, আঙুলের হীরার আংটি অন্ধকারে ঝিকমিক করে। বাঁক, মানতাসা, কঙ্কণ—কত কি গয়না! ডাল থেকে ফুল তোলার মতন নিয়ে নিলেই হল। ঘরে না ঢুকে সিঁধের গর্ত থেকে হাত বাড়ালেও নাগাল পাওয়া যায়।

আরও আছে। ঘুমের ঘোরে আলুথালু আশালতা। সাহেবের চোখ অন্ধকারেও জ্বলে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাসে তার আগুন ধরে গেল। রানীর সেই যে হাত চেপে ধরেছিল, সেদিনের মতোই বিদ্যুৎ-শিহরণ। দেহপণ্যা রানী দেবতা বলে তার মুখে চাবুক কষিয়েছিল। ভয় পেয়ে আজকে নিজে থেকেই সাহেব শামুকের মতন সিঁধের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ক্ষণকাল চুপ থেকে মিউমিউ করে বিড়াল-ডাক ডাকে সেখান থেকে। ফলটা কি রকম দাঁড়াল—মুখ একটুখানি উঁচু করে তুলে পিটপিট করে দেখে নেয়। সুড়ৎ করে পুনশ্চ ঢুকে পড়ে গর্তে। খেলায় পেয়ে বসেছে।

বিড়ালে বড় ভয় আশালতার, বিড়াল দেখলেই সে তিড়িং করে ছিটকে পড়ে। জুড়নপুরে সাহেব দেখে এসেছিল। আবার এই ক'দিনের খোঁজদারিতে দেখল। যা ভেবেছে, ঠিক তাই। ঘরে যেন বাঘ ঢুকেছে—ধড়মড়িয়ে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁপতে কাঁপতে আশালতা খাটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখ গুঁজল বরের বুকে। কলহ, কান্না এবং অতঃপর আলাপ বন্ধ ও শয্যাত্যাগ—পর্বগুলো একের পর এক এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যারাত্রি থেকে। আর বাইরে ততক্ষণ অন্য দুটো প্রাণীর যাবতীয় দেহরক্ত জোঁকে ও মশায় শুষে খাচ্ছে। বার কতক বিড়াল-ডাক ডেকে মন্ত্রের কাজ হল—পলকে মানভঙ্গ ও সন্ধিস্থাপনা। যুবতীকে বুকের মধ্যে পেয়েছে শঙ্করানন্দ। জুটি হয়ে ঘুমাক এখন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখুক। সাহেব-চোরের কাজ পণ্ড, কিন্তু মজা হল বিস্তর। হাসি-হাসি মুখ করে সে সিঁধ থেকে বাইরে বেরুল।

কেষ্টদাস ক্লান্তপায়ে পিছন পিছন ফিরেছে। মনের দুঃখ সামলাতে পারে না। বলে উঠল, মানুষই যখন জেগে, কি জন্যে তুমি পুরো ফুটো কাটতে গেলে? ঘরে ঢুকতে গেলেই বা কেন?

বলা যাবে না কাউকে লজ্জার কথা। সাহেব এড়িয়ে যায়: গাছের সবগুলো

ফল কি থাকে, দু-পাঁচটা ঝরে যায়। মন খারাপ করিসনে, চল্। আবার একদিন পুষিয়ে দেবো।

এমনি খেলা কতবার হয়েছে। অন্যের কাছে বলার কথা নয়। বুড়ো হয়ে ইদানীং গল্প করে, তাই লোকে জানতে পারছে। যে-বাড়ি কাজ হয়ে গেল, অন্য কারিগরে ভুলেও সে পথ মাড়ায় না। সাহেবের ভিন্ন রীতি। একবার দু'বার যাবেই সে মক্কেলের বাড়ি। কত যত্নে কাজ নামানো—ফলাফলটা নিজ কানে না শুনে সুখ নেই। অন্যদের টাকাপয়সা হলেই হল, সাহেব জানতে চায় কাজের কারিগরি নিয়ে কি বলছে লোকে।

এক বাড়ি অমনি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছে। পড়শিরা সব জুটেছে। মক্কেল দশাসই জোয়ান। তিন-চার দিন কেটে গেছে—বামালের শোক সামলে নিয়ে মানুষটা এখন বীরত্বের কথা বলছে: জিনিস একটাও কি থাকত? ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঘুসি খেয়ে মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে চোর পালাল।

একতরফা বকে যাচ্ছে, অসম্ভব মুখ বুঁজে থাকা। সাহেব বলে ওঠে, আঁ-আঁ করে তো তক্তপোশের তলায় ঢুকে গেলে। ঘুসি কি সেখান থেকে?

বলেই দৌড় বনজঙ্গল ভেঙে। লোকে তাড়া করল। যে শুনবে সে-ই তো টিটকারি দেবে সাহেবক, বোকা বলবে। কিন্তু ঘুসি খেয়ে পালিয়ে এসেছে—সে-ই বা এমন অপবাদ কি করে সহ্য করে।

আর একবার।

বউটা সমবয়সী এক মেয়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিল—সাহেব কান পেতে শুনেছে। বলে, ধানশীষ-হারছড়া চোরে নিয়ে গেল। আমার মা দিয়েছিল। মা মারা গেছে, আর কোনদিন কেউ আদর করে দেবে না। নতুন উঠেছে ঐ জিনিস, খুলনা থেকে একজনেরা গড়িয়ে আনল। বলল, তোর গলায় আরও ভাল মানাবে। ভাঙাচুরো গুঁড়োগাড়া যা-কিছু সোনা ছিল, স্যাকরা ডেকে দিয়ে দিল। বানির টাকা কী কষ্টে যে শোধ করেছিল মা—

বউয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হয়। আর বাইরে সাহেবের অনেক বেশি—দুচোখে ধারা গড়াচ্ছে। মা কোনদিন ছিল না তার—ইচ্ছে করে হাত বাড়িয়ে কোন জিনিস কেউ তাকে দেয় নি। তার পৃথিবী অন্য সকলের থেকে আলাদা। ধানশীষ-হার তখন থলেদারের হাতে গিয়ে পড়েছে। সহজে ফেরত দেবার মানুষ কি সে-জন—সাহেব কেবল তার পা দুটোই ধরেনি। উদ্ধার করে তারপর আবার বিস্তর পথ হেঁটে বউয়ের ঘরে হারছড়া ছুঁড়ে দিল। ছেলেবেলা রাণীর মাকড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিল—এ বয়সেও সেই ছেলেমানুষী দেখলে লোকে হেসে খুন হবে। কাউকে তাই বলতে পারেনি। এখন বলে।

বাহাদুরির কাজও কি নেই, দশের কাছে যা জাঁক করে বলা যায়? লোকের মুখে মুখে সত্যি-মিথ্যে ভালো-মন্দ অনেক জিনিস তার নামে চলছে। সাহেব-চোরের নামে লোকে তটস্থ, ছড়া বেঁধেছে কত তার নামে! সেই কুমির চোর ধরার সময়টা কী হাততালি দিন কতক! চোর হ'য়ে সাহেব পুলিসের কাজ করে দিল। তা-বড় তা-বড় পুলিস থ হয়ে গিয়েছিল, এ হেন তাজ্জব কাণ্ড কী করে মাথায় ঢোকে লোকটার! এখন সবাই ভুলে গেছে। মানুষের নিয়ম হল, মন্দটাই মনে রাখে. ভাল জিনিস চট করে ভুলে যায়।

ভাঁটিঅঞ্চলের এক গাঙের বাঁকে মা-গঙ্গার আবির্ভাব হয়। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। উৎকট নোনাজল সেই ক'টা দিন গঙ্গাজলের মহিমা লাভ করে। আসল যে পতিতপাবনী, তিনি অনেক দূরের। বাদার মানুষ সেথান কেমন করে যায়—নিয়ে যাবে কে, টাকাপয়সাও বা কোথা? দয়াময়ী সেজন্য নিজে চলে আসেন পাপী তরাতে। বছরের মধ্যে দশটা দিন—ভাদ্রের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা, ফাল্গুনেরও তাই। এই দিনগুলোয় জয়গাটা মহাতীর্থ হয়ে যায়, গঙ্গাস্নানের জন্য অঞ্চল ভেঙে মানুষ আসে। প্রকাণ্ড মেলা বসে যায় নদীর কিনারে।

ভাদ্রের ভরা গাঙে অত্যধিক ভিড়ে খেয়া ডুবল একবার। মানুষ এখানে জলচর বটে, পেট থেকে পড়ে শিশু হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে, সাঁতারও শেখে। কিন্তু হলে হবে কি—হাঙর-কুমির পোকার মতন জল ছেয়ে আছে, তাদের মচ্ছব লেগে গেল। অনেক মরল। মেলা শেষ হবার পরেও অনেক দিন ধরে জেলের জালে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওঠে। সরকার থেকে হাটে হাটে কাড়া দিল : হাঙর-কুমির মারলে পুরস্কার। পুরস্কার পাচ্ছেও অনেক।

ফকিরচাঁদ জেলের জালের ওস্তাদ। জলেই স্ফূর্তি, শক্ত ডাঙার মাটিতে চলেফিরে বেড়ানোয় বরঞ্চ অসুবিধা লাগে তার। কুচো-চিংড়ির কারবার—খটি আছে, চিংড়ি শুকিয়ে সেখানে বস্তাবন্দি হয়। হাঙর দুটো-একটা বরাবরই ফকিরচাঁদ নিজের প্রয়োজনে মেরে আসছে। চিংড়ি ধরবার বড় কায়দা—সরু খালের মুখ পাটা দিয়ে ঘিরে দেয়; মাছ বেরুতে না পারে। হাঙর পচিয়ে ফেলে দেয় জলে, হাঙরের প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করিয়ে রাখে। পচা মাংসের গন্ধে চিংড়ি সেই মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গাদা হয়ে যায়। ছাঁকনি দিয়ে সব চিংড়ি তুলে নিল তো আবার এসে জমে। দিনরাত্রি বারম্বার এই রকম তুলছে। খালের যেখানে যত চিংড়ি, আলোয় পোকা পড়ার মতন চলে আসে। চিংড়ি ধরার কাজেও তাই হাঙরের গরজ।

তার উপরে সরকারি পুরস্কারের খাতির-সম্মান ও টাকা। চিংড়ির কাজ আপাতত মুলতুবি রেখে ফকিরচাঁদ হাঙর মারতে লেগে গেল। মেরেছেও পর

পর কতকগুলো—সরকারি মহলে নাম হয়ে গেল ফকিরচাঁদের, উৎসাহ-বর্ধনের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল একটা। ইতিমধ্যে ফকিরচাঁদ আবিষ্কার করে ফেলল, পুরস্কারের টাকার চেয়েও অনেক, অনেক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে গেছে হাঙরের। মরা হাঙরের পেটে যেন শক্ত শক্ত কী জিনিস—কৌতূহলে পেট চিরে গয়না পেয়ে গেল। মেলার স্ত্রীলোক চোয়ালে কেটে গিলেছে—হাড়মাস হজম হয়ে গয়না জমে রয়েছে পেটে।

সোনোরূপোর এই আজব ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেল। তারপর থেকে ফকিরচাঁদ পাগল হয়ে হাঙর মেরে বেড়ায়। গয়নার লোভে। শেষটা আর গয়না মেলে না। মেলা ফুরিয়ে গেছে, গয়না-পরা রমণী হাঙরে আর পাবে কোথা? হাঙরই অমিল—ফকিরচাঁদ পায় না, অন্যেরাও নয়। হয় মরে নিঃশেষ হয়েছে অথবা অন্য যেখানে মেলা চলছে সেইখানে চলে গেছে ভালো খাদ্যের লোভে।

শেষেরটাই ঠিক। ফাল্গুনের মেলা জমলে আবার হাঙরের উৎপাত। সময় বুঝে চলে এসেছে। পর পর কয়েকটা নিয়ে গেল। তখন আর দূরের দিকে মানুষ যায় না, ঘাটে দাঁড়িয়ে মাথায় খানিকটা জল থাবড়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানের কাজ সংক্ষেপে সেরে নেয়। তাতেও রেহাই হয় না, ঘাটে এসেই সকলের মধ্যে থেকে টুক করে একটাকে জলতলে ডুবিয়ে নেয়। এবারের হাঙর বিষম চতুর। বড় দুঃসাহসী!

সাহেব এসে পড়েছে মেলাক্ষেত্রে। মেলায় কিছু কাজ নামিয়ে যাবে, এই অভিপ্রায়। দেশদেশান্তরের বিস্তর নৌকো ঘাটে বেঁধে আছে, সেইসব নৌকোয় কাজ হতে পারবে।

এসে দেখে হাঙরের কাণ্ড। অতিশয় চতুর হাঙর, আবার রুচিবানও বটে। শুধুমাত্র স্ত্রীলোক নিয়েছে, পুরুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। স্ত্রীলোকের মধ্যেও আবার বেওয়া-বিধবার কাছ ঘেঁসে না—গয়নাগাটি পরে ঝলমল করে যেসব মেয়ে-বউ। দশ বাঁক বিশ বাক পরে ভাসন্ত দু-একটা শবদেহ পাওয়া গেল—সর্ব অঙ্গ ঠিকঠাক আছে, গায়ের গয়নাই কেবল নেই।

সাহেবও স্ত্রীলোক হল। আহা, কী রূপসী বউটা গো! খরচপত্র মন্দ হল না, কিন্তু উপায় কি, সত্যিকারের মেয়েমানুষ নয়—সোহাগ করে কে তাকে শাড়ি-গয়না দেবে? পিতলের কানঝাপটা একজোড়া কিনল মেলার দোকান থেকে। জবর গয়না—কান দুটোর পুরো আয়তন ঢেকে গেছে। ভারী ভারী দুই কঙ্কণ দু-হাতে ঝিকমিক করছে। শাড়ির নিচে আরও কত কি আছে, দেখা যাচ্ছে না। বাইরের একখানা দুখানার এই নমুনা।

গাঁ-ঘরের নির্বোধ বউমানুষ—সাঁতার কাটতে কাটতে দূরের গাঙে গিয়ে

পড়ে। কতজনে মানা করল—বউটা কালা, না কি গো? শুনতেই পায় না কোন-কিছু। জল কেটে চলেছে। এবং যে ভয় করা গিয়েছিল—হাঙর ঠিক ধরে ফেলেছে। বউও জাপটে ধরেছে হাঙর। হুটোপুটি, কেউ কাউকে ছাড়ে না—জলের তলে ভুড়ভুড়ি কাটছে হাঙরে আর বউয়ে। মেলার যত মানুষ নদীর ধারে এসে জমেছে। অনেক লড়ালড়ির পর বউ অবশেষে জলের উপর ভেসে উঠল। এবং হাঙরকেও ভাসিয়ে তবে ছাড়ল।

হাঙর সেই ফকিরচাঁদ জেলে—কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মেলার ঘাটে নৌকোর ভিড়—ফকিরচাঁদ দূর থেকে ডুব-সাঁতার দিয়ে কোন একটা নৌকোর নিচে আশ্রয় নিত, তীক্ষ্ণ নজর ফেলত চতুর্দিকে। মক্কেল একটি তাক করে নিয়ে দিত আবার ডুব—আচমকা টানে মানুষকে কায়দা করে জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটত। কুমিরও ঠিক এই প্রণালীতে শিকার ধরে। ফকির জেলে জলতলে দম বন্ধ করে বিস্তর সময় থাকতে পারে, অন্য মানুষের ততক্ষণে দু-বার তিনবার মরা হয়ে যায়। নিরিবিলি নিরাপদ জায়গায় উঠে গয়না খুলে নিয়ে মক্কেলটাকে তারপর জলে ফেলে দেয় আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে ফেলার মতন।

মেলার মানুষ পরমোৎসাহে ফকিরচাঁদকে নিয়ে পড়েছে। মানুষটা ছিল অতি নিরীহ, কুচো-চিংড়ি ধরত খালে খালে, পাঁচ বছুরে ছেলেটার সঙ্গেও আজ্ঞে-আপনি করে কথা বলত। লোভ বেড়ে গেল হাঙর মারতে গিয়ে। কুচো-চিংড়ি থেকে হাঙর, হাঙর থেকে মেয়েমানুষ। হাঙরের পেটে যখন গয়না মেলে না কি করবে—নিজেকেই তখন হাঙর হতে হল।

ঝাঁকাঝাঁকি চলছে ফকিরচাঁদকে নিয়ে, জনতা পেটের কথা আদায় করছে: সাহেব ফাঁক বুঝে সরে পড়েছে। হাতের ও মুখের বেগ সম্পূর্ণ মিটে যাবার পর জনতার হুঁশ হল: প্রাণ তুচ্ছ করে এত বড় কাজ করলেন, ছদ্মবেশধারী সেই সজ্জন মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না তো? গেলেন কোথা তিনি? মেরামতের জন্য ডিঙি একটা উপুড় করে রেখেছে খানিকটা দূরে, সাহেব-চোর সুড়ুৎ করে তার নিচে গিয়ে আরামে শুয়ে পড়েছে। আর তাকে কেউ পাবে না। দেবতারা নরহিতের জন্য কখনো দেহধারণ করেন, কাজ অন্তে বাতাসে মিশে যান। সাহেবও যেন তাই।

চব্বিশ

সাহেব-চোরের বুড়োবয়সের এই সব গল্প—বিশ্বাস যদি না করেন, নিরুপায়। সারা জন্ম কত মক্কেলের কত মাল পাচার করেছে! আকাশের তারা, পাতালের বালির মতো সাহেবের মক্কেল গোনাগুণতিতে আসবে না।

গল্প শুনতে শুনতে কৌতূহলী একজন প্রশ্ন করেছিল, এত মক্কেলের মধ্যে সকলের বড় কে সাহেব? কার ছিল সবচেয়ে দামি মাল?

সাহেব নিজের গায়ে থাবা মেরে দেখাল: আমি।

সকলের বড় মক্কেল সে নিজেই, যা কিছু তার ছিল নিজেই সে চুরি করেছে। আশ্চর্য দেহ-রূপ নিয়ে এসেছিল, সেই বস্তু অবধি। অন্য ব্যাপার সঠিক জানিনে, এই কথাটা সাহেব কিন্তু খাঁটি সত্যি বলেছে।

অক্ষম অথর্ব সে এখন। বিষ-হারানো ঢোঁড়া, লোকে বলে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেবার প্রয়োজনে বংশীর বাড়ি এসে পড়ে। বংশী মারা গেছে—বউ আছে, সে কখনো 'না' বলে না। সাহেবের উপর করুণা—মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও বটে। সাহেব না হলে সেবারের দশধারায় নির্ঘাৎ বংশীর জেল। পাপচক্রের ফেরে একবার পড়লে জীবন থাকতে রেহাই মেলে না, ছেলে-বউ-নাতিনাতনী নিয়ে এই জমজমাট সংসার কখনো হতে পারত না। সেই সব মনে রেখেছে বংশীর বউ। বাইরের চালাঘরখানায় ঢুকে পড়ে সাহেব নিজের বাড়ির মতন মাদুর বিছিয়ে নেয়। বংশীর বউ কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিতে আসে।

বছর কয়েক পরে বংশীর বউ মারা গেল। সাহেব মরবে না, মরণে ভয়। বিধাতাপুরুষ যা পরমায়ু দিয়েছেন, তার থেকে সিকি বেলাও কমতি হতে দেবে না। হপ্তায় হপ্তায় থানায় গিয়ে এত্তেলা দিতে হয়—বৈশাখের রোদ, আষাঢ়ের বৃষ্টি কিম্বা মাঘের শীত বলে রেহাই নেই। যমালয়েও এমনি তো চিত্রগুপ্তের অফিসে হাজিরা দিতে হবে, ডাণ্ডস মারবে, নরকে নিয়ে ঠাসবে। আরও কি কি করবে সঠিক জানা নেই। সরকারের জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসামি একদিন ফেরত আসে, তার কাছে জেলের ভিতরের ব্যাপার শোনা যায়, শুনে শুনে ভয় ভাঙে। নিজের যখন যাবার সময় আসে, জেনেবুঝে তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যমালয়ের সেই বড় জেলখানা থেকে কোনদিন কেউ ফেরত এলো না, সেখানকার গতিক একেবারে জানা নেই। এখানে এই, সেখানকার না-জানি আরও কোন ভয়াবহ ব্যাপার। কায়ক্লেশে অতএব যত দিন সম্ভব মরণে দেরি করিয়ে দেওয়া।

বংশীর ছেলেরা সব সমর্থ হয়েছে—তাদেরই এখন ছেলেমেয়ে। বংশীর বদনাম ছিল—ছেলেরা চায় না কোনরকম তার ছোঁয়া লেগে থাকে। ধুয়েমুছে সব সাফসাফাই করেছেন—সেদিনের সম্পর্কে সাহেবও কেন আর চালাঘর জুড়ে থাকবে। রাত্রে বাড়ির উপর চৌকিদারের আনাগোনা ভাল কথা নয়। মা-বুড়ি বর্তমান থাকতে কিছু বলবার জো ছিল না, সাহেবকে যেন বাঘিনীর

সন্তানের মতো আগলে থাকত। মায়ের উপরে কথা বলবে, এত সাহস কার? সে বাধা সরেছে এতদিনে।

বড়ছেলের পেটে কিছু বিদ্যে আছে, সে ভাল সদালাপী। বিনয়ীও বটে। চালাঘরে ঢুকে পড়ে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়ে বলে, আমাদের বাবা নেই, তুমি আছ খুড়োমশায়। পর্বতের আড়ালে রয়েছি। কিন্তু পোড়া লোকের চোখ টাটাচ্ছে, সেটা বুঝি আর চলতে দেয় না।

সাহেবের মুখ শুকাল। কানাঘুষো চলছিল, আজকে এইবারে স্পষ্টা-স্পষ্টি। মিনমিন করে বলে, কি হয়েছে, কে কি বলল বাবা।

বাইরে শুধু নয়, ঘরের লোকগুলোও কম! পরের মেয়েদের বউ করে ঘরে আনলে—তারা অবধি শতেক রকম শোনাচ্ছে। ভয় ঢুকে গেছে, এই আর কি! পেটের মেয়েরা সেয়ানা হচ্ছে, বিয়েথাওয়া দিতে হবে, নানান জায়গা থেকে সম্বন্ধও আসছে—

শুধুমাত্র শেষ কথা ক'টিই যেন কানে ঢুকল। মুখের উপর হাসি টেনে এনে সাহেব উল্লাস প্রকাশ করে: শঙ্করী-পটলির সম্বন্ধ আসছে? বাঃ বাঃ, বড় আনন্দের কথা ওরা বড় ভালো।

হলে কি হবে? ঐ সম্বন্ধ অবধি—আসে আর ভেঙে যায়, এগুতে পারে না। সেই জন্যে বলি, তুমি একটা আলাদা আস্তানা দেখে নাও খুড়োমশায়। এ গাঁয়ের ভিতর না হওয়াই ভাল। নইলে বিয়ে গাঁথবে না।

বলে দিল দিব্যি এক কথায়। হায় রে হায়, তোমাদের খুড়ামশায়টির জন্য কত গাঁয়ে কত কোঠা-বালাখানা বানিয়ে রেখেছে, একটু শুধু দেখে নেবার অপেক্ষা। ইচ্ছে করেই যেন গড়িমসি করছি, ভাবখানা এই রকম।

ভক্তিমান বাবাজীবন প্রবোধ দিয়ে বলে, থাকো গিয়ে কোনখানে। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে যাক, নিজের জায়গায় তখন ফিরে এসো।

বাস, নিশ্চিন্ত। তিন ভাইয়ের এক্কুনে সাত মেয়ে। সব কটায় বিয়ে হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আরও সাতটার যে জন্ম হবে না, এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। হয়ে যাক সব বিয়েথাওয়া, বাঁধা যায়গা তারপরে তো রইলোই।

জবাব দাও খুড়োমশায়—

এ হেন সদ্বিবেচনার পরে অন্য কোন জবাব হতে পারে? সাহেব বলে যাবো তাই।

কবে যাচ্ছ? গাঁয়ের মানুষ ভাংচি দেয়: চোর পোষে ওরা বাড়িতে চোরের রোজগারে খায়। এমন বাড়ির মেয়ে কে নিতে যাবে বলো। এই মাসের ভিতরেই যাবে তুমি খুড়োমশায়। শঙ্করীর নতুন একটা সম্বন্ধ আসছে।

অনেক গেছে, এটা কিছুতেই বরবাদ হতে দেব না।

হাকিমের রায় দেবার মতন সুর। পরক্ষণেই হেসে ওঠে: চোরের রোজগারে খাই আমরা—কথা শোন একবার! কোন্ আমলে তালপুকুর ছিলো, সেটাই লোকে মনে করে রেখেছে। আমাদের খাইয়ে দরকার নেই—বিড়িটা-আসটাও যদি নিজের রোজগারে খেতে, দিনের মধ্যে কোন না দশ ছিলিম তামাক আমাদের বেঁচে যেত।

থানা চার ক্রোশ পথ। তার উপরে তিনটে খাল পার হতে হয় এবং একটা বড় গাঙ। 'সারা পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি'—শুধুমাত্র খেয়ার পারাপারেই পুরো বেলা লেগে যায়।

তারও উপরে আছে—খোঁড়া একটা পা। কতকাল আগে তিলকপুরে রাখালপতির গোলা থেকে সেই লাফ দিয়েছিল, পা মচকেছিল তখন। উত্তেজনার মুখে সেদিন আর টের পায় নি। এবং যতদিন বয়স ও কাজকর্ম ছিল, তার মধ্যেও খেয়াল করেনি তেমন। বুড়ো হয়ে পড়ে মচকানো পায়ে বাত ভর করেছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হাঁটু ফুলে ঢোল।

তবু যা-হোক চলছিল। বংশীর বউ গত হবার পর বাবাজীবন এখন দিনের মধ্যে পাঁচবার সাতবার চালাঘরে গিয়ে খুড়োমশায়ের খবরাখবর নিচ্ছে। বউরা ঢপ করে ভাতের কাঁসর রেখে শুনিয়ে শুনিয়ে আর্তনাদ করে: পিণ্ডি বয়ে বয়ে পারি নে বাবা। এক মাসের কড়ার ছিল, সে মাস কবে পার হয়ে গেছে।

এর পরে একদিন ভাত আর আসে না। সাহেব ডাকাডাকি করে, কিন্তু তিনটে বউ একসঙ্গে কালা হয়ে গেছে। সাহেবের শোনাশুনি নেই—ভাত আনিয়ে তবে ছাড়ল। দুপুরবেলার ভাত রান্নাঘর থেকে এসে পৌছল সন্ধ্যার পর।

পরের হপ্তায় থানায় এসে সাহেব দারোগার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ায়: দয়া করুন দয়াময়।

হল কি রে?

বংশীর বাড়ীর বৃত্তান্ত সাহেব আদ্যোপান্ত বলল: খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, চেয়েচিন্তে চলছে। গাছের আম-কাঁঠাল পেকেছে, তাই রক্ষে। কিন্তু সে আর ক'দিন।

দারোগা নীতিবচন ছাড়ে: সৎপথে গেলিনে, আখের বুঝলিনে। দুনিয়ার মানুষ খেয়ে-পরে সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে, পাপীলোক বলেই তো খোয়ার তোদের।

তা বটে! সুখেই আছে বটে মানুষ—আর যদি নিজে চোখে না দেখা থাকত! সাহেবের ঠোঁট পর্যন্ত প্রতিবাদ এসেছিল, চেপে নিল। চোরে আর দারোগায় তফাৎ আছে বই কি! চোর হল সর্বজনার—ধনীর বাড়ি গরিবের

বাড়ি চোরের আনাগোনা সর্বত্র। দারোগা শুধুমাত্র ধনীজনের। ডাকাতও তাই। ডাকাত আর দারোগা সমগোত্রের—বড়লোক দেখে দেখে মক্কেল বাছাই করে। খেয়েপরে সকলেই আরামে আছে—এমনধারা কথা মুখে আসে তাই। চোর-সাহেবের কোন বাড়ি বাদ দিলে চলে না। এক এক বাড়ি এমনও ঘটেছে—পরের দিনের খোরাকির চাল রেখে আসতে হল। নইলে ছা-বাচ্চা সবসুদ্ধ উপোস।

দারোগা বলছে, বুড়ো হয়ে গেছিস, আর কেন? ঠাকুর-দেবতার নাম নে ধর্মপথে চল এবার থেকে—

কথার মাঝখানে সাহেব বলে ওঠে, যাচ্ছিলাম তাই হুজুর—

তা কি হল? ধর্ম দাড়ি অবধি এসে আর বুঝি এগোল না।

হাসি-বিদ্রূপ সাহেব কানে নেয় না। বলে, সত্যি সত্যি ভালো হতে যাচ্ছিলাম। বংশী বউয়ের ঠেলায়। না হয়ে উপায় ছিল না। জানেন না হুজুর, বড় শক্ত মেয়েমানুষ। বংশী হেন মানুষটাকেও শেষ অবধি এমনি করেছিল, দাওয়া থেকে উঠানে নামতে হলেও জিজ্ঞাসা করে হুকুম নিয়ে নিত। বংশী গেল, তার পর আমায় নিয়ে পড়ল। ঐ এক স্বভাব ছিল, ভালো না করে যেন বংশীর বউয়ের ভাত হজম হত না।

কাতর হয়ে কাকুতিমিনতি করে: ভালো হয়েই থাকতে চাই বাকি কটা দিন। ছুটাছুটিতে ঘেন্না ধরে গেছে। হুজুর তার ব্যবস্থা করে দিন।

দারোগা ঠিক ধরতে পারে না। সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, নির্ঝঞ্ঝাটে যাতে খাওয়া-থাকাটা চলে। পাদপদ্মে সেই আমার দরকার।

দারোগা খিঁচিয়ে ওঠে: তবে আর কি—থানার উপর অন্নসত্র খুলে বসি! সরকার আমাদের সেজন্য রেখেছে।

থানায় না-ই হল, সত্র আছে বই কি! যার নাম জেলখানা। সাহেব এবারে মরিয়া হয়ে মনের মতলব স্পষ্টাস্পষ্টি বলল। দারোগার পা জড়িয়ে ধরতে যায়: তারই একটা বন্দোবস্ত পাব, আশা করে এসেছি। হাতে আপনাদের কত রকমের কায়দাকানুন, দয়া হলেই হয়ে যাবে।

আস্পর্ধা দেখে দারোগা চোখ পাকিয়ে পড়ে: দয়াটা কি জন্যে হবে বল দিকি? দয়ার পাত্রাপাত্র থাকবে না? জেলখানা পিঁজরাপোল নয়, যত বুড়ো-হাবড়া জুটে খাবেদাবে আর ঝিমোবে, সরকার সেজন্য বানিয়ে রাখে নি। সক্ষম সমর্থ মানুষের জায়গা। হতিস জোয়ানযুবো, বিবেচনা করে দেখতাম। দিতাম দশধারা ঠুকে, কি অন্য কিছু করতাম।

বলতে বলতে স্বর কড়া হয়ে উঠল: আমার এলাকা ঠাণ্ডা। জেলের

লোভে যদি কিছু বেচাল করতে গেছিস, পিটিয়েই শেষ করব। মামলা জুড়ে হাকিমের দরজায় নিয়ে যাব, স্বপ্নেও মনে ভাবিস নে। পোকামাকড় মারতে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না।

আরও চলত নিশ্চয়। একটা লোক এই সময় তেল মাখাতে এলো। দশাসই জোয়ান পুরুষ—সেই একদা নফরকেষ্ট ছিল, তারই দোসর। জামা-গেঞ্জি খুলে দারোগা উঠানে জলচৌকির উপর বসে পড়ল। কোলকাতার আস্তাবলে সহিস ঘোড়ার ডলাইমলাই করে, সাহেব ছোট বয়সে অনেক দেখেছে। অবিকল তাই। খানিকটা ঘষাঘষির পর সশব্দে থাবা মারে ঘোড়ার পিঠে। এ লোকটাও তেমনি করছে। দেখছে সাহেব তাকিয়ে যেদিন আসতে দেখতে পায়। স্নানের আগে এসে পরম যত্নে দারোগাকে তেল মাখায়, পয়সা-কড়ির কথা ওঠে না। পয়সা কী আবার, দারোগার দেহ স্পর্শ করে তেল মাখাচ্ছে, তাতেই কৃতকৃতার্থ। একলা এই তেল-মাখানো মানুষটি নয়—ভালোমন্দ অনেক জনেরই আনাগোনা। অনুগত-আশ্রিতের অন্ত নেই। বিস্তর জন ঘুরঘুর করে বেড়ায়, কোন একটা কাজে ডেকে ধন্য করে যদি থানার মানুষ। জীবনভোর সাহেব তো কত ঘরেই ঘুরল, কত রকমের মানুষ দেখেছে সংসারে—দারোগার মতন সুখ কারো নয়। নতুন জন্মে বিধাতাপুরুষ যদি বলেন, সেবারে বিস্তর দুঃখকষ্ট পেয়েছিলি সাহেব—এ জন্মে কি হতে চাস? সাহেব এক কথায় বলে দেবে দারোগা।

সামনে পুকুর। তেল মাখানো শেষ হলে গামছা কোমরে বেঁধে দারোগা জলে নেমে পড়ল। সাঁতার কাটে খানিক। তারপর বাঁধানো ঘাটের উপর বসে রগড়ে রগড়ে গায়ের তেল তুলে ফেলছে। সাহেব সেই একখানে বসে। দারোগার সাফ জবাব পেয়ে বড্ড মুসড়ে পড়েছে সে। নিরুপায়—চোখের সামনে অন্ধকার। শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বলাধিকারী বলতেন, নানা মুনির নানা মত। দারোগাদেরও তাই। অনেককাল আগে আলাদা এক দারোগা—উমাপদ দারোগা—তাঁর কাছেও সাহেব একরকম চেষ্টা করেছিল। সেবারে হল না কাঁচা-বয়সের দোষে। আজকেও নয়—বুড়ো-বয়সের দোষে। কোন বয়সেই না হবে তো সরকার উঁচু পাঁচিলের অমন সব আহা-মরি ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখেছে ইঁদুর-চামচিকের বসবাসের জন্যে? সাহেবের এত নামডাক—সে তুলনায় জেলের বিশ্রাম ঘটেছে অতিশয় সামান্য!

নবীন বয়স তখন। হাতেনাতে ধরে সাহেবকে থানায় নিয়ে চলল। আগে পিছে গ্রামবাসীরা। চোরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিম্বা সমারোহে বর চলেছে বরযাত্রীর দল নিয়ে—পয়লা নজরে কেউ বুঝতে পারবে না। উমাপদ দারোগা

সেই সময়টা থানায় নেই। সাহেব-চোরকে ধরা সামান্য ব্যাপার নয়—মাতব্বরেরা বসে আছে দারোগাকে স্বমুখে শুনিয়ে বাহাদুরী নেবে। একটা তদন্তে বেরিয়েছিল উমাপদ—

আকাশের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে সাহেব বেলার আন্দাজ নেয়। উমাপদ থানায় ফিরল, এমনি বেলাই তখন। পুকুরও একটি ছিল সেই জায়গায়, পাতিহাঁস প্যাকপ্যাক করছিল। অনেক দিন হলেও ঝাপসা রকম মনে পড়ে যায়।

সাহেবকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধেছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উমাপদ সোজা তার কাছে এলো। আপাদমস্তক দেখল কয়েকবার। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়ে—চোর-সাহেবের উপর নয়, যারা চোর ধরে এনেছে তাদের উপর।

ঠায় বসে কেন সব? বলি মতলবখানা কি? চোর ধরে থানার হেপাজতে পৌঁছে দিলে—তারপরেও কোন কাজ থাকতে পারে তোমাদের? জেল-ফাঁস-দ্বীপান্তর যা দিতে হয় সরকার বাহাদুর আছেন, সরকারি আইন আছে, তারাই সব করবে। ভিড় বাড়িও না—যাও, বিদেয় হয়ে যাও সব।

চোখ পাকিয়ে প্রবল হুঙ্কার। চোর ধরে এনে তারাই যেন অপরাধ করেছে। জেল-দ্বীপান্তরের কথা হল—দেরি করলে উমাপদ তাদেরই উপর বোধহয় সেই ব্যবস্থা করবে।

পলক ফেলতে না ফেলতে থানার উঠান খালি। আছে সাহেব আর উমাপদ। উমাপদ একদৃষ্টে চেয়ে বোধকরি সাহেবের দেহলাবণ্যই দেখছে। ভারী গোঁফের নিচে থেকে সহসা শাঁখের আওয়াজ বেরিয়ে এলো: তুই তো সাহেব। এ সমস্ত কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, আর করব না।

রীতিমত ধমক এবারে: কি করবিনে? চুরিচামারি—মুখ দিয়েছে ভগবান, যা-খুশি একখানা বলে দিলেই হল! কেমন?

অর্থাৎ বিশ্বাস করে নি উমাপদ দারোগা। দারোগা বলে কি, একটা শিশুও তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ ছাড়া জবাবই বা কি দিতে পারে? হেন ক্ষেত্রে সকলে যা বলে, সাহেবও তাই বলছে।

কনষ্টেবল ডেকে উমাপদ সাহেবের হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলল। শিউরে উঠে বলে, বেঁধেছে কী রকম! বুনো হাতিও লোকে এমন করে বাঁধে না। পাষণ্ড বেটারা।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাসির তোড়ে উমাপদ দারোগার গোঁফজোড়া আন্দোলিত হতে লাগল: চুরি করবি নে—এটা কী বললি হতভাগা। ধরা পড়বি নে, সেই কথা বল্।

আজ্ঞে না, চুরিই করব না।

তা হলে চলবে কিসে রে ?

সাহেব বলে, ধর্মপথে থেকে ক্ষুদকুড়ো যা জোটে তাতেই একরকম চালিয়ে নেবো।

চোখ বড় বড় করে উমাপদ দারোগা বলে কী সর্বনাশ! এত বড় ডাকসাইটে সাহেব—তোরও ধর্মে মতি ? দুনিয়ায় ভরসার কিছু রইল না। তুই না হয় চালিয়ে নিবি, বলি আমাদের চলবে কিসে ? যা বেটারা সব সাধু হয়ে—চাকরি খুইয়ে আমরাই তবে সিঁধকাঠি নিয়ে বেরুই ?

তারপরে গলা নামিয়ে বলল: ঢং খুব দেখালি, চলে যা এইবার। ওরা সব রাস্তা-পথে গেল, পাঠক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে পড় তুই। দেখতে পেলে খচ্চরগুলো আবার ধরে নিয়ে আসবে।

এত কাণ্ডের পর উমাপদ দারোগা এক কথায় ছেড়ে দিচ্ছে, কানে শুনেও সাহেব বিশ্বাস করতে পারে না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উমাপদ ব্যঙ্গের সুরে বলে, যেতে মন চাইছে না, জেলে মন টেনেছে বুঝি ? জেলের বড্ড সুখ শুনেছিস, সত্যাগ্রহ করে থাকবি ? জোয়ান বয়স, কাজকর্মের সময়—লজ্জা করে না এখন বুড়োহাবড়ার মতন জেলে গিয়ে ঢুকতে ? সে তদ্বির বুড়ো-বয়সে, খেটে খাবার তাগত যখন থাকবে না।

একটু থেমে আবার বলে, সরকার জেলখানা করেছেনও সেই জন্যে। চোর সাধু সবাই সরকারের প্রজা—সকলের কথাই ভাবতে হয়। যেদিন অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়বি, তখনকার আশ্রয়। কিন্তু কাঁচা বয়সেও তোরা যদি বসে বসে জেলের ভাত ওড়াবি, সরকার দুদিনে ফতুর হয়ে যাবেন যে।

উমাপদ দারোগার বিবেচনা ছিল, ভদ্রতাও ছিল। বাসাঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে উঠল: চিড়ে-টিঁড়ে দিয়ে যা রে বড়-কারিগরকে। পেট খালি থাকতে নড়বে না—

দারোগার বাসা থেকে জামবাটি ভরতি চিঁড়ে-নারকেলকোরা-গুড় এসে পড়ল। ভরপেট খেল সাহেব বসে বসে। ঘটিতে জল দিয়েছে, ঢকঢক করে পুরো ঘটি মুখে ঢালল। খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ-দারোগাকে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে সাহেব উঠে পড়ল।

আশীর্বাদ করে উমাপদ বলে, ধর্ম রেখে কাজ করে যা। ভগবান সহায় থাকবেন, আপদ-বিপদ ঘটবে না। ন্যায্যের বেশি লোভ করিসনে। যার যে রকম পাওনাগণ্ডা ঠিক মতো দিয়ে দিবি।

বলাধিকারী মশায়ের কথাও এই। অঙ্কের ভাগ বুঝসমঝ করে দিয়ে তবে

নিজেরটা। বড় বড় মুরুব্বি সবাই এই কথা বলবে।

উমাপদ আবার বলে, ভাল ভাল কারিগরে আমাদের প্রাপ্য আপনা থেকে হিসাব করে দিয়ে যায়, মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দেশভুঁই ছেড়ে পড়ে থাকি, সে তো সত্যি সত্যি সরকারি শুখো মাইনে যাটটে টাকার জন্যে নয়। সোনার-চাঁদ তোরা সব রয়েছিস, সেই ভরসায়। নিজেরা খাবি, দশজনকে প্রতিপালন করবি। তা নয়, জেলে ঢোকবার সাধ কাঁচাবয়সে! তোকে চিনতাম না কিন্তু তোর কাজের ধারা জানতে কিছু বাকি নেই। ওসব হবে-টবে না, সাফ কথা আমার। বুড়োথুত্থুরে হলে আসিস, জেলের আবদার সেই সময় শোনা যাবে। কথা দেওয়া রইল।

স্পষ্টভাষী ছিল উমাপদ, মানুষটা এক কথার। সে থাকলে নিশ্চয় কথা রাখত। কিন্তু গোড়ার হিসেবেই তো গোলমাল। উমাপদ দারোগা দেড়াবয়সি ছিল আমার—আমিই আজ এমন বুড়ো, কথা রাখবার জন্য থানার উপর এতকাল সে কেমন করে থাকতে পারে? কাজকর্ম ছেড়ে কবে বিদায় হয়ে গেছে। খুব সম্ভব ধরাধামেই নেই।

স্নান সেরে এতক্ষণে দারোগা উঠে আসছে। সাহেব গিয়ে ঘাটের কাছে দাঁড়াল।

এখনো আছিস তুই?

সাহেব বলে, তবে হুজুর হুকুম দিয়ে দিন, আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাই। কালীঘাটের গঙ্গাতীরে—

ধর্মে মতি হয়ে গেল তো? আত্মপ্রসাদে ফেটে পড়ে দারোগা। বলে, হতেই হবে। আমি যদ্দিন থানার উপরে আছি, একলা তুই নোস, সব চোরছ্যাঁচোড়ের ধার্মিক হয়ে যেতে হবে। যখন যে থানায় গিয়েছি, ধর্মের বান বয়ে গেছে।

সাহেব বলে, তা নয়, জন্মসূত্রে আমি কালীঘাটে। মরণের পরেও দেহ আদিগঙ্গায় ভাসাবে, সেই আমার বড় সাধ।

দারোগা সহাস্যে ঘাড় দোলায়: সে কি আর বুঝিনে বাপু? বড্ড চোখে চোখে রেখেছি, কাজকর্মের জুত নেই। বাইরে গিয়ে হাত-পা খেলাবি, সেই মতলব। আমার মতন করে কে তোদের ঠেকাতে যাবে?

সাহেব জিভ কেটে বলে, কী যে বলেন হুজুর! শরীরের এই হাল হয়েছে, তা ছাড়া—পায়ের দিকে তাকাতে বলি কোন্ সাহসে?—একখানা পা একেবারে জখম। একঘুমের রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ি, পায়ের দোষে তা-ও এক একদিন দেরি হয়ে যায়। হুজুর তাই নিয়ে মারধোর করতে যান।

হাতের লাঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, তুলতে গিয়ে থরথর করে হাত কাঁপে,

হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাহেব জল-ভরা চোখে বলে, দেখুন কী দশা হয়েছে চেয়ে দেখুন একবার।

যত অনুনয়বিনয় করছে, দারোগার হাসি তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, একে দিনমান তায় আমার চোখের উপরে। হাতের কাঁপুনি হবে বইকি! রাত্তিরবেলা ঐ হাতে হাতির বল আসে, সিঁধকাঠি ধরে মোটা মোটা দেয়াল কেটে ফেলিস। খোঁড়া পা তখন ঘোড়ার মতন চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। ভাঁওতা দিবিনে বুঝলি? তোর কীর্তিকথা সরকারি দপ্তরে মজুত হয়ে আছে। থানায় যে যখন নতুন আসে, চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। জানতে আর-কিছু বাকি থাকে না।

কথায় ছেদ টেনে দারোগা রান্নাঘরের দিকে চলল। জমাদারকে হাঁক দিয়ে বলে টিপসইটা নিয়ে ছুটি দিয়ে দাও অদ্দুর যাবে তো আবার ফিরে।

পথে বেরুল সাহেব। দারোগা খেতে বসেছে। তারপরে ঘুম। দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও খাওয়ার পরে লম্বা একটা ঘুম চাই। উঁকি দিয়ে দিয়ে সাহেবের চোখ রপ্ত—গরজ না থাকলেও অভ্যাস বশে সকলের সব কথা জানা হয়ে যায়। খাইয়ে-মানুষ এই দারোগাটি—এবং হাটবার আজকে, পহরবেলা থেকে হাট জমেছে। খাওয়া অতএব আজ রীতিমত গুরুতর। অন্য একজন আয়েস করে খাচ্ছে—কথাটা যতবার মনে ওঠে, ক্ষিধেটা ততই যেন দেহ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ক্ষিধে যেন ডাকাত—চেপে ধরেছে সাহেবকে। কবলমুক্ত হয়ে ছুটে পালাবে, কিন্তু পেরে ওঠে না অক্ষম অথর্ব মানুষ। সাহেবকে রেহাই দিয়ে ক্ষিধে ঢুকে পড়ুক ঐ দারোগার রান্নাঘরে যেখানে ভূরিভোজনের আয়োজন। সেকালে ছিল, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে উঠলেই কিছু না হোক ভাত চাট্টি আসবেই মুখের কাছে। অতিথি অনাহারে ফিরলে গৃহস্থের অকল্যাণ। জুড়নপুরে রাতের কুটুম্বিতায় মেয়ের গায়ের গয়না হরে নিল, দিনমানে সেই বাড়ি অষ্টব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত বেড়ে আনে। ছাড়লেন না কিছুতে মা। এমনিই ছিল। সমস্ত সুখ এখন উড়েপুড়ে গেছে। চোর-ডাকাতের এমন যে জেলখানা, তার ফটকও খুলতে চায় না। শতেক রকম বায়নাক্কা। দুর্মূল্যের দিনকাল—নিখরচায় সরকারি অন্নের লোভে সাধুসজ্জনরাও কোন এক অজুহাত নিয়ে ঢুকে পড়েন। তাঁরাও ভিড় জমাচ্ছেন—ভালোয় মন্দয় তফাৎটা কি তবে? সাহেব তবে কষ্ট করে মন্দ হতে গেল কেন?

পঁচিশ

হাট-ফিরতি নৌকা যাচ্ছে। গাঙের কূলে সাহেব হাত তুলে দাঁড়ায়: যাবে কোথায় মাঝি?

খান পাঁচ-সাত নৌকা বহর সাজিয়ে যাচ্ছে, যার খুশি জবাব দিক। দিল তাই একজনে : কানাইডাঙা—

আমি কানাইডাঙা যাবো। একটুখানি ধরো বাবা, তুলে নাও।

মাঝি বলেছে কানাইডাঙার নাম। যদি বলত বাদাবন কিম্বা খুলনা শহর কিম্বা রসাতল—সাহেবের ঠিক একই কথা : যাবো সেখানে। সব জায়গাই সমান নিষ্ঠুর—ঠাঁই দেবে না কেউ, পেটে খাওয়াবে না। এদের নৌকায় তবু কালীঘাট মুখো খানিক পথ এগিয়ে যাওয়া হবে। কালীঘাটে রানী থাকে। ধু-ধু করা তেপান্তরের বিলে একটুকু ছায়া। কোন প্রেমিক সুধামুখীর মতন ইতিমধ্যে রানীকেও যদি কেটে গিয়ে থাকে, তবে অবশ্য চুকেবুকে গেল।

নদীকূলে দাঁড়িয়ে সাহেব কাতর হয়ে ডাকছে : খোঁড়া মানুষকে দয়া করো বাবা, বেঘোরে ফেলে যেও না।

ডাঙার দিকে মাঝি নৌকা ঘুরাল। হয়েছে দয়া। কাঁচা বয়সে চেহারাখানায় কাজ দিত। এখন বোধ করি ফুরফুরে দাড়িতে। তার উপরে রয়েছে খোঁড়া পা একখানা। চিনতে পারোনি বাছাধন—সাহেব আমি, সাহেব-চোর। নামটা কানে গেলেই হাতের বৈঠা ঠকাস করে পড়ে যাবে। আপাদমস্তক তাকাবে। পাকা চুল-দাড়ির এই নিরীহ মূর্তিটা মনে হবে ছদ্মবেশ—তাকিয়ে তাকিয়ে পোশাক-চাপা বন্যজন্তুটাকে খুঁজবে। সাহেব নাম আর সাহেব-চোরের পুরানো কীর্তিগুলোই কাল হয়েছে। ভাঁটিঅঞ্চল ছেড়ে সেই জন্যেই আরও বেশি করে পালাতে চায়। কলকাতা শহর সমুদ্রবিশেষ। কোন এক সাহেব ছিল কোন এক কালে, আবার একদিন সে ফিরে এসে ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে মরে রইল, বেওয়ারিশ লাস মড়া-কাটা ঘরে চালান করে দিল, এসব খবর নিয়ে শহরের মানুষের মাথাব্যথা নেই।

চলল অতএব সাহেব কানাইডাঙা। নামটা চেনা-চেনা ঠেকে। মাঝিমাল্লারা গেঁয়ো মানুষ—নৌকায় চুপ করে থাকতে দেয় না, খুঁটিয়ে পরিচয় নিচ্ছে। হঠাৎ কানাইডাঙার যাবতীয় ঘটনা মনে পড়ে গেল। বহুকাল আগে এই গাঁয়ে গাঙ্গুলিমশায়দের বাড়ি ছোটখাট একটু কাজ নামিয়েছিল। লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত অনন্ত—ভাইয়ের সব নাম। নিষ্ঠাবতী বিধবা বোন নমি। মাঝির জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে সাহেব এক মর্মান্তিক গল্প ফাঁদল : জন্ম থেকেই দুঃখ-কষ্ট—মা'কে কেটে ফেলল, বাপ নিরুদ্দেশ সেই থেকে। বউ নষ্ট। সংসার হল না, বিবাগী হয়ে তাই পথে পথে বেড়াই। খুলনায় অনন্ত গাঙ্গুলি পেস্কার-মশায়ের সঙ্গে এক সময় পরিচয় হয়েছিল, তাঁর কানাইডাঙার বাড়ি তিনি যেতে বলেছিলেন। তোমরা যখন দয়া করলে মাঝি, সেইখানেই তবে গিয়ে উঠি।

না করলে অন্য কোন দিকে চলে যেতাম।

ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা। নৌকা ঘাটে বেঁধে হাটুরে-মানুষ মাঝিমাল্লা সব চলে গেল। সাহেবও চলল। আম-কাঁঠাল ও পুকুরের জলে পেট ভরে, কিন্তু ভাতের তৃষ্ণা যায় না। মা-কালী, ভাত জুটিয়ে দাও চাট্টি। বৈশাখের পুণ্যমাসে গৃহস্থ শিবপূজা করে—ভাতব্যঞ্জন সাজিয়ে বাইরে রেখে দেয় শিয়ালের খাওয়ার জন্য। বংশী একবার যা খেয়ে এসেছিল। তেমনি কোন এক শিবা-ভক্ত বাড়িও পাওয়া যায় না!

বর্ধিষ্ণু বড় গ্রাম কানাইডাঙা, দালানকোঠা অনেক। গাঙ্গুলি-বাড়ি কোন পথে, এতকাল বাদে ঠাহর হয় না। গিয়ে লাভও নেই অমন ভিড়ের জায়গায়। বয়স আর অনভ্যাসের দরুন হাত-পা খেলবে না। সরঞ্জাম নেই—খেলাবেই বা কোন বস্তু হাতে দিয়ে? ছুটতেও তো পারবে না, তাড়া করলে মুখ থুবড়ে পড়বে। উৎকৃষ্ট কাজের শক্তি নেই, খুচরো এক-আধটা জুটিয়ে দাও মা-কালী। স্টিমারে সার্চলাইট ফেলে—তেমনি সাহেব এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে টিপিটিপি চলেছে।

চলেছে, চলেছে—কত পথ এসেছে, আন্দাজ নেই। গ্রাম বুঝি শেষ হয়ে এলো। তেপান্তর বিলের প্রান্তে ভাঁট-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল, বাঁশঝাড়, আম-বাগান। ভিতরে ঘরও যেন একটা। এককালে রাত্রিবেলা চোখ দুটো জ্বলত, সে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। এগিয়ে দেখে ঘরই বটে। টেমির আলো জানলা দিয়ে গাছগাছালির উপর পড়েছে। আলো নিরিখ করে সাহেব ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল।

ছিটের বেড়া, কাঠের চৌখুপি জানালা। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে পুলকের সীমা থাকে না। মা-কালীর দয়া। উপোসি ভক্তের কষ্ট দেখে শিবাপূজো না হোক, ঠিক তেমনি নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র জুটিয়ে দিলেন। মায়ের দয়া নইলে এমন হয় না।

টেমির আলোর সামনে ছোট-ছেলে আর ছোট-মেয়ে। বাঁশঝাড়ে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ—ভূতপ্রেত দত্যিদানো বুঝি দাপাদপি করে বেড়াচ্ছে। গুটিসুটি হয়ে দুটিতে গায়ে গায়ে বসে। মেয়েটা বলে, মামামণি আসছে। দেখ না, ঠিক আসছে এইবার।

সাহেব চমকে যায়: দেখে ফেলল নাকি—তাকে দেখে বলেছে?

ছেলেটা বয়সে কিছু বড়। তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। বলে, দূর, কোথায় কে? ডালপালা পড়ল কি বেঙে লাফ দিল, সেই শব্দ।

জানালায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বলে, ভয় পেয়েছিস তুই সোনা। দু-দু'জন আমরা, কিসের ভয়? আমার ভয় করে না—পুরুষমানুষ, একলা

থাকলেই বা কি!

সোনা মিনমিন করে বলে, ভয় কে বলল, ভয় কেন হবে?

সাহসের প্রমাণ স্বরূপ আরও জুড়ে দেয়: দু'জনই বা কেন, ভগবান আছেন না? আকাশের উপরে ভগবান রয়েছেন। একবার নেমে যদি আসেন, বেশ হয়। না রে ঘন্টু?

হু-হু করে হাওয়া আসে বিলের দিক থেকে। আকাশে চাঁদ। চতুর্দিকে সাহেব চক্কোর দিয়ে দেখল—না অন্য কেউ নেই। শুধু ঐ ছেলে আর ঐ মেয়ে। বাড়ির যা দশা, তাতে ঐ দুই প্রাণীর উপরে থাকতে পারে বড় জোর ফুটো-কলসি ফাটা-থালা ভাঙা-গেলাস দু'চারটে ছেঁড়া কাপড়চোপড়। বাপরে বাপ, এই সম্বল নিয়েও দেখি চোরের ভয়। সাহসের পাল্লাপাল্লি শেষ করে দুটিতে সুর করে এবার চোর-তাড়ানি শ্লোক ধরল:

চোর-চোরানি বাঁশের পাতা
চোর এলে তার কাটব মাথা।
ছুটুরপুটুর লোটা কান
চৌকিদারি ঘরউঠান।
নয়া লাঙল পুরানো ইশ
বন্দিলাম দশ দিশ,
বন্দিলাম ছিরাম-লক্ষণে
ঘুরে বেড়াক চোর উঠানে।

শ্লোক এমনি তো বিষম কড়া, তায় রিনরিনে কচি গলার পাঠ। চোরের রক্ষে আছে! গেলেই তো মাথা কাটবে, উঠানে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে উপায়টা কি! ঘোরে সাহেব এদিক-সেদিক, আর ঘরের কাছে বারম্বার এসে কথা শুনবার জন্য প্রলুব্ধ কান পাতে। নিয়মও এই বটে। ওস্তাদের হুকুম: কাজের আগে এক দণ্ডের খোঁজ তিন দণ্ড ধরে নেবে, কাজে নেমে তিন দণ্ডের কাজ এক দণ্ডে সারবে। সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দেখছে কাছে-পিঠে মানুষ আছে কিনা। সব চেয়ে কাছের বাড়ি কত দূরে।

শ্লোক পড়তে পড়তে সোনা চেঁচিয়ে ওঠে: ঘন্টু রে, ওই দেখ—

প্রতি বছরই দেখে আসছে—দেখে দেখে এত বড় হয়েছে, তবু কিন্তু ভয় ঘোচে না। উঠান শেষ হয়ে কিছু ঝোড়ঝাড় ও উলুক্ষেত, তারপরে ফাঁকা বিল। বিল শুকনো। মাঘ মাসে ধান কাটা শেষ হয়ে গোড়াগুলো পড়ে আছে, তাকে বলে নাড়া। ক্ষেতে এবার লাঙল নামবার সময় হল, নাড়ায় আগুন দিয়ে চাষীরা ক্ষেত সাফ করে। নাড়ার ছাই সারও বটে—লাঙলের মুখে মাটির সঙ্গে

ছাই মিশে গিয়ে ফসলের তেজ বাড়ায়।

ক্ষেত ছেড়ে গ্রামে উঠবার সময় সন্ধ্যাবেলা নাড়ায় আগুন দিয়ে গেছে। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে বিলের বাতাসে এক সময় দপ করে জলে ওঠে। সারা রাত্রি বিলময় খণ্ড খণ্ড আগুন। সেই বস্তু দেখে ভারি ভারি জোয়ানপুরুষ আঁতকে ওঠে, এরা তো ছেলেমানুষ! আলেয়ার দল বুঝি চরে বেড়াচ্ছে ঐ—চোর-ডাকত বাঘ-ভালুক এমন কি ভূতপেত্নির চেয়েও সাংঘাতিক আলেয়া। বিল জুড়ে বিস্তর কূয়া, কূয়ার ধারে কশাড় শোলাবন। দিনমানে আলেয়ারা কূয়ার জলে অথবা শোলাবনে লুকিয়ে থাকে, রাত হলে তেপান্তরে চরতে বেরোয়। আলেয়ার চেহারাও মোটামুটি আন্দাজ আছে—কালোরঙের বিশাল গোলাকার বস্তু, গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ায়। অবয়বের মধ্যে শুধু প্রকাণ্ড মুখ, এবং চকচকে ছোরার মতো দাঁত দু'পাটি। হাঁ করে ঘন-ঘন—মুখের ভিতর থেকে সেই সময় ভলকে ভলকে আগুন বেরোয়। নাড়ার আগুনও আছে বটে—কিন্তু ভাঁটিঅঞ্চলের আবালবৃদ্ধ সকলে জানে, অসংখ্য জায়গায় ঐ যত জলছে সবগুলোই তার আগুন নয়—আলেয়া। কোনটা আগুন কোনটা আলেয়া রাত্রির বিলে তফাত ধরবার জো নেই। চলতে চলতে পথ হারিয়ে পথিকের ধন্দ লেগে যায়। আলো দেখে ভাবে গ্রাম সেই দিকে। অথবা লণ্ঠন নিয়ে কেউ গ্রামের দিকে চলেছে। আশায় আশায় ছোটে। কাছে এসে দেখে কিছুই নয়, নীরন্ধ্র আঁধার। দপ করে ভিন্ন একখানে জলে ওঠে তখনই। ছুটল সেইদিকে। না, কিছুই নয়। আবার, আবার। একবার এদিক একবার সেদিক ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অসহায় অবসন্ন ভয়ার্ত মানুষটা এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মজা তখন—সারা বিলের যেখানে যত আলেয়া কিলবিল করে মুমূর্ষুকে ঘিরে ধরে, শত শত মুখ লাগিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত শোষে। রক্তপানের পর বিষম স্ফূর্তি—মদ খেয়ে মাতালের হয় যেমনধারা

এক একদিন গভীর রাত্রে বিলের বাতাস প্রবল হয়ে ঝড় বইতে থাকে। আগুনের শিখা বাতাসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়— আগুন সেদিন ঘোড়সওয়ার হয়ে বিল জুড়ে ছুটোছুটি করছে। কিছু নয়—ভোজের পরে সেই স্ফূর্তির ব্যাপার। বীভৎস নাচানাচি। গাঁয়ের মানুষ বিলের দিকে তাকিয়ে তখন নিশ্বাস ফেলে: আহা, কোন্ মায়ের ছেলে ঘর শূন্য করে পড়ল গো আজ রাত্রে! দিনমানে দেহ খুঁজে না-ও পেতে পারো। রক্তহীন খোলাটা খানিক লোফালুফি করে খেলার শেষে আলেয়ারা নাড়ার আগুনে ঠেলে দিয়ে গেছে।

ঘরে ঘরে বড়দের এমনি বলাবলি—এরা তো দুই শিশু। জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকে টেমির আলো কাঁপে, বেড়ার গায়ে ছায়ারা নড়াচড়া করে ওঠে।

ছায়া ওদেরই, ঘরের এটা ওটা জিনিসপত্রের।

কাঁপতে কাঁপতে সোনা আঙুল দেখায়ঃ ঐ দেখ রে ঘণ্টু, কারা সব এসেছে—

মাঝ-বিলের ভয় এবারে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আজব চেহারার একপাল জীব ভয় দেখাচ্ছে ছোটমানুষদের। সোনার চেয়ে ঘণ্টু বছর দুয়েকের বড়। বড় হওয়ার দায়িত্ব বশে যথাসম্ভব সে সাহস দিচ্ছেঃ কিছু নয়, ভয়ের কি আছে? দেখ্ না দেয়ালে হাত বুলিয়ে। দেখে আয়—

জানলার কাছে সাহেব কান রেখে আছে। সর্বশুভ। দুটি ছাড়া তৃতীয় মানুষ নেই, নিঃসন্দেহ এখন। খোড়োবাড়ি একটা কাছাকাছি দেখে এসেছে, তা-ও জনমানবশূন্য। মরেহেজে গেছে সে-বাড়ির লোক, অথবা বিদেশ-বিভূঁয়ে থাকে? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ছাড়া এত দূর সম্ভবে না। সর্বরকমে নির্বিঘ্ন করে কাজখানা তিনি গেঁথে রেখেছেন।

কারিগরের যেটুকু করণীয়, সেরে ফেলুক এইবারে তবে। নিমেষমাত্র লাগবে। ঘরে ঢুকে এক হাতে ছেলেটার আর হাতে মেয়েটার টুঁটি টিপে ধরে—। উঁহু, উল্টো ফ্যাসাদ তাতে। বন্ধ ঘরেই কেঁপে মরছে, বীরমূর্তি দেখলে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে ঠিক। তখন খোঁজো জলের ঘটি কোথায়, শিয়রে বসে পড়ে জল থাবড়াও—

ঘরে ঢুকবার কায়দা ভাবছে। সিঁধকাঠি নেই—যা-কিছু দরজার পথে। বাইরে থেকে ঘা দিয়ে দরজার খিল ভাঙবে। চুরি নয় ডাকাতি—তা-ও করতে হচ্ছে, হায়রে হায়, দুটো অবোধ শিশুর উপরে। বাইটামশায়, স্বর্গনরক যেখানেই থাকো, আজকের কাজ চেয়ে দেখো না। আমগাছ-তলায় ভিটার উপরে ঢেঁকি—বোধ করি ঢেঁকিশাল ছিল ওখানটা। ঢেঁকির ঘায়ে ডাকাত গৃহস্থর দরজা ভাঙে—এটা খুব চলতি রেওয়াজ। পুরো ঢেঁকি একলা সাহেব কেমন করে তুলবে—ছেয়াখানাও পড়ে আছে একদিকে। কাঠের দণ্ড ঢেঁকির মাথার দিকে লাগানো থাকে, তার নাম ছেয়া। অনেক কষ্টে সাহেব ছেয়া কাঁধে তুলে নিল, ঘা দিতে হবে দরজায়। ভারী জিনিসের আঘাত ভিন্ন খিল ভাঙে না। কোমর বেঁকে যায়, এগোতে গিয়ে টলে পড়বার অবস্থা। অলক্ষ্য হাতে ধরে নাও আমায় মা-নিশিকালী।

লজ্জা করে চেপে থাকতে পারে না আর সোনা। বলে উঠল, আমার ভয় করছে ঘণ্টু।

কিসের ভয়। বললাম তো, ছায়া ওঁরা সব। সত্যি কিনা, হাত বুলিয়ে দেখ্ বেড়ার উপর।

প্রবোধ দিতে গিয়ে ঘণ্টুর নিজেরই গলা জড়িয়ে আসছে, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপে। বলে, যতক্ষণ ঘরের মধ্যে আছি, কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ঘর হল বন্ধনতলা, বাস্তুপূজো হয় ঘরের মধ্যে। বাইরেই ওঁদের জারিজুরি, ভিতরে সেঁদোবার জোটি নেই। ঠাকুর লক্ষ্মণ তো, ঘরদোর কিছু নয়, একটু গণ্ডি মাত্র কেটে দিয়েছিলেন। অমন যে শমনদমন রাবণরাজা—সাধ্যি হল না তার ভিতরে যাবার। ভুলিয়েভালিয়ে সীতাকে বাইরে এনে তবে সীতা-হরণ। রাম-নাম কর্ সোনা, ভয় থাকবে না।

বলে সোনা কি করে সে অপেক্ষায় না থেকে ঘণ্টু নিজেই তার স্বরে রাম-রাম করে।

সোনা বলে, ভয় কিন্তু তোরও হয়েছে ঘণ্টু—

যাঃ!

হয়েছে। বুঝতে পারছিসনে।

ঘণ্টুর মুখে আর জোর প্রতিবাদ আসে না। আমতা-আমতা করে বলে দাদু এখনো এলেন না। দুজনে একা একা তো—

দু'জন কিসে? আরও আছেন—আকাশের ভগবান। এবারে সোনাই সাহস দেয় ঘণ্টুকে: ভগবান উপর থেকে আমাদের দেখছেন।

ঘণ্টু অধীর হয়ে বলে ওঠে, দেখে শুধু শুধু কি হবে? দাদুর দেরি হচ্ছে—তা আসুন না ভগবান একটু নেমে। সত্যযুগে তো কথায় কথায় আসতেন।

ঠিক এমনি সময় আওয়াজ বাইরে। ঢেঁকির ছেয়া কাঁধ থেকে সাহেব ধপাস করে ফেলে ছিল। নয়তো নিজেই আছাড় খেয়ে পড়ত। সোনার কি হল—ভয় ভেঙে গিয়ে দ্রুত জানলায় চলে আসে। আম-ডালের ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। জ্যোৎস্নার আলপনা উঠানে। তার উপরে মানুষ একজন। লম্বা দেহ। মাটিতে চলাচল যেন অভ্যাস নয়, মাটি পায়ে ফুটছে। দাওয়ার পৈঠার দিকে মানুষটা টলতে টলতে যাচ্ছে।

ও ঘণ্টু, মানুষ এসেছে রে, মানুষ!

মানুষই বটে! মানুষ দেখে সোনার বড় আহ্লাদ। ঘণ্টুর হাত ধরে টানে, সে-ও দেখুক এসে জানলায়। নিঃশব্দে এ ওর মুখে তাকালে। দেখ্, দেখ্, কী আশ্চর্য, মানুষটা দাওয়ায় উঠবেন। পৈঠার দিকে যাচ্ছেন ঐ।

ফিসফিসিয়ে সোনা জিজ্ঞাসা করে: কে রে ঘণ্টু?

ঘণ্টু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল: ভূত-টুতও অনেক সময় কিন্তু নরমূর্তি ধরে আসে।

সোনার সে বিশ্বাস নয়। সে ভাবছে অন্য। আকাশের ভগবানের কাছে

কাকুতি-মিনতি করছিল, তিনিই বোধহয়। ভূত বলছে ঘণ্টু, কিন্তু ভগবান হতেই বা বাধা কিসের ?

জানলায় চোখ দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। চলেছেন দেখেশুনে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে। হবেই তো এমনি। মাটির উপরে পা দিয়ে চলা অভ্যাস নয়, আমাদের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে যাবেন কেমন করে ?

ঠাহর করে দেখে সোনা হাসিমুখে ঘণ্টুর দিকে ফিরল : না রে, ভূত কক্ষনো নয়। চাঁদের আলোয় উঠানের উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছেন যে ! চেয়ে দেখ।

যুক্তি অকাট্য। সবাই জানে, অপদেবতার ছায়া নেই ! তাঁদের চেনবার নিরিখ হল এই। সোনা ছায়া দেখেছে, ঘণ্টুকে দেখাল।

ভূত সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে এবারে ঘণ্টু বলে, তবে বোধহয় চোর—

সোনা বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করে : চোর কেমন করে হবে ? মানুষ একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—দুই হাত, দুটো চোখ, নাক, মুখ—কোনটা নেই ? মামামণি যেমন মানুষ, ইনিও তাই।

সে-ও একটা কথা বটে ! তা ছাড়া চোরতাড়ানি পড়ে চোরের পথ আটক করে দিয়েছে। চোর হলে সারা রাত উঠানের উপর ঘুরতে হবে, দাওয়ায় উঠতে হবে না বাছাধনের। সে-ও এক পরীক্ষা।

সোনা বলে, ঐ যে তুই ভগবানকে আসতে বললি, সত্যযুগের নাম করে খোঁটাও দিলি আবার। লাজে-লজ্জায় তাই আসতে হয়েছে।

ধৈর্য ধরতে পারে না সোনা। প্রশ্ন করে : কে ?

সাহেব থতমত খেয়ে যায়। মিষ্টি কচি গলা—অন্তরাত্মা তবু কেঁপে ওঠে। জবাব হাতড়ে পায় না ! জড়িত কণ্ঠে বলে, আমি—আমি—

দেবতাগোঁসাইরা বেশি কথা বলেন না। আত্মপরিচয় দেবেন না তো, বেশি বললে মিথ্যে বলতে হয়। বুদ্ধিমানে ঐ সামান্য থেকেই বুঝে নেবে।

ইতিমধ্যে জবাব কিছু ঠিক হয়েছে। সাহেব বলে, বিদেশি মানুষ আমি, তোমাদের অতিথি—

রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা জানা এদের। ভাঁটির দেশের কোন ছেলেমেয়ে না জানে ? সোনা বলে, রামচন্দ্র—বুঝলি রে ঘণ্টু ? গুহকের বাড়ি রাম হঠাৎ এমনি অতিথি হয়েছিলেন।

ঘণ্টু প্রণিধান করে বলে, দূর ! রাম কত বড় বীর—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেন দেখিস না ? রাম বুঝি খোঁড়া ?

ঐ রীতি ঠাকুর-দেবতার। খোঁড়া হয়ে, কানা হয়ে, কুষ্ঠে হয়ে দেখা দেন। ষোলআনা আসল মূর্তি হলে সে তেজ লোকে সামলাতে পারবে কেন ?

আড়ালে পড়ে গেল এই সময় সাহেব। জানলায় ভাল দেখা যায় না তো সোনা খিল খুলে সন্তর্পণে দরজা একটু ফাঁক করে দেখে। বলে, ঠিক বলেছিস রে ঘণ্টু। রামচন্দ্র নয়, বাল্মীকি মুনি। রামায়ণের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ, একেবারে আসল। তেমনি দাড়ি, তেমনি বড় বড় চুল। রামচন্দ্র বাল্মীকিকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুখ বাড়িয়ে এবারে সোজাসুজি ডাক দিল: আমাদের ভয় করছে। এসে বসবে একটু? অতিথি হয়েছে, খেতেও দেবো। দু'জন আছি—আমি আর ঘণ্টু। আমরা বাইরে যাব না কিন্তু—ঘর ছেড়ে এক পা-ও বেরুবনা। তুমি চলে এসো।

দুই বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ঘরের ভিতর ডেকে নিচ্ছে। দরজা ভাঙতে হল না, কোন রকম ঝামেলা নেই, আপনা-আপনি সব হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রের মতন। সাহেব-চোরকে ঘরে ডাকছে, হেন তাজ্জব কাণ্ড ভাবতেও পারে না কেউ। মা-কালীর করুণা। কত কাল হয়ে গেল মা, কালীঘাটের কালীক্ষেত্র ছেড়ে এসেছি—ভাঁটি অঞ্চল তো ভিন্ন এক দুনিয়া—অনাথ অধম সন্তানকে এত দূরেও নজর ফেলে দেখছ।

ঘরের মধ্যে এসে সাহেব এদিক-ওদিক তাকায়। যা ভেবেছে—দৈন্যের অবস্থা, জিনিসপত্র বলতে থালা-ঘটি-বাটি আর প্রকাণ্ড এক টিনের তোরঙ্গ। খাসা ফুটফুটে মেয়েটা কিন্তু, আট-হাতি নীলাম্বরী পরে গিন্নিবান্নির মতো দেখাচ্ছে···আরে আরে, হার চিকচিক করছে গলায়—হারের সঙ্গে লকেট। কেমিকেল নয়, আসল সোনা—নজর হেনেই সাহেব বলতে পারে। সেদিন নেই—সেই যে রানীর ঝুটো মাকড়ি মুঠোয় নিয়ে বুড়ো-স্যাকরার কাছে গিয়েছিল। খলেদার যত ছ্যাচড়াই হোক, এ জিনিস একশটি টাকা না দিয়ে পারবে না। ভাল খলেদার হলে অনেক বেশি দেবে। যে ক'টা দিন জীবনের মেয়াদ আছে, এতেই চলে যাবে। আর কিছু করতে হবে না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির অন্য সবাই কোথা?

ঘণ্টু বলে, একজন তো মোটে—আমার দাদু। সোনার হলেন মামামণি। আমার বাপ-মা কেউ নেই—ঐ দাদু। সোনার মা নেই, বাপ আছে—সে বাপ এখানে থাকে না।

বকবক করে ঘণ্টু আরও বিস্তর পরিচয় দিয়ে যায়: গাঙ্গুলি-বাড়ি দাদু কাজ করে। ফিরতে এক-একদিন রাত হয়ে যায়, ততক্ষণ গোপলার মা থাকে। আজ গোপলার মা রান্না করছিল—এমনি সময় খবর এলো, গোয়ালে গরু তুলতে গিয়ে গোপলাকে ষাড়ে ঢুঁশ মেরেছে। গোপলার মা বেরুল। দুজন আমরা একা।

ক্ষিধে পেয়েছে, বাচ্চা-ছেলে তো—নির্ভর হয়ে ঘণ্টুর এতক্ষণে সেটার হুঁশ

হল। সোনার দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, ভাত-ডাল সবই তো এঘরে। খেয়ে নিলে হয় কিন্তু।

আর দেরি কেন সাহেব। এক টানে মেয়ের গলার হার ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ো। মরুক দুটোয় চেঁচিয়ে। ডাকভরের মধ্যে মানুষ নেই। মানুষ জমতে জমতে তার মধ্যে তুমি বিল পাড়ি দিয়েছ।

ঘণ্টু বলে চলেছে, গোপলার মা থাকলে খাওয়া কখন হয়ে যেত। পিঁড়ি পেতে গেলাসে জল পুরে সুন্দর করে সে ভাত বেড়ে দেয়।

সোনাকেই যেন ঠেশ দিয়ে বলা নতুন মানুষটির সামনে।

সোনা ঝগড়া করে: জল পুরে পিঁড়ি পেতে আমি বুঝি দিইনে কখনো? গোপলার মা-র চেয়ে ভালো ভাত বাড়ি আমি।

এবং প্রমাণস্বরূপ তখনই সশব্দে দুটো পিঁড়ি ফেলে হাঁড়ি টেনে এনে সাহেবকে সাক্ষি রেখেই যেন ভাত বাড়তে বসল। একমনে ভাত চেপে চেপে মোচার মতো মাথা সরু করে তুলছে।

কাজকর্মের মধ্যে কাঁধের কাপড় পড়ে যায় একবার, সোনার হার বেরিয়ে টেমির আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। লহমার দেরি নয় সাহেব। মা-নিশিকালী সামনে এনে ধরেছেন, ছিঁড়ে নাও গাছের ফলের মতো।

মাদুরে বসেছিল সাহেব, তড়াক করে উঠে সেই ভাতের জায়গায় সোনার কাছে চলে গেল। হাত বাড়িয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বাঁ-হাতের ছোঁ মেরে ধরে ফেলে সাহেবের হাত। ধরে এই টান—কী টান রে বাবা, কত শক্তি ধরে এইটুকু মেয়ে, থানার সিপাহির কড়কড়ে মুঠোর চেয়ে শক্ত।

হকচকিয়ে সাহেব বলল, কী হচ্ছে?

পিঁড়ি দেখিয়ে সোনা হুকুমের সুরে বলে, বসে পড়ো। খাবে, অতিথি যে তুমি। অপর পিঁড়ির দিকে নির্দেশ করে ঘণ্টুকে বলে, তুইও বোস। দু'জনে খেয়ে নে তোরা।

কত বড় গিন্নি যেন! হাতা কেটে কেটে ডাল দিচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে ঘণ্টুকে বলে, ভাত বাড়া কেমন হয়েছে বললিনে যে ঘণ্টু? গোপলার মা-র চেয়ে ভাল কি না বল।

কৃপাময়ী মা-জননী। সারা দিন পেটে দানা পড়ে নি, সেই ব্যবস্থা জননী সকলের আগে করে দিলেন। পিঁড়ির উপর বসে সাহেব ভাত ভেঙে নিয়েছে। পিঁড়িতে বসে ভাত খায় নি কতদিন—কালীঘাট থেকে পালিয়ে বেরুল। নফরকেষ্টর সঙ্গে, তারপরে পিঁড়ি এই প্রথম। উঁহু, আর একবার—জুড়ানপুরে আশালতার বাপের বাড়ি। সেই বাড়ির মা পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন,

আশার বোন শান্তিলতা পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিয়েছিল। না না, আরও তো আছে। সুভদ্রা-বউ পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সামনে বসে খাওয়াত।

ভাত নয়, পাথরের কুচি যেন। গরুর মুখে দিলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সারা দিনের পর সেই ভাতই অমৃত সাহেবের কাছে। খেতে খেতে বুড়োমানুষ সাহেবের দুচোখে জলে ঝাপসা হয়ে আসে। গর্ভধারিণী মা গলা টিপে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, বংশীর বাড়ির বউরা খাওয়া বন্ধ করে পথে তাড়িয়ে দিল। তাই বলে জব্দটা কী করলি হারামজাদিরা! দুনিয়া জুড়ে আমার মা ছড়ানো। আশালতার বুড়ি মা ছিলেন, আবার একফোঁটা এই সোনা মেয়েটাও। মা হবার বাছ-বিছার নেই—হঠাৎ কোন একখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। বয়সেও ধরা যায় না।

ঘণ্টু বলে, তুই বসলিনে কেন সোনা?

পরে—

আবার পরে কেন? খিধে নেই?

বা রে, মেয়েলোক না আমি? মেয়েরা তো পরে খায়। খেয়ে ওঠ তোমরা আমি তার পরে।

কোন দিকে না তাকিয়ে সাহেব গবগব করে খেয়ে যাচ্ছে। নিরুপদ্রবে ভাত খাওয়া দস্তুরমতো বাবু হয়ে বসে। বলে, ডাল দে আর একটু।

সোনা নড়ে না। বিরক্তভাবে মুখ তুলে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। খাচ্ছে সে—থালা থেকে ভাত তুলে মুখে তোলা অবধি যাবতীয় প্রক্রিয়া সোনা নিষ্পলক চোখে দেখছে। ঘণ্টুরও তাই—নিজের খাওয়া ভুলে হাঁ করে সাহেবের দিকে তাকিয়ে। বড় আরামে খেয়ে যাচ্ছে, পরিমাণের তাই আন্দাজ করতে পারে নি। খাওয়াটা অসঙ্গত রকম বেশি হয়ে গেছে।

খাওয়া থামিয়ে সলজ্জে সাহেব বলে, এই যাঃ আমিই সমস্ত খেয়ে ফেললাম।

সোনা সকরুণ হেসে বলে, ডাল যা ছিল তোমায় দিয়েছি। আর চাইলে হবে না।

সাহেব, কি জানি কেন, হঠাৎ রেগে উঠল: কেন আমায় খেতে বসালি তবে? এ কি তোর মেনিবিড়াল সে চুক-চুক করে ডাকলি আধ-ঝিনুক দুধ পরিতোষ হয়ে খেয়ে চলে গেল। খেয়েছি, বেশ করেছি। আরও খাব, যতক্ষণ পেটে ধরে খেয়ে যাব।

বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিঁড়ি থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে মাদুরে গিয়ে বসল। ভাগ্যিস মুখ তুলেছিল, নইলে যা গতিক—একটি কণিকাও তো পড়ে থাকত না মেয়েটার জন্যে।

ঘণ্টুর খাওয়াও শেষ। এমনি সময় জোর বাতাস দিল। উঠানের আমতলায় টুপটাপ টুপটাপ আম পড়ে একঝাঁক।

ঘণ্টু ছটফট করে: তলায় অনেক আম পড়ে আছে, সেই সন্ধ্যে থেকে পড়ছে। সোনা যে ভয় পায়—সেই জন্যে দুয়োর খুলতে পারিনি।

সে ভয় কোন অতীতের কথা। আগন্তুক নতুন মানুষের সামনে ভীরু অপবাদ সোনা ঘাড় পেতে নেবে কেন? মুখের ভাত ক'টা গিলে ফেলে সোনা তাড়াতাড়ি বলে, ভয় আমার না তোর?

বেটাছেলে—আমার নাকি ভয়! বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ঘণ্টু সাহেবকেই সাক্ষি মানল: বলে কি শোন। দেখাই তা হলে—একলাই গিয়ে কুড়িয়ে আনি, দাঁড়াতে হবে না। এ তো ঘরের উঠোন—একা একা বড়বাগ পর্যন্ত গিয়ে আম কুড়োতে পারি।

দরজার কবাট আলগা করে দিল দু-দিকে। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। তিড়িং করে ঘণ্টু দাওয়ায় পড়ল। সেখান থেকে উঠানে। পেয়েছে আম কয়েকটা। আরও খুঁজছে।

সোনা একেবারে একা। এইবারে সাহেব নিজমূর্তি ধরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, মজা বুঝুক সাহেব-চোরকে ঘরে ডেকে আনার। কিন্তু একলা আছে বলেই কাজে ঝাঁপ দিতে হবে, তার মানেটা কি! না হয় দু'জনই হল—মেয়েটা আর ছেলেটা। দুটো ছেলেমানুষকে কায়দা করতে পারব না, সত্যিই কি এমন দশা আজ আমার? ক্ষিধের অন্ন সামনে নিয়ে বসেছে, খাওয়ার মধ্যে ভণ্ডুল দিতে নেই। অতি-বড় শত্রু হলেও নয়। মেয়েটার গলার হার ধরতে গেলে হাতের মধ্যেই এসে রয়েছে। থালার ভাত ক'টা শেষ হতে দাও, পলকের মধ্যে ছিঁড়ে নিয়ে বেরুবো।

উল্টে সাহেব অভিভাবকের মতো ঘণ্টুকে ডাকাডাকি করছে: এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরছে। ঘরে আয়। উড়ো-কাল এখন, সাপখোপ জন্তু-জানোয়ার বেরোয়। সাপ না হল, চেলা-বিছেয় তো কামড়াতে পারে।

সোনাও ডাকছে, যা পেয়েছিস নিয়ে চলে আয়। সকালবেলা দুজনে মিলে ভালো করে কুড়োব।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে—যায় কোথা রে সোনা? বাইরে কোথাও নয়—তক্তাপোশের বিছানা থেকে ছোট্ট বালিশটা নিয়ে ঝুপ করে সাহেবের মাদুরে শুয়ে পড়ল। ঘুম ধরেছে বুঝি—না, কি? কচি তুলতুলে হাত একটা এসে পড়েছে সাহেবের কোলে। গলার হার গায়ে ফুটছে। মা-কালীই তো করাচ্ছেন সোনাকে দিয়ে—হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে আলস্য, হার সেজন্য গায়ের উপরে

লেপটে ধরেছেন। গিনিসোনার জিনিস—লকেটে দামি পাথর বসানো। সাহেবের গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু হল কি বল তো, হাত একেবারে অসাড় ! পা খোঁড়া, হাত দুটোও কি নুলো হয়ে গেল বুড়ো হয়ে ? কী সর্বনাশ !

মেয়েটা আবদার করে : গল্প বলো একটা। মামামণির কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমরা ঘুমোই।

ভারি মজা তো ! গল্প না হলে মহারানীর ঘুম হবে না—বকবক করে চালাও এবারে গল্প। সাহেব-চোর গল্প বলার লোক, এমন আজগুবি কথা কোনদিন কেউ ভাবেনি। সাহেব নিজেও না। মা-মরা মেয়ে বলে মাতুলমশায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে। ইচ্ছে করে ত থাপ্পড় কষে গল্প শোনার শখ ঘুচিয়ে দেয়।

-করে ঠিক বিপরীত। সাহেব হেন মানুষের কণ্ঠে স্বর যতদূর মোলায়েম করা সম্ভব, তেমনিভাবে বলে, কিসের গল্প শুনবি ?

সোনা বলে, ভূতের—

ঘণ্টু ছুটে এসে সাহেবের গা ঘেঁসে ওপাশে শুয়ে পড়ল। সোনাকে তাড়া দিয়ে ওঠে : রাত্তিবেলা ওসব কি ? বাঘের গল্প হবে।

সোনাও ছাড়বার পাত্র নয় : বাঘের তো নামই করে না কেউ রাত্তিরে। চরে ফিরে বেড়ায়—নাম করলে ভাবে, ডাকছে বুঝি কেউ। ঘরের মধ্যে চলে আসে। তবে তুমি চোরের গল্প করো—

চোরও তো মনে ভাবতে পারে—

সাহেব ভাবছিল, আজেবাজে গল্পে হুঁ-হাঁ দিতে দিতে এখুনি ঘুমিয়ে যাবে, নির্গোলে কাজ সেরে বেরুবে তখন। চোরের নামে চমকে উঠল।

ঘণ্টু বলছে, চোরও ভাবতে পারে তাকে ডাকছে। ঘরে ঢুকে পড়বে। রাত্তিরবেলা চোরেও তো চরেফিরে বেড়ায়।

এইবার সাহেব বলবার কথা পেয়ে যায়। বেজার মুখে বলে, হুঁ, চরতে দিল আর কি ! সে এককালে ছিল বটে ! এখন বিশ হাত অন্তর থানা, পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারের উপরে দফাদার।

বলে কী ফ্যাসাদে পড়ল। চোখ বুঁজে ছিল সোনা—কৌতূহলে চোখ মেলে বলে, আমায় দেখাবে চোর ? কি রকম দেখতে তারা—বাঘের মতন, সাপের মতন ?

বলেছে মেয়েটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। বুকে হেঁটে সিঁধের গর্তের ভিতর দিয়ে চোর ঘরে উঠল—তখন সে সাপ বই আর কি ! বাড়ির লোকে টের পেয়ে হৈ-হৈ করে বেরিয়েছে—নিরুপায় চোর হঠাৎ তখন বাঘ হয়ে হামলা দিয়ে

পড়ে। আরও আছে। পালাচ্ছে চোর—দৌড় দৌড়! চোর এবার হরিণ। দৌড়ে গিয়ে ঝপ্‌পাস করে গাঙে পড়ল, জোয়ারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। চোর এবারে কুমির। ভবসংসারে যত জন্তু-জানোয়ার, সমস্ত মিলেমিশে তবেই এই একটা চোর।

ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে সোনা। হঠাৎ সোজাসুজি প্রশ্ন: তুমি কে?

সাহেবের মুখ শুকাল। কাঠগড়ার আসামি যেন উকিলের জেরায় পড়েছে। চটপট মিথ্যে আত্মপরিচয় বানিয়ে কত কত জায়গায় বেঁচে এসেছে, রক্ষে নেই আজকের এই একফোঁটা মেয়ের কাছে। কথা বেরোয় না মুখে, আমতা-আমতা করছে: আমি, আমি—

মেয়েটাই আবার উদ্ধার করে দিল। হাসছে ফিক-ফিক করে। বলে, ঘণ্টু বলেছিল ভূত। ভূত মানুষের রূপ ধরে আসে—তাই বলে কি এমন খাসা মানুষ! ঘণ্টু বোকা—না?

ঘণ্টু বলে, আর তুই বললি দেবতা। শুধু-মানুষই বা কেন হবে না?

তর্কে পারবে সোনার সঙ্গে! বলে, মানুষ হয়েও দেবতা বুঝি হওয়া যায় না। ওঁরা সব কি ছিলেন শুনি?

বেড়ার গায়ে নানান ছবি আঠা দিয়ে আঁটা। কীর্তি এই দুজনেরই। ছবি নিয়েছে রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে—রামের হরধনুভঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুন, এমনি সব। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবিও এর মধ্যে। আঙুল তুলে সোনা সেইসব দেখিয়ে দিল।

আরে সর্বনাশ, মনে মনে সাহেব শতেক বার জিভ কাটে। সাহেবের কথার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে এঁদের সব দেখায়। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল সাহেবের। জীবন মারগুতোন কত খেয়েছে, তাতে এমন হয়নি। মারের কষ্ট এতদূর নয়। রানীর ফাইফরমাস জোগান দিয়ে ছেলেবেলায় দিন কয়েক দেবতা হয়েছিল। কোন নির্নিরীক্ষ স্থানের আসল-দেবতা মহাপাপীকে সেদিন বুঝি অভিশাপ দিলেন—বুড়োবয়সে মরতে বসেও এখনো শাপমুক্তি ঘটেনি।

তবে দেখ্‌, কেমনধারা এই দেবতা! দেবতার লীলাখেলা মনের মধ্যে চিরজন্ম গাঁথা হয়ে থাকবে। শুয়ে পড়েছে সোনা একেবারে গায়ের উপর, হাঁ করে কথা শুনছে, হাত এগিয়ে গলার হার সাহেব শক্ত মুঠোয় ধরেছে—

খোলা দরজায় সেই সময় মানুষ ঢুকে পড়ল। নাটকীয় আবির্ভাব! ঘণ্টু ধড়মড় করে উঠে বলে, দাদু—। সোনা এক কাণ্ড করে—গলার হার খুলে চক্ষের পলকে মাদুরের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

সাহেব পাথর হয়ে গেছে। চিনতে মুহূর্তকাল দেরি হয় না—মধুসূদন।

আশালতার ভাই—জুড়ানপুরের সত্যসন্ধ গোঁয়ার মানুষটা। ন্যায়ের নামে অঞ্চল সুদ্ধ যে লড়ে বেড়াত। কপালের উপর সেই আঘাতের দাগ, যাকে বলে জয়তিলক। সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি বয়স, দেহ নুয়ে পড়েছে। কিন্তু রাজার রাজমুকুটের মতো কপালের ক্ষত হাজার মানুষের মধ্যে আলাদা করে চিনিয়ে দিচ্ছে।

মধুস্থদন তাকিয়ে পড়ে সাহেবের দিকে। সাহেব নির্ভয়। কতক্ষণেরই বা দেখা সেই রেল কামরার মধ্যে! বছর ধরে দেখা থাকলেও আজ চিনত না। নতুন বয়স তখন—যে দেহরূপ ছিল, জ্বলেপুড়ে তার চিহ্নমাত্র অবশেষ নেই। বলিরেখা সারা মুখে জাল বুনে রাত্রি-জাগা কাহিনীগুলো অবোধ্য অক্ষরে লিখে দিয়েছে। তার উপরে আকণ্ঠ চুল-দাড়ি। যে বিধাতাপুরুষ এত যত্নে গড়েপিঠে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত সাহেবকে আজ চিনতে পারবেন না। দেখুক মধুস্থদন যতক্ষণ খুশি। সুধামুখী বেঁচে থাকলে চেহারা দেখে সে-ও বোধকরি চিনত না।

মধুস্থদন বলে, কে তুমি? ঘণ্টুর দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে: কে রে?

ঘণ্টুর আগে সোনা-ই গড়গড় বলে, ভয় করছিল মামামণি। ইনি যাচ্ছিলেন, ডাকাডাকি করে নিয়ে এলাম। বড্ড ভালো। কত সব গল্প হল এতক্ষণ ধরে।

যা-কিছু বলা উচিত, সোনা একাই কেমন গুছিয়েগাছিয়ে বলে যায়। ঘণ্টু বলে, এত দেরি করলে কেন দাদু?

বিয়ের কাজকর্ম বাবুদের বাড়ি। আজকে তবু তো আসতে পেরেছি—কাল বউভাত, কাল আর ছেড়ে দেবে না।

তারপর মধুস্থদন বলে, খেয়েছিস তোরা?

ঘণ্টু বলে, ডাল নেমে গেছে, সেই সময়টা গোপলার খবর এলো—

বলতে বলতে আরও কি বলে বসে—বোকা ঘণ্টুকে বিশ্বাস নেই—নিজেরা না খেয়ে অতিথি খাইয়েছে, বেরিয়ে না পড়ে কথাটা। সোনা আগ বাড়িয়ে বেশি বেশি করে বলে, খেয়ে পেট টনটন করছে মামামণি। শুয়েই পড়লাম খাওয়ার চোটে।

ভয়ানক রকম খেয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় ঢেকুরও তুলল একটা।

সাহেব উঠে পড়ল। দাওয়ায় নেমে বলে, তোমার মামামণি এসে গেছেন, যাচ্ছি এবারে সোনা।

আজেবাজে কথায় কাজ নষ্ট করে এলো। নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছে করে সাহেবের। তবে একটা মুনাফা, ভাত খেয়ে এসেছে—পিঁড়ি পেতে বাবু হয়ে

পরিতৃপ্তির ভাত হাওয়া। খাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে মা-কালীর উদ্দেশ্যে তার চিরকালের অনুযোগ জানায়ঃ পরমায়ু শেষ হয়ে আসে, সাচ্চা-মন্দ তবু হতে দিলে না। সত্যপথের পথিক মধুসূদন, অসতের সঙ্গে চিরকাল লড়ে বেড়ায়। তার দুর্গতির মনে বোঝা যায়—এখন কষ্ট, পরিণামে স্বর্গসুখ। কিন্তু আমার কি—ইহকালে এই হেনস্থা, পরলোকের জন্য যমদূত তো মুকিয়েই আছে। নাকের নিশ্বাসটুকু বন্ধ হলেই চুলের মুঠি ধরে কুম্ভীপাক-নরকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবে।

ছাব্বিশ

আজকে হল না তো কাল—কাল রাত্রে সুনিশ্চিত। মধুসূদন কাল ঘরে ফিরবে না, ধীরেসুস্থে কাজ করতে পারবে। সমস্তটা দিন সাহেব, ঠিক কানাই-ডাঙা গাঁয়ের উপর না হয়ে, এদিক-সেদিক ঘুরল। জুড়নপুরের বাস ছেড়ে মধুসূদন অনেক দিন এখানে ঘর বেঁধেছে—খোঁজখবর পেতে অসুবিধা নেই। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি এক কাঠাও নেই এখন, মামলা মোকদ্দমায় গেছে। শত্রুকে লোকে অভিশাপ দেয়, ঘরে যেন মামলা ঢোকে—জুড়নপুর থাকতে মধুসূদন ফৌজদারির ফৌজদারি লড়ে বেড়িয়েছে। তার উপরে যমের মার—ছেলে ছেলের-বউ তিন দিনের আগপাছ বসন্ত রোগে মারা গেল। স্ত্রী আর একফোঁটা নাতিটাকে নিয়ে পেটের দায়ে অবশেষে এইখানেএসে কাজ নিয়েছে—গাঙ্গুলিদের গোমস্তাগিরি। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে ন্যায়ধর্মের খ্যাতিটা সদর অবধি ছাড়িয়েছিল, পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি ডেকে তাকে কাজটা দিল। দুঃখের আরো আছে স্ত্রী মারা গেল বছর কয়েক পরে, এসে জুটল অনাথ ভাগনীটা। হবে না হবে না করে আশালতার বেশি বয়সের মেয়ে—ঐ সোনা। সাহেবের মতোই সোনা মায়ের মুখ দেখেনি, প্রসব হতে গিয়ে আশালতা মারা গেল। শঙ্করানন্দ বিবাগী হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘোরে, শ্মশানে শবসাধনা করে এমনও শোনা যায়।

পরের সন্ধ্যায় সাহেব তাড়াতাড়ি বলে এসেছে। গৌরচন্দ্রিকা নয়, চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়বে।

ঘণ্টু বলে, গোপলার মা আছে, সোনার আজ ভয় করবে না।

শুকনো মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাহেব বলে, কই গোপলার মা, কোথায় সে?

ছ্যাৎছোৎ করছে রান্নাঘরে, শুনতে পাও না? রাঁধছে।

দেখতে পেয়ে সোনা ছুটে এসে হাত জড়িয়ে ধরেঃ কাল শুধু ডাল-ভাত

খেয়ে গেছে, খাবে কিন্তু আজ। মামামণি আসবে না, অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প করব।

সেকালে সেই আশালতার মা ছোট্ট নাতনিটির মধ্যে যেন কথা বলে উঠলেন। খাওয়ানোর জন্যে তিনিও আঁকুপাকু করেছিলেন একদিন। কিন্তু যে কাজে এসেছে—সোনার গলা যে খালি!

ব্যাকুল হয়ে বলে, হার কি হল তোর?

সোনা বলে, হার পরে আমায় ভাল দেখাচ্ছিল না? বলো তুমি—

খুব ভালো। যেন রাজকন্যে—

মিছাও বড় নয়। রূপবতী বলে থাকি আমরা শুধু একটা মেয়ে ধরেই নয় —সে মেয়ের গায়ে গয়না পরনের কাপড়চোপড় পায়ের আলতা কপালের টিপ একসঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে। ঝুটো-মাকড়ি পরেই বা রানীর কী বাহার খুলত। সব মেয়েরই তাই।

সাহেব বলে, হার খুলে রাখতে গেলি কেন রে? না-ই পারবি তো গয়না কিসের!

মুখ ম্লান করে আশালতার মেয়ে বলে, হার আমার নয়। মামামণি পরশুদিন এনেছে, ঔখানে রেখে দিয়েছে।

বাঁশের খুঁটির উপরটা দেখায়। খুঁটির খোলে যখন তুলে রাখছে, পিটপিট করে আমি দেখে নিলাম। ঘণ্টু গাছে চড়তে পারে, কাল ঐ খুঁটিতে উঠে পেড়ে দিয়েছিল। আর দেবে না, বজ্জাতি করছে আজ।

ঘণ্টু বলে, টের পেলে দাদু মেরে ফেলবে। কাল তো ধরেই ফেলত আর একটু হলে। তাড়াতাড়ি মাদুরের তলে গুঁজে দিল। তবু আক্কেল হয় না।

সোনা কাকুতিমিনতি করে: আজকে তো আসবেই না মামামণি। একটিবার দে। উনি এত ভাল বলছেন, হার পরে দেখিই না একটু আয়নায়। তক্ষুনি আবার খুলে দেবো। বিষ্ণের কিরে—এই বকুলতলায় বসে দিব্যি করছি।

ঘণ্টু গুম হয়ে আছে। সোনা তখন সাহেবকে বলে, তুমি উঠতে পারো না? দেখো, পড়ে যেও না আবার—

দেহ জীর্ণ, পা খোঁড়া—তবু কাজের মধ্যে আর এক মূর্তি। লম্ফ দিয়ে সাহেব উঠে গেল উপরে। হাতের মুঠোয় লকেটসুদ্ধ হার। একশ টাকা কি—দাম তিন-চারশ'র নিচে নয়।

দুয়োর খোলা, বেরিয়ে পড়লেই হয় এবার। কিন্তু গলা বাড়িয়ে আছে অবোধ মেয়েটা। মেয়ে আশালতার—অনেক কাল আগে যার যৌবন-ভরা দেহ বঞ্চনা করে গয়না খুলে খুলে নিয়েছিল। চোর হয়ে গয়না কেবল খুলে খুলেই

নিলে সাহেব, চোখ বোঁজবার আগে একজন কাউকে পরিয়ে দেখবে না! হায় রে হায়, সাহেব-চোরেরও সাধ!

হার পরিয়ে সত্যি সত্যি সুন্দর দেখায় সোনাকে। আশালতা ছিল নিশি-রাত্তের ঘুমন্ত মেয়ে, তার মেয়ে সাঁজের বেলা হার গলায় পরে আয়নায় দেখছে। আর এক ছোট্ট মেয়ের মুখ মনে এলো—পোশাকের দোকানে মোমের পুতুলের মতো বড় ঘরের মেয়েটা, সঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার মতো তার মা। নফরকেষ্টর হাতের খেলায় পছন্দর জামা খুলে দিতে হল মেয়ের গা থেকে। বড়দের বেলা আটকায় না, ছোটমানুষের গায়ের জিনিস খোলা বড় কঠিন কাজ।

আজও করতে হত তাই। সাহেব নিশ্চয় করত। কিন্তু মা-কালী বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন।

মধুসূদন রাত্রের মধ্যে ফিরবে না· এরই মধ্যে এসে পড়ল। আগেপিছে বোধকরি গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ--কোমরে দড়ি বেঁধে হৈ-হৈ করে তাকে নিয়ে এলো। দস্তুরমতো মারধোর হয়েছে—মুখের একটা দিক ফুলে চোখ একেবারে ঢেকে গিয়েছে। কপালের পুরানো দাগটার নিচে। যৌবনে চৌকিদার ঠেঙানোর ঐ দাগ—অন্তিম বয়সে না-জানি কোন অন্যায় রুখতে গিয়ে আবার নতুন জয়-পতাকা জুটিয়ে আনল।

সেই মূর্তি দেখে সোনা ডুকরে কেঁদে মামামণির দিকে ছুটে যায়। গাঙ্গুলি বাড়ির ছোটবাবু অনন্ত পুরোবর্তী। সে ধমক দিয়ে উঠল: এইও তফাত যা—সরে যা—

ফণা-তোলা সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে। ভীষণ এক বাচ্চা-গোখরো।

কেন বেঁধেছে আমার মামামণিকে? দড়ি খোল কষ্ট হচ্ছে—

ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনা মধুসূদনের উপর। দড়ি ধরে টানাটানি করে: খুলে দাও, খুলে দাও। গরু-ছাগলের মতো কি জন্যে মামামণিকে বেঁধে আনবে?

অনন্ত খিঁচিয়ে ওঠে: চোর-ছ্যাচোড়কে বাঁধবে না তো ফুলের মালা পরিয়ে পূজো করবে?

চোর!

যেন চাবুক খেয়ে সোনা পিছিয়ে আসে। খানিকটা সরে এসে সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে চায়। যেন এক নতুন মানুষ দেখছে। অনতিস্ফুটকণ্ঠে বলে, চোর মামামণি?

ভিড়ের থেকে কে যেন বলল, না না, এ মানুষ চুরি করবে, তাই কখনো হয়! ভিতরে অন্য-কিছু আছে।

অনন্ত বলে, আমিও তাই ভেবেছিলাম। অন্য সবাইকে সন্দেহ করেছি—

যে মানুষ অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে, তার কথা মনে আসে কি করে? কিন্তু আমার আড়াই বছরের মেয়ে দেখিয়ে দিল—সে তো আর মিছে কথা বলবে না। হাকিমের সামনে আইডেন্টিফিকেশন-প্যারেড হয়, তেমনি ব্যাপার আমাদের বাড়ি। পরে অবশ্য নিজেও স্বীকার করল—অভাবে পড়ে নাকি করে ফেলেছে।

স্বীকারটা কি ভাবে করল, মুখের উপরেই তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। এত মানুষের ভিতর বোধ করি কিছু লজ্জা হয়েছে অনন্তর। বলে, ভাল বংশের একজন মুরুব্বি-মানুষ— তাঁর কাণ্ড দেখে মেজাজ থাকে না। অভাবের কথা আমাদের বললেই হত, মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিতাম। তাই অসৎপথে মতি যাবে—ছিঃ-ছিঃ

বলছে অন্য কেউ নয়, খুলনা কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি। ভিড়ের লোকেরাও যা মুখে আসে বলছে। ভণ্ড পামরের উপর সকলেরই জাতক্রোধ (নিজের প্রতিচ্ছবি পায় বলে নাকি?)।

সোনার পলক পড়ে না, একদৃষ্টে চোর দেখছে। কই, চোর হয়েও এক তিল বদল হয়নি মামামণি। মুখের দিকে অবোধ করুণ চোখদুটো তুলে আবার প্রশ্ন করে: মামামণি, তুমি চোর?

চোরাই-মালের খোঁজে তোলপাড় ওদিকে। মধুসূদন খুঁটির মাথা দেখিয়ে দিয়েছে, নেই সে বস্তু। বারবার হুঙ্কার দিচ্ছে অনন্ত: কোথায় বের করো শিগগির। ঘরের জিনিসপত্র তচনছ করছে, রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভাঙছে। বস্তায় চাল ছিল চাট্টি—উঠানে ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

সোনা হঠাৎ অনন্তর কাছে ছুটে গিয়ে পড়ে। দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, কাতর দৃষ্টি মেলে কেঁদে কেঁদে বলে, মামামণি চোর নয়। ওদের বলে দাও ছোটবাবু, মামার বাঁধন খুলে দিক।

কাপড়ের নিচের হার খপ করে এঁটে ধরে অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে: এই যে—দেখ তোমরা। আড়াইবছুরে মেয়ে আমায় ঠিক ঠিক চোর ধরিয়ে দিল। এই সে জিনিস।

সাহেব ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমতলা পার হয়ে ঝোপের ভিতরে চলে যায়। কয়েক পা গিয়েই বিল। খুশি মতন আ'লের আড়ালে বসে পড়লে, মানুষ কোন ছার, যমদূতেও খুঁজে পায় না। কিন্তু পা দুটো কে যেন আটকে দিল। এই বীরত্বের আসরে কথাবার্তা কেউ খাটো গলায় বলছে না। চোরের নামে মধুসূদনের যে উৎকট ঘৃণা! ট্রেনের কামরায় সেই কথাগুলো: চোরের অল্পস্বল্প শাস্তি নয়—ফাঁসি লটকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সেই মানুষটা নিজেই আজ চোর হয়ে যাচ্ছে!

হার হাতে নিয়ে অনন্ত গর্জায় : লকেটে নাম লেখা আছে, এই দেখ। আমার মেয়ের হার চুরি করে ভাগনির গলায় পরানো হয়েছে।

সাহেব এসে বলে, পেন্নাম হই গাঙ্গুলিমশায়। ও হার আমি পরিয়ে দিয়েছি। বল্‌রে সোনা, কে পেরিয়েছে। সত্যি কথা বলবি। সাহেব আমি। নাম শোননি ?

[মা-কালী, মন্দ হবার জন্য ছোট বয়স থেকে মাথা খুঁড়ছি—দুনিয়া জুড়ে সকলের ভাল করে বেড়াচ্ছ, আমার বেলা মন্দটুকুও সরল না তোমার !]

জরায় জীর্ণ বুকের উপর থাবা মেরে সাহেব বলে, আমি সাহেব-চোর। কাজখানা দেখেও বুঝল না কেউ ?

সোনার দিকে চেয়ে হেসে বলে. চোর দেখতে চেয়েছিলে খুকি, দেখে নাও। চোখ বড় বড় করে দেখ। এত বড় চোর তল্লাটে আর নেই।

জনতার আক্রোশ ফেটে পড়ে। মাথা ঘুরে সাহেব পড়ে যায়। মসীময় করাল স্রোত—ধাক্কা মেরে যেন তার মধ্যে ফেলে দিল। বিশ্বসংসার ডুবে গেছে সেই আবর্তে। তীরের বেগে সাহেব ভেসে চলল। অন্ধকারের সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে লহমার মধ্যে। সাহেব আঁকুপাকু করে। মরলে হবে না—যমদূত সেখানেও ডাণ্ডস নিয়ে তৈরি। সে নাকি আরও নিদারুণ ! বাঁচাতেই হবে, না বাঁচলে রক্ষা নেই।

যেন বাতাসে খবর হয়ে গেল, সাহেব-চোরকে ধরে গাঙ্গুলি-বাড়ি নিয়ে আটক করেছে। যজ্ঞিবাড়ি এমনিই বিস্তর লোক, এখন লোকারণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলে মধুসূদনের পক্ষে। ন্যায়ের জন্য জীবন দেয় মানুষটা, কপালের উপর সেই জয়তিলক বয়ে বেড়াচ্ছে—নির্যাতনের চোটে কী একটা কথা বলল, সেইটেই মেনে নিতে হবে !

অনন্ত বলেছে, মধুবাবু ছাড়া কাছাকাছি অন্য কেউ আসেনি, আমি বিশেষ খোঁজখবর নিয়েছি—

বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত চটে গিয়ে বলেন, মধুসূদন না হয়ে আমি যদি কাছাকাছি থাকতাম, আমাকেও ঠেঙাতে ঐ রকম ?

লজ্জিত অনন্ত বলে, মধুবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ো না দাদা। পঁচিশটা টাকা দিয়ে দেব। মলম-টলম লাগিয়ে দু-দিনে ঘা সেরে নেবেন।

এমনি সময় নমিতা বেরিয়ে এলো। আহ্নিকে বসেছিল, সেজন্য দেরি। সরে গিয়ে সকলে পথ করে দেয়। বয়সে প্রৌঢ়া হয়ে শুচিবাই আরও বেড়েছে, বকের মতন লম্বা পা ফেলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে দাঁড়াল। গাঙ্গুলিবাড়ির

সম্ভ্রম বিবেচনা করে বুদ্ধিমান অনন্ত প্রেমপত্র ও গয়নার ব্যাপার চেপে গিয়েছিল সেবার। বাড়ির মধ্যে গোপন তর্জন-গর্জন হয়ে থাকবে, বাইরে কিছুই প্রকাশ নেই।

নমিতার চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে : মাগো মা, কী সাংঘাতিক চোর মচ্ছবের বাড়ি ঢুকে টিপিটিপি কাজ সেরে পালাল, কারো একটিবার চোখে পড়ল না।

সাহেব প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ খুলে নমিতাকে দেখে। টিপিটিপি আরও যে একদিন ঢুকেছিলাম পুণ্যবতী ঠাকরুন, চিনতে পারো না? চোখে ধারা গড়িয়েছিল, পা ধরতে যাচ্ছিলে, ধর্মবাপ বলেছিল।

কিন্তু দুই ঠোঁট একত্র করে দাঁতে দাঁত চেপে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। ভালোরা ভালোই থেকে যান—দাগি মানুষ আমরা সজ্জনদের কলঙ্কের দাগ ভাগ করে নেবো। ভালো তো সবাই—যতক্ষণ না ধরা পড়ে যাচ্ছে। সে ধরা ক-জনেই বা পড়ে!

জনতার ভালো লোকেরা শাস্তির নানান রকম পন্থা বলছে। কেউ বলে, আর এক-পা খোঁড়া করে হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে নুলো করে ছেড়ে দাও।

অন্য জনে জুড়ে দিল : তারপর বস্তায় পুরে ডাঙা-মুলুকে ফেলে দিয়ে এসো। বেড়াল যেমন বাড়ি থেকে বিদায় করে।

চোরের উপর আক্রোশ সর্বজনার। আর এক ভালো লোক বলে, ডাঙা-মুলুক জ্বালিয়েপুড়িয়ে মারবে, নুলো করে দিয়ে ঠেকাবে না। বস্তায় মুখ বেঁধে মাঝগাঙে ফেলে দিয়ে এসো, শাস্তি!

কোন যুক্তি খাটল না। চোরের কপালটা ভালো। থানার ছোটদারোগা পাশের গাঁয়ে তদন্তে এসেছিল, সাহেব-চোরের কথা শুনে নাম কেনবার লোভে দলবল নিয়ে এসে পড়ল। খাতা বের করে সকলের মুকাবেলা নাম-ধাম-বিবরণ লিখে নিচ্ছে।

নাম কি তোর?

গণেশচন্দ্র পাল—

সাকিন?

সাহেব চুপ করে থাকে। একটু যেন হাসির ঝিলিক মুখের উপরে।

সাকিন বলিস না কেন রে? ভাল চাস যদি ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যা।

সাহেব বলে, একটা সাকিন পাকা আছে হুজুর, সেই মাত্র জানি। এখানে নয়, ওপারে গিয়ে। কুম্ভীপাক-নরক। দুনিয়ার উপর আমার কোন সাকিন নেই।

কি লিখে নিল দারোগা, কে জানে। লিখে সাক্ষিদের সই নেওয়া হল।

কাজ চুকিয়ে, আসামি নিয়ে চলে যাচ্ছে এবার। নমিতা কি কাজে একটু ভিতর দিকে গিয়েছিল, ছুটে এসে পড়েঃ খাওয়া হল না যে!

দারোগা একগাল হেসে বলে, ব্যস্ত হতে হবে না। আপনাদেরই তো খাচ্ছি। তদন্তে যেখানে গিয়েছিলাম, তারা ছাড়ল না। গলায় গলায় হচ্ছে। নেমতন্ন তোলা রইল দিদি, আর একদিন এসে হবে।

নমিতা বলে, আপনার না হল দারোগাবাবু, এ মানুষ যে উপোসি। বাড়িতে বউভাত, নতুন বউ জনে জনের পাতে ভাত দিয়ে বেড়াল—

চোরের পাতেও ভাত দেবেন নাকি?

আবদারের সুরে নমিতা বলে, আপনাকে একটু বসতেই হবে। একমুঠো না খাইয়ে আমি ছাড়তে পারব না।

চোখ বুঁজে সাহেব দেয়াল ঠেস দিয়েছিল, চকিতে চোখ মেলে তাকায়। দুশ্চারিণী ভণ্ড স্ত্রীলোকটির কণ্ঠের মধ্যেও আশালতার মা কথা বলে উঠলেন। যেন সুধামুখীর গলা, বউঠান সুভদ্রার গলা। বলাধিকারীকে মনে পড়ে অনেক দিনের পর। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীকে দেখেছেন, কাজলীবালাকে দেখেছেন, হৃদমুদ্দ নিজেও চেষ্টা করছেন। একদিন বুঝি বড় হতাশ হয়েই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলঃ মানুষ জাতটারই দোষ রে! চেষ্টা যতই করো, মন্দ হবার জো নেই। সুধামুখীর ঘরে ঠাণ্ডাবাবুও নাকি এমনি সব বলতেনঃ অমৃতের পুত্র—মরতে সবাই গররাজি।

উৎসব-বাড়ির পেট্রোমাক্স আলোয় তাকিয়ে দেখল, নমিতার বড় বড় চোখের সজল দৃষ্টি তার উপরে। মারের চোটে ঝিম হয়েছিল সাহেব, স্ফূর্তি পেয়ে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভালোর অভিশাপ একলা তার উপরেই নয়। এ জীবন বিস্তর ভালো চোখে পড়েছে। যাদের দেখেনি তাদের মধ্যেও কত না-জানি রয়েছে। দেখে যাদের মন্দ ভেবেছে—তিলকপুরের মন্দাঠাকরুন যেমন—আজকে মনে হচ্ছে, ঢং দেখিয়ে তারা মন্দ সেজে বেড়ায়। দায়ের মুখে ভালো মূর্তিটা বেরিয়ে পড়বে। অমৃতের বেটা-বেটি সব, ভালো না হয়ে উপায় আছে? মানুষ যতকাল আছে, জাতের স্বধর্ম বয়ে বেড়াতে হবে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

(ভ্রমণ কাহিনী)

[প্রথম খণ্ড]

রচনাকাল ঃ আশ্বিন, ১৩৬৩

উৎসর্গ

আমার মা বিধুমুখী বসুর স্মৃতিতে—
দূর-বিদেশে অনেক অসহায় মুহূর্তে
আবার আমি যাঁর শিশু হয়ে যেতাম

॥ এক ॥

চীন দেখে এসেছি, রাশিয়ায় চললাম। এই দেখুন, বিসমোল্লায় গলদ।
রাশিয়া বলি কেন, রাশিয়া আর কতটুকু জায়গা, যাচ্ছি সোবিয়েত দেশে। ষোল শরিকের একান্নবর্তী দেশ; সবাই সমান তেজীয়ান—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। একান্নবর্তী আছেন নিজ নিজ সুবিধা বিবেচনায়; বনি-বনাও না হলে পৃথক হতে বাধা নেই। রাশিয়া-হলেন সেই ষোলর একটি। এই সব বড় শরিক ছাড়াও মেজো ছোট রকম-বেরকমের বৃত্তিভোগীরা রয়েছেন। বিজ্ঞজনদের ধরুন, জলের মতন বস্তুটা জিলিপির মতন প্যাঁচ খেলিয়ে খেলিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

বিস্তর খবর শুনেছেন রাশিয়া সম্বন্ধে। আপনি বলে কেন, পাঁচ বছরের শিশুটা অবধি বুকনি ছাড়ে। উভয় তরফই পণ ধরে আছেন—আপনি কানে ছিপি আঁটলেও তাঁরা না শুনিয়ে ছাড়বেন না। গাঁটের পয়সায় বই কাগজ ছেপে বিশ্বজন হিতায় বাড়ি বাড়ি পাঠাচ্ছেন—তার পাঁচটা উনুনধরানো কর্মে আত্মদান করেও একটা অন্তত যদি নজর সুমুখে হাজির হয়। লোহার পর্দায় নাকি দেশটি ঘেরা, ভিতরে রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা। চীন দেখে এসে আমার কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। আহা, দেখেই আসি না কেন—কোন্ সব জীবজন্তু নরমূর্তিতে ওথায় বিচরণ করছে। মোলাকাত করে আসি।

আর সেই যেমন হয়ে আসছে—যেটা ভাবব, ঘুরে ফিরে তাই কিনা ঘটে যাবে। আমার এক দৈত্য তাঁবেদার আছে, বুঝলেন। আলাদিনের যেমনটা ছিল। অহরহ সে হুকুম তামিল করে বেড়ায়। হুকুমটা আবার মুখ ফুটেও বলতে হয় না, মনে মনে মতলব করলেই হল। রাগও হয় এই নিয়ে। আরে দূর, হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, এবং দু-চার ঘটি চোখের পানি বিহনে জীবন নিতান্তই আলুনি। ওগুলোও চাই।

যাকগে, যাকগে। ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হয়ে গেল। 'চীন দেখে এলাম' বইদুটো পড়লেন নাকি? গল্প-উপন্যাস নয়—পড়তেই হবে, এমন-কিছু নয়। ধরে নিচ্ছি, আপনার ভবনে এই সব আজেবাজে বইয়ের ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। অতএব কিঞ্চিৎ ফলাও করে বলতে হবে। পড়তে মন না হয় তো বাদ দিয়ে যান। উপন্যাসের ভিতরে প্রাকৃতিক বর্ণনা অথবা মনোবিশ্লেষণ এসে পড়লে যেমন করে থাকেন।

পিকিনের সম্মেলনে সোভিয়েত থেকে ওজনদার এক দল গিয়েছিল। দলনেতা অ্যানিসিমভ জঁাদরেল পণ্ডিত—এবং কি আশ্চর্য, লেখকও। লেখাপড়া জানলে তো লিখতে পারে না। কিন্তু একাধারে দুধ খায় তামাকও খায়—সেই মানুষটা দেখলাম। দোস্তি জমে গেল আঁচরে। সেটা যে ঠোঁটে বুলানো হাসির দোস্তি নয়—মালুম হল মস্কোয় ওদের খাস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ক'দিনই বা দেখা, কিন্তু পুরোপুরি মনে রেখেছেন। কথাবার্তাগুলোও। সেইসব বলতে লাগলেন। একটা জিনিসই চেপে গেলেন শুধু। অথবা ভুলে মেরেছেন। কিন্তু যেহেতু নিমন্ত্রণের ব্যাপার—উনি ভুললেও তো আমরা ভুলতে পারিনে।

তলস্তয়ের কথা উঠেছিল সেবারে পিকিন হোটেলে আলোচনার মধ্যে। দাবি তুললাম, তলস্তয় ব্যক্তিটি শুধুমাত্র আপনাদের ষোলআনা নন; আমাদেরও হিস্যা রয়েছে। আমাদের ভালবাসার মানুষ। ১৮৫৭-য় অভ্যুত্থানের শোধ নিচ্ছে ধনবান সাহেব চুরানব্বুই জন সিপাহিকে গুলি করে মেরে—তলস্তয় লিখলেন ধন্য ঈশ্বর। কি এলেমদার বানিয়েছ ওদের, কেমন শান্তচিত্তে বিচার-বিবেচনা অন্তে চুরানব্বুইটা মানুষ খুন করছে। লিখলেন, দেখ দেখ কি তাজ্জব—ত্রিশ হাজার দুষ্ট বেনে বিশ কোটি সাহসী স্বাধীনতাকামীদের পায়ে পিষছে। ...দুর্দিনের এমন বন্ধুকে পর ভাবতে পারি?

বেশ তো, বেশ তো—অ্যানিসিমভ চালাও নিমন্ত্রণ কর দল সঙ্গে সঙ্গে। একশ' পঁচিশ বছর পুরো হচ্ছে তলস্তয়ের। জাঁকিয়ে উৎসব হবে। কাণ্ডটা হল সাহিত্যিকদের—দুনিয়ার এখানে-সেখানে যত আমরা কলমধারী আছি, তলস্তয়ের নামে, আসুন, এক জায়গায় মিলে ফুর্তি-ফার্তি করি। ভারত থেকে অনেক জনকে চাই।

প্রস্তাব মাত্রেই কামরায় সমবেত সমুদয় মস্তক একসঙ্গে কাত হয়ে সমস্বরে সাধু সাধু রব দিয়ে উঠল। দেশেঘরে ফিরেছি, তখনও ঐ নিমন্ত্রণ আবার ঘুরছে। কাগজ দেখে একদা লাফিয়ে উঠলাম—সিকি ইঞ্চির সংবাদ বেরিয়েছে, তলস্তয়-উৎসবের জন্য কমিটি বানানো হল। আর কি, পাশপোর্টের জোগাড় দেখতে হয় এবার। আমার আন্তর্জাতিক পাশপোর্টে ইউ. এস. এস. আর.—চারটি মাত্র অক্ষর ঢুকিয়ে দেওয়া। কর্তাদের বেশি খাটনি হবে না।

কিন্তু নিরীহ ঐ চারটি অক্ষর লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে গেলেই না কি শঙ্খ-শূল-গদা চক্র। ওরা বরঞ্চ যমালয়ের ছাড়পত্র দেবেন, রাশিয়ার নয়। যতেক ভালমানুষ লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়ে ফিরে আসে।

দপ্তরের জন্য তত আমার তাড়া নেই, রাশিয়াটা আগে। জনৈক ঘড়েল ব্যক্তিকে ধরলাম। তিনি বুদ্ধি দিলেন, শুধো-দরখাস্তে হবে না হে। উপর-তলায় ঘুরতে হবে; অমুককে গিয়ে ধরো।

বলে তো দিলেন। কিন্তু আমি এক গোত্রছাড়া মানুষ—রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘর-বারাণ্ডা গোলকধাঁধা আমার কাছে; কাকে ধরলে কি হয়, এই তত্ত্বে নিতান্ত আনাড়ি। কোন পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াই উপরতলার উক্ত মহামান্যটির সামনে? সাহিত্যিক বলতে ওঁরা কয়েকটিকে চেনেন, দরবারে যাঁদের নিয়মিত হাজিরা। তাঁরা দায়েবেদায়ে কবিতা লেখেন, বক্তৃতা ছাড়েন। নিতান্তই গোনাগুনতি, লিস্টিভুক্ত—পশ্চিম-বঙ্গের সরকারি বার্ষিক রিপোর্টে* সেই ক'টি নাম পাবেন। সেই লিষ্টির শেষে একটা 'ইত্যাদি'ও নেই যে তার মধ্যে আন্দাজে মাথা ঢুকিয়ে সরকার-জানিত বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ নেবো।

এমনিতরো তা-না না-না করে দু-পা এগিয়ে দেড় পা পেছিয়ে—যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়লাম অবশেষে একদিন। কি বলব, মানুষ সব এমন ভাল! জাঁদরেল অফিসার—লোকে কত রকম ভয়-দেখানো কথা বলে—মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

রাশিয়ায় যাবেন, নেমন্তন্ন এলো নাকি?

আসব-আসব করছে। ঝামেলাগুলো চুকিয়ে দিন। এলেই যাতে চাদরটা কাঁধে ফেলে—থুড়ি, পাশপোর্টটা পকেটে পুরে, বেরিতে পড়তে পারি।

দরখাস্ত করে দিনগে, হয়ে যাবে। আপনারা যাবেন—এতে আর কথা কি!

অভয় পেয়ে দরখাস্ত ছাড়লাম। এক মাস যায়, দু-মাস যায়। সেই ঘড়েল মশায় বললেন, হয়ে যাবে বলেছে—কবে হবে, দিনক্ষণ ধরে তো বলে দেয় নি! লাল-ফিতের গাঁট ছাড়াতে অমন এক-জন্ম দু-জন্ম কাবার হয়ে যায়।

পুনশ্চ অতএব রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেওয়া গেল। এবারে অত উঁচু হিমালয়-চূড়ায় নয়—মাঝ বরাবর, ধরুন বন্ধ্যাশৃঙ্গে।

হাঁ-না একটা কিছু বলে দিন মশায়। জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে কত কাল রাখবেন?

বিজ্ঞমশায় বললেন, পাশপোর্ট কবে হয়ে আছে! রা কাড়ছেন না দেখে আমরাই খবর দেবো ভাবছিলাম। বসুন, নিয়ে যান।

পাশপোর্ট বাক্সবন্দি করে উদ্বেগ বেড়ে গেল। চিঠি আসে-আসে, তবু আসে না। দেশঘরে যেন জল-বিছুটি মারছে, ডাক পিওনের পাগড়ি দেখলেই মন আকাশের প্লেন ধরতে ওড়ে। এলো অবশেষে নিমন্ত্রণের চিঠি নয়, অন্য এক খবর—স্ট্যালিনের মৃত্যু।

স্ট্যালিনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মতলব বানচাল হল। অনেক ব্যবস্থা উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। ভলস্তয়ের উৎসবটাও একরকম নমো-নমো করে সারল নিজ দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার যে হাত কামড়ানোর অবস্থা! ঘরে বসে দিনের পর দিন যাচ্ছে। পাশপোর্টের মেয়াদ কমছে। মেয়াদ কমছে জীবনেরও। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি হুকুমের দৈত্যবর? যা ভাবি, তা আর ঘটে কই?

হেন কালে কানে এলো দাওয়াত এসেছে সোবিয়েত থেকে। এটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ—যার নাম হল ভোক্স্-ভারতের গুণীজ্ঞানীদের দেশ দেখতে ডেকেছেন। মানুষ বাছাই করছেন ভারত সোবিয়েত সংস্কৃতি-সমিতি। পশ্চিম-বংলায় তার শাখা আছে—এখানকার ভাগে ফেলেছে চার জন। শাখাধীশরা তেড়েফুঁড়ে চারের জায়গায় একেবারে পুরো ডজন নাম পাঠিয়ে বসলেন। এবং অধমের নাম এগারো নম্বরে। গুণ নেই জ্ঞান নেই—এবং এ দুটো না হলেও অনুকল্পে যা দিয়ে কাজ চলে, ধনও নেই। এর অধিক অতএব কি করে সম্ভবে? গতিক দাঁড়াচ্ছে এখন, আমার উপরের অন্তত ছয় ব্যক্তির যাওয়া পণ্ড হবে কোন না কোন গতিকে। এই ধরুন, অসুখ করল কারো, কিম্বা ছেলে (বা ছেলের মা) কাঁদছে ভীষণ ভাবে, অথবা পাশপোর্ট মিলল না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবেই আমার ডাক পড়বে। এতজনের ব্যাপারে যুগপৎ এত উৎপাত—পাপ কলিযুগে ইচ্ছাশক্তির উপর এতদূর ভরসা রাখা যায় না। পাশপোর্ট অতএব বাক্সবন্দি থাকুক যথারীতি—নাড়াচাড়া করবার গরজ দেখিনে।

কী তাজ্জব! বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লই শেষ অবধি। একচক্ষু হরিণ কিনা, ও পথটা নজরে আসেনি। শাখারা যা করবার করলেন, বম্বের কেন্দ্রীয় দপ্তর তদুপরি সারা ভারত থেকে ন'টি প্রাণী বাছাই করে নিলেন। অধম তার ভিতরে। অত দূরে কি করে নাম পৌঁছে গেছে—কেউ বলে থাকবে, লোকটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই লিখলেও চীনের বই দুটো হাই তুলতে তুলতে কোন গতিকে শেষ করা যায়। দাও পাঠিয়ে তবে, দেখা যাক—সোবিয়েত নিয়েই বা কি লেখে।

প্রাতঃকালে দুই বন্ধু এসে খবর দিলেন, গাঁটরি বাঁধুন—মাঝে আর কয়েকটা দিন মাত্র। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গরম জামা বানাও শীত ঠেকাবার জন্য, মোটাসোটা খাতা বাঁধিয়ে নাও লেখায় ভরাট করে এনে ভালমানুষ পাঠকদের জ্বালাতন করবার জন্য। সকলের চেয়ে দরকারি বস্তু—মাথায় মাখবার তিলের তেল। নারিকেল তেল নিয়ে গিয়ে পিকিনে কী জব্দ! গরম করে গালিয়ে মাথায় ঢালতে না ঢালতে জমে আবার কাঠ হয়ে যায়। আর মস্কো-লেনিন-

গ্রামের শীত, যা শুনেছি, পিকিনের পিতামহ।

ট্রেনে দিল্লি। চার বন্ধনন্দন চলেছি একসঙ্গে। আমি ছাড়া বাকি তিনজন ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার—জ্ঞান মজুমদার, দাঁতের ডাক্তার—অরুণ গাঙ্গুলি আর একজন নিতান্তই কাগুজে ডাক্তার, একটা ফোড়া কাটারও বিদ্যে নেই। সেই মহাশয় হলেন—ধীরেন সেন।

[ডায়েরি]

রেলগাড়ি—রাত্রি ১১ টা।

ছুটছি। বর্ধমান পার হয়ে এসেছি। আর তিনজন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—কোদালে কুড়ালে মেঘ বলে আমাদের পাড়া-গাঁয়ে। দু-পাঁচটা তারা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারারা ছুটছে। ছাড়বে না আমায়, কিছুতে ছেড়ে দেবে না। দেশ-দেশান্তর চলেছি, ওরাও ছুটল সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ এই রাত্রিটুকু আছে। নিষ্ঠুর নিষুপ্ত পৃথিবীতে আজকে আমার কেউ নেই ঐ তারা কয়টি ছাড়া।

ছোট্ট বয়সে তারা দেখতাম। এক তারা ন্যারাব্যারা, দুই তারা পথহারা, তিন তারা আপশোস, চার তারায় নেই দোষ···তারপর, তারা দেখিনে আর। শহরের ইঁটের স্তূপের আড়ালে কখন তারা ওঠে, কাজের মানুষ আমরা—ফুরসত কখন তারা দেখে সময় নষ্ট করবার? আজকে এই অনেক দূর চলেছি—প্রতিটি মিনিটে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে নিজভূমি ও চেনা মানুষদের সঙ্গে। ছোট্ট বয়সটা সঙ্কুচিত হয়ে রেলের কামরার আধা-অন্ধকারে যেন প্রবীণ গণ্যমান্য মানুষটিকে চুপি-চুপি একটুখানি দেখতে এসেছে।

রেললাইনের ধারে ধারে জল জমে আছে, ম্লান জ্যোৎস্নায় নজরে আসছে। গাছের ছায়া পড়েছে জলে। আর দূরবিস্তৃত ধানবন। ঝোপেঝাপে-ঢাকা ঘরবাড়ি পলক না ফেলতে পার হয়ে যাচ্ছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে তারা আশা-উল্লাস দুঃখ-ব্যথা ভুলে গিয়ে রাত্রির এই মধ্যযামে। আবার চিরকালের-চেনা মানুষগুলির ঘরের পাশ দিয়ে নতুন দেশে চললাম। যাচ্ছি ভাই, সেই তাদের সঙ্গেও একটু চেনা-পরিচয় করে আসি।

স্টেশন মাঝে মাঝে। সাঁক-সাঁক করে পার হয়ে যাচ্ছি। জোরালো আলো সেই সময়টুকু। আবার ঘোলা-ঘোলা জোৎস্না। আজ আমি বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রাণ পরিপূর্ণ করে মাঠ-ঘাট, ধানবন, ঘর-বাড়ি, জল-আকাশ, আকাশের তারা দেখে নিচ্ছি।

কয়লার দেশে এসে গেলাম। বড়বড় চোঙা, কপিকল, পাহাড়ের মতন কয়লার স্তূপ···

পরদিন, বেলা ১১টা।

ভারতবর্ষকে চোখের উপর দেখতে দেখতে যাচ্ছি। চাষী চাষ করছে। খোলার ঘরের গ্রাম—ঘরের পাশে গরু শুয়ে আলস্যে জাবর কাটছে। গাছের ছায়ায় কাটা-ধান স্তূপাকার করে রেখেছে। শাখাবিস্তারী ছত্রছায় আমবাগান। অড়হর-ক্ষেত, ক্ষেতে হলুদ ফুলের সাগর। মহিষ দৌড়চ্ছে—ন্যাংটো ছেলে দৌড়চ্ছে তার পিছু-পিছু। তীরগতিতে ছুটেছে রেলগাড়ি, ডায়েরির লেখা বড্ড ট্যারাবাঁকা হচ্ছে। স্টেশনের নামটাও পড়ে দিতে পারলাম না, হুশ করে এমনি ভাবে বেরিয়ে গেল। বড় দীঘি স্টেশনের পার্শে, ছেলেমেয়েরা স্নান করছে, জলে ঝাঁপাচ্ছে। ভেড়ার পাল। গঙ্গা ডানদিকে—হঠাৎ একবার বর্ষার গঙ্গার রূপালি জলধারা ঝিকমিকিয়ে উঠল। ভোল পাল্টে গেছে চারিদিক-কার। জোয়ার আর অড়হরের ক্ষেত। চাষীদের মাথায় পাগড়ি। এক-মানুষ দেড়-মানুষ-সমান কাশের বন।

আমার কামরার অপর তিন সহযাত্রী বিবিধ বিতর্কে মেতেছেন। বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁরা—মানুষের অধিগত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় শাখায় তাঁদের বিচরণ। তাঁরা বাঁ-দিকে—আর ডাইনে গাড়ির জানালার ওপারে ভারতের লক্ষকোটির সাধারণ দিনগত জীবনযাত্রা। একদিন আমিও অমনি কত সহজ ছিলাম, তাই ভাবি। গাছের ছায়ায় পথ-চলতি মানুষেরা বসে বসে জিরোচ্ছে, ধুলোর মধ্যে আমিও কতদিন পা অমনি করে ছড়িয়ে বসেছি। আজকে আলাদা, ওরা সব তটস্থ হয়ে উঠবে আমি কাছাকাছি গেলে। ধুথুবু ভদ্রলোক হয়ে যাবে। অনেক দূর চলেছি—পৃথিবীর এক দূর-প্রান্তে। আরও যাব কোথায় না জানি একদিন—মহাব্যোম বায়ুভূত হয়ে ঘুরব না কি করব! তারই পয়লা কিস্তি হল শহরবাসী ও গণ্যমান্য হয়ে গিয়ে মানুষজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। একেবারে সমস্ত ছেড়ে যাবার প্রাথমিক ভূমিকা।

এলাহাবাদ স্টেশনে ভারী দরের অনেকের সঙ্গে দেখা, এক ট্রেনে যাচ্ছি। বিধু সেনগুপ্ত, আনন্দবাজারের অশোককুমার সরকার,—প্ল্যাটফরমের উপরেই বিজয়ার কোলাকুলি। অরুণ গুহ মহাশয়ও যাচ্ছেন—আমাদের বিস্তর ভাল-বাসার অরুণদা।

ঠিক দুপুরবেলা। গ্রামের পর গ্রাম ছুটছে পিছন মুখো। এবারে পোড়ো-ভূমি, পলাশবন। ন্যাড়া-বটগাছ মাঝখানে। ছাগলের পাল চরছে। কাঠের ঝাঁটি কাঁধে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে রেলগাড়ির দিকে চেয়ে—গলায় বাহারের রূপার হাঁসুলি।

ভিতরে নানান আলোচনা তুমুল হয়ে উঠেছে—বেদ-উপনিষদ, দেশি-বিদেশি দর্শন, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি......আর ওদিকে আমতলায় ছোট্ট একটুকু কবর, খানাখন্দ, অজস্র নিমগাছের জঙ্গল। কয়েকটি গ্রামবৃদ্ধ ছাতা নিয়ে চলেছে কোন দিকে; ঝাঁকা মাথায় জনকয়েক গল্পগুজব করছে। বক উড়ছে ধানবনের উপর দিয়ে। লাইনের ধারে ঝিলের জলে কুমুদবন—মুদিত কুমুদরা মাথা জাগিয়ে আছে, জল দেখবার জো নেই। এদিকে ওদিকে বাবলা-বন, বট, কত রকমের ঝোপঝাড়। সমস্ত হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গিয়ে অনেক—অনেক দূরের ডোঙাঘাটা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে—পাকিস্তানের ভিতরে এখন বাংলাদেশে ছোট্ট গ্রামটি—আমার বাল্য-কৈশোর আজও সেখানে এলোমেলো ছড়ানো আছে।

॥ দুই ॥

দিল্লী অনেক দূর। দূর বলেই ভাঁওতা দিয়ে কিঞ্চিৎ পশার জমিয়েছি ঐ জায়গায়। এবেলা-ওবেলা নেমতন্ন, সন্ধ্যে হলেই মীটিং। রাজধানীর মানুষ কী ভালোমানুষ গো? সাহিত্যের নামেই গলে যান, ভ্রূ কুঁচকে কষ্টিপাথরে দর ঠুকতে বসেন না।

ওখানে সন্তোষ ঘোষ থাকেন, যাঁর লেখায় আপনারা মশগুল। সন্তোষ ছোট ভাইয়ের মতন, দিল্লি গেলে অনেক সময় ওখানেই আস্তানা। আস্তানা এমন অনেক জনেরই। যত মানুষের ঝামেলা বাড়ে, বউমা'টির স্ফূর্তি বেড়ে যায় ততই। খেটে খেটে খেটে সুখ করে নেন। এবার আমায় ঘোরতর দাবড়ি দিয়েছেন। একটা দিন মাত্র আছেন—খবরদার কোনখানে নেমতন্ন নেবেন না। নিলেও যাওয়া হবে না, স্পষ্ট কথা।

তবু রেহাই হল না। সোবিয়েত এমব্যাসি সন্ধ্যের পর ডেকেছেন, যাত্রামুখে একসঙ্গে স্ফূর্তিফার্তি হবে। দিল্লীর ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি-সমিতি এদিকে রাস্তার আধখানা জুড়ে মেরাপ বেঁধেছেন, অধমদের চায়ে বসিয়ে দিয়ে সেই ঝোঁকে গোটা পাঁচ-সাত বক্তৃতা শোনাবেন। কোন দায়টা এড়ানো চলে বলুন। ভোর থেকে বিষম হুটোপাটি। যাও মার্কারি-ট্রাভেলস্‌—কাবুলে দলসুদ্ধ চালান করবার যাঁরা ভার নিয়েছেন। ক'টার সময় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সঠিক অন্ধিসন্ধি জেনে এসো। ঠিক দুপুরে একবার মীটিংয়ে যেতে হবে নেতা ও উপনেতা বাছাইয়ের জন্য। মানুষ ঠিকই আছে—কার প্রস্তাব কোন ব্যক্তির সমর্থন কতক্ষণ সময়ে অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠবে, আগাগোড়া পাকাপাকি ছকে ফেলা আছে। তবু নিয়মরাক্ষিক হাজির হয়ে একটিবার ঘাড় নেড়ে

আশা। ঘাড় না নাড়তে চান, চুপ করে বসে থাকবেন—তবে হাজিরাটা চাই।

ইতিমধ্যে নিখুঁত এক ফর্দ হয়ে গেছে, দূর-বিদেশে আর কোন কোন বস্তু দরকার পড়বে আমার। পেন্সিল তো অতি অবশ্য চাই—আকাশের অনেক উপরে উঠলে কলমের মুখে ভলকে ভলকে কালি বেরোয়, পেন্সিল তখন অগতির গতি। সন্তোষ বলল, সে হবে তার খরচে। অতএব পাঠকসজ্জনদের এই যে খোঁচা-খুঁচি করছি, পাপের ভাগ তারও আছে—পেন্সিল-অস্ত্রটার সেই যোগান দিয়েছে।

দেবদাস পাঠক মহোৎসাহে ফর্দ নিয়ে বেরুল। দিল্লির যাবতীয় পথঘাট তার নখদর্পণে। আমার একারই শুধু নয়—ওরা কাশ্মীরে যাচ্ছে তার টুকি-টাকি জিনিস আছে, গৃহস্থের ফরমায়েসও আছে দুটো একটা। কেনাকাটা সুবিধা দরেই হল বটে—বটে—পেন্সিলে দু-পয়সা কম, মোজায় এক আনা। টাঙায় রিক্সায় ট্রামে টাকা তিনেকের মতো ব্যয় করে নয়াদিল্লি-পুরানো-দিল্লির সকল মহল্লা ঘুরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এক প্রহর রাত্রে সওদা এনে ফেলল—তা কম নয়, আনা পাঁচ-ছয় মুনাফা করে এসেছে মোটমাট। করিৎকর্মা ছেলে—এত কষ্ট করে এসেও তিলেক বিশ্রাম নয়। জিনিসপত্র গোছাতে লেগে গেল। গুছিয়েও ফেলল চক্ষের নিমিষে। কাবুলে রাত্রিবেলার হিমে ঠোঁটে একটু ক্রিম ঘসব, পেঁটরা খুলে দেখি,—না, জিনিষ গোনাগুনতি ঠিকই দিয়েছে, ক্রিমের বদলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বউমার সিঁদুরকৌটা।

শেষ রাতে রওনা। তখন মোটর মেলে না—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের একটা গাড়িতে এরোড্রোম যাত্রার বন্দোবস্ত হল। ঐ কাগজের পল্লন্দা এডিটার হলেন ধীরেন সেন—তাঁকে তুলে নেবো আত্মীয়ের বাসা থেকে। ঘুম যদি না ভাঙে, তজ্জন্য হরেক ব্যবস্থা। ঘড়িতে এ্যালার্ম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কল কব্জার কথা বলা যায় না—সে ঘড়ি ধরুন আজকের রাতে বাজল না। ঘড়ি ছাড়া মানুষও তখন জন পাঁচ-সাত সমকণ্ঠে ভরসা দিলেন, কোন চিন্তা নেই—ঠিক সময়ে তাঁরা তুলে দেবেন। গাড়ির ড্রাইভার বললেন, শেষ রাতের কাগজ নিয়ে স্টেশনে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ, ঘাবড়াবেন না। চারটের কি বলছেন—বলেন তো একেবারে বারোটায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে যাই। সন্তোষ নাইট-ডিউটি নিয়ে নিয়েছে। বলে, বেয়ারা পাঠিয়ে দেবো—শিকল ঝনঝনিয়ে জাগিয়ে তুলবে। তার পরে আমি তো এসে যাচ্ছি ঠিক সময়ে।

বারান্দায় শুয়েছি। রাস্তা খানিকটা দূরে। লনের মাথার উপরে আকাশ-ভরা তারা ঝিকমিক করছে।...

ধড়মড় করে উঠে বসলাম এক সময়। সর্বনাশ! সকাল হয়ে গেছে যে। উঁকি দিয়ে দেখি, যাঁরা অভয় দিয়েছিলেন, সমতালে নাসাগর্জন চলেছে তাঁদের। কোথায় সন্তোষের বেয়ারা, কোথায় বা স্টেশনে কাগজ পৌঁছানোর ড্রাইভার! কাচের জানালা ভেদ করে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসের অগণ্য আলো আর রোটারি মেশিনে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে শুধু। ঘড়িটাও, যা ভাবা গিয়েছিল, মওকা বুঝে ধর্মঘট করেছে, বেশ একখানা ঝাঁকুনি দেয়া দরকার। আরে আরে কি কাণ্ড। মোটে যে এখন আড়াইটে।

তা উঠে পড়েছি যখন, গোছগাছ করে নিই। নিশিরাত্রি এবং কনকনে শীত হলেও দিনমানের স্নানটা চুকিয়ে নিই। পা টিপে টিপে চোরের মতো স্নানঘরে গেলাম—বউমা'টি জেগে ওঠেন। বেরিয়ে এসে দেখি, যে ভয় করেছিলাম—গুদের ঝিরঝিরানিতে বউমা চোখ মুছতে মুছতে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে গরম গরম লুচির বন্দোবস্তে বসে গেছেন।

খেয়ে-দেয়ে মাথার চামড়ায় চিরুনি বুলিয়ে জামাজুতো পরে পা দোলাচ্ছি, তখন একে একে সব উদয় হচ্ছেন। শিকল বাজিয়ে উঠল সন্তোষের বেয়ারা! ড্রাইভার ও গাড়ির যুগপৎ গর্জন উঠল নিচে থেকে। ওবাড়ির শচীন ঘোষ এলেন। সাইকেলে মাছওয়ালারা এসে উষালোকে রকমারি মাছের নাম শোনাতে লাগল। ডিউটি সেরে স্বয়ং সন্তোষ তারপর এসে পড়ল।

আমি যাব এরোড্রোম অবধি।

কী দরকার! রাত জেগে কষ্ট করে এল—

তাই ভোরের হাওয়ারই দরকার।

ঘরের ভিতরের নাসাগুলো সহসা নিস্তব্ধ। কর্তব্যে সজাগ হয়ে তাঁদের একজন বলে উঠলেন, উঠুন, উঠে পড়ুন—যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বলি, ঘুমোন, ঘুমিয়ে পড়ুন—ঠিক যেমনটা ছিলেন। শব্দ-সাড়ায় বাচ্চারা জেগে উঠলে যাওয়ার দেরি পড়ে যাবে।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। নির্জন পথ, হুশ করে এক-আধটা মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে কদাচিৎ। আলো একটা এখানে, একটা ওখানে—তারাই পাহারাদার। জনমানব নেই কোন দিকে। কোজাগরী পূর্ণিমা—জোৎস্নায় চতুর্দিক হাসছে। তার মধ্যে মৃদু গর্জনে ছুটছে আমাদের গাড়ি। এ রূপ দেখা হয় না কোনদিন—রাজধানীর এমন রূপ ক'জন দেখেছে!

এরোড্রোমে পৌঁছলাম, তখনও সকাল হয়নি। একে দুয়ে দলের সব এসে জুটছেন। ভাড়া-করা প্লেন, দশ-বিশ মিনিটে দেরাদুন ফেলে পালাবে না—

জেনেবুঝে চা-টা খেয়ে ঢুলকি চালে আসছেন তাঁরা। রওনায় তাই কিঞ্চিৎ দেরি হল। কাস্টমসে রীতরক্ষার মতো একটু চোখ বুলিয়ে নিল। ছবি তুলছে; গলায় মালার উপর মালা চড়াচ্ছে। পয়লা সারিতে গিয়ে বসেছি আমি। হাতে কলম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সকলে। তা দেখুনগে —ওতে লজ্জা নেই, আমার এই জাতব্যবসা।

উল্লাস-ধ্বনির মধ্য দিয়েও প্লেনের দরজা এঁটে দিল। খাঁচার ইঁদুর এখন। কাঁচের আড়াল থেকে লোকজনের বিদায়-অভিনন্দন দেখছি। প্রপেলারের তিন সুদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে প্লেন খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। অতি ভয়ানক রকম গর্জাচ্ছে—কাঁপছে থর-থর করে। ছুটল খানিকটা পাগলের মতো। তার পরে হুশ করে আকাশে উঠে পড়ল।

সফাদরজং প্রাচীন মহিমা নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে সেটা বিলীন হয়ে গেল। বিশাল দিল্লি শহর এখন মাত্র সাদা সাদা কতকগুলো স্তূপ। জমির উপর খানিকটা করে চুন ঢেলে দিয়েছে যেন। তার পরে জঙ্গল—পাহাড় মাথা বাড়িয়েছে জঙ্গল থেকে। দিল্লি যে পাহাড়ের উপর, আকাশে উঠলেই সেটা ভাল করে মালুম হয়।

পাহাড় গেল তো মাঠ—মাঠের আর শেষ নাই। এক একটা জায়গায় অনেকগুলো বাড়িঘর—যেন এটার ঘাড়ে ওটা, এমনিভাবে গাদা করে রেখেছে খালগুলো মাঠের এপার ওপার চিরে চিরে গেছে। এমনি অজস্র ধমনী-পথে ক্ষেতে ক্ষেতে জল সরবরাহ হয়। আঁকাবাঁকা বৃহৎ জলধারাও দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে। নদী ওগুলো।

যাচ্ছি এখন সাড়ে ছ-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। পাইলটের ঘর থেকে খবর এলো—লাহোর নামব পৌনে-ন'টায়। তার আগে বড়নালার উপর দিয়ে যাব ৭-৫৪ মিনিটে। আকাশে উঠে ভাবনা-চিন্তাও উঁচু দরের হয়ে ওঠে। পদতলে অনেক নিচের মাটি-অঞ্চলে মানুষ নামে একপ্রকার কীট কিলবিল করে বেড়ায়। ঐ দেখতে পাচ্ছেন তাদের গ্রাম—শতখানেক খেলাঘর ছটাক খানেক জায়গায় জড়ো করা। ঘর যাই হোক একটু চোখে দেখছেন, কিন্তু মানুষ নজরে আসবে না। ল্যাবরেটারির অণুবীক্ষণে বীজাণু দেখবার মতন করে দেখতে হবে। গুটি-গুটি রেলগাড়ি চলেছে শুঁয়োপোকার মতো। খেলনার লাইনের উপর যেন দম-দেওয়া গাড়ি।

বড়নালা এসে পড়ল। কি হিসাব করলে চাঁদ, দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল যে-সময় তোমরা লিখে জানিয়েছিলে। শহর ডান দিকে—ঝুঁকে পড়েছি, কিন্তু পলক না ফেলতে পার হয়ে চলে গেলাম। দেখবারই বা কি আছে?

অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘরবাড়ি—দালানকোঠা বেশির ভাগ—সকালের রোদ ঝিকমিক করছে, জ্যোতি বেরুচ্ছে। অভ্র যেন গাদা দিয়ে দিয়ে রেখেছে, তেমনি আমার চোখে লাগল।

লাহোর আর একটুখানি পথ, ঢিল ছুঁড়লে গিয়ে পড়ে—এই গতিক। ১০৫ মাইল মাত্র। একটু এগিয়ে জলাভূমি—এখানে-সেখানে বিস্তর জল জমে আছে। লম্বা লম্বা খাল জলাভূমি ফুঁড়ে জলাশয়ের দিকে চলে গেছে। উষর নিঃসীম মাঠের মধ্যে খাল যাচ্ছে দু-তীরে শ্যামল গালিচা বিছিয়ে দিয়ে।

উড়তে উড়তে আজ দেশের সমগ্র ছবি চোখের উপর এসে গেল। কাঠা চারেকের ছোট্ট বাড়িটুকু মাত্র নয়—এত বড় দেশ আমার, আমারই। ভাবতে আনন্দ লাগে, আকাশ-বিহার অন্তে যে ছোট্ট কুঁড়ের ভিতর আবার ঢুকে পড়ব, সেটা আমার সুবিশাল দেশের; শুধু মাত্র চার কাঠার মধ্যেই তার সীমা নির্দিষ্ট নয়। আজকের মানুষ আমরা পরম ভাগ্যে অনন্ত আকাশে পাখা মেলে উড়তে শিখেছি, উড়তে উড়তে আমি কত বড় দুনিয়ার মানুষ, মালুম পেয়ে যাই।

আঃ, দু-চোখ জুড়িয়ে গেল। এ কী শ্যামায়িত রূপ আমার দৃষ্টির সুদূর সীমানা জুড়ে। এক ফোঁটা নগ্ন মাটি দেখিনে কোথাও—ফসল আর ফসল। আর দেখছি জল। এখানে জল, ওখানে জল—দুরিৎ ফ্রেমে বাঁধাই চৌকো চৌকো কালো জল। নদীর উপর এসে পড়লাম—আঁকাবাঁকা বলেই বোঝা গেল, কাটা-খাল নয়—স্বাভাবিক নদী। বর্ষার জলৈশ্বর্যে ভরপুর হয়ে আছে। নদীর কূলে ঘরবাড়ি ছিটানো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। প্লেন হঠাৎ খুব নিচুতে চলে এলো। পাকিস্তানে ঢুকছি বোধ হয়। লাহোর দূরবর্তী নয়। শ্লিপ এলো—আর মাত্র পঁচিশ মাইল। সে তো নিতান্তই নস্যি।

আরও নিচু হয়েছে প্লেন—নদীর ধারে ধারে ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাভি নদী পার হলাম তবে—যার সাধু-নাম ইরাবতী। জলের মধ্যেই যেন বাড়ি-ঘর বসিয়ে দিয়েছে কতকগুলো। আরও—আরও নিচু। এরোড্রোম দেখা যায়। দু-পাশে উঁচু বাঁধ-দেওয়া লম্বা লম্বা খাল সোনালি-পাড় লাল শাড়ির মতন দেখাচ্ছে। বাংলা দেশের মতো খোড়ো-ঘর একটাও নেই, শুধু মাঠ-কোঠা। উপর থেকে দেখাচ্ছে বিশাল ধ্বংস স্তূপের মতো। বেল্ট বাঁধবার আলো ফুটল, নামব এবারে।

যাই বলুন, লাহোর এরোড্রোম দেখে ভক্তি হল না। নিতান্ত সাদামাঠা—অনেক গেঁয়ো এরোড্রোমেও এর চেয়ে ভাল বাড়ি, যাত্রীদের আসবাবপত্র। ব্রেক-ফাস্ট এখানে—মেটুলি চচ্চড়ি আণ্ডার পোচ ইত্যাদি শেষ করে নিরামিষ

চপে হাত বাড়িয়েছে, দিল্লির ডাক্তার প্রেমচাঁদ ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছেন : কি মশায়—উত্তর রকমই ? শ্রীমতী মদন হাসি-হাসি মুখে কণ্ঠস্বর করুণ করে বললেন, আমার নিরামিষ সমস্ত উনি খেয়ে নিচ্ছেন।

আমিষাশী বলেই নিরামিষ খাইবে—এটা ধরে নেবেন কেন ? শুধু আমিষে কে বাঁচতে পারে ? দুই রকমই চলে আমাদের।

চল্লিশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে, আবার আকাশে চড়ছি। এঁদের ঘড়ি আধ ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ বারোটা আধ ঘণ্টা আগে বাজবে আমাদের চেয়ে।

লাহোর শহর পেরিয়ে আবার মাঠ আর ছোট ছোট গ্রাম। মাঠ, মাঠ, মাঠ। পয়লা দলে ষোল জন চলেছি আমরা। প্লেনে এর বেশি জায়গা হল না। পরের দল দিল্লি পড়ে রইলেন, এই প্লেন ফিরে গিয়ে তাঁদের আনবে। গোড়ার সারিতে আমি—পিছনে তাকিয়ে দেখে নিই একবার। ভাব বদলেছে। উত্তম ভোজনের পর জন দুই-তিন ছাড়া সকলেই চোখ বুঁজেছেন। ফ্‌রৎ ফ্‌রৎ—নাসা শব্দও শ্রুত হচ্ছে। আমি বাদে বাকি পনের জনের তিরিশটা গহ্বরের ঠিক কোন কোণটা থেকে—সঠিক মালুম পাচ্ছিনে। খবরের কাগজে মুখ গুঁজে আছেন কেউ কেউ, একজন ডিটেকটিভ-নবেলে। পড়ছেন না ঘুমুচ্ছেন—কে বলবে ?

লম্বা পাড়ি, একেবারে কাবুল গিয়ে ভুঁই নেবো। দুর্গম পাহাড়ে ঠুকে আগে ভাগে পড়ে যাই তো আলাদা কথা। প্লেন উঁচু—আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। পাশের লোকটি বললেন, তাকিয়ে দেখুন—খাইবার-পাস গিয়ে পড়ব এখুনি। আর যা ভেবেছিলাম—কলমের কালি বেরিয়ে হাত কালিমাময় হয়ে উঠছে। লেখা চলবে না আর কলমে। আমিও তৈরি—সন্তোষের পেন্সিল বের করে নিয়েছি।

বড় মুশকিল হল তো ! রোদ ঝিকমিক করছে প্লেনের পাখার উপরে, নিচে কিন্তু ঘন কুয়াশা। চোখের দূরবীন চালিয়ে অশেষ কষ্টে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কঙ্করময় ভূমি। হরিদ্রাভ। গাছপাপালারও অমনি হলদে ভাব। কুয়াশার জন্য বোধ হয়।

চেয়ারটা নামিয়ে দিয়ে একটু তবে আরাম করা যাক। দিব্যি সবাই ঘুমুচ্ছিলেন—তারই মধ্যে কেমন করে যেন কায়দাটা দেখে নিয়ে তড়াক করে উঠে একে একে চেয়ার নামাচ্ছেন। মহানন্দে পুনশ্চ চোখ বুঁজলেন, একা আমিই কেবল চোখের দেখাগুলো টুকে টুকে যাচ্ছি। কি বিপদ, শেষ অবধি আমারও যে ঐ গতিক। চোখ ভেঙে আসছে—এক লাইন লিখছি তো ঘুমিয়ে নিচ্ছি কিল-সেকেণ্ড। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন—আলো নেই, মেঘ নেই,

জীবচিহ্ন নেই নিচের দিকে—একটানা প্রপেলারের আওয়াজ। লিখবারও নেই আর কিছু…

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাপ করুন আপনাদের গোলামের দশ মিনিটের এই গাফিলতি। দশ মিনিট মানে কিন্তু বিস্তর দূর। তার মধ্যে স্বপ্ন দেখছি আরও দূর-দূরান্তরের। স্বপ্ন কিম্বা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনা। ধীরেন সেন গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিলেন: খালি গায়ে আছেন—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। খালি গায়ে মানে কোট খুলে রেখে দিয়েছি, শুধু মাত্র গেঞ্জি ও শার্ট। সত্যিই শীত লাগছে। কোট গায়ে ঢুকিয়ে দেখলাম, কনকন করছে, ঠাণ্ডা ঢুকে গেছে ওর ভিতরে। সাড়ে-বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি ১৭২ মাইল বেগে। তখৎ-ই-সুলেমান ঐ দেখুন পায়ের নিচে। খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে এখন। অনেকেই উঠে এসে জানালায় ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছেন। আকাশে ঘুরে ঘুরে সুলুকসন্ধি সমস্ত আমার জানা—কোন সিট থেকে উত্তম দেখা যায়। নিজের জায়গায় হেলান দিয়ে বসে দিব্যি আমি দেখতে পাচ্ছি।

কুয়াশা কেটে গেছে, উজ্জ্বল রোদ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়। অধিত্যকায় এখানে আলো ওখানে ছায়া। আলো-আঁধারে রহস্যময় রূপ নিয়েছে আমার চারি দিকের দিগ্‌ব্যাপ্ত পর্বতমালা।

শীত বাড়ছে। গরম কোট-ট্রাউসারে মানাচ্ছে না এখন। উপরে—কত উপরে উঠেছি। উঠেই চলেছি। প্লেন বড় দুলছে। বে-অব-বেঙ্গলে একবার ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম। জাহাজের কী দুলুনি। তার সঙ্গে অবশ্য তুলনাই হয় না। তবু দেখি, অনেক জনের মুখ শুকিয়েছে।

দুই পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথরেখা। উঁহু, পথ কোথা—শুকনো জলপথ। নির্জলা পথ সাদা দেখাচ্ছে—হঠাৎ একদিন ঢল নামবে, বিলকুল সব কালো হয়ে যাবে। এখন দেখাচ্ছে, মাঠ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলার পথ পড়ে গেছে। খানিক খানিক কালো দেখাচ্ছে সাদার উপরে, সেটা হল সুদূর পর্বতের কোন ছায়া।

বড্ড দুলছে এখন, ডাইনে বাঁয়ে, উপর নিচে। লেখা চালানো মুশকিল। ভারি মজা লাগছে, পেন্সিল এবং পেন্সিলের সঙ্গে তাবৎ দায়িত্ব পকেটে পুরে এই বয়সে নাগরদোলা চড়ার সুখ উপভোগ করছি।

একবার ঢুকে পড়লাম পাইলটের ঘরে। দরজায় লেখা—'ক্রু মেম্বারস ওনলি'। কিন্তু উঁকিঝুঁকির রকম দেখে ওরা ডাকছেন, আসুন না, একে একে এসে দেখে যান।

তিন জন আছেন—দু-জন সামনের দিকে, কাচের আড়াল থেকে পথ নিরিখ করছেন। যে-সে কাচ নয়—আমরাও নজর চালিয়ে দেখলাম, চারি দিক একেবারে কুয়াশায় ঢেকে গেছে, অথবা অনেক উঁচুতে উঠায় দরুন সাদা চোখে নিচের মাটি দেখতে পাচ্ছিনে—তবু কিন্তু সুস্পষ্ট দেখা চলে ঐ কাচের ভিতর দিয়ে। একজন স্টিয়ারিং-চাকায় হাত দিয়ে আছেন, ঘুরোচ্ছেন একটু-আধটু, দ্বিতীয় জন ম্যাপের সঙ্গে হিসাব করে পথ মেলাচ্ছেন। তৃতীয় ব্যক্তি রেডিও-অপারেটার; বাইরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তাঁর বসবার জায়গায় কাঁচ দেওয়া নেই বাইরে তাকাবার। যন্ত্র কানে লাগিয়ে যেন ধ্যানে বসে আছেন তিনি।

কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করি, কোন জায়গায় এখন?

পাকিস্তানের চৌহদ্দির ভিতরে। সুলেমান রেঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছি।

খাইবার পাস?

যাবই না সেদিকে। হেসে বললেন সুলেমানের সিংহাসন ডিঙিয়ে যাবার তাগত হয়েছে—পর্বত কোথায় দয়া করে একটু আধটু গলিঘুঁজি ছেড়ে দিয়েছেন, সে খোঁজে গরজ কি আমাদের?

হিন্দুকুশে যাব কখন?

সেদিকে কেন যাব ঘুরতে?

তাই দেখলাম, সবজান্তারা কেবল ঘরে বসে নেই দলের সঙ্গেও দু-পাঁচটি বেরিয়ে এসেছেন। তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নখাগ্রে তাঁদের। দিল্লি থেকেই আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেছেন, মুখের সামনে দাঁড়াবে হেন শক্তি কোন দুঃসাহসীর?

পর্বতের মাঝে প্রশস্ত সমভূমির মতো দেখাচ্ছে। যৎকিঞ্চিৎ ফসলও ফলেছে। এখানে-ওখানে গোটাকয়েক ঘর—সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে গ্রাম ছুঁড়েছুঁড়ে দিয়েছে যেন আকাশ থেকে। উপজাতিদের বসতি। নিচে নেমে গিয়ে দেখুন না। দরজার বুকের উপর লুফে নেবে আপনাকে, অথবা বলা নেই কওয়া নেই বুলেট ছেঁদা করে দেবে আপনার বুক।

বিস্তর উঁচু পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ থেকে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পার হতে দেব না। তাই কি শুনি আমরা? আপনারা পাঠাচ্ছেন, আপনাদের শুভেচ্ছা রয়েছে পেছনে—গায়ে বল কত। এক লাফে উঠে পড়লাম চূড়ার উপর। কত উঁচুতে উঠেছি, আরও উঠছি। তবু মনে হচ্ছে পাহাড়ের গা ঘেঁসে যাচ্ছি, গড়িয়ে চলেছি পাহাড়ের উপরে। ভয় হয়—এই

বে ঃ লাগল বুঝি মা, সব সুদ্ধ তালগোল পাকিয়ে আগুনে জ্বলে পুড়ে পড়ে রইলাম এই অপরিজ্ঞাত দুরারোহ অঞ্চলে।

কিচ্ছু যে হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, এই যে লিখে লিখে জ্বালাতন করছি। পর্বত পার হয়ে এবারে সমভূমি—বিশাল এক জলপথ। প্লেনের বেগ কমেছে—এসে গেল বুঝি! জুতো-জোড়া খুলে আরাম করে বসেছিলাম, তাড়াতাড়ি পায়ে পরলাম। মতামতের জন্য একটা ছাপা কাগজ দিল হাতে ঃ কেমন লাগল ভ্রমণ? প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তা সত্ত্বেও ত্রুটি হতে পারে। ইঁটের ঢিল বা ফুলের তোড়া (brickbats boquets) —যা দেবেন খুশি মনে মাথা পেতে নেব।

পর্বতে আবার আটকে গেল। দুই পর্বতের ফাঁকে নদী; শহর নদীর উপরে। পেটি বাঁধবার লেখা ফুটল। অতএব যা ভেবেছি—কাবুল, ঐ যে শহর কাবুল। পাহাড়ের নানান গলিঘুঁজি পার হয়ে আবার ফাঁকায় এসে পড়লাম। জল জমে আছে চতুর্দিকে, কৃষিক্ষেত্র। অজস্র জনবসতি। পাহাড়ে ঘেরা একটুকু সমতল জায়গায় প্লেন নেমে পড়ল। কাবুল।

॥ তিন ॥

মাথায় কাবুলি টুপি দীর্ঘদেহ এক ব্যক্তি এয়ারফিল্ডে। কাবুলিওয়ালা শ্যাম বর্ণেরও হয় নাকি? কাছে এসে বাংলা কথা, আপনি ডাক্তার মজুমদার?

উঁহু, সাদামাটা বোস আমি। সামান্য ব্যক্তি।

নাম বলতে সমাদরে তিনি হাত জড়িয়ে ধরলেন। আপনাকে খুঁজছি। আমি গুপ্ত—অপূর্বভূষণ গুপ্ত। কে. এল. এম. বিমান-কোম্পানীর ম্যানেজার।

এই যে লিখে এত জ্বালাতন করি আপনাদের, দেখা গেল, এত দূরে কাবুল-এরোড্রোমেও সে পাপ গোপন নেই। বাংলা কাগজ এখানেও আসে —এমন হিমালয় পর্বতও পথ রুখতে পারে না। বাঙালি তো আড়াই ঘর— চীনের লেখাগুলো কিন্তু বরাবর এঁরা পড়ে এসেছেন। এবং এমন ক্ষমাশীল, গালমন্দ না করে তাজ্জব বচন ছাড়তে লাগলেন।

কাস্টমসে মাল ছাড়ানো হচ্ছে—খুঁজে দেখি, বইয়ের প্যাকেট লোপাট। অধমের লেখা কিছু বই যাচ্ছে মস্কোয়। পাখনা নাই থাক, বই কিন্তু দস্তুরমতো ওড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনার আলমারির খাঁচা থেকে বের করে কয়েকটা দিন ফেলে রাখুন বাইরে। আর নেই। হীরেমুক্তো বরঞ্চ এক জায়গায় পড়ে থাকে, বই কদাপি নয়। আকাশলোকে প্লেনের গহ্বরেও, দেখছেন তো সেই ব্যাপার। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। কোথাও পাত্তা নেই। বইয়ের

গাদা দেখিয়ে বিদেশ-বিভূয়ে কিঞ্চিৎ পশার জমাব ভেবেছিলাম (ভিতরের বস্তু পড়তে পারছে না, তখন ভাবনা কি ?)। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গুপ্তর বিষম খাতির—বিশেষ করে এই এয়ারফিল্ডের চৌহদ্দির মধ্যে। খুঁজে পেতে দেখ রে বাপু, প্লেনের মধ্যে আছে কি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছেই তো একটা প্যাকেট। সব মাল বেরিয়ে গেছে, ওটা ঘাপটি মেরে পড়ে রইল—কোনও সাহিত্যপ্রেমিক গুদ্ধরের কারচুপি কি না কে জানে !

কাবুলের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মাত্র আমাদের দায়-দায়িত্ব চুকে গেছে। সোবিয়েত এমব্যাসির হেপাজতে এখন। মনিব্যাগের মুখ বেঁধে ফেলেছি, খাওয়া-শোওয়া ও ঘোরাঘুরির যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁদের। তাঁরা হাজির আছেন। বিষম মুশকিলে পড়ে গেছেন ভদ্রলোকেরা। উত্তম হোটেল সর্বসাকুল্যে দুটো। মালিক হলেন খোদ আফগান-গবর্নমেন্ট—আপনি-আমি ইচ্ছে করলে হোটেল খুলতে পারব না এখানে। কাবুল হোটেলের নতুন এক ব্লক বানানো হয়েছে সেটা চালু হয়নি এখন অবধি। স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তার উপরে আজ মঙ্গলবার—ভারত থেকে প্লেন আসার দিন। দুটো প্লেন এসে পৌঁছল, একটা নিয়মমাফিক, বাড়তি আর একটা আমরা ভাড়া করে নিয়ে এলাম। এয়ারফিল্ড থেকে শহরে যাব, তার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। ঝনাৎ করে টাকা ফেলে ট্যাক্সি ভাড়া করবেন, সে জায়গা কাবুল নয়। কড়া রোদে পথের ধারে সকলে দাঁড়িয়ে আছি—আসছে, ঐ যে ধুলোর ঝড় উঠেছে, ঐ বুঝি আসছে গাড়ি ! কিন্তু ঝড় তুলবার জন্য কাবুলের রাস্তায় মোটরকারের প্রয়োজন হয় না, জন দুই-চার লোকেই বীর পদক্ষেপে চতুর্দিকে অন্ধকার করে তুলতে পারে। এমব্যাসির লোকেরা লজ্জা পেয়েছেন—অপ্রতিভ হাসি হেসে বারম্বার ভরসা দিচ্ছেন, দেরি নেই—এসে পড়ল বলে মেশিন, বেশি আর দেরি হবে না। মেশিন মানে মোটরগাড়ি।

অবশেষে এসে পড়ল একখানা কার ও একটি স্টেশন-ওয়াগন। মানুষের যা হয় হোকগে, মাল মিলিয়ে তুলে ফেলা যাক তো আগে। মাল বোঝাই হয়ে স্টেশন-ওয়াগন শহরমুখো চললো। ড্রাইভারের পাশে কায়ক্লেশে দুটো জায়গা হয় ; আমি আর প্রেমচাঁদ চড়ে বসলাম। বয়স কম হলে কি হয়, প্রেমচাঁদ অসামান্য ব্যক্তি। হেন বিদ্যা নেই যা তাঁর অজানা। মায় উর্দুতে পদ্য বানানো অবধি। বিশ-পঁচিশ গণ্ডা রাশিয়ান কথা জানা আছে, সে জন্য খাতিরের অভাব নেই। দলের সেক্রেটারী এবারের চালানে আসতে পারেনি, পিছনের দলে আসছেন। রুশীয় বিদ্যার জোরে প্রেমচাঁদকে কাঁচা-সেক্রেটারি করে নিয়েছেন দলপতি। সকলের দেখাশুনা ও বিলিবন্দোবস্ত উনিই করবেন

আপাতত। স্টেশন-ওয়াগনের ড্রাইভারটি জাতে রুশ, দু-চারটি রুশ-কথার ফোড়ন দিয়ে প্রেমচাঁদ তার তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এটা কি ওটা কি জিজ্ঞাসা করছেন, ড্রাইভার যথাজ্ঞান জবাব দিচ্ছে। নিজেও উপযাচক হয়ে এটা-ওটা দেখাচ্ছে।

আগে ভিন্ন এক হোটেলে গিয়ে দাঁড়াল। না, সেখানে জায়গা নয়। দুটো ছাড়া হোটেল নেই—অতএব নিশ্চিত কাবুল-হোটেলে। সামনে কাঁচা নর্দমা, তার ও-পারে ফুটপাথ। সেইখানে মালপত্রের পাহাড় ঢেলে দিয়ে গাড়ি আবার এয়ারফিল্ডে চলল মানুষ আনবার জন্য।

প্রেমচাঁদ হাঁক দিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি যাব। সেক্রেটারী মানুষ—মালপত্রের মতই মানুষগুলোও গুনেগেঁথে হিসাবপত্র হিসাব-কিতাব করে নিয়ে আসবেন বুঝি। ভাল দায়িত্বজ্ঞান একেই বলে!

ও হরি, যাচ্ছেন নিজের গরজে। মাথার টুপি কোথায় ফেলে এসেছেন, খুঁজে পেতে আনতে চললেন। ফুটপাথ থেকে জিনিস বয়ে বয়ে হোটেলে নিয়ে তুলল। সাবেক ঢঙের বাড়ি, ছোট ছোট ঘর। জাঁদরেল সরকারি হোটেল—তা ড্রইংরুমে লম্বার দিকে একটা পুরো মানুষ পা ছড়িয়ে শুতে পারে, চওড়ার দিকে হয়তো বা পা একটু গুটাতে হয়। পাঁচ-সাতটি প্রাণী বসতে পারে টায়েটোয়ে। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে সেই ঘরের ভিতর দিয়ে—তার এক ধাপে চড়লেন তো পরের ধাপ দেখতে পাবেন কোমরের কাছাকাছি। নেহাত পক্ষে হাত তিনেক মাপের এক-একখানা পা হলে ঐ সিঁড়ি ভেঙে অবাধে উঠা যায়। মালপত্রে তামাম ড্রইংরুম ভরাট হয়ে গিয়ে এবারে ঐ সিঁড়ির উপর থাক দিচ্ছে। ধাপ অতএব আরও উঁচু হয়ে উঠল।

সহযাত্রীরা সামাল করে দিয়েছেন—জায়গা খারাপ, তিলেকের অসাবধানে ব্যাগটা-ব্যাগটা নাকি এদিক-ওদিক সরে যাবে। সতর্ক চোখ মেলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছি তাই। আর জনান্তিকে শুনছি, এত লোকের জায়গা হবে না হোটেলে—এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দেবে। পাকাপাকি ঘর নিয়ে আছেন অনেকে। পাইলটের জায়গা রিজার্ভ করা থাকে, দু-খানা প্লেনের যাবতীয় পাইলট হাজির আজকে এক সঙ্গে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তার উপরে আমরাও ষোলজন এই মাত্র নির্বিঘ্নে পৌঁছলাম।

আছি দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ পরে মোটরকারে মেয়েরা এসে পড়লেন। এবং তন্মধ্যে তেজা সিং। দাড়িওয়ালা হাতে বালা-পরা শিখ। বেঁটে মানুষ—পাগড়ি বেঁধে বিনুনি-করা চুলের ঝুঁটি তদ্‌গর্ভে ঢেকে দিয়েছেন, এবং আকারেও কিঞ্চিৎ লম্বা হয়েছেন। কেওকেটা ব্যক্তি—পেপসুর চীফ-জাস্টিস ছিলেন, পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার। অতএব দলপতি হয়েছেন।

দলপতিত্ব এবং পাকা দাড়ির গৌরবে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঠাঁই দিয়ে পয়লা গাড়িতে ওঁকে নিয়ে এলেন। অন্য সবাই পথে বসে আছেন স্টেশন-ওয়াগন উদ্ধার করে আনবে এই প্রতীক্ষায়।

হোটেল-ম্যানেজারের সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলে তেজা সিং অবস্থা বুঝে নিলেন। গোমড়া মুখে বসে আছেন। ভেবে ভেবে তড়াক করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আমায় ডাকছেন, আসুন—ঘরদোর বেছে নেওয়া যাক।

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, সকলে এসে পড়ুন—

এসে পড়লে তখন কি আর মনের মতন বাছাবাছি চলবে?

বোকারাম আমি, হিতকথা কানে গেল না। একটা বাক্সে চেপে বসে পা ছড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছি। দুর্লঙ্ঘ্য সিঁড়ি বেয়ে বুড়োমানুষ তেজা সিং শম্বুকগতিতে উঠতে লাগলেন। উত্তম ঘর পাবার লোভে মেয়েরাও মহোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। ওরে বাবা, রেলিঙে ঝুল খেয়ে এ-বোঝা ও-বোঝার উপর দিয়ে পাহাড়ে চড়ার মতো আলটপকা উঠে গেলেন দলপতিকে বিস্তর পিছনে ফেলে। হিমালয়ে তুলে দিলে, যা কাণ্ড, তেনজিঙের আগেই তো এঁরা এভারেস্টে চড়ে বসতেন।

ঘর দখলের কাজ সমাধা করে তেজা সিং নেমে এসে খাবার তাগিদ দিলেন। মহিলারাও নামতে লাগলেন। মিনিট দশ-পনেরোর বেশি নয়—আহা হা, কি হয়ে সব আসছেন ইতিমধ্যে! ঘরের চেয়ে ওঁরা সাজ-বদলের জন্যেই অধিক আকুল হয়েছিলেন। স্নান নামক বিলাসিতার বেশি রেওয়াজ নেই এখানে, অত জনের স্নানের জল কে জোগাড় করে রেখেছে? যেটুকু ছিল, তা এঁদের মুখ-হাত ঘষাঘষিতেই ব্যয় হয়েছে। ব্যয় সার্থক বটে! ঈশ্বর মোটা-মুটি এক চেহারা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায়ে কি অসাধ্য-সাধন হয়—স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্তা এখন এঁদের দেখলে চিনতে পারবেন না।

তেজা সিং হোটেল-ম্যানেজারের উপর হাঁকডাকছেন, কই গো, আর কত দেরি?

আমায় বললেন, খাইগে চলুন যাই—

হুকুম দলপতির হলেও ঘাড় নেড়ে বসলাম: বন্ধুরা পথে পড়ে, আমি এখন খাচ্ছি না।

অনেক দেরি হবে তাদের আসতে।

দেরি যতই হোক, আমি বসে আছি এখানে। তাদের ফেলে খাব না।

দলপতি বললেন, আমি চললাম তবে বাপু। কিছু মনে করো না।

যথা আজ্ঞা! আগের হুকুম না মেনে অপরাধী হয়েছি, পুনশ্চ সেটা আর

করতে চাই নে। উনি খানাঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আমি কিছু মনে করলাম না।

ক্রমশ সকলে এসে পড়লেন। কাস্টমস বাবদে এবং যানবাহনের অভাবে দু-তিন ঘন্টা পথের উপর ঘোরাঘুরি করে মেজাজ সমধিক উষ্ণ।

মালপত্র ?

নির্ভয় হন। সেগুলো ঠিক আছে। কোনখানে নিয়ে তুলবেন, সেই সেইটে ভাবুন।

লীডার কোথায় ?

দেখা হবে না, বিশেষ কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন।

তা হলে সেক্রেটারি মশায়—

প্রেমচাঁদ সহসা জিভ কেটে বলে উঠলেন, এই যা :—আবার এয়ারফিল্ডে দৌড়তে হল। জিনিস ফেলে এসেছি।

টুপি তো ঐ মাথায়—

উঁহু, ফোলিওব্যাগ ভুলে এসেছি কাস্টমস-ঘরে।

একটা গাড়িতে সার্স্ট দিয়েছে, দৌড়ে তার ভিতর ঢুকে পড়লেন। অস্থায়ী যদিচ, তাহলেও সেক্রেটারি। মানুষ ও মালপত্রের যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁর উপর। দলপতি সেক্রেটারি বাছাই করেছেন। মানুষ অতি উপযুক্ত, কাবুলে পা দিয়েই বারম্বার মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

এয়ারফিল্ড থেকে এক ভদ্রলোক পিছু নিয়েছেন। চেহারা ও হিন্দি জবানে প্রকট হল ভারতীয়। জীপগাড়ি সঙ্গে—যাকে সামনে পান, কাতরাচ্ছেন গিয়ে উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন। কেউ কানে নেয় না। আপনি কে হলেন মশায় ? রুশ-রাজদূতের অতিথি—যত্র তত্র গেলে আমাদের ইজ্জত থাকে ?

ভদ্রলোক অতএব ক্ষুণ্ণ মনে ফিরলেন তা বলে নিরস্ত হবার পাত্র নন। ফিরে এসে বসে আছেন হোটেলে। জাতভাইরা এসে পড়েছে, উপকার না করে কিছুতে ছাড়বেন না। আর আছেন অপূর্ব গুপ্ত। ছায়ার মতন সেই থেকে সঙ্গে ঘুরছেন। দুপুর গড়িয়ে যায়—তা হোক, তা হোক, খাওয়াদাওয়া তো রোজই আছে। আপনাদের সকলের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—সেইটি দেখে তবে যাব।

জনা তিনেক ফালতু হয়ে থাচ্ছি। যা গতিক, মেজের সতরঞ্চি বিছানো ছাড়া উপায় দেখি নে। জীপের মানুষটি পরম পুলকে এগিয়ে এলেন : তবে আর কি, উঠে পড়ুন এবারে জীপে। ইণ্ডিয়ান ক্লাবে খাট-বিছানা পেতে রেখে এসেছি। তোফা থাকবেন। কেন মিছে ঝামেলা বাড়ান এখানে ?

নিরুপায় হয়ে তখন ভদ্রলোকের পরিচয় নিতে হয়। গোবর্ধন দাস মালহোত্র—টালিগঞ্জ জয়া-ইঞ্জিনিয়ারিঙের লোক। বছর কয়েক ধরে কাবুলের মা-লক্ষ্মীদের সেলাই-কল যোগান দিয়ে আসছেন। আমি বালিগঞ্জে থাকি, তবে তো এক পাড়ার লোক—দাস-মশায়, আগে বলতে হয়।

ঐ জীপের খবরও বেরিয়ে পড়ল। ভারত-সরকারের গাড়ি—এম্ব্যাসি থেকে ম্যালহোত্রের জিম্মায় দিয়েছে আমাদের কাজ কর্মে লাগে যদি। কিচ্ছু তো বলেন নি এতক্ষণ—মিনমিন করছিলেন, জীপের মালিকানা তবে তো আমাদেরই অর্শায়। নিজের গাড়িতে ড্যাং-ড্যাং করে ঘুরব, তা নিয়ে আর কথা কি।

উঠুন—

তিন নয় কিন্তু. চার বাঙালী আছি। কে পড়ে থাকবে, তার জন্যে কি টস করতে বসব এখন?

মালহোত্র বললেন, চারই আসুন চলে। আন্দাজি চার বিছানা পেতে রেখে এসেছি, গিয়ে দেখতে পাবেন। আমার কেমন মনে হল, বাড়তি একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সে তো হল, কিন্তু দলপতির অনুমতি চাই যে। তিনি রাজি না হলে স্বয়ং যমরাজও যদি এসে পড়েন, তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হবে। খোঁজ, খোঁজ, কোথায় আছেন দলপতি।

খানাঘরে সেই যে ডেকে গেলেন আমায়, তখন থেকেই চালাচ্ছেন। সর্বনাশ। হোটেলের মালিক খুদ আফগান গর্বমেন্ট—খেয়েই তাঁদের ফতুর করবেন। ভারতের সঙ্গে বিশেষ দহরম-মহরম—এই নিয়ে শেষটা দুই গবর্নমেন্টে ঝগড়া না বেধে যায়।

পরে অবশ্য টের পেয়েছিলাম আশঙ্কা অমূলক। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম—মুরগির হাড়ে। যে সব লোকের উপর হোটেলের কর্তৃত্ব, তারা অতিশয় হিসাবি। সোবিয়েত দেশ থেকে ফেরার মুখে এক রাত্রি খেয়েছিলাম হোটেলে। তাই যথেষ্ট। মুরগির কোর্মার মাংসগুলো নিপুণ হাতে চেঁচে নিয়ে লম্বা লম্বা হাড়গুলো ঝোলে ডুবিয়ে রেখেছে। দাঁতের কত শক্তি ধরেন, পরীক্ষা দিন খানা-টেবিলে বসে। নাজেহাল হয়ে দাঁতের বিশ্রাম দিয়ে শেষ অবধি হয়তো বিবেচনা করলেন ঝোল শুষেই কিঞ্চিৎ উশুল করে নেবেন। তা ঝাললঙ্কা এমন ঠেসে দিয়েছে—মুখবিবর থেকে উদর অবধি ছ্যাঁকা দিতে দিতে এগুবে। জলে ঠাণ্ডা হবে না। মুখব্যাদান করে ঘণ্টাখানেক অন্তত লালা ঝরাবেন। খাদ্যের এই মাহাত্ম্য সেদিন জানা ছিল না। তাই ভাবলাম,

তেজাই সিং অফুরন্ত সাপটাচ্ছেন এ বেলা ধরে।

একজনে খানাঘরে ছুটলেন অনুমতির জন্যে। আর ফেরেন না। বলা যায় না, মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বসেই গেলেন বা। ক্ষিধেয় নাড়ি পট-পট করছে—তার চেয়েও বড় ব্যাপার, ধুলোয় আপাদমস্তক বিভূষিত। ঘন্টা তিনেক বোপে এই কাণ্ড—সহ্যের সীমা শেষ হয়ে এলো।

পুনশ্চ একজন, তাঁরও পাত্তা নেই। তাগিদ দিতে তখন আরও একজন গেলেন। সর্বশেষ আমি। যাই হোক, মিলে গেল অনুমতি। মুরগির হাড় স্তূপীকৃত পাতের পাশে। এতক্ষণ ঐ তালে ব্যস্ত ছিলেন—ভরতি মুখ থেকে কায়ক্লেশে বলেছিলেন, দাঁড়ান—ভেবে দিখি। একে একে এসে চুপচাপ এঁরা সারবন্দি দাঁড়িয়ে। উনি খাচ্ছেন আর ভাবছেন। সমস্তগুলো প্লেট নিঃশেষিত হবার পর ভাবনা শেষ হল। অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অতএব যাবতীয় মালপত্র এবং মালহোত্র ও শ্রীগুপ্ত সমভিব্যাহারে চললাম ইণ্ডিয়ান ক্লাবে। সগর্জনে এবং সগৌরবে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে—হঠাৎ একি হয়ে গেল, চারিদিক দিব্যি নজরে তো এসে যাচ্ছে, ধুলো নেই, আওয়াজও রীতিমত কোমল হয়ে এসেছে। তাকিয়ে দেখি, রাস্তায় পিচ দেওয়া। সারা শহরে একমাত্র পিচের রাস্তা—শাহী-সড়ক এর নাম—মাইল দেড়েক হবে লম্বায়, কাবুলবাসী এই সড়কের গুমরে বাঁচেন না।

শাহী-সড়ক ছাড়িয়ে আরও অনেক বাঁক ঘুরে ইণ্ডিয়ান ক্লাবে পৌঁছানো গেল। খাসা বাড়ি—চওড়া উঠান, ফুলবাগিচা। টেনিস-লন আছে, সারি সারি আপেলের চারা লনের এক দিকে। অদূরে পাহাড়—ঘরে শুয়ে পাহাড় দেখা যায়, ভারি সুন্দর জায়গা। হাত-মুখ ধুয়ে অগৌণে আহারে বসা গেল। অতি মহাশয় লোক মালহোত্র, সব দিকে খর দৃষ্টি, ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কর্তৃস্থানীয় একজন—এঁদেরই চেষ্টায় ক্লাব গড়ে উঠেছে।

শ্রীগুপ্ত এতক্ষণে বিদায় নিলেন। পাঁচটায় (আমাদের ছ'টা) কাবুল-হোটেলে আসবেন আবার, ঐখানে সকলে গিয়ে জুটব। ভারত-দূতাবাসের নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেই হবে। আর কি করা যাবে, তা-ও ভেবে দেখব তখন।

খাদ্য পরিপাটি। বটের পাখির মাংস, পোলাও ও তন্দুরা-রুটি। ঘি নির্ভেজাল—সের আড়াই টাকার মতো। চাল এমন মিহি, বোধ করি ফুঁ দিলে দিলে উড়ে যায়। হাতে-ঠাসা অতিকায় তন্দুরা-রুটি। চিনি দেওয়া নয়, অথচ চিবিয়ে দেখুন কি মিষ্টি। এখানকার গমের গুণ। খাওয়ার পরে ফল—আঙুর, তরমুজ, আপেল। বড় আঙুরের সের দু-আনা। আপেলের পাউণ্ডও দু-আনার মতো। দেদার খেয়ে যান, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

কাবুলে মা-বারুণীর সাক্ষাৎ পাবেন না, ইসলামি নিয়মে শহর শুকনো করে রেখেছে। কিন্তু ক্লাববাড়িতে, যদি হুকুম করেন, বন্যা বইয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখেন এঁরা। সমস্ত ভাল, পাবেন না কেবল সঙ্গ। পুরুষের বেলা তবু না হোক, মেয়েদের ভারি কষ্ট। নিতান্ত মজুরানী ছাড়া অতিশয় কড়া পর্দা। পথ-চলতি কদাচিৎ একটি দুটি মেয়ে দেখবেন—দেখতে পাবেন দীর্ঘ একখানি বোরখা চলেছে জুতোপরা দুটি পায়ের উপর নির্ভর করে। শ্রীমতী মালহোত্র দিল্লি পালিয়ে গিয়ে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

গুরুভোজনের পর পাৎলুন ছেড়ে লুঙি পরে আরামসে লেপের নিচে গিয়েছি, শ্রীযুত মুখুজ্জে এলেন। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ভারত-দূতাবাসের কেষ্ট-বিষ্টু একজন, হাতে একগাদা যুগান্তর কাগজ। সাতদিন অন্তর ভারতের ডাক, একদিনে ওঁরা হপ্তার কাগজ পড়েন। আর বললেন, মাসিক বসুমতীও আসে। দেখুন তাই, অধমের কলমের কসরত হিমালয় পার হয়েও চলে এসেছে। দিব্যি করছি, লিখবার জন্য ভবিষ্যতে এমন কাগজ বাছাই করব কম্পোজিটার ও প্রুফ-রীডার ছাড়া যা কেউ পড়ে না। তা হলে এই সমস্ত লানান কথা শুনতে হবে না। বস্তুত, শ্রীমুখুজ্জে এমন সব বিশেষণ ছাড়তে লাগলেন—মুখটুখ লাল করে একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবার কথা, কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত পাকা রং বিধায় সে যাত্রা কাটিয়ে উঠলাম। ডেলিগেটদের লিস্টি দিল্লি থেকে আগেই এসে গেছে—তার মধ্যে নাম পেয়েছেন। এতক্ষণ ফুরসত হয় নি, অফিসের পরে এই বেলা তিনটের সময় ছুটতে ছুটতে এসেছেন—নাওয়া হয় নি, খাওয়া হয় নি। যেতে হবে একবার আমার বাসায় যেমন করে হোক সময় করতে হবে। ছেলে বড্ড দেখতে চায়। ছেলের মা-ও চান। তিনি অবশ্য এমব্যাসির নিমন্ত্রণে যাবেন, সেখানে দেখা-শুনো হবে। ছেলে তো সেখানে যাবে না।

মুখুজ্জে চলে গেলেন তো টানা ঘুম তার পরে। এমব্যাসির জীপ উঠানে এসে ভকভক করে তাগাদা দিচ্ছে! উঠে চোখ মুছতে মুছতে পুনশ্চ কাবুলের রাস্তায়। রাস্তা বটে! জীপগাড়ি শক্ত ইস্পাতে বানানো, ভেঙেচুরে তাই ছত্রখান হয় না। বাংলাদেশের তেলে-জলে ধুলোয়-মাটিতে দেহগুলো পাকা-পোক্ত করে তবে আমরা পথে বেরিয়েছি, আমাদেরই বা করবে কি?

দেবি দেখে গুপ্ত আমাদের তল্লাসে আবার ক্লাবমুখো চলেছেন। তাঁকে তুলে নেওয়া হল। কিন্তু এলাম কার কাছে? দলপতি গুরুদ্বার-দর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। একসঙ্গে জুটেপুটে হোটেল থেকে এমব্যাসিতে যাওয়া তবে আর হল কই?

গাড়ি ঘোরাতে বললেন গুপ্ত। তবে এই ফাঁকে আমার বাড়িটা একবার ঘুরে চলুন—

আপেল তো জানি ফলের দোকানে বাক্সবন্দি হয়ে থাকে এবং আঙুর দু-চার থোলো সামনে ঝুলিয়ে রসিকের রসনা লালাসিক্ত করে। এ হেন আঙুর-আপেল গাদা গাদা গাছে ঝুলছে, দেদার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ হেন রূপকথার দেশ মর-ভুবনেই আছে, এই কাবুল শহর। অপূর্ব গুপ্তর উঠানে ঢুকে আঙুরের মাচার নিচে দিয়ে যাচ্ছেন—মাথা নিচু করে যাবেন, নয়তো সুপক্ক আঙুরের থোলোর থাবড়া খাবেন বারে বারে। মাচায় আর কিছু দেখবার জো নেই, খালি আঙুর। এমনি ধারা সর্বত্র—আঙুরের সের দু-আনা হবে না তো কি। খাচ্ছে, শুকিয়ে কিসমিস বানাচ্ছে, আর কি করবে ভেবে পায় না। তারপরে উঠানের আঙুরের অত্যাচার সয়ে সয়ে বারান্দায় উঠলেন তো পাশেই নিচু আপেল গাছ। আপেল পেকে লাল টুকটুক করছে। অতিথিকে যা-ই কিছু খেতে দেবেন, সঙ্গে মস্ত বড় ফলের প্লেট। শ্রীমতী গুপ্ত দক্ষিণ-ভারতের মেয়ে—ইংরেজি বলনেওয়ালা তো বটেই, বাংলা বলেও বহু খাস বাঙালিনীকে লজ্জা দিতে পারেন। রান্নাই বা কী চমৎকার! কিন্তু এক মারাত্মক দোষে সবমাটি করেছে—বিষম খাওয়ান। আসনে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন—ছুটোছুটি করে একটা জিনিস আনতে গেছেন, তখনও কড়া নজর—ঐ অবসরে আপনি কোন এক পদে ফাঁকিজুকি না দিয়ে বসেন।

আর কাকে ফেলে কার কথাই বা বলি! শ্রীমুখুজ্জে—ফিরতি মুখে এসে এঁদের দু-বাড়িতে দুই সাঁঝ খেয়েছিলাম। বাপরে বাপ, প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড! মেয়েদের শৌখিনতার চোটে বিস্তর পুরুষ ফতুর হয়ে যায়। সকলের সেরা শখ দেখলাম, মানুষ খাওয়ানো। রাশিয়াকে এত প্রগতিবান বলেন, কিন্তু সেখান-কার মেয়েরাও এই বনেদি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি! পুরুষদের জবর রকম খাইয়ে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলে এঁরা বিজাতীয় আনন্দ পান।

দেশের বাইরে ঘোরাঘুরি হল তো যৎকিঞ্চিৎ। একটা জিনিস ঠাহর করেছি—অজানা জায়গায় কোন এক গৃহচূড়ায় হঠাৎ যখন আমাদের তেরঙা ঝাণ্ডা দেখতে পাই, মন কেমন তুড়ি-লাফ দিয়ে ওঠে। যেন আমার নিজের বাড়ি, বাড়ির ভিতরে আমার নিজের লোকেরা। আমার দেশভূঁয়ের কথাবার্তা পোশাক-পোশাক খাওয়াদাওয়া—দেয়ালে দেয়ালে আমাদের ভালবাসার মানুষদের ছবি। এই হল ভারতীয় এমবাসি। অকূল সমুদ্রের মধ্যে সবুজ দ্বীপ। তা-বড় তা-বড় কত মেমন্তন্ন ছেড়েছি, কিন্তু ভারত-এমবাসি থেকে যেখানে যে-

কেউ ডেকেছেন, কোন দিন অবহেলা করিনি।

এমব্যাসি সদর রাস্তার উপরে, সুন্দর দোতলা বাড়ি, উত্তম কম্পাউণ্ড। আরও বানানো হচ্ছে। দুপুরবেলা এয়ারফিল্ড থেকে হোটেলে যাবার মুখে ইতিপূর্বেই সামনে দিয়ে গেছি। রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ভগবৎদয়াল, উত্তর প্রদেশের লোক—চিরকাল কলেজে মাস্টারি করেছেন। কূটনীতির কাজ কতদূর কি করেন আমার জানবার কথা নয়, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও পড়াশুনোর কথায় প্রবীণ মানুষটি মেতে ওঠেন। এমনি ব্যাপার আরও শুনে এলাম। মস্ত মস্ত জায়গায় ভারত যাঁদের দূত করে পাঠিয়েছে—তাঁদের অনেকে ঝানু ডিপ্লোম্যাট নন, দিক্‌পাল পণ্ডিত। যেমন রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন মস্কোয়। গল্প শুনলাম —সত্যি-মিথ্যে হলপ করে বলতে পারব না—প্রথম সাক্ষাতে স্ট্যালিন নাকি পরমাগ্রহে এদেশ-ওদেশের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে পড়লেন, রাজনীতির কথাবার্তা হল না। চীনে গেলাম, তার ঠিক আগেই রাষ্ট্রদূত ছিলেন সর্দার পানিকর। পানিকর ও তাঁর মেয়ের গল্পে চীনের ইতরভদ্র পঞ্চমুখ। এমনিই সব লোক পাঠিয়ে বাইরের ভুবনে আমরা এত বড় ইজ্জত গড়ে তুলেছি। ভারত বড় ভাল। মানুষগুলো কেমন দেখ—শয়তানি-ফেরেব্বাজির ধার ধারে না, আত্মভোলা পণ্ডিত। সেকালে ভারতের সাধুসন্ত ও বিদগ্ধেরা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে জনচিত্ত জয় করতেন, সেই ধারাই চলছে খানিকটা।

এমব্যাসিতে উত্তম উত্তম আয়োজন—ও সব তো আখচার হয়ে থাকে, একটা সামান্য জিনিস মনে রয়ে গেছে—নুন-পেস্তা। পেস্তা তো এখানকার জঙ্গলে গাছে হয়, তার আর কি দাম আছে বলুন। নুনের সঙ্গে জারিয়ে বেড়ে বানিয়েছে—টপাটপ গালে ফেলতে মন্দ লাগে না। শ্রীমতী দয়াল ও তাঁর মেয়ে আছেন—মা-মেয়ে খুব খাটছেন অতিথিদের আদর-অভ্যর্থনায়। আর সেখানে আলাপ হল শ্রীমতী মুখুজ্জের সঙ্গে। আলাপ জমতেই দিলেন না তিনি—অহো কি সৌভাগ্য।—ইত্যাকার বচনের পর কোন পামর টিকতে পারে সেই জায়গায়? আমার তো মনে হয় ভদ্র ভাবে এই এক সরিয়ে দেবার কায়দা।

ষড়যন্ত্র হল, নেমন্তন্নের আসর থেকে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়া যাক। এ তো চলবে এখন বিস্তর রাত অবধি। রাশিয়ার প্লেন এসে বসে আছে, সকাল বেলা আমাদের নিয়ে উড়ে পালাবে। অতএব বসে বসে গুলতানি না করে, যা পারা যায় দেখে নিই।

বাবরের কবর—সেটা রাত্রিবেলা হবে না। আমানুল্লা শহর বসাচ্ছিলেন, প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—মাইল চার-পাঁচ এখান থেকে। এমব্যাসির জীপে সেইমুখো বেরিয়ে পড়া গেল। কনকনে শীত। কাবুল নদীর পাশে পাশে

পথ। ও হরি, ইনি আবার নদী নাকি! খাল বললেও মান দেখানো হয়—আয়তনে উল্টাডিঙির খালের আধাআধি হতে পারেন। বর্ষায় জল-সম্পত্তি কিছু নাকি খাড-বাড়ন্ত হয়। সে আর কত—লাঙুল ফুলে কলাগাছ হোক, শালগাছ হতে পারে না। ঠাণ্ডা রাত্রে চাখানায় জমজমাট। গরিব হতে পারে—কিন্তু আমিরি জাত-এরা, সন্দেহ নেই। জীবনের আমোদ-স্ফূর্তি ছেড়ে টাকার ধান্দায় ঘুরতে হবে, এ তত্ত্ব তারা মান্য করে না। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা, তাই দেখবেন, আড্ডা কখনো ফাঁকা নয়। উৎকৃষ্ট আড্ডাধারী-দের খাতিরও খুব, পথ চলবার সময় চাখানা কাফিখানা তারস্বরে ডাকাডাকি করে, চা-কফি মুফতে মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে। আমাদের জীপের ধুলো ও আওয়াজে বোধ হয় রসভঙ্গ হচ্ছে, ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওরা। বস্তুত মোটরগাড়ি এ সব জায়গায় বেমানান, মোটরের জন্য রাস্তাঘাটও তাই বানায় নি।

শ্রীযুত মুখুজ্জের বাসা হয়ে ওদের ছেলেটিকে তুলে নেওয়া হল। প্রবীর-কুমার মুখোপাধ্যায়—বছর বারো বয়স, স্বাস্থ্য আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ফেটে পড়ছে। কি কাণ্ড, বইটই পড়ে নাম জেনে বসে আছে। দেশের মানুষ পায় না তো বাংলা কথা শুনে কী খুশি। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' বইটা লাইনকে-লাইন পড়েছে। এখানকার লোকের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা উঠল। দেখা হলে কুশল প্রশ্নের বান ডেকে যায়। বলেই চলেছে গড়গড় করে—কমা-সেমিকোলন নেই, জবাবের জন্য তিলেক থামবে না, জবাবের পরোয়াই করে না—

থামো, থামো। লিখে নিই।

তখন প্রবীর থেমে থেমে বলছে। খাতা বের করে তাড়াতাড়ি টুকে নিলাম। দেখা হলে এক জনে অন্যকে অন্ততপক্ষে এই ক'টি কথা বলবেই:

চেতোর হাস্তে্দ (কেমন আছ)? জান মান তর্ন জোর আস্ত্ (তোমার শরীর ভাল আছে)? খেখ্যার হাস্তে্দ (ভাল আছ তো)? চুচা বাচচায়ে তন খুব আস্ত্ (ছেলেপুলে ভাল আছে তো)? সোমা খুব হাস্তি্দ (আপনি ভাল আছেন)?…এমনি ধারা নিরবধি চলল।

পাহাড়ের লম্বা লাইন—আমাদের রাস্তা সেই পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, রাস্তার জায়গাটু বুতে কেবল পাহাড় নেই। মতে পারে কোন এক পুরাকালে পাহাড় কেটে সমান চৌরস করে রাস্তা বের করে দিয়েছে। জনশ্রুতিও তাই নাকি, বিশাল ফটক ছিল রাস্তার এই জায়গায়; ফটক বন্ধ হলে বাইরের কেউ কাবুল শহরে ঢুকতে পারত না। পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুতের আলো—

আমাদের ডাইনে বাঁয়ে টানা চলে গিয়েছে। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গলগুলোর কালো কবরীতে আলোর মালা পরেছে যেন। কবেকার কোন রণ-বিজয়ের স্মৃতি। শহরে আলো জ্বালুন বা না জ্বালুন—পাহাড়ে আলো জ্বলবেই।

আরো এগিয়ে চলেছি। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। পথ নির্জন। ধাবমান মোটরগাড়িতে কনকনে হাওয়া ঢুকে সর্বদেহ কাঁপিয়ে তোলে। উপরে উঠছি—দার্জিলিঙের রেলগাড়ির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঁচুতে নিয়ে তুলছে। হঠাৎ দেখি, আকাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক অট্টালিকা। জ্যোৎস্না পিছলে পড়েছে তার গায়ে। দরজা-জানলা বন্ধ। একটা ক্ষীণ আলো নেই কোন অলিন্দে।

রাস্তা সেই অবধি গিয়ে শেষ। পৌঁছানোর এখনো দেরি আছে, আরও দুটো তিনটে বাঁক ঘুরতে হবে। উঠছি—উঠেই যাচ্ছি। তেমাথার কাছে রেলের কামরা আর রেলের গাড়ি চিত-কাত হয়ে পড়ে আছে। ছোট শিশু রাগ করে যেমন খেলনার গাদা ছড়িয়ে ফেলে যায়। বছরের পর বছর রোদে বৃষ্টিতে বরফে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। যেন টাকা পয়সায় কেনা নয়—মাংনা এসেছে।

গতিক তাই বটে। আমানউল্লার মাথায় পোকা ঢুকেছিল, শিক্ষা শিল্প-রুচি ও সাজসজ্জায় জাগরণের জোয়ার বইয়ে দেবেন। রেললাইন পাতবেন সারা দেশ জুড়ে, বিদ্যুৎগামী প্রগতির রথ ছুটবে। আফগানিস্তানের কামাল পাশা! ফলে যা দাঁড়াল, তাবৎ দুনিয়ার মানুষের জানা আছে। আমাদের চোখের উপরে সামান্য একটু নমুনা এই রেলের সাজ সরঞ্জাম—ওরে বাবা, কার এমন বুকের পাটা, যত্ন করে রাখতে যাবে অলক্ষুণে বস্তুগুলো! যার দায়ে অত বড় আমিরি খসে গেল আমানউল্লার, পরিজনের হাত ধরে দেশভুঁই ছেড়ে পালাতে হল। প্রাণে মনে যাদের ভাল চেয়েছিলেন, সারাজীবনে তাদের একটু চোখের দেখা দেখবার উপায় রইল না। অতএব থাক এসব দুর্বুদ্ধি, তামাম আফগানিস্তান বরঞ্চ দেমাক করে বেড়াক, বোরখাবিহীন একটি মেয়ে পথে দেখতে পাবে না, সিকি মাইলও রেলগাড়ি নেই সমস্ত দেশে। নির্ভেজাল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হেন দেশ দেখাও দিকি কোথায় আর একটি আছে!

ঘেউ ঘেউ কুকুর ডেকে উঠল। বাঘের মতন এক কুকুর তেড়ে আসছে গাড়ির দিকে। নির্মানুষ পুরীর সতর্ক পাহারাদার। যেন হাঁক দিচ্ছে—এগিও না, এক ইঞ্চিও আর নয়, ফিরে চলে যাও।

অবশেষে বিশাল অট্টালিকার চত্বরে এসে পৌঁছানো গেল। বড় বড় কক্ষ,

মোটা মোটা থাম। সে কী জ্যোৎস্না, যেন দিনমান। ফুল ফুটে আছে চৌদিকে। জায়গা একটা বাছাই হয়েছিল বটে—কাবুল শহর এবং পাহাড়ে-ঘেরা সমগ্র উপত্যকা পরিষ্কার নজরে আসে এখান থেকে। কিন্তু হলে কি হবে, জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছে. বিশাল এক গোরস্থান।

মানুষের জন্য চেঁচামেচি করছি, আছে কে এখানে? দেওয়ালগুলো গমগম করে ; প্রতিধ্বনি আহ্বান ফেরত দেয়, কে আছে?

ফটক খোলা। দলসুদ্ধ উঠে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দেখছি। তখন দেখি, টাটকা ফুলের তোড়া নিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে। বাড়ির প্রহরী—থাকে বাগানের ভিতরে কোন অলক্ষ্য কুটিরে কি কোথায়, বলতে পারি নে। লোক দেখে হয়তো বা তাড়াতাড়ি ফুল তুলে তোড়া বাঁধতে বসেছিল। কিঞ্চিৎ দক্ষিণার আকাঙ্খা।

উপহারের ফুল হাতে নিয়ে উপর নিচে চতুর্দিকে চক্কোর দিয়ে এলাম। রূপকথায় যেমন শুনি—পাতালপুরির রাক্ষসে খাওয়া এক রাজবাড়ি। লাখ লাখ টাকার এমন প্রাসাদ বিলকুল খালি পড়ে আছে—যাহোক একটা সরকারি অফিসও তো বসানো যেত।... কি বস্তু এটা? কিনা, প্রাসাদের আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষাধিক খরচ করে আমানউল্লা ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন। ঐ অভিশপ্ত জিনিস ছুঁতে যাচ্ছে কে বলুন। যে মায়া দেখাতে যাবে, তারও যদি আমানউল্লার দশা হয়। বছরের পর বছর আলগা পড়ে থেকে অত দামের জিনিস এখন অকেজো লোহার আণ্ডিল।

নেমে আসছি। পায়ে হেঁটে নামছি। জীপগাড়ি পিছনে থেমে থেমে আসছে। বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে সেই কুকুর। ক্ষেপে গেছে, গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুঝি। নিশিরাত্রে নির্জন পাথরের কন্দরে কন্দরে কুকুরের ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। না গো, গতিক ভাল নয়। জীপে উঠে পড়ো—ধুলোয় ধুলোয় জ্যোৎস্না অন্ধকার করে পালিয়ে চলো কাবুল শহরে।

।। চার ।।

সকাল ৯-২০। গটমট করে প্লেনে উঠে পড়লাম। মাল-মানুষ কিছুই ওজন হয় না, কাস্টমস বাক্সপেটরায় হাতেই ছোঁয়াল না মোটে। রুশ এয়ারশিপ কাল দুপুর থেকে পাখনা মেলে বসে আছে আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে মস্কোয় পৌঁছে দেবার জন্য। ক্যাপ্টেন এসে মাঝের সিটে বসে পড়ল। কেমন-ধরা ক্যাপ্টেন হে—চড়নদারের মধ্যে এসে আড্ডা জমায়? কথা বোঝে না বলে দোভাষি একটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। এয়ার-হোস্টেসও

এসে দাঁড়িয়েছে —কমবয়সি মেয়ে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, থোপা থোপা চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখখানা ঘিরে। মোটা মোটা দাঁত, হাসলে তবু কিন্তু মন্দ দেখায় না। হাসছেই তো অবিরত। হিন্দুকুশ ডিঙিয়ে যাব, জানেন—পনের হাজার ফুট উপর দিয়ে। সিটের পাশে পাশে নল গিয়েছে, অক্সিজেন সরবরাহ হবে। শুধু-নাকে নিশ্বাস নিতে পারবেন না অত উঁচুতে।

তার পরে সময় হয়ে গেল তো ক্যাপ্টেন সাঁ করে ইঞ্জিনঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন, এবং চক্ষের পলকে মালুম হল উঠে পড়েছি আকাশে। পায়-ভারা কষল না গ্যাংওয়ের উপর, ভুকানে আমাদের তুলো ঠাসতে হল না, কোমরে বেল্ট আঁটতেও বলল না। হাতড়ে দেখি, বেল্টই নেই আদপে সিটের সঙ্গে। আকাশে ওড়া ওরা একেবারে ডাল-ভাতের সামিল করে ফেলেছে। প্লেনে চড়া আর ট্রামে চড়া একই কথা। যেমন-তেমন সিটের উপর খোপানো ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছে। আমরা নেমে গেলে, ওয়াড়ও বদলে দেবে। যে প্লেনে যখনই উঠেছি, সদ্য পাট-ভাঙা এমনি সাদা ওয়াড়। আগে কত কত জাঁদরেল প্লেনে ঘোরাঘুরি করেছেন, লাউঞ্জে তাস পিটেছেন, ঘুমিয়েছেন, আরামসে টানটান হয়ে, লিখবার বাসনা হল তো টেবিল বেরিয়ে এলো সামনের সিটের কানাচ থেকে। সে স্ফূর্তি এদের দেশে পাবেন না। এমন কি, পাকা আমের মতো টুপ করে ভুঁয়ে পড়ে লহমার মধ্যে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেবেন, সে সুখটুকুও এরা হতে দেবে না। পাঁচ বছরেও একটা নাকি আকাশ-দুর্ঘটনা হয় নি—বলুন দিকি, অঙ্ক কথার মতো এমন ধারা নির্গোল ভ্রমণে সুখ আছে?

যাকগে, দুঃখ-সুখের কথা পরে ভাবা যাবে—অধোলোকে তাকান কাচের জানলা দিয়ে। কাত হয়ে চলেছি তো চলেছি—তামাম দুনিয়া কাত হয়ে আছে। গোটা কাবুল শহরটা ছোট্ট এতটুকু—টেবিলের উপর যেন একটা মডেল-শহর বানানো।

তার পরে হিন্দুকুশ। ছোট বয়স থেকে ইতিহাসে ভূগোলে কত এর নাম শুনেছি, আজকে আমি চললাম সেই হিন্দু-পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে। নিচু হয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। প্লেনের গা বেয়ে যে লম্বা নল চলেছে, সেই পথে অক্সিজেন পাঠাচ্ছে। গ্যাসমাস্ক পরে কিম্ভূত-কিমাকার সেজেছি প্রতি জন, কেউ বাদ নেই। আয়না না থাকায় নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ছে না, হেসে খুন হচ্ছি অন্য সকলের চেহারা দেখে। হঠাৎ আর এক ছবি মনে এলো, হাসি শুকিয়ে গেল। অনেক দিনের ঘটনা। ভুবনভরা এত বাতাস—আমার দু-বছুরে মেয়ে হাঁসফাঁস করছে একটুকু নিশ্বাস নেবার জন্যে।

অক্সিজেন-সিলিণ্ডার খুলে ধরেছে, তবু কাজে এলো না। ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল। কত দিনের কথা! একেবারে ভুলে গিয়েছি, এই ধারণা ছিল। আজকে হিন্দুকুশের চূড়ার উপর মহাব্যোমে ঘুরছি—যেখানে শুনতে পাই, নিরালম্ব আত্মারা ভেসে ভেসে বেড়ায় বায়ুভূত হয়ে। আমি সেই নিষ্পাপ দুটি শিশু-চক্ষের করুণ আকৃতি দেখতে পেলাম। লিখতে লিখতে স্তব্ধ হয়ে রইলাম কতক্ষণ।

একবার খেয়াল হল, দেখাই যাক না কি ঘটে মুখোস খুলে ফেললে। একটু তুলে ধরেছি—বাপরে বাপ, সঙ্গে সঙ্গে বনবন করে মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। কাজ নেই বীরত্ব দেখিয়ে। বিশাল কঠিন কালো পাহাড়—মনে হচ্ছে, প্লেন গরুর গাড়ি হয়ে পাথরের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে; ময়দা অথবা চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে পাথরের উপর। তার পরে শুধুই ময়দা—পাথর বিলকুল ঢাকা পড়ে গেছে, ময়দার পাহাড়। আর দেখতে পাচ্ছি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। ফগ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন-কিছুই নেই—শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

তার পরে এক সময় দেখলাম, ধোঁয়া কেটে গেছে—প্লেন আমাদের জাহাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুধ-সাগরের উপর দিয়ে হেলতে দুলতে চলেছি। মাটির উপরের সামান্য জীব সপ্ত-সমুদ্রের মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা লবণ-সমুদ্রটাই শুধু দেখে থাকেন, আমরা আকাশের উপরের রকমারি সমুদ্র দেখে এসেছি। আচ্ছা, হল তাই—সাগর নয়, ধবধবে সাদা মেঘ। কিন্তু মেঘে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে,—তবে আর সাগর বলায় দোষ হয়েছে কি!

দিগন্ত-সীমায় নীল রং। দুধ-সাগর পাড়ি দিয়ে এ বুঝি আর এক রাজ্যে পড়লাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তালগোল পাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, মাটি ও আকাশ আবার আলাদা হচ্ছে। মাটির উপর কালো আর বাদামি পাহাড়, চূড়ায় চূড়ায় সাদা মেঘ। হিন্দুকুশ বোধকরি পার হয়ে এলাম—অন্তত হিন্দুকুশের এলাকায় বারো মাস তিরিশ দিন বরফ জমে থাকে। মাস্ক খুলে ফেললাম। এ-রকম আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে লেখা মুশকিল। লেখা তবু ছাড়িনি। উপরে উঠলে মন নাকি উদার হয়ে যায়। আমার কই সে সব কোথায়? ফিরে এসে আপনাদের হাড় জ্বালাতে হবে—আকাশের মেঘ আর পদতলের মধ্য থেকে তারই তো মশলা কুড়িয়ে এনেছি।

পাহাড় আর কালো নেই, গেরুয়া রং নিয়েছে। উঁচু পাহাড়ে মাঝখানে সমতলভূমি। বালুমরুতে এসে যাচ্ছি। পথ পড়েছে বালুর মধ্য দিয়ে—আঁকা-বাঁকা উঁচুনিচু। এয়ারহোস্টেস মেয়েটা গ্যাসমাস্কগুলো গোছগাছ করে

ঝুলছে—কি গো, পথ নয় ঐ নিচে? তাই। কাবুল আর তাব্রিজের যোজক। এই পথে বাসে গিয়েছেন কেউ কেউ—ঘণ্টা দশ-বারো লাগে, বিশ্রী রাস্তা। ঝাঁকুনির চোটে দেহের কলকব্জা খুলে যায়, হাত-পা ধড়-মুণ্ডু আলাদা হয়ে পড়ে। একটা-দুটো দিন তাব্রিজে থেকে ইস্কুপ এঁটে সেরে-সুরে নিতে হয়। হিন্দুকুশের গিরিসঙ্কটে ক্যারাভানের পায়ে পায়ে অনেক শতাব্দী ধরে পথ পড়েছে। দিল্লি থেকে কানাঘুষো শুনেছিলাম আমরাও ঐ পথের পথিক হব। কিন্তু ভাগ্যে ভর সইল না, আগে ভাগে প্লেন এসে আকাশের পথ খুলে দিয়েছে।

হিন্দুকুশ ছেড়ে এসেছি, কিন্তু পাহাড় ছাড়ে নি এখনো। মনে হচ্ছে কি জানেন—মরুর ভিতর এই টুকরো টুকরো পাহাড় একটু আগে ছিল না, বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে, আমরা আর খানিক এগিয়ে গেলে পাহাড় ফিরে গিয়ে হিন্দুকুশের আস্তানার মধ্যে আবার মাথা ঢোকাবে। পাহাড়ের এখানে-ওখানে খুবলে খুবলে খেয়েছে কিসে। সত্যি তাই—জন্তু-জানোয়ার নয়, খেয়েছে মরুবালুকায়। নিঃসীম মরু আরম্ভ হল এবার। দিনরাত্রি নির্বাধ বাতাসে পাহাড়ের উপর বালির ঝাপটা এসে পড়ে, বালির ধারে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তার পরে দেখছি, বালি পড়ে পড়ে পাহাড়ের অনেকখানি চাপা পড়েছে। শেষে পুরোপুরি বালু-ঢাকা পাহাড়। এক একটা ওরই মধ্যে বিদ্রোহ করে মাথা নাড়া দিয়েছে বুঝি—সমুন্নত দেওদারের মতো কালো গিরিশিখর মরুভূমি পাহারা দিচ্ছে। বালু আর বালু—রুক্ষ, ধূসর, অন্তহীন। বিক্ষুব্ধ বিশাল সমুদ্র মুনির অভিশাপে যেন মরু হয়েছে—ঢেউগুলো, আহা, স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—ঢেউ জলের নয়, বালির। মাঝে মাঝে হঠাৎ ওয়েসিস দেখি, নয়ন জুড়িয়ে যায়। ধূসরতার মধ্যে খানিকটা ভিজে ভিজে জায়গা, খাবলা খাবলা সবুজ। ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার ঐ জায়গাটুকুতে। বালুকার মহাসমুদ্রে টুকরো টুকরো দ্বীপ।

প্রেমচাঁদ গণ্ডা বিশেক রুশ-কথার সম্বলে এয়ার-হোস্টেস মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন। এই মূর্খের মরুভূমিতেও মেয়েটাও যেন একটা ওয়েসিস পেয়েছে। খুব চোখ-মুখ নেড়ে কথাবার্তা বলছে, হাসছে। খন্তা-কোদাল দাঁত সত্ত্বেও হাসিটুকু খাসা। পাঁচ টাকার নোটখানা প্রেমচাঁদের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আনি-দুআনিও বেরুল কয়েকটা। সে ক'টা আর ফেরত দেয় না—উল্টে-পাল্টে নানান ভাবে দেখে বিশাল পকেটের খোলে ফেলে দিল। হিন্দি বই একটা আবিষ্কার হল প্লেনের বইয়ের গাদার ভিতর। ভারতীয়েরা যাবে বলেই হয়তো নমুনা রেখে

দিয়েছে। খ্যানি-দুখ্যানিগুলো পকেটস্থ করে এবারে হিন্দি শিখবার মনন হল। প্রেমচাঁদের কাছে পাঠ নিচ্ছে। যত না পড়ে হাসে তার দ্বিগুণ।

বিশাল জলাভূমি—প্লেন অনেকখানি নিচু দিয়ে যাচ্ছে, নদী বলে মালুম হচ্ছে। সুদীর্ঘ সুনীল জলধারা এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত অবধি প্রসারিত। জায়গাটার উপর এসে দেখি, হায়রে, কোথায় কি—গৈরিক বালুভূমি নদীজল ঐ অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে চিক চিক করে দাঁত মেলে হাসছে। মরীচিকা—প্লেন মরীচিকার পিছু নিয়েছে। মরু-পথিকের মতোই, কে জানে কোন এক সময় শঙ্কায় ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়বে কিনা মাটির উপর।

অবশেষে সত্য সত্যই পাশে বাঘ পড়ল। ফাঁকি নয়, সত্যিই নদী। আমুদরিয়া—যার জন্য এতক্ষণ তাঁক করে আছি। বালু প্রান্তরে পথ হারানো এক শ্যামলা মেয়ে এঁকে বেঁকে চলছে।

ওপারে সোবিয়েত এলাকার শুরু। সীমানার ঘাঁটিতে প্লেন নামবে—জোর কমিয়ে দিয়েছে তাই, নিচু হয়ে চলেছে। নদীর মাঝ বরাবর এসে ঘাড় বেঁকিয়ে একবার এপারে ওপারে তাকাই। নদী খুব বড় বলে মনে হয় না, কিন্তু দুই পারের ব্যবধান আকাশ ও পাতালের। সারবন্দি ষ্টিমার নোঙর ফেলে আলস্যে ধোঁয়া ছাড়ছে ওপারের ঘাটে, মাল তুলছে। জল কাটিয়ে ছুটোছুটি করছেও কয়েকটা। আমুদরিয়ার ধারে ধারে গুটগুট করে কেমন রেলগাড়ি চলেছে। আর ওপারে কাল রাত্রে দেখলেন তো—রেলের পাটি ও কামরাগুলো ইচ্ছে করে পয়মাল করছে। প্লেন আরও নিচু হল—দালান-কোঠা, চোখজুড়ানো সবুজ ক্ষেত, গাছপালা। আর আফগানিস্তানের পারে দেখুন তাকিয়ে, রুক্ষ ধূসর দিগব্যাপ্ত মরু ক্রোশের পর ক্রোশ আতপ্ত তৃষ্ণায় হা-হা করছে। সারা দিনমান রোদে ঝলসায়, সারা রাত্রি হিমে হি-হি করে। অথচ একই ভূমি প্রকৃতি—এপার-ওপারের এককালে অবিকল এক চেহারা ছিল। দেখে প্রত্যয় হবে না, মনে হবে গালগল্প ছাড়ছে।

সোবিয়েত এলাকায় ঢুকে পড়েছি। পা ছোঁয়াব এখুনি, সীমান্তের বিমান ঘাঁটিতে নামছি। উঃ, সত্যি সত্যি এলাম তবে! তেরমেস। নিতান্তই সাদামাঠা জায়গা—গ্যাংওয়েটুকুও পাকা গাঁথনির নয়। চিকচিকে বালুর উপরে নামিয়ে দিল।

দরজা খুলতেই গ্যাটম্যাট করে জন তিন-চার ঢুকে পড়ল। চেহারা কী—মানুষ নয়, আস্ত দৈত্য। একটি বোধহয় হাত ছয়েক লম্বা, চওড়াও তদনুপাতে। দুটো বড় সাইজের মর্তমান কলার মতো চমরানো আধ-পাকা গোঁফ ঠোঁটের দু-দিকে। এসেছে পাশপোর্ট পরখ করতে, ফাঁকিঝুকি দিয়ে নেমে পড়তে না

পান। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—হুঙ্কার নয়, মুখভরা হাসি। হাসি ও-মুখের জন্য নয়, ও-বস্তু যোটে মানাচ্ছে না। হলে হবে কি—হাসতে হাসতে আমাদের নেমে পড়বার ইশারা করল।

মরুভূমি ধূ-ধূ করছে, মাঝখানে এইটুকু এক জনালয়। চতুর্দিক তাকিয়ে দেখি, ঝুপসি-ঝুপসি গুল্ম আর আধ-শুকনো লম্বা ঘাস। রাজপুতানায় ট্রেনে যেতে যেতে যেমন দেখতে পান।

আহা কত ফুল ফুটেছে! রং-বেরঙের বাহারের ফুল—তারই মাঝখান দিয়ে পথ। পথ শেষ হল টানা-লম্বা খানকয়েক পাকা ঘর অবধি গিয়ে। নতুন আনকোরা। অফিস ওয়েটিংরুম রেস্তোরাঁ—যা কিছু চান, সমস্ত ঐ। খোপে খোপে ভাগ করা। বারাণ্ডায় উঠে দেখি, আরও আছে—একটু হাসপাতালও। ডাক্তার নার্স ওষুধপত্র গোটা দুই-তিন বেড—ঠিক যেমনটা হতে হয়।

সিঁড়ির মুখে নার্স-ডাক্তার যন্ত্রপাতি সহ লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে। একটু টিলে ভাব দেখিয়েছেন কি বগলদাবায় পুরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিছানায় শোয়াবে। অত উঁচু হিন্দুকুশের চূড়ার উপর দিয়ে এলেন—হৃৎপিণ্ডে বা আর কোন যন্ত্রে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ হওয়া তো উচিত, সেই প্রত্যাশায় আছে ওরা। কিন্তু বীর পদদাপে উঠে যাচ্ছি আমরা—ষোলজনের মধ্যে কারো একটু ধুকপুকানি নেই। শিকার না পেয়ে পরম মর্মাহত ডাক্তার নার্স অতএব নিজ নিজ বিবরে ফিরল।

দুপুর হয়ে এলো, কিন্তু দুপুরের খাওয়া খাবেন অপরাহ্নে তাসখন্দে গিয়ে। প্রাতরাশ এখানটায় সেরে নিন। মরুভূমি জায়গা—দরজা-জানলায় ডবল কাচ লাগানো। দৈবগতিকে একটা ভেঙেচুরে গেলেও আর একটা বইল। বালি আর গরম হাওয়া না ঢুকতে পারে। খাওয়ার জিনিসপত্র দূর-দূরান্তর থেকে আনতে হয়। টিনের মাছ খাওয়াল—খাসা। লাল পাঁউরুটি, চিজ—চমৎকার। মাখন—অতুলন। সসেজ—উপাদেয় স্বাদ। কোন কোন মশলায় বানানো হে? আরে, ছ্যা, এখনকার সালে এমন ব্যক্তিও পথে বেরোন—সসেজ বস্তুটা থোড় জাতীয় তরকারি বলে যিনি জেনেবুঝে আছেন। হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়েছি ক'জনে, চেখে চেখে উনি তারিফ করে খাচ্ছেন—কে যেন এমনি সময় বলল, শুয়োরের মাংসে চর্বি বেশি বলেই স্বাদ এত চমৎকার। তখন তাজ্জব অবস্থা—গিলতে পারেন না, আবার এত লোকের মধ্যে থু-থু করে ফেলেন বা কোন লজ্জায়?

· হেলকালে প্লেটভরতি ক্যাভিয়ার এলো। টেবিলের সব চেয়ে উপাদেয়

পদ। বিপ্লবের পর তামাম দুনিয়া রুশকে বয়কট করল, রুশের এই ক্যাভিয়ার শুধু বাদ। দিয়ে যথারীতি তার ব্যাপারবাণিজ্য চলে। যে ভোজে ক্যাভিয়ার নেই, সে ভোজের কৌলিন্য কেউ মানে না। সেই বস্তু পাতের কোলে নিয়ে এসেছে। মাছের ডিম—লালচে রঙের। কালো রঙেরও দেখেছি। ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে মণিমুক্তার মত তোলে। মণিমুক্তারই তুল্য মূল্য দেয় এরা, শত কণ্ঠে যে রকম ব্যাখ্যান করছে। বড় চামচের পাকা দুটো তুলে নিলাম—ফুরিয়ে গেলে কি জানি, আর হয়তো নিয়ে আসবে না—মনে তখন ক্ষোভ থেকে যাবে। লোভে পড়ে মুখ ভরতি করে নিয়েছি —তার পরে অবিকল সেই ভদ্রলোকের সন্দেশ ভক্ষণের ব্যাপার। ক্যাভিয়ার খেতে খেতে সাহেবলোকেরা নাকি সপ্তম স্বর্গে ওঠে—আমার কাছে কিন্তু শুধুমাত্র মাছের পচা ডিম, আঁশটে গন্ধ। ভীত হয়ে উঠেছি, শারীরিক প্রক্রিয়া বিশেষে খানা-টেবিলের যাবতীয় বস্তু এবং সকলের খাওয়া নষ্ট করে না দিই। সারা সোবিয়েতে ঐ বস্তু তার পর বহুবার টেবিলে দেখা দিয়েছে! কত অনুরোধ-উপরোধ! আহা, দেখুন না চোখে। সখেদে নিশ্বাস ছেড়েছি: লোভ তো হচ্ছে ভাই, কিন্তু বোকার মতন আগেই যে পেট ভরতি করে ফেলেছি, দাঁতে কাটবারও শক্তি নেই। আর কাণ্ড শুনুন—ফিরে এসে এবার কলকাতা শহরের এক উগ্র-আধুনিক ভোজেও ঐ ক্যাভিয়ারের সাক্ষাৎ পেলাম। বিস্তর মূল্যে টিনে ভরতি হয়ে এসেছে। আমি একেবারে আদিস্থান ঘুরে এসেছি, খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে—এইটাই সকলে ধরে নিল। তাই বেঁচে গেলাম। কয়েকটি ভদ্রসন্তান খাচ্ছেন, এবং আনন্দে যেন গলে গলে পড়ছেন। শক্তি ধরেন বটে ওঁরা। কায়ক্লেশে গলাধঃ-করণ মাত্র নয়, সেই সঙ্গে স্ফূর্তি দেখানো।

যাকগে, যাকগে। খানাপিনা অন্তে সিগারেট ধরিয়ে এরোড্রোমের প্রান্তে মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম (বেঢপ লম্বা সিগারেট—আমাদের দেড়গুণ তো হবেই। অর্ধেকটা ফাঁকা—কাগজের নল মাত্র, ঐ পথে ধোঁয়া এসে কণ্ঠ-নালীতে ঢোকে)। একটুখানি ঘুরে ফিরে দেখবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না। শুনতে পাই, লৌহ-যবনিকার দেশ—যেটুকু সদয় হয়ে দেখাবে, তাই সকলে দেখেশুনে যায়। নিজের ইচ্ছেয় কোথাও গিয়েছ কি ক্যাঁক করে টুঁটি ধরবে। আজ্ঞে হাঁা, এমনি ভয়াবহ বৃত্তান্ত আপনারা শুনেছেন, আমিও শুনেছি। ভয়ে ভয়ে তাই এগুচ্ছি—এক পা বাড়াই, এদিক-ওদিক তাকাই। কারো দৃকপাত নেই। তখন পুরোপুরি সীমানার বাইরে এলাম। বিস্তর হেলিকপ্টার ত্রিপল দিয়ে ঢাকা কয়েকটা সৈন্যও দেখলাম। আমি একটা

মানুষ চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে পাদচারণ করছি, কেউ তারা আমলে আনল না। মাইলের পর মাইল ক্যাকটাস জাতীয় গুল্ম। দোভাষি পাকড়ানো গেল একটা। সে বলে, সমস্ত আর্জানো মশায়। বিস্তর ঝঞ্ঝাট। আগে গবেষণা করে দেখা হল, কোন গাছ হতে পারে এই সব জায়গায়। এবং কি কায়দায় তার চাষ হবে। গাছে দেখুন শুধু কাঁটা—ফুল নেই, ফল ধরবে না, দেখতেও সুন্দর নয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় এগুলো। সেই ছাইয়ের উপর আবার চাষ হয়, আবার পোড়ায়। বন্ধ্যাত্ব মুছে যায় এমনি ভাবে, জমি ক্রমশ ফসল ফলাতে শেখে। তার নমুনা ঐ এদিকে-সেদিকে সবুজ ক্ষেতের টুকরো আর সারবন্দি গাছপালা। গাছগুলো পাহারাদার—সীমানা পাহারা দিচ্ছে, মরু-ভূমি বালু উড়িয়ে এনে খাঁটির মধ্যে চুপিসারে সারে না ঢোকে।

নদীর ধারে ফ্যাক্টরির সুদীর্ঘ চোঙে ধোঁয়া উঠছে। কিম্বা হুশ-হুশ করে উড়ছে যেন মরুবিজয়ের কেতন।

একজন, নাম জেনে রেখে কি হবে? ডক্টর ধীরেন সেন—আজ তিনি ইহলোকে নেই। ওদের আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছেন। বারাণ্ডায় সারি সারি বেঞ্চি, নানান ধরনের লোক বসে দাঁড়িয়ে। এরোড্রোমের কর্মী প্রায় সবাই—কেউ ড্রাইভার, কেউ বা অন্য কিছু। বেশির ভাগ উজবেকি। তাতার আছে, রুশও দেখছি একটি। বেঞ্চির উপর চেপে বসে আমাদের মানুষটি পাশের লোকের হাত টেনে নিয়ে নিবিষ্ট ভাবে দেখতে লাগলেন। কাঁচা-পাকা দাড়ি লোকটার—আমাদের গ্রাম্য চাষীদের মতন। জাতে উজবেকি, ধর্মে মুসলমান। কথা বোঝে না, কিন্তু কোরানের বয়েৎ বোঝে। রোজা রাখে, নমাজ পড়ে পাঁচ ওখত। মোরগকে আমরা বলি কুকড়া, ওদের ভাষায় কুড়া।

তখন আর যাবে কোথা! ভারতের মানুষ যখন, করকোষ্ঠি মারণ-উচাটন ঝাড়ফুঁকে নিশ্চিত মহামহোপাধ্যায়। চারিদিকে ঘিরে ধরল তাঁকে। দো-ভাষিকে টেনেটুনে নিয়ে এলো—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি রায় দেন, জেনে বুঝে নিতে হবে তো! আমাদের মানুষটিও কল্পতরু হয়ে উঠেছেন, সুখসৌভাগ্য দেদার বিলোচ্ছেন। গ্রহের কুদৃষ্টি একেবারে যে নেই, তা নয়—সদয় হয়ে প্রতিষেধকও বাতলে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে।

মক্কেলের ভিড় অতিরিক্ত হওয়ায় আর দু-একজন আগুয়ান হলেন। এঁদেরও জমে উঠল। কমবয়সি এক মেয়ে—বিশ-বাইশ বয়স—এগিয়ে এল। হাসকুটে মেয়ে, হাসপাতালের কর্মী। ডাক্তার-নার্সের কাজে সোবিয়েতের মেয়েরা হু-হু করে উৎখাত ছেলেদের করে ফেলেছে। প্রায় একচেটিয়া করে তুলল। মেয়েটা

এসে জো হাত বাড়িয়ে দিল। গণৎকার বললেন, তুমি যে শিল্পী! যে কাজই করো, শিল্পীর স্বভাব তোমার।

ঘাড় নেড়ে মেয়েটা স্বীকার করে, হাঁ—

দুই বিয়ের যোগ আছে দেখছি।

হেসে সে গড়িয়ে পড়ে, দু-দুটো—ওরে বাবা!

গণৎকার স্থিরদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে বললেন, একটা ছেলের দিকে মন পড়েছে—মনস্থির করতে পারছ না তুমি।

ভালমন্দ এবারে কিছু বলে না মেয়েটা, গম্ভীর হয়ে থাকে।

বিয়ের দেরি আছে, অনেক বয়সে বিয়ে হবে তোমার।

মুখ শুকনো হল হাস্যমুখ মেয়েটার।

আমি রসভঙ্গ করি, আহা, কি সব হচ্ছে চলুন, চলুন—উঠে পড়তে হবে এবার।

বেলা পৌনে-একটা (ভারতের সময়)। প্লেন গর্জন করে উঠল। পাক দিয়ে আকাশে উঠছি। সজীক্ষেত ঘরবাড়ি চাষ-করা কাঁটাবন গাছগাছালি ছাড়িয়ে আবার দিগব্যাপ্ত মরুভূমি। আমুদরিয়ার ধারে ধারে চলেছি।

চলেছি, চলেছি। শুধুই বালি, আর কিছু নয়। দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, আর এখন বাইরে তাকাইনে। চাঞ্চল্যের এক ঢেউ এসে পড়ল হঠাৎ। এয়ারহোস্টেস বলে ওঠে, সমরখন্দ! পুরানো শহর সমরখন্দের উপর দিয়ে উড়ছি। জানলায় জানলায় আমরা সকলগুলি প্রাণী। মধ্য-এশিয়ার গৌরীবরণ মরু-প্রান্তরে শহরটাও একটি তিলের মতন দেখাচ্ছে উঁচু থেকে। 'প্রিয়তমার অধরের একটি তিলের লাগি' এমন একটা-দুটো শহর দান করতে মুশকিলটা কি তবে?

আবার নদী, বেশ বড়সড় আছেন। ইনি শিরদরিয়া। মরুর সঙ্গে জলা-শয় গলা-ধরাধরি করে চলেছে এখন। একটা জিনিস বেশি রকম নজরে আসছে—দীর্ঘ জ্যামিতিক রেখায় গোটা অঞ্চল ভাগ করা। চৌকো, তে-কোণা—নানান রকমের ক্ষেত্র। যেন গোটা দেশখানা টেবিলের উপর ফেলে ইচ্ছামতো খাল কেটে রেলগাড়ি বসিয়ে চিত্রবিচিত্র করেছে।

শিরদরিয়া চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে-সেদিকে ডালপালা বেরিয়ে গেছে। শেষটা মূল-নদী ছেড়ে একটা শাখার উপরে চলেছি। ডাইনে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের বিস্তর ঝরনা গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে পড়েছে। ঝিকমিক করছে, দশ-বিশ গণ্ডা আয়না ধরে আছে যেন চতুর্দিকে। খাল কেটে কেটে জল পৌঁছে

দিচ্ছে দেশের অন্ধিসন্ধিতে, মরুভূমির মুঠো থেকে জায়গাজমি ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ ফসল ফলাচ্ছে, বসত বানাচ্ছে। মরুর এখানে-সেখানে জনপদ ছড়ানো।

মুশকিল হয়েছে, এয়ারহোস্টেস মোটে ইংরেজি জানে না। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কি গল্প জমাবেন—সে জো নেই। ওঁরা ক-জনে জেরমেনের সেই পুরানো ব্যবসা ধরলেন। প্রেমচাঁদ ক-গণ্ডা রুশ কথার সাহায্যে যথাসাধ্য বোঝাচ্ছেন। মেয়েটার ডানহাত মেলে ধরে হস্তরেখার পাঠোদ্ধার করছেন, দুই বিয়ে হবে তোমার। সে কিছু বলে না, বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল। বিয়ের দেরি আছে—একটিকে মনে ধরেছে, কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না। খিল খিল করে মেয়েটা হাসিতে ফেটে পড়ল, হাসি থামে না কিছুতে। হাসি থামিয়ে শেষে বলে, বিয়ে হয়ে গেছে আমার। এক বাচ্চা আছে। বেকুব, কী বেকুব!

প্লেন কাত হয়েছে। নামছে। তাসখন্দে এসে পড়েছি যে। উজবেকিস্তানের রাজধানী—পুরানো জায়গা, বিস্তর নাম।

॥ পাঁচ ॥

প্লেন থেকে নামতে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা। হাতে হাতে ফুলের তোড়া, নানান প্রতিষ্ঠান থেকে স্টেশনে এসেছে। খাসা এরোড্রোম, বিরাট গ্যাংওয়ে। বিস্তর প্লেন ওঠানামা করে। পরিচয়াদি শেষ করে সীমানার বাইরে এলাম। মোটরকার, মোটরট্রাক—গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। অথচ খাস-রাশিয়া নয়, উজবেকিস্তান। বছর তিরিশেক পিছিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন—মধ্য-এশিয়ার অতি গরিব এক দেশ। উজবুক বলে বাংলায় এক গালি চলিত আছে জানেন তো, সেই থেকে সেদিনের বাসিন্দাদের অবস্থা বুঝে নিন। মরু ও স্তেপভূমি খাঁ-খাঁ করছে, তার মাঝখানে বিশাল ওয়েসিসের উপর শহর। সে কালের শহরের অল্প নমুনা এখনো দেখতে পাবেন। শহর আসলে দুটো—পুরানো আর নতুন। ভাল মতন জোড় পড়ে নি, চেহারার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

হোটেলে পৌঁছানো গেল। বিরাট অট্টালিকা—ষাট বছর আগে বানানো। গোড়া থেকেই হোটেল এখানে। পুরানো দেয়াল-ছাতে হাল আমলের পলেস্তারা পড়েছে, এখানে-ওখানে একটু বদল-সদল করে হাল আমলের আরাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এক বিপদ, কল-পায়খানার সংখ্যা অতিমাত্রায় কম। বিশ-পঁচিশ জনের ভাগে এক-একটা পড়েছে। গোটা মধ্য এশিয়া জুড়ে এই দেখলাম। ওদের অসুবিধা হয় না। স্নান এক রকম বিলাসের বস্তু, এবং অপর শারীরিক ব্যাপার সম্পর্কেও ওরা নাকি অতিমাত্রায় মিতব্যয়ী। কিন্তু আমরা তো মারা পড়ি মশায়।

দোভাষিও কম দিয়েছে। দুটি মেয়ে—একটি এই উজবেকিস্তানের, হাসি-য়ানা (পরে জানলাম, হাসিয়ানা বলে ডাকে বটে,—বিশুদ্ধ নাম হাসিয়াৎ)। অন্যটি রুশ—মারা। রুশ-মেয়েদের এমনি এদেশি নাম হরদম পাবেন। আমা-দেরই দলে দুটি মেয়ে দোভাষি ছিল—যাঁরা আর ইরা।

কী রূপ হাসিয়ানার। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স। বাপের নাম বলুল আবদুল বা ঐ গোছের কিছু। স্বাস্থ্যবতী লম্বা ছাঁদের মেয়ে, দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রং, নাক-চোখ টানাটানা, কালো ভ্রূ, ঘন কালো মাথার চুল। এই মেয়েটাই শুধু নয়, এ তল্লাটে মেয়ে পুরুষ অনেকেরই ভাল চেহারা। খাস-রাশিয়ার শ্লাভ জাতীয় মেয়ে বিস্তর নিরেশ এদের তুলনায়। গোলগাল মোটা-সোটা—ঐ যেমন চাটুর উপর আটার তাল রেখে হাতের থাবড়া দিয়ে রুটি বানায় না, সৃষ্টিকর্তা সেই প্রক্রিয়ায় বুঝি বানিয়েছেন। আর কোন শিল্পী যাবতীয় সুষমার মশলা দিয়ে বাটালি ধরে কুঁদে কুঁদে গড়ে তুলেছেন এদের প্রতিটিকে।

যাকগে, যাকগে, ব্যাঙ্কুয়েটে বসে গেছি। বিকাল চারটেয় মধ্যাহ্ন-ভোজন। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার নিমন্ত্রণে যেমনটা হয়ে থাকে। টেবিলে ঠাসাঠাসি, হলের মধ্যে পা ফেলা যাচ্ছে না—জায়গার তুলনায় মানুষ তবু বেশি। বিস্তর রকমের পদ, গুনতিতে আসে না। টিনের মাছ, কাঁকড়ার তরকারি, রকমারি মাংস ও শাক-সবজির পর স্তূপ এনে হাজির করল। তার পরে পোলাও এ অঞ্চলের আদি বস্তু—খাঁটি ঘিয়ে বানানো, গন্ধ ভুরভুর করছে। কিন্তু তখন একেবারে উপায় নেই। এক চামচে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

ধর্মের কথা উঠল। মুসলমান প্রায় সকলে। হাসিয়ানা পাশে বসেছে; সে হেসে বলে, নানান দিকে এত কাজ আমাদের যে ধর্মকর্মের সময় পাইনে। নবীন কালের এরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রবীণেরা রীতিনিয়ম মানেন—গোল টুপি মাথায়, মুখে দাড়ি, পরণে প্রাচীন পোশাক—পথে পার্কে এমন অনেককে দেখলাম। তাজিকিস্তানে এই দল আরও ভারী; জুম্মাবারে মসজিদে জায়গা পাওয়া দায়। পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে যাদের বয়স, অর্থাৎ বিপ্লবের পরে যারা জন্মেছে তাদের সাজ-সজ্জা রীতিনীতি পুরোপুরি আধুনিক ধাঁচের।

বিপদ শুনুন। খাওয়া-দাওয়া অন্তে কাপড় বদলাতে ঘরে গিয়েছি। যৎ-সামান্য দেরি হয়ে থাকবে—অর্থাৎ খানিক বা শয্যায় গড়িয়ে খানিক বা উঠে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছি—বেরিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ, গাড়িগুলো আর সবাইকে নিয়ে শহরে চক্কোর দিতে বেরিয়ে গেছে। আমাদের একটু মুখের কথাও বলে গেল না।

চারজনে পড়ে আছি—আমি, জ্ঞান মজুমদার, ধীরেন সেন এবং পার্লামেন্টের মেম্বার হায়দরাবাদবাসী শ্রীযুক্ত ডাগে। নতুন জায়গা, কোথায় যাই, কি করি—ওঁরা তো একেবারে অপেরা দেখে ফিরবেন রাত্রি এগারোটা-বারোটায়। ঘোর-ঘোর থাকতে পুনশ্চ উড়তে শুরু করব,—শূন্য হোটেলে বসে বসে হেলায় নষ্ট হচ্ছে সময়টুকু।

একজন বলেন, বেড়ানো যাক একটু ঘুরে ফিরে—আর কি হবে?

নিচের তলায় হোটেলের অফিসে গেলাম। শতেক উপায়ে বোঝাতে চেষ্টা করি, কেউ ইংরেজি জানে না। গণ্ডা দেড়েক রুশ কথার সম্বল, তারই একটা ছাড়লাম—ডেলিগাৎসি। অর্থাৎ প্রতিনিধি দলের আমরা। তখনই কিঞ্চিৎ বুঝল, একজনে ছুটে বেরিয়ে অচিরে এক ইংরেজি-নবিশকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তড়বড়িয়ে ইংরেজি বললেন তিনি খানিক—ইংরেজি শব্দ দু-পাঁচটা ছড়ানো আছে, কিন্তু আর যা-ই হোক ইংরেজ জাতির ভাষা সেটা নয়। আমার এই দেড় ঘণ্টার সম্বলে হরদম যদি রাশিয়ান বলে যাই, যে বস্তু দাঁড়াবে তাই। কতকটা ভাষায় কতক বা মুখ-চোখ-হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল। বুঝলেনও তিনি বিস্তর ধস্তাধস্তির পরে: দেখা যাক, কি করতে পারি।

দশ বিশ জায়গায় ফোন করলেন। গাড়িগুলো এখন কোন মহল্লায় ঘুরছে, পাত্তা মেলে না। বললেন, আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা হল। এক্ষুনি এসে তোমাদের চারজনকে তুলে নেবে। দেখ, খুঁজে পেতে পাও যদি সাথীদের।

সারা শহর টহল দিচ্ছি, তারা কর্পূর হয়ে উবে গেল না কি? এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি জনারণ্য। সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে; ট্রাফিক-পুলিশ ছুটোছুটি করছে—সামলাতে পারছে না। হয় কোন গুরুতর রকমের দুর্ঘটনা···আমাদের ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে ইসারা করে, উঁহু—নেমে পড়ো। তোমাদেরই দল, গাড়ি দেখছ না, ঐ যে!

তাই বটে। পার্কে নেমে পড়েছেন ওঁরা। মস্কোয় আছে রেড-স্কোয়ার এর নামও তাই। অজস্র ডালিমগাছ—ফুল ফুটেছে, ফল ফলেছে। এই সমস্ত দেখছেন ওঁরা, আর শহরের অর্ধেক লোক সেখানে ভেঙে পড়েছে। আত্মপ্রসাদ জাগে মনে মনে। দেশেঘরে আপনারা হেনস্তা করলে কি হবে, বাইরে এসে বুঝে নিন কি দরের মানুষ আমরা। সাংস্কৃতিক দল পৌঁছেছে, খবর বেরিয়ে গেছে কাগজে—কাজকর্ম ফেলে মানুষ পাগল হয়ে ভিড় জমাচ্ছে। প্রায় তো পাগলামির ব্যাপার—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমাদের প্রতিজনকে, দেখে দেখে যেন আশা মেটে না। তা দেখুক, ভাষায় আলাপ জমাতে পারছে

না—চোখের দেখায় ভারত-সংস্কৃতির স্বাদ নিচ্ছে।

একটি মুখে হঠাৎ শুনতে পাই—নার্গিস। চমক লাগে। দোভাষিকে কাছে ডেকে লোকটা কি-সব বলল। সপ্রশ্ন চোখে দোভাষির দিকে তাকাই। দোভাষি বলে, নার্গিস কে আছে তোমাদের মধ্যে তাই জিজ্ঞাসা করছে। অবস্থা মালুম হল তখন। খুঁজছে ওরা আমাদের নয়—ফিল্মের মানুষগুলোকে। ভারতের ছবি নিয়ে খুব হৈ-হৈ চলছে তখনও, আওয়ারা ও দো-বিঘা জমি জোরদার চলছে। ফিল্মের একটা দল তামাম সোবিয়েৎ দেশ চষে বেড়াচ্ছেন। কাগজে কাগজে তাঁদের ছবি ও খবরাখবর। ভারতের লোক দেখে আন্দাজ করেছে, সেই দলটি এসে পড়ল আজ তাসখন্দে। আন্দাজ অকারণ নয়। আমাদের নেতা মশায়ের শিরে রঙিন পাগড়ি, কণ্ঠে কাঁচা-পাকা দাড়ি, যে ওভারকোট পরেছেন তার কলারে ফারের বুনুনি; দড়ি আর ফারে মিলেমিশে একশা হয়ে গেছে। বেঁটে মানুষ সকলের আগে আগে চলেছেন, সিনেমার মেক-আপ নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়েছেন—আনাড়ি মানুষ মনে করে বসে। অতএব প্রশ্ন আসছে, রাজকাপুর কে তোমাদের মধ্যে? নার্গিস কোন জন? রাজকাপুর বলে কাউকে দেখিয়ে দিয়ে পশার জমানো অসাধ্য নয়, কিন্তু নার্গিস ···কে নার্গিস হতে পারেন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। দলের মধ্যে মহিলা আছেন বটে, কিন্তু ছবির নায়িকা হিসাবে চলে না। অতএব মানে মানে গাড়িতে ঢুকে পড়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিনে। পালাবার সময় দোভাষি পরিচয়টা দিয়ে দিল—সিনেমার নয়, সাংস্কৃতিক দল এরা। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তখন ছোটে। ছায়াবিহারীরা কান্না ধরে ঘুরছে, এই আন্দাজে এতক্ষণ দেখেছে; সংস্কৃতির পাঁচমিশেলি মানুষগুলোকে এবার আর এক চোখে একটু-খানি দেখতে চায়। গাড়ির বেগ কমাতে হল, ভিড় বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে এগুচ্ছি। জনতার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রসন্নতায় মন ভরে যায়। আহা, কী সব চেহারা! কুরূপ-কুৎসিৎ একটা নজরে পড়ে না। অপ্সরীর মতো এক পরমা রূপসী দেবশিশুর মতো কোলের বাচ্চাটার হাত বাড়িয়ে ধরলেন শেকহ্যাণ্ডের জন্য। গাড়ির জানলায় হাত বের করে সেই তুলতুলে হাত-টুকুন ছুঁয়ে দিলাম।

শহর চক্কোর দিচ্ছি। পুরানো শহর, নতুন শহর। পুরানো শহরে ছোট-খাটো বাড়ি বিস্তর—আমাদেরই দেশের ধাঁচ। টিন ও খড়ে-ছাওয়া চালু ছাত, ছাতের উপরে মাটির লেপ দেওয়া; ধোঁয়া বেরুবার জন্য ছাত ফুঁড়ে একটু চিমনি বেরিয়ে এসেছে। নতুন শহরের একেবারে আলাদা চেহারা। পিচ-দেওয়া প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় দোকান, কংক্রিটে তৈরি আকাশ-ছোঁয়া ঝকঝকে

বাড়ি। কার্ল মার্কস স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—তিন কামরা ট্রাম চলছে, আবার কলকাতার মতো দুটোও দেখছি। ফ্যাক্টরি অজস্র। খুব ব্যস্ততা চতুর্দিকে। আর একটু এগিয়ে তুলার গুদাম। তুলার গাঁইট সাজিয়ে সাজিয়ে পাহাড় করে রেখেছে। তুলা-অঞ্চল এটা—দেশ জুড়ে তুলার চাষ। এমন ফলন আর কোথাও নেই। ফ্যাক্টরিও বেশির ভাগ তাই সুতা ও কাপড় বানানোর।

আগের আমলে এমন ছিল না, যে ক'টা ফ্যাক্টরি সমস্ত খাস রাশিয়ার। এশিয়ার মধ্যে নয়, পুরোপুরি য়ুরোপীয় তল্লাটে। চাষের তুলা চালান হয়ে যেত সেখানে। এ সব দেশ জারের জমিদারি, কাঁচা মাল জোগান দেবার জায়গা। আজকের আলাদা নীতি। কাঁচা মাল দূরদূরান্তরে বয়ে খরচ ও ঝামেলা বাড়ানো হবে না। যেখানকার মাল সেখানেই ফ্যাক্টরি বানিয়ে কাজে লাগাও।

আর চাষই বা কতটুকু হত সে আমলে। মাটি হাঁ করে থাকত এক ফোঁটা জলের পিপাসায়। অঞ্চলটার পুরানো নামও তাই—ক্ষুধার্ত স্তেপ (Hungry Steppes)। রিক্তভূমি খাঁ-খাঁ করছে, আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার কিনারা ধরে সামান্য ফসল ফলে। আজকে দুই নদীর তাবৎ জলধারা মাঠে মাঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিরদরিয়ার তো এক বালতি জলও আর অকারণ বয়ে যেতে দিচ্ছে না। আমুদরিয়ার উপর লেগে গেছে এখন, আষ্টেপিষ্টে বাঁধ বেঁধে বেঁধে গোটা নদী মুঠোর ভিতর নিয়ে আসছে।

ফরহাদ হল শিরদরিয়ার উপর সব চেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ-স্টেশন।

আরে সর্বনাশ, ফরহাদ কে জানেন না? উজবেকিস্তানের পুরানো প্রেমগাথা সিরিফরহাদ—ফরহাদ প্রেমিক, রূপসী সিরির সে প্রেমে পড়ল। সিরিও আকুল হয়ে ভালবাসে ফরহাদকে। তবু মিলন হয় না। জলের অভাবে ফসল হচ্ছে না, দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। এর মধ্যে সিরি ভালবাসার নীড় বাঁধবে কোন লজ্জায়? ফরহাদ বাঁধ বাঁধতে গেল শিরদরিয়ায়। বাঁধ বেঁধে জলধারা নিয়ে আসবে ক্ষেতে ক্ষেতে, তৃষ্ণার্ত মাটির মুখে জল দেবে। হল না, দুর্বার শিরদরিয়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল ফরহাদকে। এত কাল পরে ১৯৪৮ অব্দে দরিয়া বন্দী হয়েছে। নতুন কালের কত সিরি ঘরকন্না করছে এবার মনের সাধে।

অনেকক্ষণ থেকে তাগিদ দিচ্ছে অপেরা-হাউসে যাওয়া যাক—দেরি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস্তবাগীশ—আটটায় পালা আরম্ভ, সাতটাও বাজে নি, বলছে কিনা এখনই চলুন। শশধর মামার ট্রেন ধরা আর কি! বলতেন, বলা যায় না রে বাপু! আজকে যদি এক ঘণ্টা আগেই গাড়ি এসে পড়ে। তার চেয়ে

ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে বসে বিড়ি ফুঁকিগে।

ওরা বলছে আজ্ঞে না—নিশ্চিন্তে বসবার সময় কোথা? পালা আরম্ভের আগে বাড়িটা দেখতে হবে। একটা ঘণ্টার নমো-নমো করেও তো হয়ে উঠবে না।

তাড়া খেয়ে গাড়ি পুরো দমে ছুটতে ছুটতে অপেরা-হাউসে এসে হাঁপাতে লাগল।

বাড়ির কাজ এখনো শেষ হয় নি, অলঙ্করণ চলছে দেয়ালে দেয়ালে। উঠানে মস্ত বড় ফোয়ারা—এক'শ ছাব্বিশটা মুখ। প্রকাণ্ড এক কার্পাসফল, খোলা ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে—জলধারা বেরিয়ে আসছে তার ভিতর থেকে। কার্পাসফলটা ক্ষেতের নয়, তিন-চার জনে বেড় দিয়ে ধরতে পারে না, অত বড় ফল গাছে ফলে না তা ওরা চাষবাস নিয়ে যত দেমাকই করুক। পাথর কেটে বানানো। অপেরা-বাড়ি না ঢুকে চুপচাপ এই ফোয়ারার পাশে খানিকক্ষণ হাত-পা মেলে বসতে ইচ্ছে করছে। সময় কোথা?

যা বলেছে—এক ঘণ্টায় কিছু দেখা হয় না। বাড়িটা অনেক বেশি মজাদার অপেরার চেয়ে। ছাতে দেয়ালে অপরূপ কারুকর্ম ও ছবি। উজ-বেকিস্তানের ছটা বিশেষ অঞ্চলের নামে ছ'টা হল হয়েছে। নিচের তলায় ফরগনা হল ও তাসখন্দ হল। ফরগনা শ-দুই মাইল এখান থেকে—সেই যেখান থেকে বাবর শা হিন্দুস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দোতলার একদিকে বোখারা হল। অন্যদিকে সমরখন্দ হল। মাঝের সব চেয়ে বড় হলটা মানুষের নামে—আলি শের নবাই হল। আলি শের হলেন জাতীয় কবি, উজবেকি সাহিত্যের জনক; নিজে উজির ছিলেন যদিচ, সাধারণ মানুষের হয়ে আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে বিষম লড়াই লড়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত-বাণী—তুমি যদি মানুষ হও, যে জনমঙ্গলের জন্য কাজ করে না, কক্ষণো তাকে মানুষ বলে খাতির কোরো না। পনের শতকের মাঝামাঝি জন্ম; ১৮৪৮ অব্দে পাঁচ শ বছর পুরল, তাই নিয়ে জাঁকিয়ে উৎসব হয়ে গেল। সিনেমা-ছবি হয়েছে আলি শেরের জীবন নিয়ে। আর অপেরাবাড়ির এত বড় হল তাঁর নামে।

তেতলায় উঠে গেলাম। খিবা হল। পাশে তরমেস হল—সেই যে সকালবেলা যেখানে নামলাম। তরমেস জায়গাটা নিতান্ত অর্বাচীন নয়, জনপদের ঠাট আছে শ পাঁচেক বছর ধরে। এই হল ছটোর কারুকর্ম চলছে এখনো, শেষ হবার দেরি আছে। কী কাণ্ড, কত অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়—দেখে তাজ্জব হতে হয়। যে নামের হল, সেই অঞ্চলের শিল্প-রীতি তুলে ধরা হয়েছে ছাতে-দেয়ালে। পুরানো ইতিহাস ছবি করে আঁকা হয়েছে।

সেকালের ব্যাপার শুধু নয়, নিতান্ত হাল আমলেও বাদ পড়েনি। অর্থাৎ অপেরা দেখতে এসে দেশভুঁইগুলোও ভাল করে জেনে বুঝে যাও। মস্কোর কৃষিপ্রদর্শনীতে মেট্রো-স্টেশনগুলোয় কি বিরাট কাণ্ড করছে, স্বচক্ষে না দেখে তার আন্দাজ পাবেন না। দু-হাতে টাকা ঢেলেছে বললে কিছুই বলা হয় না, আহার নিদ্রা বাতিল করে দিয়ে সারাদিন ও সমস্ত রাত্রি টাকা ঢাললেও দু-খানা মাত্র হাত দিয়ে ক'টা টাকাই বা ঢালা যায়? ওদের টাকা ওরা খরচ করে, চোখ দেখেই আমাদের বুক করকর করে। মেট্রো-স্টেশন নিয়ে একদিন কথা হয়েছিল—পাতালপুরীর মধ্যে কোটি কোটি টাকা ঢেলে দিয়েছে, কি কাণ্ড! ওদের একজন বলল, টাকার এমন সার্থক খরচ আর হয়নি কোথাও। লাখ লাখ লোক রোজ ওঠানামা করে—তারা দেশভুঁইকে চিনছে, শিল্পরুচি গড়ে উঠছে তাদের ভিতর, সমগ্র সোবিয়েত-ভূমি নিয়ে ঐক্যচেতনা জাগছে···

যাকগে, এ সমস্ত পরে আসছে। হলগুলো দেখে-শুনে তার পরে পালা দেখতে ঢুকলাম। উপর নিচে চতুর্দিকে হাততালি। কোন লাটবেলাটেরা এসে কৃতকৃতার্থ করল যেন। টিকিটের দাম শুনলাম দুই রুবল থেকে ষোল রুবল। এক রুবল হল একটাকা দুই আনার মতো, অতএব হিসাব করে নিন। রোজই কিছু না কিছু হয় এখানে—কোনদিন নাটক কোনদিন অপেরা কোন-দিন বা নাচ। এই তল্লাটের ওবং লোক-নৃত্য দেখানো হয়। আজকে হচ্ছে পুশকিনের লেখা এক পালাগান, চেকবস্কি সুর দিয়েছেন। বড় ঘরের প্রেম—মান-অভিমান-দুঃখ-বেদনার পরে অবশেষে মিলন। গোটা পালাটা ছেঁকে ফেলে আপনি এক কাচ্চাও হিতোপদেশ পাবেন না, শিক্ষণীয় কিছুই নেই, নিছক রোমান্স। সেকেলে ধনীদের ঘরবাড়ি বাগান। সিনসিনারি ভাল, তবে আহা-মরি কিছু নয়—আমাদের দেশে দেখে থাকি এ রকম। আলোক-প্রক্ষেপণটা ভারি চমৎকার। দোতলা ও তেতলা থেকে কোণাকুণি আলো ফেলছে—নানা রঙের গোটা পনের আলো। কনসার্টই অপেরার প্রাণ—স্টেজের নিচে এবং সামনাসামনি প্রেক্ষাঘরের খানিকটা ঘিরে নিয়ে কনসার্টের জায়গা। ব্যাণ্ডমাস্টার বই দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে, বাজনার সঙ্গে নিখুঁত মিল রেখে অপেরার গান ও কাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে।

সকলের সামনের সারিটা আমাদের জন্য রিজার্ভ করা। পর্দা ঠেলে এক শিল্পী বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভারতীয় অতিথিদের। ভারতের জয় হোক, ভারত সর্বসমৃদ্ধ হোক, ভারত ও সোবিয়েতের প্রীতি চিরজীবী হোক। তার পরে পালা শুরু। পাড়াগাঁয়ে বড়বাড়ির সংলগ্ন উঠান। বাঁশবন অদূরে—গান আসছে আড়াল থেকে। কাঠের টেবিলের ধারে বাড়ির

গিন্নি উল বুনছেন—নায়িকার মা ইনি। নায়িকার দিদিমা অদূরে চাতালের উপর বসে। মা-দিদিমাও গান ধরলেন। অপেরার যা নিয়ম কথাবার্তা হবে না—সবই গানে গানে বলবে। নেপথ্যের নায়িকা দেখা দিল অতঃপর—বাড়ির যুবতী মেয়ে। উঃ স্বাস্থ্য বটে—মন দুয়েকের ধাক্কা। আমাদের মা-লক্ষ্মীরা বললেন, ওমা, মেয়ে কোথায়—মেয়ে ঠানদিদি যে। যেমন-তেমন নায়ক এ জায়গায় প্রেম জমাতে ভরসা পাবে না। শেষটা নায়ক এসে পড়ল—না, নায়িকার মাপসই বটে! মা-দিদিমা ঝি-চাকর চেহারার দিক দিয়ে কেউ কম যান না। বিরামক্ষণে প্রেক্ষাঘরের দিকে ভাল করে তাকাই, জোয়ান মানুষ ও জোয়ান মেয়েমানুষের দেশ—রোগা, ডিগডিগে তো একটাও দেখছি নে।

এক একবার পর্দা পড়বার পর হাততালি। হাততালি শেষ হতে চায় না। সেখানে ঐ গতিক। এ দেশের রেওয়াজই এই। প্রধান চরিত্রেরা বেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে অভিনন্দন নেন।

রাত থাকতে রওনা—ঠিক চারটের হোটেল ছেড়ে বেরুব। শেষ অবধি অতএব থাকা চলল না, আধাআধি দেখে উঠে পড়লাম। প্লেনে মস্কো দশ বারো ঘণ্টার পথ। শেষ রাতে উড়তে শুরু করে সন্ধ্যার কাছাকাছি পৌঁছব পথে কোন রকম বিভ্রাট যদি না ঘটে।

হোটেল অপেরা-হাউস থেকে বেশি দূর নয়। কাঁহাতক গাড়ির অপেক্ষায় থাকি, হেঁটে হেঁটে চলেছি। সঙ্গে হাসিয়ানা। হাসিয়ানা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চ লাগে। মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরে রাত দুপুরে আজ জোরে হাওয়া দিয়েছে। কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ। সুপ্রাচীন শহর বিদ্যুতের আলোয় নতুন সাজসজ্জায় ঝকমক করছে। তিন জন বাঙালি আমরা গরম কোট ওভারকোট মুড়ে পাথরের রাস্তায় জুতো বাজিয়ে চলেছি। ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে এলাম, লোকজন খুব কম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারা। সুন্দর মানুষগুলোর কালো কালো চোখের কৌতূহল-ভরা দৃষ্টি—কী ভাল যে লাগে!

হাসিয়ানা পুরোপুরি নতুন কালের। তরুণী মেয়ে নিশিরাত্রে কুণ্ঠাহীন পায়ে তিন বিদেশিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আর এই শহরেরই এক ব্যাপার—প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে। জারের লোক জবরদস্তি করে সকলকে লড়াইয়ে পাঠাচ্ছে। এক মা পাগল হয়ে রাস্তায় ছুটে এলো, কামানের মুখে ছেলে দেবে না সে—কিছুতে দেবে না। সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মায়ের

উপর, মেরে তাকে শেষ করে ফেলল—জারের লোক নয়, ঐ মায়েরই প্রতি-বেশী আত্মীয়জনেরা। জারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সেজন্যে নয়, জারকে তারাও খুব অপছন্দ করে। মুসলমান মেয়ে হয়ে বোরখা খুলে মুখ দেখাল—হোক না ছেলের মরন-বাঁচনের ব্যাপার—মৃত্যু ছাড়া এত বড় পাপের শাস্তি নেই। এই তাসখন্দেই ঘটেছিল উনিশ শ ষোল সালে। চল্লিশটা বছরও পোরে নি।

আর শুনবেন? বর গিয়েছে বিদেশে। একা নারীর মন হাঁপিয়ে উঠছে ঘরে—বরের কাছে পাঠিয়ে দিল এক গোছা খড় কিম্বা এক টুকরো কয়লা। প্রিয়তম, আমি খড়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছি তোমার বিরহে। অথবা কয়লার মতো কালো হয়ে গেছি প্রিয়তম। লিখতে জানে না তো—এই হল সেকালের মেয়েদের চিঠি। মা-দিদিমারা এমনি অবোলা ছিলেন, হাসি-য়ানাকে দেখে আজকে মানবেন এ-কথা? বলবেন, লোকটা মিথ্যে বানিয়ে বলছে।

এক ঢোক্ চা খেয়ে শুয়ে পড়া যাক এবার। সকাল সকাল উঠতে হবে। চায়ের সঙ্গে এক ধরনের লম্বা বিস্কুট, খাসা লাগল। উঁহু, আর কিছু নয়। নিমন্ত্রণ তো রইল—আসতে হবে এই পথে, থেকে যেতে হবে কয়েকটা দিন। খেয়েদেয়ে সেই সময় তোমাদের সাধ মেটাব।

শেষ রাত্রি। তাসখন্দ শহর আলোর মালা পরে ঘুমুচ্ছে। আমাদের চারটে গাড়ি নিঃশব্দে এয়ারফিল্ডমুখো চলল। এখানকার সময় ভারতের আধ ঘণ্টা এগিয়ে। ঘড়ি ঠিক করে নিই নি, একেবারে মস্কোয় পৌঁছে কাঁটা ঘোরাব।

ঠিক পাঁচটায় প্লেন আকাশে উঠল। বড় গেটে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে সবাই বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন। উপর থেকে শহর আরও অপরূপ। ভূমিতলে তারা ছড়ানো। অগুন্তি তারা—শেষ নেই, সীমা নেই। কাত হচ্ছে প্লেন, সোজা হচ্ছে। পাক দিয়ে এসে পড়ল শহরের ঠিক মাথার উপর যেন ইতিহাসের এক সেরা সুন্দরীর ঘুমন্ত রূপ দেখবার জন্য। আহা, কত হীরা-মানিক জ্বলছে তার সর্ব অঙ্গ জুড়ে। আকাশের তারারা যেমন জ্বলে আর নেভে, শহরের আলোর ঠিক সেই গতিক। কেন তা বলতে পারব না; যেমন চোখে দেখছি, তাই লিখে দিলাম। কতক আলো একেবারে স্থির। কতক বড় বেশি উজ্জ্বল, কতক বুড়ো মানুষের দৃষ্টির মতো মিটমিট করছে। অনেকক্ষণ ধরে প্লেন চক্কোর দিল শহরের উপর। আলো কমে আসছে এবার। মির্মিরীক্ষা ভুবনের উপর এখানে কতকগুলো ওখানে কতক-

গুলো আলোর টুকরো। আরও কম, আরও কম। শেষটা একেবারে নেই। মহা ব্যোমের অতল অন্ধকারে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি।

কাঁচা ঘুমে উঠে এসেছি, চোখ ভেঙে আসছে। অনুমতি দিন আপনারা ছোট এক ঘুম ঘুমিয়ে নিই···

তা নেহাত মন্দ হল না। সাড়ে-সাতটায় চোখ মেলে দেখি, রাত্রি যাই-যাই করছে। বিষম কুয়াশা। রবার দিয়ে ঘষে গোটা বসুন্ধরা মুছে দেওয়ার ব্যাপারটা চোখের উপর দেখছি। রবারে মুছে দিলে কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে যায়। তেমনি ঐ অস্পষ্ট ধরালোকে নজর হেনে যদি কিছু পাওয়া যায়, নিরিখ করবার চেষ্টায় আছি। শিরদরিয়া ধরে যাচ্ছি। পাশে রেললাইন, পিছনে তেপান্তর।

মাঝে মাঝে কুয়াশা একটু বা পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্যাস্পিয়ান সাগরের কিনারে পৌঁছলাম। ক্যাস্পিয়ান নাকি কাশ্যপ ঋষির নামে? এই তল্লাটে ওঁদের চলাচল ছিল, এই হল আর্যদের আদি জায়গা? আকাশ থেকেই বেশ আপন-আপন লাগছে। এক ঘণ্টার বেশি কিনারা ধরে যাচ্ছি সাগর তবু শেষ হয় না।

তার পরে ঘন কুয়াশায় একেবারে তলিয়ে গেলাম. পাহাড়, পাহাড়—কাপেথিয়ান পর্বতমালা ঐ যে! ভোর না হয়ে রাত দুপুর আবার ঘুরে এসে বসল। অন্ধকারের মধ্যে গোঙাতে গোঙাতে প্লেন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

প্রায় তো পাঁচ ঘণ্টা কাটল। সকাল হয় না যে! সর্বনাশ, রাত্রির পরে দিন—সে নিয়ম পালটে গেল নাকি আজ থেকে। তরে পরে মালুম হল। সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে প্লেন। পূব থেকে পশ্চিমে। কে আগে গিয়ে উঠতে পারে? সূর্য জিতলে তবেই তো সকাল! শেষ অবধি তাই হল বটে। আমার ঘড়িতে ৯-৫০। মস্কোর সময় ৭-২৫। অর্থাৎ আড়মোড়া ভেঙে রাত্রি এবার বিদায় নিচ্ছেন।

প্লেন খুব নিচুতে এসে পড়ল। মাটির কাছাকাছি। শহরের মতো দেখা যায়। নদী, পাকা ঘরবাড়ি, রেললাইন। কী সাংঘাতিক কুয়াশা। প্রায় তো ভুঁয়ের উপরে, ক্ষণে ক্ষণে তবু সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ধু-ধু করছে মাঠ। শহরটুকু ছাড়া কাছাকাছি জনবসতি দেখিনে। শুকনো নদীর খাত। কাজাকিস্তান—কাজাকদের দেশ। খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে চোঙ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তেলের খনি-টনি নাকি ওখানে?

প্লেন নামল। জায়গাটার নাম আখচুবিনস্ক। এক ঘণ্টা থাকবে। আজ-কের দুপুরের খাওয়া এখানে। চারিদিকে তৃণময় নিঃসীম স্তেপভূমি। সেকালে

দলে দলে পশু চরাত এই তেপান্তরে। মানুষগুলোও পশু। এখন ঐ তো দেখছেন শহর, ফ্যাক্টরির চোঙ। প্লেনের খোপ থেকে বেরিয়ে নজর হেনে দেখা যাক।

খটখট খটখট ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পান? দুরন্ত যাযাবরের দল তৃণময় তেপান্তরের পশু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁবু খাটানো একদিকে। থাকবে এরা দু-দশ দিন, কিম্বা ভাল লেগে গেল তো দু-মাস। তার অধিক কিছুতে নয়। রক্তে চরে বেড়ানোর নেশা—ঘরদোর বেঁধে পাকাপাকি গৃহস্থালি করবে, তবে তো কাঠের পুতুল ভদ্রলোক হয়ে গেল। ক্লান্ত উটের সারি দিনের পর রাত রাতের পর দিন ব্যাপারির সওদা বয়ে বয়ে বেড়ায়। মারামারি খুনোখুনি লুঠতরাজ ঐ সব ব্যাপারি আর কাজাক-দলের মধ্যে। বেশি নয়, তিরিশটা বছর আগে এলেও এমনি দেখতেন। দেখে যে ঘরের ছেলে সুভালাভালি ঘরে ফিরে যেতেন, এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে।

আজকে দেখুন, ঝকঝকে দালানকোঠা—গেটে দাঁড়িয়ে ওরা ইসারায় ভিতরে যেতে বলছে। দোতলায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্রশস্ত খানাঘরে ভোজনে বসে পড়ুন। মাঠের মধ্যে গাজসুয় আয়োজন করে রেখেছে, কোন-কিছুর অভাব নেই। রেললাইন বসিয়েছে যুগযুগান্তের ক্যারাভানের পথ ধরে। সে লাইন চলে গেল সুদূরের সাইবেরিয়া অবধি। ধমনীর মতো লাইনে লাইনে জালবদ্ধ তাবৎ অঞ্চল, অহর্নিশ ঐ সব লাইন বেয়ে প্রাণপ্রবাহ চলাচল করছে। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এই ব্যাপার। পোল্যাণ্ড-সীমানায় যা খেয়ে এলেন, হুকুম করে দেখুন না, প্রশান্তসাগর-কিনারে খানাটেবিলেও ঠিক সেই বস্তু এনে হাজির করবে। অক্ষাংস আর উত্তর মেরুতে অঢেল ফারাক—ভুগোলে তাই বলে বটে, কিন্তু দূরত্ব ওরা নিশ্চিহ্ন করে এনেছে।

হাড়-কাঁপানো শীত। একটু আগে ভারি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল জমে জমে আছে। এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। বিষম হাওয়া। প্লেনের ভিতরটা গরম করে রাখে—কি করে বুঝব, বাইরে এই ব্যাপার। যেখানটায় প্লেন রেখেছে, গেট তার অতি নিকটে। যেন এক বাগান-বাড়ির ফটকে গাড়ি এসে দাঁড়াল। লাল-ভেরেণ্ডা আর্জানো পথের দু-পাশে। মাঝে মাঝে হলদে-পাতা এক রকমের গাছ। এরোড্রোম-কর্মীরা অবোধ্য ভাষায় নমস্কার জানাচ্ছে। ভিতর ঢুকে প্রথমেই বইয়ের আলমারি। আকাশ যাত্রিরা বই কেনাকাটা করে। খাদ্য-বিহনে বরঞ্চ এক আধ-বেলা চলতে পারে, বই চাই-ই। গোটা সোবিয়েত-ভূমে নেশাটা বিষম চালু—নিতান্ত অন্যমনস্কেরও চোখ এড়াবে না। একজনে ছুটে এসে উপরে উঠবার পথ দেখিয়ে দিল। ওভার-

কোট ও হাত-ব্যাগ নিয়ে নম্বরের চাকতি দিল।

খাওয়া। শুধু মাত্র আমরা নই, বিরাট হল-ঘরে বিস্তর লোকের খানাপিনা চলছে। আমিষ-নিরামিষ হিসাবে দুটো দল। মহিলাটি, আহা, বিরস মুখে দাঁড়িয়ে দেখছেন। প্লেটে সাজানো পাহাড় পর্বতগুলো বহুজনের সমবেত অধ্যবসায়ে দেখতে দেখতে বেমালুম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ মহাযজ্ঞে তাঁর কিছু করবার নেই। প্লেনে চড়লেই উদরের যাবতীয় বস্তু ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ভুঁয়ে নেমেছেন, তবু এখনো গোলমাল করছে। হেন অবস্থায় বিদেশে বেরুনোই ঝকমারি।

এক ঘন্টা কাটিয়ে আবার প্লেনের খোপে। না মশায়, আঙুর খাইয়েই খুন করবে বুঝতে পারছি। গাদা গাদা আঙুর এনে তুলছে। সাদা আঙুর, লাল আঙুর। সাদা আঙুর খুব মিষ্টি, লাল আঙুর টকে মিষ্টিতে মেশানো। কাচের গ্লাস রূপোর ফ্রেমে বসানো—তাইতে চা দেয় নেবুর রস মিশিয়ে। ক্রিম-দেওয়া অথবা দুধ-মেশানো চা-ও পাবেন অর্ডার করলে।

যে প্লেনে হিন্দুকুশ চড়াও হয়েছিলেন—আজকে সেটা নয়; অক্সিজেনের নল দেখা যাচ্ছে না। সেটা আবার কাবুল গেছে পিছনের দল নিয়ে আসতে। তাহলেও একই জাতের প্লেন—বাবুগিরির আয়োজন নেই, দরকারটুকু মাত্র মিটবে। প্লেনের মেয়েটার দাঁত বাঁধানো, দাঁতের সোনা ঝিকমিক করছে। তরমেসের এয়ারফিল্ডে তিন-চারটাকে এমনি দেখলাম। একটির তো রকমারি দাঁত—অষ্ট প্রকার ধাতুর গোটা আষ্টেক। আজ দুপুরে আশচুবিলস্কে যে মেয়েটা পরিবেশন করছিল, তার দাঁতও এমনি। ফ্যাসান নাকি, দাঁত তুলে ফেলে হয়তো বা সোনা রূপোয় বাঁধায়? উঁহু, অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার দরুন তাড়াতাড়ি এদের দাঁত পড়ে যায়।

বেলা দুটোয় আকাশ হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। ভূমি সুস্পষ্ট নজরে আসে। রেল-লাইন, ঘর-বাড়ি, চাষের জমি—সমস্ত যেন ছককাটা; গাছপালা থরে থরে সাজানো। নদী ধরে চলেছি—ভল্গা। ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ ভেসে এসে একবার দৃষ্টি আড়াল করে, দৃষ্টি ছেড়ে দেয় আবার। নিচে হাস্যপ্রসন্ন সমভূমি। গোটা অঞ্চল নজরে আসছে, চৌকো-ত্রিকোণ নানা আকারের জ্যামিতিক ক্ষেত্রে ভাগ করা।

ভল্গা পার হলাম। গাঢ় নীল জলধারা, বেশ চওড়া। মাঝে মাঝে চড়া পড়ে জল ভাগ হয়ে গেছে। পার হয়েই মালুম হল পাহাড়-অঞ্চল—সাদা সাদা কি-সব মাথা উঁচু করে আছে। অগণ্য ঘরবাড়ি নজরে আসছে, ফ্যাক্টরি অনেক। ভেড়ার গায়ের মতো মাটির উপর হলদে রঙের কুঞ্চিত লোম উঠেছে

—কোন বস্তু, খোদায় মালুম। আঁকাবাঁকা সরু-সরু নদী-খাল—দুধারে ঢালাও সবুজ।

হাশা সেন বললেন, সবুজটা বোঝা যাচ্ছে—ফসলের ক্ষেত। পিচ-ঢালা জায়গার মতো ঐ যেন ঘন কালো—আর হলদে হলদে পায়ের ছাপ ফেলে কারা হেঁটে গিয়েছে তার উপর দিয়ে? কি ওগুলো?

সঠিক কে বলবে? নানান রকম গবেষণা। কালো মাটির দেশ এখন কালো জায়গাগুলো বোধহয় ফসল তুলে-নেওয়া ক্ষেতখামার। নদী, কাটা খাল—নদীর বাঁধও দেখা যায়। নদী থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতর খাল শেষ হয়েছে। অগুন্তি খাল এমনি। মোটের উপর টের পাচ্ছি, ভারি সমৃদ্ধ অঞ্চল।

রোদে চারিদিক ভরে গেল। ওরা বলছে, জোর বাতাস বইছে বাইরে—হাওয়ার উজানে প্লেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। প্রশস্ত রাস্তা—তার দু পাশ দিয়ে গ্রাম সাজানো। বড় শহর একটা নিচে, ফ্যাক্টরি। নাম পেলাম—বেন্থ্জা। অরণ্য এসে গেল এবার, জনপদ ও ফসলের ক্ষেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দূরবিসারী অরণ্য চলেছে। ক্ষেত টুকরো টুকরো নয়, অনেকখানি নিয়ে এক-একটা প্লট। যৌথ-খামার। নদীর বাঁধ বেঁধে খালের পথে যেখানে খুশি জল নিয়ে যায়, যেখানে খুশি জল আটকায়। দেশে দেশে হাজার হাজার মাইল বায়ু-বিহার করেছি, এমন পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায় সাজানো ঘরবাড়ি বন-মাঠ-ফ্যাক্টরি দেখি নি কখনো। বিরাট যজ্ঞশালা এশিয়া য়ুরোপের আর্ধেক অঞ্চল জুড়ে—চলতে চলতে এই উপমা মনে আসে বারম্বার।

হোস্টেস ছাড়া আর এক রুশ ছোকরা আছে, সে ও দেখাশুনা করছে। ইংরেজি জানে না—কি করবে, কথার অভাব হাসিতে পুষিয়ে দিচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, নিচের দিকে চেয়ে আলটপকা নাম বলে দিচ্ছে নদীটার কিংবা শহরটার। অকারণে একবার নার্গিস-রাজকাপুরের নাম করে বসল। কাল তাসখন্দে ঠিক এই নাম দুটোই শুনলাম—ভারত বলতে এই ওরা চিনে রেখেছে নাকি? তারপরে মালুম হল, সোবিয়েতের এমুড়ো-ওমুড়ো জুড়ে দুটো ভারতীয় ফিল্ম দেখানো হচ্ছে—আওয়ারা ও দো-বিঘা জমিন। মানুষ খুব সিনেমা দেখে এখানে; তারও বেশি অবশ্য অপেরা-থিয়েটার। রাজকাপুর-নার্গিসের টাটকা ছবি ওদের মনে ঘুরঘুর করছে, নাম দুটো অতএব তাই ঠোঁটের আগায়।

কিন্তু কি হল বলুন তো? ভোর পাঁচটায় পাখা মেলেছি, আবার প্রায় পাঁচটা বাজে—পথ শেষ হবার গতিক দেখিনে। রৌদ্রদীপ্ত মেঘের সাগর প্রপেলারের ঘায়ে আলোড়িত করে চলেছি, চলেছি। ভূমিতল এই দেখছি—

পরক্ষণে কুয়াশায় চারিদিক একাকার। তা ভাল—লিখে লিখে আঙুলের ডগা ব্যথা হয়ে গেল, চুপচাপ খানিকটা জিরিয়ে নিই। কোন কিছু নজরে না এলে আগডুম-বাগডুম কি শোনাই বলুন?

তখন উঠে পায়চারি করছি। এক সিটের উপর কাঁহাতক থাকা যায়? আমার দেখাদেখি অনেকেই ইতিমধ্যে খাতা খুলে বসেছেন। বিস্তর বই বেরুবে অতএব। একটা খোপের ভিতর এতগুলো লেখক গা ঢাকা দিয়েছিলেন— আমি সরল সোজা মানুষ, একাই কলমসুদ্ধ সকলের আগে ধরা পড়ে গেছি। বুড়া নেতা তেজা সিং আর তরুণী মেয়ে বিমলা রাঘবাচারী রুমালে ফাঁস লাগানো খেলা খেলছেন। ঝুনা হেডমিস্ট্রেস বিশালাক্ষী দেবী—তিনিও জুটলেন ঐ খেলার মধ্যে। সময় কাটানো আর কি! রুশ ছেলেটাকে বহু জনে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন—কোত্থেকে রাশিয়ান প্রথম ভাগ একখানা জোগাড় করে খেড়ে ছাত্র-ছাত্রী জুটিয়ে সে দিব্যি এক পাঠশালা বসিয়ে দিয়েছে। দাগে তাড়াতাড়ি এসে বলেন, বাংলা বই আছে? আছে নিশ্চয় আপনার কাছে— দিন তো একটা। অর্থাৎ এই বাজারে তিনিও কিছু জমাতে চান; বাংলা বই পড়ে চমৎকৃত করবেন সকলকে। কিন্তু বই বাক্সে বন্ধ, এখন বেরুবে না। অন্য কোন খেলা ভেবে দিন।

মস্কো এসে গেল অবশেষে। দু ঘন্টা দেরি। যারা দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়তে বলল তাদের। উঠছে নামছে প্লেন, দুলছে এদিক-ওদিক। কুয়াশায় চতুর্দিক এঁটে আছে, তার ভিতরে নজর চলে না। কুয়াশার মধ্যে নামতে গিয়ে দমদমায় সেই কাণ্ড হল। তা মন্দ হয় না, মস্কোর দ্বারপ্রান্তে নাটকীয় ভাবে ভূতলে পড়ে বেশ খানিকটা হৈ-চৈ জমানো যায়। মুশকিল হল, একেবারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে নিচে। পেটি বাঁধবার ব্যবস্থা নেই, হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছে চুপচাপ বসে থাকবার জন্য। নিচে নামছি, অনেক নিচে এসে গেছি। উঁচুনিচু জমি—জমির উপরে যেন বাগান সাজানো। বিষম কাত হয়েছে প্লেন, ভূমির সঙ্গে প্রায় সমকোণ। জলা জায়গা—আর বিস্তর গাছপালা। কিন্তু এত কাত হল কেন? বড্ড দুলছে, লিখতে পারি না আর যে। কাত হচ্ছে, সোজা হচ্ছে। বহুব্যাপ্ত বিশাল শহর ঐ নিচে। এরোড্রোম নজরে আসছে। সূর্য নেই, আলো নেই, মলিন আকাশ। মস্কো, মস্কো!

কত দূর-আকাশ ভেঙে আমরা এলাম, আর এমন মুখ ভার করে আছ কেন গো?

॥ ছয় ॥

মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই বক্তৃতা। এ-তরফের, ও-তরফের। তোমরা ভাল,

আমরা ভাল—মজবুত রকমের দোস্তি গেঁথে ফেলি এসো দুই দেশের মধ্যে। এই সমস্ত আর কি। ফুলের তোড়া দিল দলপতি ও মেয়েলোক ক'জনাকে—সকলকে নয়। খাঁটি ফুল বড় মাগ্‌গি। একটা গোলাপ এই মরশুমে, ধরুন, তিন রুবল অর্থাৎ চোদ্দ সিকের মতো। সে বস্তু বাজে লোকের খাতে খরচ করতে যাবে কেন? এন্তার কাগজের ফুলের চলন। কাঁচি-কাটা কাগজে লোকে ফুল লেনদেনের সুখ ভোগ করে।

মাঠ পেরিয়ে ঘর দালান পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে কি দেয়, গাড়ির পর গাড়ি চক্কোর দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে—উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। আসন্ন সন্ধ্যা—ঘোলাটে ক্ষীণ আলোর তেপান্তরের মাঠ ধু-ধু করছে। পাকা ঘরবাড়ি এখানে একটা ওখানে বা দুটো। খানিকটা দূরে সবুজ লেপটে আছে, জঙ্গল বলে মালুম হয়।

কয়েকটা ছেলেমেয়ে গাড়ির জানলায় এসে ইংরেজিতে শুধায়, দোভাষি আছে আপনাদের সঙ্গে? বলেন তো যে কেউ যেতে পারি বুঝসমুঝ করে দেবার জন্য। এক ছোকরা উঠে পড়ল। পরে ভাল পরিচয় হয়েছে—এলেক্সি বরখুদারভ, সংস্কৃত ও ফারসির ছাত্র, পণ্ডিত গোছের মানুষ। পাঁচ বছর ইংরাজি পড়ছে—কিন্তু অত্যধিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলে। ইংরেজির পরীক্ষায় বসলে হেড মাস্টার পাশ নম্বরটাও দেবেন না তাকে। সলজ্জ বলে, বিদেশির সঙ্গে কথাবার্তা এই প্রথম। ভুলচুল হবে, মাপ করবেন। শহর-মুখো চলেছি, কুতূহলে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছি—গ্যাঁ-গ্যাঁ করছে লাগসই কথার অভাবে। পকেট-ডিক্সনারি আছে, বোঝাবে কি—ডিক্সনারি হাতড়ে কেবলই কথা খুঁজে বেড়ায়।

জঙ্গল বলে আঁচ করে ছিলাম, কসাড় জঙ্গল না হলেও মোটামুটি তাই বটে বার্চবন পথের দুধারে। শহর মস্কো অনেক দূর—বরখুদারভ যা বলল, হিসাব-পত্তোর করে দেখি বিশ মাইলের ধাক্কা। এক কোলখোজ অর্থাৎ যৌথখামারের সীমানা ধরে যাচ্ছি। চোখ-জুড়ানো ক্ষেত যতদূর অবধি নজর চলে—ঘরবাড়ি দূর প্রান্তে। ছোটখাট টিনের ঘর, চিমনি বসানো। বড় বাড়িও ক্রমশ দেখা দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি, ঝকমকে সাদা অট্টালিকা মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠে গেছে। য়ুনিভার্সিটি। সে যে কী কাণ্ড, কেমন করে বোঝাই। কালিকলম-কাগজের সম্বলটুকুতে সে বস্তুর বর্ণনা হয় না। শহরের উপান্তে লেনিনপাহাড় অঞ্চলে সদ্য বানানো। ক'বছর আগেও জনবিরল জঙ্গলে জায়গা ছিল—সেখানে আজকে সারা দেশের তরুণ ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনন্দের হাট জমিয়েছে। সোবিয়েতের ছেলেমেয়ে শুধু নয়, ভুবনের নানান দেশের। মূল

রাস্তা ছেড়ে গাড়ি একটুখানি ঘুরিয়ে য়্যুনিভার্সিটি-চত্বর দিয়ে চলল। মস্কো ঢুকবার আগে বিদেশিদের চোখের দেখা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা জাঁক করে বেড়াবারই বস্তু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু বাড়িই নয়—স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে এই ছেলে-মেয়ের দল। একদল ক্লাস থেকে বেরুচ্ছে। একদল দৌড়চ্ছে—বোধকরি এই তাদের ক্লাস বসে গেল। বাগানে ঘুরছে কতক, বসে বসে গুলতানি করছে অনেক। গাড়ির ভিতর থেকে দেখতে দেখতে চলেছি। বাড়ি বানানো একেবারে শেষ হয়নি—মূল-বাড়ি হয়ে গেছে, এদিকে-ওদিকে আরও বিস্তর বাড়ি উঠছে, কাজকর্ম চলছে। ভর সন্ধ্যাবেলা বড় বড় ক্রেন অশ্রান্ত নৈঃশব্দে ভারী ভারি বোঝা শূন্যলোকে তুলে দিচ্ছে।

য়্যুনিভার্সিটি ছাড়িয়ে এসে এদিকে-ওদিকে বিস্তর বস্তি। বাড়ি তৈরির কাজে বিস্তর জনমজুর খাটছে, এগুলো তাদেরই জন্য বানানো, কাজ চুকে গেলে ভেঙে দেবে। খুদ মস্কোর ভিতরেও সেকেলে বিস্তর চালাঘর। আজ্ঞে হ্যাঁ, চোখে দেখে এসে তবে বলছি। একটার ভিতরে ঢুকেও দেখলাম। বাইরে রং-চটা কাঠকুটো বটে, ভিতরে তাজ্জব। ঘরদোর বিদ্যুতে গরম, ফলজোড়া কার্পেট, আহা-মরি স্নানঘর, রেডিও বাজছে, দেয়ালে দেয়ালে ছবি —দশ-বিশ তলা বাড়িগুলোয় যেমনটা দেখে থাকেন, এখানেও প্রায় তাই। লোকদের দাওয়াত পেয়ে আমরা গিয়েছি—সরলা মোলাকাতে স্পষ্টাপষ্টি তাঁরা বলে দিলেন, স্বর্গধাম দেখবার মতন করে এসে থাকেন তো হতাশ হবেন। সেকেলে কাঠের বাড়ি ভেঙে ভেঙে আধুনিক ঘর তোলা হচ্ছে, তবু এখনো অনেক বাকি। আট-শ বছরের শহর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে একেবারে পরিপাটি হবে কেমন করে? খাটছে সকলে প্রাণপণে, তবু অঢেল দোষ-ত্রুটি। দোষগুলো আপনারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যাবেন, তবেই তো বন্ধুর কাজ হবে।

এই দেখুন, কি কথায় কদ্দুর এসে পড়লাম। খেয়াল আছে তো, য়্যুনিভার্সিটি ছাড়িয়ে খাস শহরের দিকে ছুটেছি। মস্কো। দুনিয়াটা কমলা-লেবুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন—সেই লেবুর মোটমাট যদি ছ'টি কোয়া হয় সোবিয়েত দেশ হল সেই ছয়ের এক। অত বড় জায়গার রাজধানী। আট-শ বছর ধরে গড়ে উঠেছে। কাশীতে যেমন অগুন্তি শিবমন্দির, মস্কো শহরে তেমনি অগুন্তি মিউজিয়াম। অবসর আর উৎসাহ থাকে তো ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের নানা অধ্যায়ের পরিচয় নিনগে। মস্কো নামটার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বিপ্লবের কত রোমাঞ্চক ছবি মনে আসে বলুন তো! আর এক শহর প্যারি। দুনিয়ার মধ্যে এই দুই জায়গার জুড়ি নেই।

বারো শতকে সর্বপ্রথম মস্কোর নাম শুনতে পাচ্ছেন। এক প্রিন্সের ছোট্ট জমিদারি। ১১৪৭ অব্দে দেয়াল ঘিরে শহর হল মস্কো নদীর কিনারা ধরে। ব্যাপার-বাণিজ্যে হৈ হৈ চলল। ১৯৪৭-এ অষ্টম-শতবার্ষিকী পূর্ণ হয়েছে, উৎসব হল তাই নিয়ে। আঠারো শতকের গোড়ায় পিটার দ্য গ্রেট রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন এখান থেকে। ব্যবসায়ের গৌরবে শহর তবু টিকে রইল। ১৮১২ অব্দে নেপোলিয়ানের আক্রমণের সময় পুড়ে গেল শহরের বেশির ভাগ। বিলকুল আবার নতুন করে বানানো।

থাক এখন পুরানো ইতিহাস। শহরে এসে পড়লাম বলে, দেরি নেই। ছাড়া-ছাড়া ঘরবাড়ি ঘন হয়ে আসছে। শহরতলী বলা চলবে না আর এখন। উঁচু-উঁচু গির্জার চূড়া, বিস্তর গম্বুজ। গির্জাগুলো ক্রেমলিনের ভিতরে। ক্রেমলিন মানে হল দুর্গ। দিল্লির লালকেল্লায় যেমন, তেমনি ধরনের পাঁচিলও নজরে পড়েছে। পাহাড়ের পিঠে নদীর ধারে দুর্গ বানিয়ে তারই আশেপাশে জনবসতি হল, এই হল আদি-মস্কো। শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গির্জা কত অট্টালিকা উঠল ক্রেমলিনের চৌহদ্দির মধ্যে। মস্কো নদীর কিনারা ধরে বেড়ে চলল ক্রেমলিন। গম্বুজের সোনালি চূড়া। সোনা নয় কিন্তু, পিতল দিয়ে গড়ে সোনার রং ধরানো।

মস্কো-নদীর উপরে লোহার পুল। পুল পার হয়ে এসে পড়লাম। দু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা। দেয়ালে দেয়ালে এমন আঁটা, বাইরের কিছু দেখতে পাইনে। সেকালের ধনী ব্যাপারিরা এই সব বানিয়েছিল। ঘুরে ফিরে আবার নদীর ধারে। নদী শুনে শোণ-গঙ্গা বিবেচনা করবেন না, উল্টোডিঙির খালের দেড়-গুণ দু-গুণ হবে বড় জোর। দুই পাড় পাথরে বাঁধানো, মাটি দেখবার জো নেই। যেন পাথরের সড়ক বানিয়ে হুকুম চালাচ্ছে তরঙ্গিণীর উপর, এই পথ ধরে চলতে হবে। দু চার শ' হাত অন্তর লোহার বা পাথরের পুল। যাবে কোথায় যাদুমণি! ঐ অগণ্য পুলের তলায় গুঁড়ি মেরে মেরে পাথরের বাঁধা সড়কের উপর নদী মন-মরা হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। সেদিনের সন্ধ্যালোকে আমার অন্তত তাই মনে হল।

মস্কো-নদী ওখা নদীতে পড়েছে, ওখা পড়েছে ভলে। এই জলপথে চিরকাল সওদাগরের আনাগোনা। বিজ্ঞানের দেমাকে এখন ওরা ধরাকে সরা বিবেচনা করে, ঘুরপথে চলাচল করতে রাজি নয়। সোজা খাল কেটে মস্কোর সঙ্গে ভলের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। শহর মস্কো এখন পাঁচ সাগরের বন্দর।

তারা ঝিকমিক করছে। আকাশের হাজার তারার মাঝখানে বাড়তি লাল তারা—এখানে একটা, ঐ যে আর একটা, আরও দূরে একটা। ক্রেমলিন

আর কয়েক হাত মাত্র দূরে। আকাশ ফুঁড়ে ক্রেমলিনের গুম্ভ উঠেছে, মাথায় মাথায় তারা বসানো।

নয় চূড়ার সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল। নানান রংচং, লেকেলে ধরনধারণ। আইভ্যান দ্য টেরিবল—নাম শুনেছেন, ষোল শতকে সেই আমলের গির্জা। এখন মিউজিয়াম। ক্যাথিড্রালের সামনে গোলাকার উঁচু বেদী; মাঝখানে ভারী এক কাঠ পোঁতা। দোষীদের সাজা দেওয়া হত এখানে। রক্ত বিস্তর গড়িয়েছে বেদীর উপরে; এখন একটি ফোঁটাও কোনখানে লেগে নেই। অনেক বর্ষায় অনেক বরফে ধুয়ে-মুছে গেছে। মানুষটাকে মাঝের ঐ দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে হাত কাটা হত, পা কাটা হত, শেষটা মুণ্ড। আইভান বিস্তর কোতল করেছেন ঐ জায়গায়। প্রথম পিটার বিদ্রোহী দেহরক্ষীদের কেটেছিলেন ঐ বেদীর উপরে নিয়ে। এমনি অনেক। বেদীর পাশ দিয়ে কত বার গিয়েছি—গাড়িতে গিয়েছি, পায়ে হেঁটেও গিয়েছি। এক দিনের কথা বলি শুনুন। ফুরফুরে বরফ পড়ছে, টিপিটিপি বৃষ্টি। লোকজন বড় কম। মেঘছায়ায় রাস্তার আলোর জোর নেই—কেমন বুঝি এক-পায়ে দাঁড়িয়ে এক চোখ বুঁজে তাকিয়ে আছে। আবছায়া রহস্যময় ভাব। সেই রাত্রে সত্যি আমার গা ছমছম করেছিল মৃত্যুবেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময়। পাথরের পথে জুতো খটখট করে চলেছি, মনে হল জুতো দু-গাছা মাত্র নয়—আরও অনেক—চল্লিশ কিম্বা চার-শ গাছাও হতে পারে।

এই দেখুন, মস্কোয় নেমে এখনো আস্তানায় পৌঁছুনো গেল না—পাঠকদের ভূতের ভয় দেখাচ্ছি। কোথায় যেন আছি? বাঁ-হাতে ক্রেমলিন ঐ যে—বেসিল ক্যাথিড্রাল ছাড়িয়ে রেড-স্কোয়ারের উপর এসে পড়েছি। কমুনিস্ট রাজ্য—স্কোয়ারের নামটা ভাবছেন সেই কারণে লাল। আজ্ঞে না, ও সব কিছু নয়। পুরানো কালের এই নাম, বিপ্লবের অনেক আগেকার। তখন বাজার বসত এই জায়গায়, মেলা জমত। যে রুশ কথাটার মানে হল লাল, তারই অন্য মানে 'সুন্দর'। সুন্দর-স্কোয়ার, জায়গাটা তাই রেড-স্কোয়ার বলত। বিপ্লবের দিনে শত শত সর্বত্যাগীর রক্তধারায় স্কোয়ারের কালো পাথর রাঙা হয়েছিল, মানুষের মনে মনে স্কোয়ার আরও সুন্দর হয়েছে সেই দিন থেকে।

লেনিন-মুসোলিয়াম—ওখানে পাতালপুরীর কক্ষে লেনিন ও স্ট্যালিন* ঘুমিয়ে রয়েছেন। তারই পাশে ঘাস ও ফুলে ভরা দুই ফালি জমি। হঠাৎ এই চারিপাশের ঘরবাড়ি-আলো-মানুষ মুছে গেল আমার দৃষ্টির সামনে। আবছা-আঁধারে রেড-স্কোয়ারে অগণিত নিঃশব্দ নরছায়া দেখছি। মাটি খুঁড়ছে ক্রেম-

---

*পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের দেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

লিনের দেয়ালের গায়ে। মাটির পাহাড় হয়ে গেছে, তবু ক্লান্তি নেই। কোদাল-গাঁইতি মেরে চলেছে—হাত কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে, আর এক-জনে নিয়ে নিচ্ছে তার হাতের কোদাল। মাটি খোঁড়া বন্ধ হয় না। এক সময় হয়তো বা কাজ থামিয়ে মাটির স্তূপের উপরে উঠে দূরের দিকে তাকায়। আসছে, নিয়ে আসছে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত রণবিজয়ী শহীদদের। প্রিয়জনরা কাঁধে বয়ে নিঃশব্দ মিছিলে আসছে। এনে নামাচ্ছে রেড-স্কোয়ারে। ভরে গেল স্কোয়ার। স্কোয়ারের প্রতিটি পাথরের টুকরো পুণ্যময় হল। চারিদিকে অতল নিষুপ্তি—হঠাৎ এক-একবার তার মধ্যে শোকের ক্ষীণ ধ্বনি উঠেই থেমে পড়ে, লজ্জা পেয়ে শোক বোবা হয়ে যায়। জীবন দিয়েছে বটে এরা, কিন্তু সিদ্ধিও পেয়েছে। তারপর একটি একটি করে সন্তর্পণে শোয়াচ্ছে নিচে গর্তের ভিতর। একের পাশে আর একজন। জায়গা ভরে গেল তো উপরে থাক দিচ্ছে। মানুষের উপর মানুষ শুচ্ছে। বড় বড় দুটো গর্ত নরদেহে ভরে গেল। পাইকারি কবর। সামান্য স্বস্তিবাচনের পর মাটি দিয়ে দিল। আজকে সেই মাটির উপর দেখুন কত সবুজ ঘাস, কত রঙিন ফুল। সারা সোবিয়েত দেশের মধ্যে সকলের বড় তীর্থ ঐ দু-ফালি জায়গা। গুণী জ্ঞানী ও যাবতীয় কৃতী পুরুষদের সর্বোত্তম কামনা, মরবার পরে ওরই আশেপাশে একটু যদি ঠাঁই পাওয়া যায়। তার চেয়ে বড় সম্মান ওদেশের মানুষ ভাবতে পারে না। আছেও তাই বড় বড় বিপ্লবী-নেতার কয়েকটি কবর এদিক-সেদিকে। জায়গা নেই তো দেহ পুড়িয়ে সেই ছাই পুঁতে রেখেছে জায়গাটার সামনাসামনি ক্রেমলিনের দেয়ালে। গোর্কির ছাই আছে দেওয়ালের ভিতর। আরও কতজনের।

প্রশস্ত রাস্তা রেড-স্কোয়ার জুড়ে। স্কোয়ারের স্রোতের মতো গাড়ি-মানুষের অবিরাম চলাচল। তার মধ্যে, কাণ্ড দেখুন তো, আমি একেবারে উনিশ-শ সতেরোয় চলে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আরও কিছু রাস্তা ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি আবার এক স্কোয়ারের সামনে। সেকেলে বাড়ির কার্নিশে কালো পাথরে খোদাই এপোলো চার ঘোড়ার শকটে চড়ে ছুটছেন। ঠিক তাই—আপনিও হলপ করে বললেন, পাথরের ঘোড়া চারটে ছুটেছে তীরের মতো; খটাখট আওয়াজ পাচ্ছি বোধহয়। বলশই থিয়েটার। থিয়েটারের বয়স পৌনে দু-শ বছর ছাড়িয়ে গেছে। বুঝুন। বাইরে কত কাণ্ড, রাজার রাজ্যপাট অতলে ডুবে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন হল—আর ঐ থিয়েটার-হলে এই পৌনে দু-শ বছর প্রতিটি সন্ধ্যায় পট উঠে গিয়ে পরীরা উড়ে বেরিয়েছে, স্বর্গ-নরকে লড়াই জমেছে, রাজা-রাণী রাজপুত্র-রাজকন্যা পাত্রি-পুরুত ইতিহাসের কবর

খুঁড়ে দর্শকের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন...

কিন্তু থাক এখন। কলম যখন ধরেছি, সহজে কি রেহাই পাবেন? সমস্ত তোলা রইল। রাত থাকতে সেই তাসখন্দ থেকে বেরিয়েছি, হোটেলে এই-বারে ঢুকে পড়া যাক। হোটেল—মেট্রোপোল, পুরানো হোটেল—বনেদি পাড়ার মধ্যে। মস্কোর যত কিছু কীর্তিচিহ্ন, বেশির ভাগ এই অঞ্চলে। বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই হোটেল চালু আছে। দোতলায় এক ঘরে থাকতে দিল। ভাল ঘর। খাটে ধবধবে নরম বিছানা। বাথরুমে ব্যবস্থাও অতি উত্তম—আধুনিক সাজসরঞ্জাম। লাগোয়া লাউঞ্জ রয়েছে—আড্ডা দিন অথবা মাথায় পোকাব উপদ্রব থাকলে লেখাপড়া করুন টেবিলে গিয়ে। সে যা হোক পরে দেখা যাবে, সারাদিনের ধকলের পর হাত-পা ছেড়ে গড়িয়ে নিই একটু। তারপরে এক সময় উঠে পড়ে গরম জলে মজাসে স্নান করে আঃ—বলে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব।

একটা দরকারি কাজ—সকলের আগে মেট্রনের কাছ থেকে ভারতীয় এমব্যাসির ফোন নম্বরটা নিয়ে আসা। হ্যালো, বাঙালি কেউ আছেন এম-ব্যাসিতে? একজন নয়, তিন তিনটি। ফোন ধরেছেনও এক বাঙালি—দাশগুপ্ত, ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত। চলে আসুন দাশগুপ্ত মশায়। কখন আসছেন, ঠিক করে বলে দিন।

ডিনারের পরে অপেরা। ঐ যে দূর থেকে দেখলাম—ঐ বলশই থিয়েটারে। থাকগে, আমি যাব না। একদিনে তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আপনি আসুন দাশগুপ্ত।

ডিনারে আপাতত নিরামিষ দলে ভিড়লাম। সুবিখ্যাত ক্যাভিয়ার মুখে দিয়ে সেই এক কাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেল, তারপরে দেখেশুনে বিচার-বিবেচনা অন্তে তবে আমিষ ছোঁব। এক ছোকরা পাশে এসে বসল—পাভলিচেঙ্কো, ডাক নাম হল পল—এসে খুব আলাপ জমিয়ে নিল। দোভাষি, হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারা, ইংরেজিও বলে ভাল। এই কলকাতায় আবার দেখতে পেলাম পলকে, বিজ্ঞান কংগ্রেসের দলে দোভাষি হয়ে এসেছিল।

দাশগুপ্ত এসে গেলেন স্ফুর্তিতে ডগমগ। এসেই প্রথম কথা: ভারতে ফিরে যাচ্ছি এমব্যাসিতে নতুন লোক এসে পৌঁছানো মাত্রেই। তিন বছর একটানা মস্কোয় থেকে একঘেয়ে লাগছে, দিল্লি ফিরে কিছু কাল থেকে আবার কোন নতুন জায়গায় পাড়ি দেবেন। জোর করে দাশগুপ্তকে বসানো হল আমাদের সঙ্গে, ছাড়াছাড়ি নেই। সবাই মুখ চালাবে আর আপনি খালি ঠোঁট নাড়বেন, সেটা কেমনে হয়? ভীষণ আতিথ্য ওদের। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরে ধরে

স্তূপাকার সাজিয়ে রেখেছে—আসন নিয়ে মুখে এখানে জল ঝরে না, মুখ শুকিয়ে ওঠে। একজন আমাদের, একজন ওদের—এমনি কায়দায় বসেছে। পেট-ভরে খাও, ফাঁকিজুকি দিও না। মনে করো নিজেদের ঘরবাড়ি—যখন যেমন খেতে চাও, আগেভাগে ফরমাশ কোরো, সেই মতো চেষ্টা করা যাবে।

কী ভীষণ খায়, না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। অ্যাপিটাইজার বলে গোড়ায় দিয়ে যায়, সেটা হল ভোজনের গৌরচন্দ্রিকা—বস্তুগুলো চেখে চেখে ক্ষুধায় শাণ দিয়ে নেবেন, এই হল উদ্দেশ্য। তা ক্ষীণজীবী আমাদের এতেই ভরপেট হয়ে যায়, প্রাণ আইঢাই করে, শয্যায় গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু শুনছে কে? সুপ ওদিকে এসে গেল, 'ভোজনে চ জনার্দন' স্মরণ করে পুরোপুরি ক্রিয়া এইবারে। তিনটে চারটে কোর্স—তার সিকিখানাও তো ধস্তাধস্তি করে মুখ-বিবরে ঢোকানোর উপায় দেখছি নে। আর ওদের ঐ সতর্ক অক্ষিতারকাগুলো অভাগ্য অতিথিকুলের উপর বারম্বার বিঘূর্ণিত হচ্ছে; কথাবার্তা গল্পগুজবে ভুলিয়ে ভালিয়ে পার পাবেন না। হাতে-কলমে দেখিয়েও দিচ্ছে। রোস্ট-টার্কির আধখানা অর্থাৎ ওজনে সের দেড়েক, এক এক কামড়ে কেটে নিয়ে পরমানন্দে চিবাতে চিবাতে বলে, দেখ, খাওয়া যায় না যে? কেউ না কি খেতে পারে না? এই ভবে কি করছি?

পলকে বলি, বন্ধু-বন্ধু করে তো গলা ফাটাও—খাওয়ার টেবিলে এমন শত্রুতা কেন বলো দিকি?

আমাকে শত্রু বলছ?

আলবৎ, একশবার! এত জবরদস্তি শত্রুতেও করে না।

জবরদস্তির অপবাদ দিলে? হায়, হায়—আমি শত্রু? পলের কণ্ঠস্বর কাঁপছে। টেবিল থেকে ছুরি তুলে বুকের উপর উদ্যত করে: এ জীবন রাখব না, আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াব। তোমরা আমায় শত্রুর অপবাদ দিয়েছ।

পাষাণ আমরা হি-হি করে হাসছি। ও-ছুরিতে মাখনের দলাই কাটা যায়। দেখ না চেষ্টা করে—ছুরি ভাঙবে, তোমার বুকের কিছু হবে না।

॥ সাত ॥

দাশগুপ্তকে চুপিচুপি বলি, দেশটা জুড়ে শুনতে পাই লোহার ভারী ভারী যবনিকা। ভাল করে বাৎলে দিন তো মশায়, কোন্ কায়দায় চলাফেরা করব, কি ভাবে কথাবার্তা চালাব।

দাশগুপ্ত হেসে ফেললেন।

তিন বছর রয়েছি এখানে, আমি তো কই মালুম পাইনে। পরের কথা

থামবেন কেন, নিজেরাই দেখুন না খোঁজখবর করে। আমি বলি, বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করুন বরঞ্চ। যবনিকার গায়ে দৈবাৎ যদি ঠোক্কর খান, দেশে গিয়ে সে কথা লিখতে পারবেন।

তা চেষ্টা করেছি আমরা যথোচিত। ক্রমশ শুনতে পাবেন। মোটের উপর, লৌহ-যবনিকা এমন সেরে সামলে রেখেছে—অতবড় রাজ্যের ভিতর বাইশ হাজার মাইল চক্কোর দিয়েও কোনখানে হদিশ পেলাম না। বিষম চালাকি খেলেছে, কি বলেন?

দলের আধাআধি লোক পিছনে পড়ে। সকালবেলা খবর শোনা গেল, আবহাওয়া বিষম খারাপ। তাসখন্দ অবধি বড় জোর তাঁরা এসে পৌঁছতে পারেন। তার পরে দিন তিনেক অন্তত সেখানে আটক থাকতে হবে। আকাশের দশা ভাল না হওয়া অবধি প্লেন উড়বে না।

হাওয়া-অফিস থেকে বলছে তো? পুলকিত হয়ে উঠি। আজকে না-ই হোক, নির্ঘাৎ তবে তাঁরা কাল নাগাদ এসে হাজির হবেন। দেখে দেখে ঝুনো হয়ে গিয়েছি। ওঁরা যা বলেন, ঠিক তার উল্টোটি হয়। বৃষ্টি হবে বললেন, সেদিন রোদ। রোদের কথা বললে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে। অভ্রান্ত হিসাব ওঁদের, লোকের উপকারও হচ্ছে—যা বলছেন, ঠিক উল্টো ধরে নিলে, হুবহু মিলে যাবে।

কিন্তু এখানে না'কি ভিন্ন ব্যাপার। রোদ মানে সত্যিকার চড়চড়ে রোদ, বৃষ্টি মানে বৃষ্টি। সে যাকগে, আসতে লাগুন ওঁরা। সে ক-দিন মস্কোর উপর বসে আমরাও শুধু শুধু অন্নধ্বংস করব না। প্রোগ্রামটা ছকে ফেলা যাক। কিন্তু সকল কর্মের আগে ফুল নিয়ে যেতে হয় তো লেনিন-মুসোলিয়ামে—শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি। সকলের আগে এটা। যেমন আমাদের অতিথিরা দিল্লিতে পা দিয়েই রাজঘাটে মালা দিয়ে আসেন।

না হবার জো নেই এখন। নবেম্বর-বিপ্লবের স্মরণোৎসব এসে পড়ল। মুসোলিয়ামের উপরে নেতারা দাঁড়াবেন, রংচং হচ্ছে। মুসোলিয়ামে আপাতত যেতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে। আছেন তো কিছু দিন, তাড়া কিসের? উৎসব চুকে-বুকে যাক, তখন হবে। পয়লা দিনেই শ্রদ্ধা না দেখালে মহাভারত অশুদ্ধ হবে, এমন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন ভোকস—সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ। সেখানে একবার চেহারা দেখিয়ে আসতে হয়: এসে গেছি এই দেখুন। বিরাট নিজস্ব বাড়ি, উপরে নিচে তিন-চারটে লেকচার হল। উঠানে হেথায় মোটরের জায়গা, কর্তাব্যক্তিরা গাড়ি চড়ে এসে এসে নামছেন। কলেজ জীবনে তিন

টাকায় একফালি টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে আমরাও এক সমিতি গড়েছিলাম—অখিল-ধরিত্রী সংস্কৃতি সংসদ। বাকি ভাড়ার দরুন ঘর ছাড়তে হল ; সংসদও গেল উঠে। তা কি হবে, স্টেট যদি এই রকম পিছনে থাকে, টিনের ঘরে না বসে আমরাও চৌরঙ্গির উপর সাততলা বাড়ি হাঁকাব।

ভোকসের সভাপতি হাজির নেই, দাওয়াত পেয়ে কোন মুলুকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমাদেরই গতিক—এই আমরা যেমন দেশভুঁই ছেড়ে এদের দেশে এসে পড়েছি। সহ-সভাপতি মশায় আমাদের নিয়ে বসলেন। মাথায় চকচকে টাক, রসিক মানুষ—ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে। ওসব রেখে কাজের কথা হোক মশায়। ভারতীয় এক দল তো পথের উপর—আপনাদের হাওয়া-বাবুরা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন, দেরী হবে পৌঁছুতে। তা সে যাই হোক, ইত্যবসরে প্রোগ্রাম পাকা পাকি করে ফেলা থাক—কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, ক-দিন থাকা হবে কোন জায়গায়। তাঁরা এলেই যাতে তিলার্ধ দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি।

হরি, হরি! একেবারে সাফ জবাব। কোথায় যাবেন, আমরা তার কি জানি? ও-তালে নেই। সকলে মিলে মিটিং করে আপনারাই প্রোগ্রাম ঠিক করবেন। খবরাখবর চাইলে আমরা দিয়ে দেব, যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে দেব। পথের কষ্ট যত কম হয়, সেই চেষ্টা করব। বিশেষ রকমের অসুবিধা থাকলে সেটাও বলে দেব স্পষ্টাস্পষ্টি। এই অবধি—তার অধিক ভার পেরে উঠব না।

মোটের উপর বুঝে এলাম, খানাপিনা ও মস্কো শহরে ঘুরে ফিরে বেড়ানো আপাতত কাজ আমাদের। যে ক-দিন পিছনের দল না এসে পড়ছেন। একটা বাসে চেপে বসা গেল অতএব। দোভাষি উঠেছে পাঁচ জন। চার কোণে চারটি, বাকিজন কেন্দ্রস্থলে সিট ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে। পঞ্চমুখেই বক্তৃতা চলেছে শহরের কোন তল্লাট দিয়ে যাচ্ছি এখন, ডাইনে বাঁয়ে ও সামনের দিকে কি কি বস্তু দ্রষ্টব্য, তার নাড়ি নক্ষত্রও আদ্যন্ত ইতিহাস। নেমে পড়ছি কোথাও বা। রাস্তা এই যেন আকাশমুখো চলল, এই আবার নিচু হয়ে পাতালে নামছে। পাহাড়ে জায়গার উপর মস্কো শহর, সেই কারণে। এখন পাহাড় কে বুঝবেন? রাস্তা ও ঘরবাড়ি বানিয়ে পাহাড় বিলকুল পালিশ করে দিয়েছে। শহরের প্রতিষ্ঠা করেন য়ুরি ডোলগোরুকি। তাঁর মূর্তি ও তাঁর নামে পার্ক আছে। আছে এমনি বহুতর গুণীজনের নামে। পুস্কিনের নামে, সুরকার চেকোবস্কির নামে।

সরু রাস্তা ছিল সেকালে। প্রাচীন শহরের যেমন হয়ে থাকে। এখন

চওড়া ও চৌরস হয়েছে। একাজ এখনও চলছে। গর্কি রোড দিয়ে যাচ্ছি—বারো মিটার ছিল, সেইটে পাঁচগুণ অর্থাৎ ষাট মিটার চওড়া করেছে। শহরের সেরা এই তল্লাট পুরানো কাল থেকেই। কাজকর্মের অফিস বাজার, স্ফূর্তি-ফার্তির অপেরা থিয়েটার। বিষম ঘিঞ্জি জায়গা ছিল, ভেঙে ভেঙে এখন বিস্তর চওড়া বানিয়েছে। পার্ক দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা, আবার ঐ যে, ফের দেখুন ঐ ওখানে। শত শত বৎসর আগে শহরের পয়লা আমলে যে জায়গায় বাজার বসত, সেই স্মৃতিতে বাজারের নামেই এক স্কোয়ার।

ঐতিহাসিক বাড়ি অনেক আছে, সেগুলো ভাঙা চলে না। কিম্বা ধরুন বিস্তর খরচপত্রের বিপুল অট্টালিকা। চওড়া করতে গিয়ে রাস্তা তার উপরে পড়ে গেছে। কি করা যায়? আহা, ঠেলে পিছিয়ে দিন না দু-শ চার-শ হাত। এইটুকু মাথায় আসে না!

সত্যিই তাই। দেখাতে লাগল, ঐ যে বাড়িটা—মস্কো সোবিয়েত বিল্ডিং—ঠিক এই জায়গায় ছিল, যেখান দিয়ে আমরা গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছি। বিপ্লবের অনেক গৌরব-স্মৃতি জড়ানো, ও-বাড়ি কিছুতে ভাঙা চলে না। সরিয়ে দিয়েছে চল্লিশ মিটার পরিমাণ। সরিয়ে বাড়ির উপরে আরও দুটো তলা তুলেছে। পুরানো বাড়িতে তিল পরিমাণ ফাটল ধরেনি এই সরাসরি ব্যাপারে। আলো-জল-কলপায়খানা যেমনকে তেমন। একটা দুটো নয়—পঞ্চান্নটা বাড়ি সরানো হয়েছে মস্কো শহরের উপর। চোখের হাসপাতাল সরানো হল, রোগিরা কেউ জানতেও পারেনি—চোখের অপারেশন চলছে বাড়িটা যখন সরানো হচ্ছে। এমন মৃদু গতিতে সরানো হয়। নইলে তো ফেটে চৌচির হবে।

এ যে আরব্য উপন্যাসের ব্যাপার! কি করে হয় বলুন।

বুঝতে পারলেন না? খুব সোজা ব্যাপার ঘোরপ্যাঁচের কিছু নেই। তিন কথায়, সত্যি, একেবারে জল করে বুঝিয়ে দিল। আপনাদের যদি মনন থাকে—ধরুন, দ্বারভাঙা-বিল্ডিং পিছিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর উপর নিয়ে যাবেন। ভিতের তলা অবধি খুঁড়ে আলগা করে ফেলুন সকলের আগে। ভিতরে নিচে ইস্পাতের পাত দিয়ে বেঁধে দিন, পাতের সঙ্গে এঁটে দিন চাকা। ঐ সব চাকার তলায় রেলের পাটি পেতে দিয়েছেন, অর্থাৎ গাড়ির উপরে তুলে ফেলেছেন গোটা অট্টালিকা। বাস, আর হাঙ্গামা নেই—ইঞ্জিন জুড়ে টেনে নিয়ে চলুন লোহার পাটির উপর দিয়ে। রাস্তা এক লেবেলে হওয়া চাই কিন্তু, সিকি ইঞ্চির হেরফের হলে সর্বনাশ। এই ৎসামান্য মাপজোপের ব্যাপার আর কি! আর বাড়ির ভিতরে-বাইরে আষ্টেপিষ্টে

বাঁধন দিয়ে নিয়েছেন তো, কোন দিক বাদ পড়ে না থাকে। ইঞ্জিন শামুকের মতন আস্তে আস্তে সরবে। ঐ যে হাসপাতালের কথা বললাম পঁচানব্বই মিটার যেতে লেগেছিল দুই দিন দুই রাত্রি। মস্কোর মাটি পাথুরে— আমাদের নরম পলিমাটির উপর—নড়াচড়া করতে কিছু বেশি সামাল হতে হবে কিন্তু। আমার কয়েকটি জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু আছেন—তাঁরা তুড়ি দিয়ে বলেন, এ আর কঠিন হল কিসে? তবে নতুন বাড়ি বানানোর কত গুণ খরচা পড়বে এই সরানোর ব্যাপারে, সেইটে আগে হিসাব করে দেখো।

বাস থেকে নেমে পড়েছি এটা-ওটা ঘুরে দেখবার জন্য। কালো কালো এক দঙ্গল জীব পিলপিল করে বেড়াচ্ছে—লোকে লোকারণ্য। ভিড় জমানোর বাবদে মস্কোর মানুষ কলকাতার চেয়ে একটুও কম যায় না। ফটোগ্রাফারের দল সঙ্গে আছে, মওকা বুঝে হরদম ছবি নিচ্ছে। কত যে ছবি তুলেছে, অন্ত নেই।

কত মানুষ—মেয়ে পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো। দুটো-একটা কথা বলবে ওরা, কথা বোঝাবার জন্য আঁকুপাকু করে। কোলের ছেলেটা অবধি উঁ-উঁ করে মায়ের দেখাদেখি। মায়ের কোল থেকে আমাদের মেয়েরা ডাকাতি করে কেড়ে নিচ্ছেন বাচ্চাগুলো। বুকে রাখছেন, কাঁধে তুলে ধরছেন। আদর সেরে মায়ের নিধি ফিরিয়ে দিচ্ছেন আবার মায়ের কাছে। ক্লিক-ক্লিক—এই-সব ছবি তুলে রাখছে তাড়াতাড়ি। না না, আদরের অমন রীতি নয়— সহযাত্রিণী একজনকে সামাল করে দিলাম। মায়ের মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছে এ দেখুন, গালে হাত দিয়ে আদর ওরা পছন্দ করে না। রোগ-বীজাণু আসতে পারে, স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে। ভদ্রতা করে মুখে কিছু বলেনা, শিউরে শিউরে উঠছে।

দলছাড়া গোত্রছাড়া হয়ে কখন ইতিমধ্যে ভিড়ের ভিতর তলিয়ে গিয়েছি। এই আমার এক দোষ, মানুষের ভালবাসা দেখলে আপনহারা হয়ে পড়ি। পিকিন শহরের রাস্তায় রাস্তায় এমনি কাণ্ড কতবার ঘটেছে। জনসমুদ্রকে ভয় করিনে, স্ফূর্তিতে আমার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এত বয়স হল, সামলে থাকতে শিখলাম না! ভাগ্যবশে বদি বড় সরকারি চাকরে হতাম কী গতি হত যে আমার। চব্বিশ ঘণ্টাও তো চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারতাম না। মানুষের সমারোহ, বর্ণাঢ্য বিচিত্র কত রকমের মানুষ—আর আমায় তখন দোর গোড়ায় পিওন বসিয়ে কাগজের স্লিপ টাঙিয়ে একাকী এক জেলখানা বানিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে হত। ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। চাকরি বাকরি হয়নি ভাগ্যিস। পথ চলতি অতি সাধারণ এই সব মানুষ—মরি মরি

কী স্বাস্থ্য কী অপরূপ মুখের হাসি! খোঁড়া মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, তার মধ্যে ভালবাসায় ভরা চোখে তাকিয়ে একবার দেখে গেল—ভাল হোক ওদের—মিষ্টি স্বপ্নের মতো হাসতে হাসতে সারা জীবন কাটাক। শিশু ঐ জন্মের পরেই যা একটুখানি কেঁদে নেয়, আর যেন কাঁদতে না হয় তাকে কোনদিন।

ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ কথা বলছে, কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তা আমিও ডরাই নাকি—আসবার আগে গণ্ডা দেড়েক রুশবাক্য রপ্ত করে এসেছি। গুরুনাম স্মরণ করে তারই একজোড়া আন্দাজি ছেড়ে দিলাম—ইণ্ডিস্কি ডেলিগাৎসি। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার ডেলিগেট আমি। শুরু হল কিনা খোদার মালুম। কিন্তু যতদূর হল তারই ঠেলায় যাই যাই অবস্থা। ওরা ধরে নিয়েছে রুশ ভাষায় দস্তুরমতো এলেমদার আমি। একে ইণ্ডিয়ান, তায় বিদ্যাদিগ্‌জ। মুষলধারে প্রশ্ন ছাড়ছে। আঁ আঁ আঁ করি, আর অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাই। অতল সমুদ্রে ডুবে যাবার দাখিল। পেয়েছি—দোভাষি একজন দেখতে পাচ্ছি ঐ যে অনেক দূরে। আসছে সে আমারই দিকে। বাস বিস্তর ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, আর সকলে উঠে পড়েছে, আমিই একা কেবল জল সমুদ্রে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছি। দোভাষি আসছে উদ্ধার করে নিতে।

তখন তাকেই তোড়ের মুখে ঠেলে নিজে পিছিয়ে আসি। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিক পাক দিয়ে দিয়ে জবাব দিচ্ছে। উৎসাহের প্রাবল্যে কেউ বা তার মুখ ঘুরিয়ে নিজের কথাটা আগে শুনিয়ে দিচ্ছে। যা গতিক, স্বয়ং দশানন হাজির হয়ে দশটা মুখে এক নাগাড় বলেও তো সামাল দিতে পারতেন না। তার উপরে আর এক মুশকিল—আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তবে তো উত্তর বলবে। কত জনে এসেছো তোমরা, ক'দিন এসেছ? আছ কোথায়? কেমন লাগছে আমাদের দেশ? ইণ্ডিয়া তো গরম জায়গা, শীতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়···

যেন রাস্তার মানুষদেরও পাইকারি অতিথি আমরা। হাতে-নাতে কিছু করতে পারছে না তো দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দুটো-চারটে কথাবার্তা বলে দায়িত্ব পালন করেছে। পাকাচুলের এক বৃদ্ধা ওরই মধ্যে একটু বকুনি দিল, খালি মাথায় বেরিয়েছ কেন বাপু? একখানা কাণ্ড ঘটাতে চাও? সব সময় মাথায় ঢাকা দিয়ে বেরুবে। আমার চোখ ছল-ছল করে আসে। মা কবে চলে গিয়েছেন। মা, তোমার গলা শুনতে পাই মস্কোর পথে, তোমার অবোধ ছেলেটাকে ধমক দিয়ে উঠলে।

অতি-সুন্দরী তরুণী এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করো, পেশা কি তোমার? দোভাষি প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিল। তবে রে—পেয়ে গেছি আর এক মওকা বিদ্যে জাহির করবার। জবাব আমার দেড় গণ্ডা শব্দের মধ্যেই পড়ে গেছে। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গিয়ে সমুখে বলি, পিশাতিয়েল—লেখক আমি একজন।

কে জানত, পিশাতিয়েল মানে ওদেশে সাংঘাতিক এক ব্যাপার! · চোখে চোখে খবর হয়ে গেল—দূরের মানুষ রে-রে করে ছুটে আসছে। দেখে যা রে, কোথাকার কোন পিশাতিয়েল পথে বেরিয়েছে। ভিড়টা নিরেট হয়ে গেল দেখতে দেখতে। দোভাষির বাপের সাধ্য নেই, উদ্ধার করে বাসে নিয়ে তুলবে। পিশাতিয়েল-দর্শন নয়ন-ভরে হয়ে যাক, তার পরে যদি দয়া করে একটু পথ করে দেয়। তা ছাড়া কোন উপায় দেখি নে।

গোটা সোবিয়েত জুড়ে এমনি কাণ্ড। লেখকদের কেষ্ট-বিষ্টু জ্ঞান করে। বাহার কত লেখকদের! যে কাজই করুন, জোরদার ইউনিয়ন আছে। লেখক-দেরও আছে। দু-দিন গিয়েছিলাম লেখক-ইউনিয়নে। বলব কি মশায়, মস্ত-বড় উঠানে গাড়ির ভিড়ে পা ফেলতে পারিনি। দামি দামি পোষাক পরে এক এক লাটসাহেব নামছেন যেন। এই দেখুন, কি বলে ফেললাম—লাটসাহেবও তো ফতুর হয়ে যাবেন ঐ ছাঁটকাটের পোশাক পরে ঐ দরের গাড়ি চড়ে বেড়ালে। ওদেশের লাটগুলোর কথা বলছি অবশ্য—সোবিয়েত দেশের শাসনভার যে কর্তাদের উপর। অনেক গরিব তারা লেখকদের তুলনায়। সাম্যবাদীর দেশ বটে, তা বলে মানুষ এক সমান নয়—বড়লোক আছে, গরিব লোক আছে। আর বড়-লোকের পয়লা সারিতে বিরাজ করছি আমরা—পিশাতিয়েলবর্গ। আর আছেন বিজ্ঞানী, গবেষক ও অধ্যাপকেরা। এবং ব্যালেরিনা মেয়েগুলো—অপেরায় যারা নাচে। অর্থাৎ শিল্পী ও পণ্ডিতদল—নতুন বর্ণাশ্রমে যাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। খাতির কুড়ান, রুবলও লোটেন।

হবে না কেন? মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো—জাত ধরেই সে নেশাগ্রস্ত। বই পড়ার নেশা। গাঁজা-ভাঙ এর চেয়ে অনেক ভাল মশায়, তার তবু সন্ধ্যা-সকাল আছে। এ নেশার সময়-অসময় নেই। আশি মাইল বেগে মাটির নিচে মেট্রোয় ছুটেছে, এক একখানা বই মুখে ধরে আছে প্রায় সকলে। জিনিসপত্র কেনা তো ঝকমারি ঐ হতভাগা দেশে। ডিম-মাংস সবজি-আনাজের কথা ছেড়ে দিন—ক্যামেরা কিনবেন, সেখানেও সিকি মাইলের এক কিউ। গ্রামোফোন কিনতে যান, সেখানেও। এমন দেখেছি, বরফ পড়ছে—কিম্বা টিপটিপে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়া, অবিচল ধৈর্যে তারই মধ্যে মানুষ কিউয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। বই হাতে আছে এক একখানা—ব্যস, তাতেই হয়ে গেল। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, ভুবন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও কেউ টের পাবে না। এমন যে উৎকট নেশা, তার জোগানদার হলেন লিখিয়েলগণ। হাত-গাঁটে তাদের দু-চার পয়সা আসবেই, আমি আপনি হিংসা করে করব কি?

আবার তা-ও বলি, হিংসা করতে গেলে পাপ হবে। আমার বাঙালি পাঠকেরা যেন কিছু কম যান ওদের চেয়ে! কত দিকে কত দারিদ্র্য, নিজেদের তবু নানা রকমে বঞ্চিত করে আপনারা বই কেনেন। বই কিনে কিনে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, উৎসাহ দেন। প্রাণপাত করে লিখে যাই আমরা। বাংলায় তাই এত লেখক, বাংলার সাহিত্য তাই এমন বৈচিত্র্য আর এত প্রাণবন্তা। মস্কোর এক সভায় বলেছিলাম আমি আপনাদের কথা বুক চিতিয়ে।—আমি এই মানুষ মশায়, চাকরিবাকরি করি নে—নিতান্তই বেকার। পাঠকেরাই আমায় খাওয়ান পরান। চেহারাখানা দেখছেন তো? (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কিঞ্চিৎ গায়ে গতরে আছি।) পাঠকেরা তা হলে খুব খারাপ খাওয়ান না, কি বলেন?...

যাকগে, যাকগে। মস্কোর রাস্তায় ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু। টেনে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওঁরা দোভাষি পাঠিয়েছেন, আর আজে-বাজে বকতে লেগেছি আপনাদের সঙ্গে। সেই তরুণী মেয়েটা জিজ্ঞাসা করে, লেখক! লেখক বট হে তুমি? নামটা কি শুনি—

নাম আবৃত্তি করে দু তিন বার। স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হাসি পেয়ে যায় আমার। পারবে না মাণিক, মিথ্যে হয়রান হচ্ছ। লিখি তো ভালই (অন্তত আমার নিজের মতে)—কিন্তু বশম্বদ ঢাকি জোটাতে পারি নি, কলম ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ড্যাডাং-ড্যাডাং করে কাঠি পিটতে লেগে যাবে। কান বাঁচাবার খাতিরে মানুষ তখন তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে দেবে, হাঁ, হাঁ —ক্ষমতা ধরো তুমি লেখক; এবারে থামাও বাজনা। আমার তা হল না, গোড়ায় ভুল করে বসে আছি। নাম শুনে আমার নিজের দেশের মানুষই তিনবার মাথা চুলকায়, তোমা অবধি নাম পৌঁছবে কি করে দূরের কন্যা?

তরুণী ভাবতে থাকুক ভ্রূ কুঁচকে। ইতিমধ্যে এক মাঝবয়সি মহিলা এগিয়ে এসে পরিচিয় দিচ্ছেন। আমার স্বামীও লেখক ছিলেন। আর আমি হলাম আর্টিস্ট, ছবি আঁকি। কলম ফেলে লড়াইয়ে ছুটলেন আমার স্বামী, আর ফেরেন নি। শোন লেখক, এই খবরটা শুনে যাও—লড়াইয়ে আমরা জিতেছি, কিন্তু গোটা সোবিয়েত দেশে এমন বাড়ি নেই যেখান থেকে একটি বলি অন্তত না গিয়েছে। ফুলের মতন কত ছেলে প্রাণ দিল, কোন দিন তার

হিসাব হবে না। ছবি আঁকি আমি, আর অভিশাপ দিই যারা লড়াই বাধায়…

এমন একটি-দুটি নয়—লড়াইয়ের কথা উঠলেই, দেখছি, বলতে বলতে মানুষ ক্ষেপে যায়, চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, চোখ ফেটে ধারা ছোটে। মস্কোয় লেনিনগ্রাডে এমন কি মধ্য-এশিয়ার দেশগুলোয়—দেখে নে যাবেন এমনি ব্যাপার। রাস্তাঘাটে পঙ্গু বিকৃতাঙ্গ অনেক দেখতে পাবেন, লড়াই দয়া করে যাদের প্রাণটুকু রেখে গেছে।

আর নয়, মহিলাব দৃষ্টির সামনে থেকে এক ছুটে বাসের ভিতরে। চালাও, চালিয়ে দাও—। আমাদের ওরা কত আপন ভাবে, তাই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। রাস্তার নগণ্য মানুষটাও আনন্দে ডগমগ হয়। ভারত বড় ভাল, ভারত কোন দিন মারামারি-কাটাকাটি করেনি ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে। ইণ্ডিয়ানের কাছে মন খুলে দিতে বাধে না তাদের। দাশগুপ্তর কাছে ওদের ভালবাসার কত গল্প শুনলাম। বিনয় রায় আছেন—মস্কো রেডিওর বাংলা-বিভাগের কর্মকর্তা, তাঁর কাছেও শোনা গেল। অপেরা-থিয়েটারের নামে পাগল ও-দেশের লোক—টিকিট কেনার জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। দাশগুপ্ত গুটিগুটি পিছনে গিয়ে জায়গা নিচ্ছেন—কোন দিক দিয়ে একজন এসে হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল। সকলের আগে যে জন, তারও আগে দাঁড় করিয়ে দিল তাঁকে। তুমি ভারতের মানুষ—লাইন-টাইন তোমার জন্য নয় গো! এ-সব আমাদের। আর মেট্রোর ব্যাপার তো বিকেলবেলা নিজের চোখেই দেখতে পেলাম আজ। অফিস-ফিরতি ভিড়—এত জন আমাদের বসবার জায়গা হচ্ছে না। মানুষ-জন উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। থুনথুনে বুড়োমানুষটা ডাণ্ডা ধরে ঝুলবে আর আমি মজাসে বসে বসে পা দোলাব, এটা কেমন হয়! হাত ধরে ঝুলোঝুলি করি তাঁকে বসাবার জন্য। জান কবুল, বসবেন না। দূর-বিদেশে রেলের কামরার ভিতর মারামারি করা তো যায় না, রণে ভঙ্গ দিয়ে আমাকেই তাই বসে পড়তে হল।

আরে, মস্কো-নদীর ধারে এসে পড়েছি যে! বাস থামল। ওপারের কূল ঘেঁসে ক্রেমলিন। একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে ইস্কুল থেকে ফিরছে। ধরতে যাই একটিকে। টের পেয়েছে, দৌড়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। আরও অনেকে ছুটছেন ধরবার জন্য। ওরাও ছুটেছে। কিন্তু একেবারে পালিয়ে যায় না—দৌড়ে আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে, কৌতুকদৃষ্টিতে তাকায়। শহর মস্কোর রাস্তার উপর ছোটয় আর বড়য় ও-দেশে আর এদেশে লুকোচুরি

খেলা শুরু হল দস্তুরমতো। রাস্তাটা খুব ফাঁকা, একটা-দুটো মোটর যাচ্ছে কদাচিৎ। দেখতে দেখতে খেলা খাসা জমে উঠল। অনেক শতাব্দীর বুড়ো ক্রেমলিন মিনার-গম্বুজের দশ-বিশটা মাথা তুলে মাথার উপর সোনার মুকুট চাপিয়ে আমাদের ছেলেখেলা দেখতে লাগল নদী-পার থেকে। শিশুদলের মধ্যে হঠাৎ এক বীর পুরুষ খাড়া হয়ে দাঁড়াল, ছুটোছুটির মধ্যে তার কোন রকম নড়াচড়া নেই। ভারি পরোয়া করি কি না তোমাদের—ভাবখানা এই প্রকার। বছর সাতেক বয়স। গায়ে হাত দিলাম, মুঠির মধ্যে হাত নিয়ে নিলাম—দৃকপাত নেই। হাতে বই রয়েছে—রংচঙে ছবির বই। সগর্বে দেখাচ্ছে খুলে। দেখাদেখি আরও সব আশেপাশে ধরা দিচ্ছে কাছ ঘেঁসে এসে। গ্রেপ্তার হয়ে গেল এবারে সকলেই। ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছি। তখন তারাই হুড়োহুড়ি করছে পাশে এসে ছবির মধ্যে ঢোকবার জন্যে। বাচ্চা হলে কি হবে, জনতান্ত্রিক পৃথিবীতে ছবির মহিমা এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে।

ঘুরে ঘুরে রেড-স্কোয়ারে এলাম। আবছা আঁধারে কাল দেখে গেছি, আজ এই দিনের আলোর রেড-স্কোয়ার। মুসোলিয়মের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছি। ঝকঝকে মিলিটারি পোশাকে চারজন লম্ব-মাপায় বন্দুক নামিয়ে সারাদিন সারারাত্রি পাহারা দেয়। ঘুমোও ঘুমোও—হাজির রয়েছি আমরা; রয়েছে আমাদের সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের অতন্দ্র ভালবাসা। বেলা ঠিক একটা—পাহারা-বদল এইবার। ক্রেমলিনের বড় গেট দিয়ে গটমট মার্চ করে নতুন পাহারাদাররা এসে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল এরা, জায়গা ছেড়ে নেমে এলো। নতুনেরা ঠাঁই নিল সেখানে। মার্চ করে পুরানো দল ঢুকে পড়ল ক্রেমলিনের ভিতরে। আমাদের সঙ্গে ভিড় করে কত মানুষ এই পাহারা-বদল দেখছে!

অদূরে ডান হাতের দিকে বেসিল ক্যাথিড্রাল। কাল এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বললাম, মনে পড়ছে না? এটা নিয়ে মুশকিলে পড়েছে ওরা। সরায় নি. সরাবার জায়গা নেই। এমন ঐতিহাসিক বস্তু নষ্টও করা যায় না। রাস্তার ঠিক মাঝখানে নয়—ধারের দিকে বেমানান রকমে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে পথ। আর ঠিক সামনে, বলেছি তো, উঁচু বধ্যভূমি। রেড স্কোয়ারের চেয়ে ঢের ঢের বড় স্কোয়ার মস্কো শহরেই অনেকগুলো আছে। পাশে, ঐ দেখতে পাচ্ছেন, ক্রেমলিনের উল্টো দিকে বিরাট ডিপার্টমেন্টাল-স্টোর। আর ক্যাথিড্রালের মুখোমুখি হল বিপ্লবের মিউজিয়াম ইত্যাদি। মস্কো ইতিহাসের পনেরআনা ছড়ানো রেড-স্কোয়ারের আশে-পাশে এদিকে-সেদিকে। চৌহদ্দি বাড়ানো যায় কেমন করে তবে বলুন।

এক রাস্তায় এসে পড়লাম—তার একদিকে বেঁটেখাটো কাঠের বাড়ি, কতক বা কাঠে-ইটে মেশাল-করা, উপরে টালির ছাউনি। আর উল্টো দিকে দশতলা বিশতলা অট্টালিকা আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-ও এক এক-জিবিশন যেন—কেমন ছিল পুরানো শহর, আর কি এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হুড়মুড় করে যা ভাঙাচোরা লাগিয়েছে—দশ বিশটা বছর সবুর করুন, পুরানো মস্কোর চেহারা তখন ঐতিহাসিক বাড়ি কয়েকটা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবেন না।

এত করেও জায়গার অকুলান এখনো। এই শহরের এবং বড় বড় সকল শহরের যাবতীয় ঘরবাড়ি জায়গাজমি সরকার নিয়ে বসে আছে। লাখ টাকা ঢালুন কোটি টাকা ঢালুন, এক কাঠা জমি কেউ কিনতে পাবেন না। শহরের বাইরে অবশ্য পেতে পাবেন—জমি কিনে ঘরবাড়ি বানান, কয়েকটা গাছপালা এবং একটু সবজি ক্ষেতও করতে পারেন আশেপাশে। শনি-রবিবারে ছেলে-পুলে ও ইয়ারবন্ধু নিয়ে নিজের বাড়ি বসবাসের সুখভোগ করে আসুন। মরবার পর সে সম্পত্তি পুত্রপৌত্রেও অর্শাবে। বাস ঐ অবধি—ওর থেকে দু-এক বিঘে অন্যের কাছে বিলি করে যৎকিঞ্চিৎ খাজনার বন্দোবস্ত করবেন, সেটি চলবে না। আর শহরের মধ্যে যতক্ষণ আছেন ভাড়া বাড়িতে থাকতেই হবে, তা সে ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ যে দরের মানুষ হন না কেন আপনি। ঘরের জন্য নগর সোবিয়েতে দরখাস্ত পেশ করে বসে থাকুন।

ঘর কি রকম দেবে, সেটাও শুনে নিন। এক মজার দেশ মশায়, আজব হিসেবপত্তোর। ষাট রুবল ভাড়ায় দুটো ঘর দেবে তো ষোল রুবলে পাঁচটা। ধরুন, য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক আপনি—বেতন তিন হাজার। এতৎসত্ত্বেও বিয়ে করেননি, একলা থাকেন। অতএব দুটো ঘরেই আপনার তোফা চলবে—বেশি চাইলে দিচ্ছে কে? ভাড়ায় তা বলে রেহাই পাচ্ছেন না, দু-পার্সেন্ট হিসাবে ষাট রুবল থোক দিয়ে যান। আর এক মাস্টার আছেন, নতুন ইস্কুলে ঢুকেছেন, মাইনে পাচ্ছেন আটশ'। ইতিমধ্যে বিয়েথাওয়া করে মাস্টারমশায় দিব্যি এক সংসার বানিয়ে ফেলেছেন, পাঁচটা ঘরের কমে কুলোয় না। বেশ, বেশ ভাই, পাঁচ-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট পেলেন তিনি। ভাড়া ঐ মাইনের দু-পার্সেন্ট—ষোল রুবল। বিচার দেখুন তবে ষোল রুবলে একজনে পাচ্ছে পাঁচটা ঘর, আর ষাট রুবল দিয়ে অন্যজন দুটো। মোটামুটি একই ধরনের ঘর—কার্পেট বিছানো মেজে, আলো, রেডিও, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ঘর গরম রাখার বন্দোবস্ত—মাঝামাঝি আরামে থাকতে গেলে মানুষের যা সমস্ত লাগে। অর্থাৎ জায়গা পাচ্ছেন যতখানি আপনার প্রয়োজন, ভাড়া দিচ্ছেন যত দূর আপনার

সাধ্য। এই হল বিধি। মানুষের কম পক্ষে কতটা আরাম ও আনন্দের প্রয়োজন, তা-ও ওরা ছকে দিয়েছে। ভাড়ার ঘর বানাচ্ছে বলে তার নিচে নামতে পারবে না।

হোটেলে পা দিয়েই আবার এক ফ্যাকড়া। ফরম দিল প্রতিজনকে—পূরণ করে দিয়ে তার পরে উপরে যাও, খাওয়া-দাওয়া করোগে। বিয়ে করেছ কিনা—না করে থাক ভালই, করে থাকলে বউয়ের নাম ঠিকানা ইত্যাদি সবিস্তারে লেখো। ব্যাপার কি? আমরা স্ফূর্তি করে দেশ-বিদেশ ঘুরছি, দেশেঘরে সে বেচারিরা সংসার বহন করছে, তাদের নাম নেবার হঠাৎ গরজটা কি হল? এখন নেই বটে, গরজ হতেও পারে। আইন ছিল, রুশ মেয়ে বিদেশি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। সে আইন বাতিল এখন। কপালে থাকে তো প্রেম জমান, এবং সাহস থাকে তো বউ করে স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে চলুন। তার আগে জানা দরকার, ঘর আপনার ভরভরতি নয়। আগেভাগে সত্যি খবরগুলো লিখিয়ে নিচ্ছে, প্রেম একবার জমে উঠলে ঘরের গোলমাল তখন কি আর বলতে যাবেন? পরম-সৌম্য বৃদ্ধ একজন আমাদের মধ্যে—মাথার চুল একটি কাঁচা নেই, তাঁকে দিয়েও ফরম পূরণ করাচ্ছে। আরে বাপু, সাড়ে তিনকাল গিয়েছে, আমি প্রেম জমাতে যাব কোন নাতনির সঙ্গে? হলে কি হবে, আইন বয়সের হিসাব শুনবে না। এবং শুনতে পাই, প্রেম জমজমাট হলেও অবিকল সেই গতিক। ঐ অবস্থায় কফিনের মধ্যেও নাকি পাশমোড়া দিয়ে উঠে মিষ্টিমিষ্টি বুলি ছাড়তে শুরু করে।

বিকালে মেট্রোয় চড়লাম। মাটির নিচে রেলপথ, তার এই নাম। মস্কোর রাস্তায় বেড়াচ্ছেন কিংবা অট্টালিকায় শুয়ে আছেন—টেরও পাচ্ছেন না, অনেক নিচে বিষম আওয়াজ তুলে পাতালের রেলগাড়ি ছুটোছুটি করছে। বিদ্যুতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, লাখ লাখ মানুষ ওঠানামা করছে। এত কাণ্ড, উপর থেকে তার ভাঁজ পাবেন না। পঞ্চাশ কোপেক অর্থাৎ আধ রুবল দিয়ে টিকিট কিনে টুক করে সিঁড়ির উপর উঠে পড়ুন। এ্যাসক্যালেটের অর্থাৎ চলতি-সিঁড়ি—সর্বক্ষণ সিঁড়িই উঠানামা করছে, মানুষ নয়। কষ্ট করে পা ফেলে নেমে যেতে হবে না, সিঁড়িই আপনাকে পাতালপুরী নিয়ে চলল। পাশাপাশি দেখতে পাবেন, আর এক কেতা সিঁড়ি হাজার হাজার মানুষ বয়ে ভূ-পৃষ্ঠে তুলে দিচ্ছে।

মেট্রোর মতলব ১৯২১ অব্দে মাথায় আসে। প্যারি লণ্ডন বার্লিন সর্বত্র আছে, মস্কো কেন বাদ যাবে? সেই থেকে বছরের পর বছর লাইন বেড়েই

যাচ্ছে। শহরের তলদেশও অতএব একেবারে ফোঁপরা। গোটা শহর ঘুরে গোল হয়ে লাইন গেছে, আবার সোজাসুজিও বিস্তর লাইন ঐ বৃত্ত ভেদ করেছে মস্কো-নদীটাও রেহাই করেনি, তার তলা দিয়ে লাইন (প্যারিস সীন এবং লণ্ডনের টেমস যেমন)। নদীতলের লাইন আরো—আরো নিচুতে। তাই দেখুন, পাতালে তলিয়ে গিয়েও নিস্তার নেই—দফায় দফায় সিঁড়ির উঠানামা। সিঁড়ি চড়ে এ লাইনের পাশে এলেন, ঘুরে গিয়ে দেখুন ভিন্ন লাইন। খানিকটা নেমে নতুন আর একটা। আবার বা উঠে পড়লেন খানিকটা। তলায় তলায় লাইনের জাল, গোলকধাঁধা ছাড়া কি বলবেন একে? ভাড়া কিন্তু ঐ একবার যা টিকিট কেটে নেমেছেন টিকিটটা নিয়ে নিয়েছে নামবার মুখে। মেট্রো চলে সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি একটা অবধি। পঞ্চাশ কোপেকের মূল্যে এই উনিশ ঘন্টা ধরে স্বচ্ছন্দে আপনি এ-গাড়ি ও-গাড়ি করুন—কেউ কিছু বলতে যাবে না। কত গাড়ি চড়বেন চড়ুন না। একবার ভূলোকে উঠে আবার যদি নামতে চান, তখনই নতুন টিকিট।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে ভয়াবহ রকমের গতিতে এ-লাইনে ও-লাইনে ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে। থামলেই দরজা আপনা-আপনি ফাঁক হয়ে গেল। উঠল নামল মানুষ। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার রওনা। দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। স্টেশনে গিয়ে না থামা পর্যন্ত কুড়াল মারলেও এখন দরজা খুলছে না।

আহা, পাতালে ইন্দ্রলোক বানিয়েছে রে। একেবারে দিনমান। আলো প্রখর নয়, অথচ আবছায়া ভাব নেই কোন দিকে। দিনমান বলেই অতি সহজে মেনে নেবেন। স্টেশনগুলো অপরূপ। কোটি কোটি রুবল খরচ করে সাজিয়েছে এই এদের এক রেওয়াজ—যেখানে লোকের আনাগোনা, সে জায়গা আহা-মরি করে সাজাবেই। শিল্প-পরিবেশে প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি আসুক পথের মানুষদের, রুচি জন্মাক। মার্বেল ও রকমারি পাথরের উপর কারুকর্ম—তার একটা টুকরোও বাইরের আমদানি নয়। হাঁকডাক করে দেশের মানুষদের যেন বলছে—তোমার কত কি আছে, চোখে দেখে নাও। গর্ব ও আত্মপ্রত্যয় জাগুক। চুয়াল্লিশটি স্টেশন—প্রতি স্টেশনের চেহারা আলাদা, আলাদা ছাঁচের অলঙ্করণ। দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কো। ইউক্রেন থেকে উজবেকিস্তান—বিভিন্ন জীবন-যাত্রা দেয়ালে দেয়ালে অদ্ভুত হয়ে ফুটেছে। এক স্টেশনের দেয়ালে আটটা খোপ বানিয়ে রঙবেরঙের টুকরো পাথরে ছবি করেছে। সাড়ে তিন লক্ষ টুকরো লেগেছে এক এক ছবিতে। পুরানো কাল থেকে জনমুক্তির যত চেষ্টা হয়েছে, সেই সব ছবি। পিটার দ্য গ্রেট আছেন, আরও সব আছেন; জার আমলের ইতিহাস কিছু কিছু রয়েছে ছবিতে। আশিটা বিশাল ব্রোঞ্জ-

মূর্তি—এঁরা সব বিপ্লবের বলি ; সামান্য সাধারণ মানুষ প্রাণ দান করে চিরজীবী হয়ে আছেন। কী খরচ করেছে রে! পয়সাকড়ি আমাদের নয়, পদে পদে তবু আঁতকে উঠি। মানুষের চোখের সামনে দেশের পরিচয় তুলে ধরা, এর চেয়ে বড় সদ্ব্যয় ওরা ভাবতে পারে না।

একেবারে-খালি এক-একটা ট্রেন আসছে মাঝে মাঝে। প্ল্যাটফরমে একটা মেয়ে হাতের পাখা নাড়ছে, আর চিৎকার করছে : এ গাড়িতে উঠে পড়ো না কেউ। চার-পাঁচ ঘণ্টা অন্তর গাড়ি সাফসাফাই করার জন্য সাইডিংয়ে নিয়ে যায় ; পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করে পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ি দিয়ে দেয় আবার লাইনে। মেয়েটা হল সিগন্যালার, স্টেশনে স্টেশনে প্রত্যেকটা লাইনের মুখে একজন করে আছে। হাতে যে পাখার কথা বললাম, ঠিক পাখা নয়—দেখতে জাপানি পাখার মতন গোলাকার চাকতি ; এক পিঠ তার লাল। সতর্ক নজর রয়েছে। যদি ধরুন, কোন চড়ন্দার উঠতে না উঠতে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, দু-দিক দিয়ে দরজা এসে চেপে ধরছে তাকে—পাখার লাল পিঠ ঘুরিয়ে ধরে তক্ষুনি গাড়ি থামিয়ে দেবে। প্ল্যাটফরমে দুটো করে ঘড়ি। একটায় সময় দেখে। আর একটার কাঁটা ঘুরছে, পরের ট্রেনটা যত কাছে আসছে কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে চিহ্নিত জায়গায়। বিকালবেলা এখন চড়ন্দারেরা বাজার-সওদা নিয়ে যাচ্ছে—রুটি, ফল-পাকড়, টিনের কৌটোয় এটা-সেটা। মাঝারি সাইজের স্যুটকেশ দেখছি মেয়েদের হাতে। স্টেশনে কুলি নেই, কেউ বয়ে দেবে না আপনার মাল, নিজে বইতে হবে। আর ঐ যা বলেছি—ভারতীয় দেখে জায়গা ছেড়ে সকলে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

বিস্তর ঘোরাঘুরি হল। এবার উপরে উঠে যাব। মানুষ গুনতি করে একজন কম হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বাদ দাওনি তো হে, দেখ দেখ—অমুক আছেন, তমুক আছেন? মহিলা একজনকে দেখা যাচ্ছে না তো। গাড়ি বদলানোর মুখে উঠতে পারেন নি, আগের স্টেশনে পড়ে আছেন। দোভাষি গাড়ি চেপে ছুটল তাঁর খোঁজে। আর এদিকে মিনিট খানেকের মধ্যে তিনি এসে হাজির। তখন আমরাই উঠে চললাম ; দোভাষি থাকুক পড়ে পাতাল-পুরে। ওদের দেশ, চিনে ফিরতে পারবে ঠিক।

আজকেও থিয়েটার। থিয়েটার রোজ আছে। এমন থিয়েটার-পাগলা জাত আর দেখবেন না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বরফ সুযোগ-দুর্যোগ বাইরে যেমনই হোক থিয়েটারের সমস্ত সিট ভরতি। সেই বড় বিপ্লবের দিনগুলোয় কি হয়েছিল, জানতে ইচ্ছা করে। থিয়েটার বন্ধ নিশ্চয়—অন্তত সেই বাবদে মানুষগুলোর কি মর্মান্তিক অবস্থা!

যেখানে আছি, বলতে গেলে থিয়েটার-পাড়া এটা। সকলের বুড়ো বলশই থিয়েটার। আশেপাশে আরও বিস্তর—তারাও কিছু কম যায় না। যাচ্ছি বাচ্চাদের থিয়েটারে। ভাববেন না, বাচ্চা ছেলেমেয়ের হৈ-চৈ মাত্র—অভি-নেতারা শিশু নয়, সবাই পাকাপোক্ত, সিনসিনারিতে ফাঁকি নেই। দর্শকের নব্বুই ভাগ শিশু, এই বয়স থেকে থিয়েটার দেখায় পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। অভিভাবকেরা ধরে ধরে পৌঁছে দিয়ে যান, কচিৎ কদাচিৎ কেউ বা হলের ভিতরে ঢোকেন। শতকরা দশভাগ হলেন তাঁরাই। পরিচ্ছন্ন ভাল নাটক, উৎকৃষ্ট অভিনয়, ভাল গান—যা থেকে আনন্দ পায় শিশুরা, সব মানুষকে ভাল বাসতে শেখে, দেশের সম্বন্ধে গৌরব বোধ করে, সৎ হতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। ছেলে খেলা মনে করে না—এদের ভারি মনোযোগ শিশু-নাটাশালার উপর। ইস্কুলের বাড়া-মহাশয় পালা দেখছে, ওর মধ্যে কখন যে বড় হবার ভাল হবার মানুষ হবার চিনি মাখানো পিল খাইয়ে দিচ্ছে, শিশুরা তা মালুম পায় না।

হলের ভিতরে ঢুকে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারিনে। উপরে নিচে, এ-তলায় ও-তলায় অজস্র ফুল ফুটে আছে। আজ্ঞে, হাঁ, হলফ করে বলছি, ঝকমকে মুখ, ঝিকমিকে হাসি, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা—ফুলই তারা। কৃষ্ণমূর্তি আমরা সব ঢুকছি, সমস্ত থিয়েটার উচ্ছলিত হয়ে উঠল। হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা করছে, আওয়াজ উঠল স্ফূর্তির। কতক্ষণ কেটে গেল—এ কী জ্বালা, থামতে চায় না।

ঐ-বড় থিয়েটার হল বোঝাই একেবারে। আমাদের ক'জনকে পিছন দিকে এক জায়গায় নিয়ে বসাল। কাল টিকিট করে এনেছে, সামনের জায়গা-গুলো তার অনেক আগে খতম। দেখতে পেয়ে শিশুর দল এসে চড়াও হল। আগে নিয়ে বসাবে। তাদের কেনা সিট আমাদের ছেড়ে দিয়ে তারা এই পিছনে এসে বসবে। তাই কি হয় রে বাবা. এই লম্বা বিড়িঙ্গে মানুষগুলো সামনে পাঁচিল হয়ে বসবে—বালখিল্য তোমরা দেখবেই না তো কিছু। যুক্তি মানবে না হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, এমন আবদেরে ছেলেমেয়ে দেখিনি কখনো। উঁহু, মিছে কথা বলা হল—দেখেছি এমনি সারা চীনে। বিদেশি মানুষ, ভিন্ন চেহারা, আলাদা পোশাকআশাক তা বলে এক বিন্দু সমীহ করবে না। ভালবাসার পুতুলটাকে যথা ইচ্ছে নিয়ে যেমন শোয়ায় সেইরকম বিবেচনা করে আমাদের। আর আমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে কালিম্পং-হোমসের অদূরে পাহাড়ের পথে বিচরণের সময়কার এক ঘটনা। নিচের মাঠে খেলা করছে ছেলেরা। খেলা থামিয়ে 'কালা—কালা—' বলে চেঁচাতে লাগল। সে সময়টা ঘোরতর ইংরজি আমল, ছেলেগুলোও

ষোলআনা না হোক, আধা ইংরেজ বাচ্চা। অতএব, শুনলাম না শুনলাম না—এমনি ভাবে এগোচ্ছি। তাই কি ছাড়ে, সদলবলে কাছে এসে চেঁচাতে লাগল—'বাঙালি বাবু ডালভাত খাবু ?' পত্তু ছেলেপেলের খুব মুখ পাকিয়েছে, দেখা গেল, ঐ বয়সে—বাংলা পদ্য। এখন আত্মাদির পরে কি ধরনের পদ্য মেলাচ্ছে, শুনে আসতে মাঝে মাঝে লোভ হয়।

যাকগে, যাকগে। ড্রপ উঠল ঐ যে। পুসকিনের লেখা গল্প, তার নাটক হয়েছে। সুরকার চেকভস্কির দেওয়া সুর। জলা জায়গায় ছেলে ছিপে মাছ ধরছে, এক মেয়ে এসে খুনসুটি করতে লাগল, ঢিল ফেলেছে চাবের মাছ যাতে সরে যায়। জলে শব্দ হচ্ছে, জল ছিটকেও উঠল একটু। সত্যি, আয়োজন ষোলআনার উপর আঠারো আনা। বাচ্চা বলে অবহেলা নেই। বাচ্চাদের ভাগ্য দেখে হিংসা হয়।

একটা ড্রাপের পরে বেরিয়ে এসেছি। দোভাষি পল সঙ্গে। রক্ষে আছে ? সবাই প্রোগ্রাম এগিয়ে দিচ্ছে, অটোগ্রাফ দাও ওর উপর। পড়তে পারবে না —তা কি হয়েছে-নাও লিখে ওর উপরে নাম, আমরা রেখে দেব। বাঁধানো খাতাও বেরুল কয়েকখানা। সইয়ের পরে বিনয়ে ঘাড় হেঁট করে ধন্যবাদ জানায়। আমরা বড়-মানুষরাও এত দূর পারিনে কিন্তু। দেদার সই মেরে যাচ্ছি—শ'খানেক হয়ে গেল বোধ হয়। আমি একা নই, সবাই এমনি পাই-কারি চালাচ্ছেন। এমনি সময় ঘণ্টা বাজল, ভিতরে যেতে হবে। বেঁচে গেলাম রে বাবা, নয় তো আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি করে এবারে খাটনি বকাশস দিচ্ছে আমাদের। কেউ ইস্কুলের ব্যাজ পরাচ্ছে, পায়োনি-য়াররা গলার লাল রুমাল খুলে জড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের গলায়।

॥ আট ॥

ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, কনকনে বাতাস। হোটেলের দরজা খুলে বাইরে পা দিতে কাঁপুনি ধরে যায়। বেরিয়েছি এক একটা যেন পশমি কাপড়ের বাণ্ডিল। সামলে ওঠা তবু দায়। এই হল এখানকার সাধারণ আবহাওয়া। বলি, এমন মুখ-আঁধারি আকাশের নিচে এত ঠাণ্ডায় থাক কি করে তোমরা ? মাস কয়েক পরে প্রথম অঘ্রানে ঐ দোভাষিদের একজন—মীরা এসেছিল কলকাতায়। সে এসে পাল্টা শোধ দিয়ে গেল, উঃ—এমন জলজলে রোদের মধ্যে এত গরমে থাক কি করে তোমরা ?

ফুটপাথের গা ঘেঁষে সারবন্দি মোটরগাড়ি। ইঞ্জিন গর্জাচ্ছে। স্টার্ট এমনি দেওয়াই থাকে—গাড়ির ভিতরটা কুসুম-কুসুম গরম করার যন্ত্রটা

চালু রাখে স্টার্ট এই রকম বন্ধ না করে। ফটক থেকে ফুটপাথটুকু মাত্র পায়ে হেঁটে পার হওয়া। মোটরের গর্তে ঢুকে পড়লে আর শীত নেই, দিব্যি আরাম।

বাচ্চাদের বইয়ের কেন্দ্রভবনে (The Central House of Books for Children) যাচ্ছি। শিশু-শিক্ষণের যত রকম ব্যবস্থা হতে পারে, সোবিয়েত দেশে কোনটা তার বাকি রাখে না। কত ভাবেন পণ্ডিতরা, কত রকমের তোড়জোড। কেন্দ্র-ভবনে গিয়ে কিছু কিছু তার নমুনা দেখে আসি।

গাড়িগুলো একে একে ভবনের ফুটপাথের কিনারায় গিয়ে থামল। এক-ছুটে দুয়োর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ি। টুপি খুলে ওভারকোটের বোঝা নামিয়ে পুনশ্চ ভদ্রলোক। উপরে-নিচে এঘর-ওঘর ঘুরে ঘুরে এবার ওদের কাণ্ডকর্ম দেখুন। আর কোন ঝামেলা নেই।

কর্ত্রী এলেন, ইয়া লম্বাচওড়া দশাসই মানুষ—স্বাস্থ্যে ঝলমল করছেন। আয়তনে মালুম হবে অনেক বয়স কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে উল্টো ভাববেন। কচিকাঁচা মুখ—যে শিশুদের ব্যাপার নিয়ে মেতে আছেন তাদেরই একজন যেন। বললেন বসুন একটুখানি—চা টা খেয়ে নিন। আগেভাগে প্রতিষ্ঠানের দু-চার কথা শুনুন, পরে তা হলে দেখবার সময় সুবিধা হবে।

বাচ্চাদের বই লেখা ভারি কঠিন অন্য দশ রকম বইয়ের মতন নয়। ছাপায় ছবিতে বিস্তর ভাবনাচিন্তা করতে হয়। বিষম দায়িত্বের কাজ। লড়াইয়ে কত ক্ষতি হয়েছে দেশের, কত মানুষ মরেছে, কত সমস্ত পরিগঠন-ব্যবস্থা বানচাল হয়েছে। শিশুরাই এখন ভাবী দিনের ভরসা, ওদের ঘিরে এত উদ্যোগ-আয়োজন। সত্যিকার মানুষ হবে যাতে তারা গড়ে ওঠে, সেইটে দেখতে হবে সকলের আগে। অতএব ওদের হাতে যে বই দেব, তা হেলাফেলার বস্তু নয়। খাটতে হবে এর জন্য।

একগাদা রংচঙে বই রয়েছে টেবিলে। নেড়েচেড়ে দেখি। ভাষাটা রুশীয়, পড়তে পারিনে। কিন্তু ছবি দেখে ভিতরের বস্তু বড় অজানা থাকে না। প্রতি বইয়ের শেষে ছাপা রয়েছে, ঐ দেখুন—আপনারা আব পড়ছেন কি করে?—ছাপা রয়েছে, বই পড়ে কেমন লাগে জানিও, দোষগুণ সমস্ত লিখো। তা নতুন কোন বই বেরুলে হৈ-হৈ পড়ে যায় ছেলেপুলের মাঝে। খুব চিঠিপত্র লেখে। আর বই তো হামেশাই বেরুচ্ছে। কমপক্ষে তিন শ চিঠি পাই রোজ আমরা।

এক একটা বই নিয়ে যত চিঠি আসে, আলাদা ফাইল করে রাখা হয়। ছ-মাসে যত চিঠি এসেছে, আমাদের দেখালেন। গাদা হয়ে গেছে।

শিশুরা নিজের জিনিস ভেবে স্ফূর্তি করে লিখছে, প্রত্যেকটা চিঠির জবাব দিই। এর জন্য পুরো এক ডিপার্টমেন্ট। বুলেটিন বেরোয় প্রতিষ্ঠান থেকে—তাতে বিশেষ এক বইয়ের সম্বন্ধে যে সব ভাল চিঠি এসেছে তার কতক কতক তুলে দেওয়া হয়। বই যিনি লিখলেন বা সম্পাদনা করলেন, এবং যিনি ছবি আঁকলেন, বিশেষ বিশেষ চিঠি তাঁদের কাছেও পাঠাই। অথবা ডেকে এনে শুনিয়ে দিই: শোন তোমরা, কি বলছে তোমাদের পাঠক। শিখে যাও, ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা যাতে কাজে লাগাতে পার। শিশুমনের অন্ধিসন্ধি লেখক-চিত্রকররা জেনে নেন এই সব চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে।

শুনবেন নাকি একটু আধটু? চিঠির গাদার ভিতর হাত ঢুকিয়ে খান কয়েক টেনে নিয়ে শোনাতে লাগলেন। দশ বছরের ছেলে লিখেছে—টমাসকে নিয়ে কবিতা লিখেছ, তা পড়লাম। আমাদের এখানে ঠিক ঐ ধরণের দুষ্টু ছেলে আছে একটা। তোমার কবিতায় টমাসের মতি-পরিবর্তনের কথা আছে। আমরা কিন্তু ঠিক ঐ পথ বে এ ছেলের কিছু করতে পারলাম না। আবার কবিতা লেখো, নতুন:-একটা কায়দা থাকে যেন তাতে···

এক বছর আটেকের ছেলে লিখছে, জাদুদণ্ড কোথায় পাওয়া যায় হ্যাঁগো লেখকমশাই? ঠিকানাটা অতি অবশ্য পাঠিও। যেমন করে হোক, আমার চাই একটা··

এক গল্পের নায়ক ডায়েরির আকারে আত্মকাহিনী বলেছে। শিশু পাঠক সেই নায়ককে চিঠি দিয়েছে, তোমার ডায়েরি পড়লাম ভাই। আমার বাবা বারাণ্ডার উপর ঘর বানাতে দিচ্ছে না তোমার মতো। কি করি বলো তো? তোমার বাপ মাকে আমার ভালবাসা জানিও।

এ তো গেল সাদামাঠা চিঠিপত্র। সমালোচনাও আছে—লেখা ও ছবি নিয়ে বাচ্চা পাঠকদের অভিমত। খানিক খানিক পড়ে দোভাষির মারফতে মানে বুঝিয়ে দিলেন। ওরে বাস রে, কী কঠোর নির্মম খুদে বিচারকরা। বড়দের সমালোচনায় দয়াধর্ম থাকে, রেখে ঢেকে বলেন তাঁরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে। এদের হাতে মাথা-কাটার গতিক। বই লিখে ফেলে লেখক বোধ করি থরহরি কাঁপেন পাঠক মশায়দের রায় কি রকমটা দাঁড়াবে। ছোট মানুষ বলে মতামত হেলা করা হয় না। আট বছরের ছেলে ছবির সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছে—সেই ছবির পাতাটা খুলে মিলিয়ে দেখলাম। ওদের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, বড়রা অনেক সময় অমন করে ধরতে পারেন না। মতামতটা চিত্রকরের অতএব নিশ্চয় কাজে লাগবে।

এখান থেকেই ঠিক করা হয়, কোন কোন বই চলবে। সেগুলো ছাপতে

চলে যায়। যাঁরা শিশুদের বই লেখেন, সকল রকমে সাহায্য করা হয় তাঁদের। বই যতদূর নিখুঁত করা যেতে পারে, সেই চেষ্টা। শিশুদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করা হয়; লেখকেরা তার মধ্যে থাকেন। শিশু-পাঠক আর লেখকের মধ্যে বুঝসমঝ হয় এমনি ভাবে, মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক বই লিখে এনেছেন। ছাপানোর আগে সেটা পড়া হল এমনি এক সভায়। লেখক ভেবেছিলেন ছেলে মেয়েরা খুব হাসবে। উল্টো হল, তারা গম্ভীর হয়ে বসে রইল। একটা মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল লেখার মধ্যে। আমরা বড়রা যেন ক্ষেত্রে হাসাহাসি করি, ওরা বেদনা পায়। লেখককে পালটাতে হল সেই সব ব্যঙ্গের জায়গা। পাণ্ডুলিপি লেখকেরা অনেক সময় এখানে রেখে যান, শিশু-পাঠকেরা ধীরেসুস্থে পড়ে যাতে সমালোচনা করতে পারে। শিশু মানে আড়াই থেকে সতের বছরের ছেলেমেয়ে। এদের পাঠযোগ্য বই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা-গবেষণা। যাদের সতের পেরিয়েছে তাদের বই অন্য প্রতিষ্ঠানের হাতে। ইস্কুলপাঠ্য বইও এদের এক্তিয়ারে নয়।

শুধুই রুশ-ভাষার বই। লেনিনগ্রাডে শাখা আছে। নানান ভাষাগোষ্ঠী নিয়ে সোবিয়েতের বিভিন্ন রিপাবলিক, প্রতি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা এমনি প্রতিষ্ঠান। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে বিভিন্ন ভাষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। একে অন্যকে সাহায্য করে; একের গবেষণার ফল সকলে ভাগ করে নেয়। ধরুন, একখানা অতি উপাদেয় বই বেরুল তাজিক ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটা রুশে তর্জমা করে এখানকার শিশুদের সামনে ধরবে। রুশীয় অবশ্য সকলের প্রধান। রুশ-ভাষাটা সকলকে শিখতে হয়। সোবিয়েতের সকল প্রান্তের তাবৎ শিশু কোন প্রকার উত্তম উপভোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, শিক্ষা-নেতারা তার জন্য কোমর বেঁধে আছেন।

মাসে একবার দু-বার শিশু সাহিত্য নিয়ে বৈঠক বসে। লাইব্রেরির লোক সমালোচক, লেখক, শিল্পী, শিক্ষক—এঁরাই সব আসেন। কেমন কাজ হচ্ছে, কি ধরনের বইয়ের অভাব আছে, চাহিদা বেশী কোন বইয়ের—এমনি সব শলাপরামর্শ চলে। বার্ষিক কাগজ বেরোয়, তাতে বৈঠকের বিবরণ থাকে। কনফারেন্স হয়, সোবিয়েতের নানা অঞ্চল থেকে গুণী-জ্ঞানীরা বিস্তর আসেন। শিক্ষাদপ্তর থেকে বিচারক নিযুক্ত হন—কনফারেন্সের যাবতীয় আলোচনা থেকে ভাল ভাল পেপার বাছাই করে দেওয়া হয় রিপোর্টে। যেমন 'রুশীয় উপকথা শিশু-শিক্ষণের দিক দিয়ে কি কাজ করেছে?' 'গোর্কিকে শিশুদের সামনে কি ভাবে উপস্থিত করা হবে?' এমনি সব বিষয় নিয়ে লেখা।

লাইব্রেরি আছে আছে শিশুদের জন্য। রকমারি সংগ্রহ। শুধুমাত্র রুশীয়

নয়, অন্যান্য ভাষার বইও আছে। রুশ ভাষারই বেশি অবশ্য। কাছাকাছি শিশুরা এসে পড়াশুনা করে, কিন্তু দূরের কারো আসতে মানা নেই। একজিবিশন হয়, সেই সময় বড়রা আসেন। অভিভাবকেরা আসেন—তাঁদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। লেখকে লেখকে মেলামেশার ব্যবস্থা রয়েছে। পাকা লেখকেরা নতুনদের শেখান, ছোটরা কি চায়—কোন কায়দায় লিখতে হয় তাদের বই।

লাইব্রেরিতে ঘুরতে বেরুলাম। ফুটফুটে কত ছেলেমেয়ে এক মনে পড়ছে। নিঃশব্দ, পরম শান্ত। উল্টেপাল্টে দেখছি নানান বই। কী ভাল যে লাগল! জীবন-চরিতের চাহিদাই বেশি—তা আবার লেখকদের জীবন, আদিকাল থেকে লিখে লিখে যাঁরা এদের আনন্দ দিয়ে আসছেন। লেখক, লেখক, লেখক—কোথায় লাগে রাজা-দিক্‌পালেরা লেখকের কাছে! লেখায় আর ছবিতে মরা-লেখকদের বাঁচিয়ে ধরেছে শিশুদের সামনে। এ সব বই পাতার এক পিঠে ছাপা. ইচ্ছে হলে কেটে নিয়ে দেয়ালে টাঙাতে পারো।

একেবারে বাচ্চাদের জন্য তিন রকমের ছবির বই—খেলনার ছবি; বাচ্চা যে সব জিনিস ব্যবহার করে তার ছবি. আর, ঘরের ঠিক বাইরে বাচ্চা যা সমস্ত দেখতে পায়। পৃথিবীর নানান দেশের উপকথা ছবি দিয়ে বের করেছে। ভারতের সম্পর্কে খুব আগ্রহ। ভারতের কাজকর্মের খবরাখবর ওঁরা পেতে চান শিশুদের জন্য ভাবতে যে সব ভাল ভাল বই রয়েছে, পেতে চান সেগুলো। অনেক ভারতীয় মানুষ কথা দিয়ে গেছেন, দেশে গিয়েই ভারী ভারী প্যাকেটে বই পাঠিয়ে দেবেন। কর্ত্রী হেসে বললেন, ভুলে যান তাঁরা—একটা প্যাকেটও আজ অবধি আসেনি। আমরাও তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলাম, এবং ভবনের বাইরে এসে ভুলে গেলাম যথারীতি।

মাইনে-ভোগী অনেকগুলি সর্বক্ষণের সম্পাদক। লেখকেরা এঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি দেন। এখানে না'মঞ্জুর হলে উপদেষ্টা-সমিতি আছে—তাঁদের কাছে দাখিল করতে পারেন। তাঁদের উপরেও আছে। এবং সকলের উপরে খুদ শিক্ষামন্ত্রী। শিশুদের বই শিক্ষা-দপ্তরের, অপর যাবতীয় বই সংস্কৃতি-মন্ত্রীর তাঁবে।

চলুন বলশই থিয়েটারে। পালা দেখা যাক। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে টুপি-ওভারকোট মুড়ি দিয়ে নিন। বলেছি তো, একেবারে পাড়ার মধ্যে। পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে পথটুকু।

বলশই থিয়েটার অথবা ম্যাজেস্টিক স্টেট থিয়েটার। দুনিয়ার সেরা থিয়েটারগুলোর একটি। বয়সে খুব প্রবীণ—উনিশ শ' তিপান্ন একশ' পঁচাত্তর

পুরে গেছে। সেই বাবদে উৎসব হল জাঁকিয়ে। বাড়িটার চেহারাতেও পুরানো বনেদিয়ানা। মোটা মোটা থাম, ভারী ভারী খিলান—কার্নিশের উপর ব্রোঞ্জের এপোলো-মূর্তি। সোনালি কাজকর্মের ছড়াছড়ি হলের ভিতরে। অতিকায় বেলোয়ারি আলোর ঝাড়, দেয়ালচিত্র—যেদিকে তাকাবেন বিপুল আতিশয্য ঘরবাড়ি-ময় এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। আধুনিক রীতির অল্পবিস্তর ছিমছাম কাজকর্ম নয়।

সুবিশাল ঐতিহাসিক এই রঙ্গক্ষেত্রে ঢুকে মনটা অন্য রকম হয়ে যায়। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ আনন্দ কুড়াতে এসেছে এখানে—সেই অবিরাম প্রবাহের সঙ্গে মিলেমিশে আমরাও কত সমুদ্র কত পর্বতের ওপার থেকে আজ এসে পড়লাম।

পোর্টিকো পার হয়ে গিয়ে—বাপরে বাপ, শুধু এক ওভার কোট জমা দেবারই বা কত দিকে কত জায়গা! জমা দিয়ে এক একটা নম্বর পকেটে ফেলুন। তারপর সিট খুঁজে বসে পড়ুনগে যান। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। ছ-তলা বাড়ি, রকমারি সিট—ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নিচে এদিক-সেদিক হরেক গলিঘুঁজি সিটে পৌঁছবার। দোভাষিরা ছিল তাই—নইলে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে নিজের ঠাঁই খুঁজে নেওয়া বাইরের লোকের সাধ্য নয়। সাধারণের সিট বাইশ শ'। একটা সিটও খালি পড়ে থাকে না এর মধ্যে।

ভিতরে ঢুকে দেখুন শুধুই নরমুণ্ড। তিন দিন আগে টিকিট করেছে, তবু আমাদের চল্লিশ জনের জায়গা একত্র নয়, এক তলাতেও নয়—দশ জন এখানে বসল, সাতজন ঐ ওখানে, পনেরো জন হয়তো সুদূর ঊর্ধ্বলোকে—সাদা চোখে যাদের ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে। আজ্ঞে না, বাড়িয়ে বলছি নে—ছ-তলা পাঁচ-তলায় যারা বসেছে, নিচে থেকে তাদের মোটের উপর মানুষ বলেই বুঝতে পারা যায়—ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বাইনোকুলার সঙ্গে নিয়ে সকলে থিয়েটারে আসে। জাতটা ধরেই থিয়েটার-পাগলা। খাওয়া-পরা যেমন, থিয়েটার দেখাও তেমনি। বাপ-মা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে এনে থিয়েটারে রপ্ত করে। যেমন জামা-জুতো চাই, থিয়েটার দেখার বাবদে বাইনোকুলারও চাই এক একটা। এখন ডুপ পড়ে আছে। অন্য কাজের অভাবে বাইনোকুলারগুলো, দেখি, আমাদের দিকে তাক করেছে। একই টিকিটে এটা হল উপরি-পাওনা—বাইনোকুলার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই যে ভারতীয় মানুষ দেখে নিচ্ছে।

মীরা ইরা পল ভিমিট্রোভ বরখুদারভ—যে ক'টি দোভাষি আমাদের খেদ-মত করে বেড়ায়, শশব্যস্ত সকলে। অনেকগুলো দল হয়ে গেল, একজন দু'জন করে দলের সঙ্গে বসেছে। পল আমাদের মধ্যে। এত বড় প্রেক্ষাগৃহের

কনসার্ট আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যাণ্ডমাস্টার উঠে দাঁড়িয়ে বাদ্যচালনা করছে। আশি জন বাজনদার, গণে দেখলাম। বলশই থিয়েটারে নাটক হয় না, শুধু অপেরা আর ব্যালে। কোন পালাতেই পাত্রপাত্রী কথা বলে না, গান গেয়ে বলে যায়। সাজপোষাক সিনসিনারি আর আলোর খেলা। অনেকগুলো পালা দেখেছি এখানে। পরীরা উড়ছে, গাছ ফুলে ফুলে ভরে গেল—আরও কত কি। এই স্বর্গ চক্ষের পলকে আবার নরক হয়ে যায়। বলে বোঝান যাবে না—স্টেজের একেবারে সামনে বসে দেখছি, কোত্থেকে যে কি হয়ে যাচ্ছে মালুম পাইনে। ক্ষণে ক্ষণে চোখ কচলে বুঝতে হয় যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না—সত্যি সত্যি খোলা চোখের সামনে এই সব দেখাচ্ছে।

আজকে এক ঐতিহাসিক পালা। পল প্রোগাম এনে দিল—কি বুঝব, আগা-পাস্তলা রুশীয়। চীনে সুবিধা ছিল—প্রোগাম দিত, চীনা ছাড়াও তাতে ইংরেজি অনুবাদ থাকত। এরা ওসব ধার ধারে না। প্রোগ্রাম দেখে দেখে পল গল্পটা একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, হেনকালে ড্রপ উঠে গেল। পল বলে, চিনতে পার?

জবাব দেব কি, সবাই হাঁ হয়ে গেছি। এ বস্তু ধারণায় আনা যায় না। স্টেজ নয় গড়ের মাঠ। মাঠ বলছি অবশ্য জায়গার পরিসর বিবেচনায়। মাঠের মতন ফাঁকা নয়। গোটা স্টেজ জুড়ে দেখতে পাচ্ছি, সেকেলে শহর একটা।

এক ধারে আঙুল দেখিয়ে পল জিজ্ঞাসা করে, দেখ তো কি ওটা? চিনতে পারছ না?

তাই তো হে! নয়-চূড়ার বেসিল-ক্যাথিড্রাল—হোটেল থেকে ক্রেমলিনের দিকে বেরুলেই হামেশা যা নজরে আসে। কী কাণ্ড, পুরো ক্যাথিড্রালটা এই রাত্রিবেলা যেন তুলে এনে স্টেজের উপর বসিয়ে দিয়েছে। ক্যাথিড্রালের ওদিকটায়—হাঁ, ক্রেমলিনেরই দেয়াল বটে।

পল বলে, ষোল শতকে ক্রেমলিন মোটামুটি এই রকম ছিল। আর পুরো দিনটা হল সেই সময়ের মস্কো শহর।

শেষ রাত্রি। মেঘ ভাসছে আকাশে। কে বলবে, সত্যিকার মেঘ নয়। ক্রেমলিনের ফটকের উপর দিয়ে ক্যাথিড্রালের চূড়া ছুঁয়ে মেঘ ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবছা আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ। কনসার্টে প্রভাতী বাজনা। সূর্য উঠল। ধড়াং করে খুলে গেল ক্রেমলিনের ফটক। ডিউকের সাঙ্গোপাঙ্গরা বেরিয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই—শ-দুই হবে গুণতিতে। তার পরে ঘোড়ায় চড়ে খোদ ডিউকমশায় দেখা দিলেন। ছ-জন পাত্রমিত্রও ঘোড়ায়। এতগুলো ঘোড়া স্টেজে এসে দাঁড়াল, কত বড় স্টেজ এর থেকে আন্দাজ করে নিন। সত্যিকার ডিউক চোখে দেখিনি, এ যুগের মানুষ হয়ে ডিউক দেখার ভাগ্য হবে না কখনো। তবে হ্যাঁ, এদের দেখে মনে হল—এই রকম চেহারা গোঁফদাড়ি পোশাকআশাক চালচলনই ডিউকের হওয়া উচিত। ধর্মীয় কলহ নিয়ে নাটক। দুই প্রতিপক্ষ—ডিউক আর পাদরি।

এক একটা সিন অনেকক্ষণ করে চলে। পর্দা পড়ে, খানিকটা বিরাম। আবার কনসার্ট শুরু হয়ে যায়। পর্দা উঠে গিয়ে নতুন দৃশ্য। বন্দুকধারী সৈন্যদের আড্ডাখানা। বন্দুক সেকেলে, সাজপোশাকও তাই। মাতলামি করছে সৈন্যরা, খুব তড়পাচ্ছে। হেনকালে বউরা দল বেঁধে এসে পড়ল। সৈন্যেরা যত বড় বীরই হোক, বউরা ততোধিক; তাদের সামনে সৈন্যদল একেবারে কেঁচো। সকল দেশে এবং কালে, দেখা যাচ্ছে এই এক গতিক।

শেষ দৃশ্যটা সকলের চেয়ে জমজমাট। ডিউকের প্রাসাদের ভিতর উৎসব-সমারোহ। নাচওয়ালীরা এসেছে নানান দেশ থেকে। নাচের পর নাচ। পালার ভিতরে কায়দা করে পৃথিবীর অনেক জায়গার বিস্তর পুরানো নাচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। অঢেল নাচ দেখা গেল। সর্বশেষে মেরে ফেলল ডিউককে। তখন পাঁচ-শ লোক স্টেজের উপরে অভিনয় করছে। আমি গণেছি, আর কেউ কেউ গণে থাকবেন। কী বৃহৎ কাণ্ড, ভেবে দেখুন। তার পরে পর্দা পড়ল।

এক একটা সিন হয়ে পর্দা পড়ে, অমনি হাততালি। ঐ রেওয়াজ।—ভারি আনন্দ পেয়েছি, তাবৎ দর্শকের প্রাণঢালা ভালবাসা নাও। সে কী হাততালি, থামতে চায় না কিছুতে। পর্দা তুলে পাত্রপাত্রী সকলকে সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। যে যার ঢং নিয়ে বেরিয়ে আসে। পরী আসে, আধা-উড়ন্ত অবস্থায়। ব্যালেরিনা, নাচের ঠমকে আসে, রাজা আসেন গম্ভীর চালে পা ফেলে। আর শেষ দৃশ্যে ঐ যে ডিউক মরে পড়ে গেল, সে-ও দেখি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর মাথা নুইয়ে বারম্বার

নমস্কার। পর্দা পড়ে যায়, তবু হাততালি থামে না, মানুষজন নড়ে না কেউ। ছ-তলা বাড়ি গমগম করছে। আবার পর্দা তুলতে হয়, আবার তেমনি নমস্কার। পালা শেষ হয়ে কম-সে-কম পনের মিনিট হয়ে গেল, ঝামেলা তবু মেটে না। বিরক্ত হয়ে আমরা শেষটা বাইরে আসার পথ খুঁজি। হাততালি তখনও চলছে।

॥ নয় ॥

সোয়ান-লেক নাচ—'সোয়ান-লেকের' বাংলা নাম কি দেবেন, হংসবাপী? চুলোয় যাকগে, নাম খুঁজে কি হবে? এই নাচটার ভারি নামডাক। সেবার কলকাতায় এসে এই নাচ ওরা দেখিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলশই থিয়েটারের ব্যাপারই আলাদা। অতবড় স্টেজ আর অমন তোড়জোড় দুনিয়ার আর কোথায় পাবেন? বাইরে যত আয়োজন করেই দেখাক, বলশইর কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

কাল রাত দুপুর অবধি বলশই থিয়েটারে পালা দেখে এসেছি, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে আবার চলেছি। ঠিক দশটায় শুরু—পালার সেরা পালা সোয়ান-লেক নাচ। রবিবার আজকে, তারিখটা সতেরোই অক্টোবর। ছুটি-ছাটা পেলে সকালবেলাটাও বাদ দেয় না। ঐ যা দেখলাম দেশটা জুড়ে—খাটে মানুষ অসুরের মতো, খায় যেন এক এক রাক্ষস। হাসবে তো কানে তালা লেগে যাবে আপনার, সভয়ে ছাতের দিকে তাকাবেন—ফাটল ধরে গেল কি না। আর আমোদ-যচ্ছবে, দেখবেন, মধুপায়ী পিঁপড়ের সারির মতন লাইন দিয়ে আছে। ভাবনাচিন্তার পোকামাকড় মগজে ঢুকবে, তার জন্য দুদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে তো মানুষটাকে—কিন্তু সে ফুরসৎ কবরের মাটি নেবার আগে বড় একটা ঘটে ওঠে না।

এই থিয়েটারে কাল এসে গেছেন—ঘরবাড়ির কথা বলতে হবে না, দু-কথায় পালাটার একটু আঁচ দিয়ে যাই। প্রোগ্রাম দিয়ে গেল নিতান্ত সাদা-মাঠা—না ছবি, না মুদ্রণের বাহার, বাজে কাগজে পাতা দুই ছাপা রুশীয় হরফে। পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া আমাদের কোন কাজে আসবে না। অতএব পালা দেখে যা বুঝি, টুকে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি। আলো-নেবানো হল—একাগ্র দৃষ্টি আমার এবং সর্ব মানুষের ঐ স্টেজের দিকে। নিমেষ মাত্র দৃষ্টি ফেরাবার জো নেই, সেইটুকুর মধ্যেই না জানি কোন কাণ্ড ঘটে যাবে। স্টেজের দিকে চোখ—এবং হাতের কলম অন্ধকারে নিজের তাগিদে কাজ করে যাচ্ছে। ব্ল্যাকবোর্ড ধরেছেন কখনো, খানিকটা সেই কায়দা। পরের সারির লেখা

বেঁকে এসে আগের সারির উপর দিয়ে চলে গেছে, পাঠোদ্ধার করতে বসে আজ এখন জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

রাজার প্রমোদোদ্যান। রাজপুত্র বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। পাত্রী পছন্দ হবে কাল। আসন্ন শুভ ব্যাপারে রাজা রাণী ও পুরনারীদের আনন্দের অবধি নেই। রাজপুত্রের কিন্তু ভাল লাগে না—কি জানি কেন, উৎসাহ নেই মনে। বিষাদের বাজনা। হঠাৎ এক হংস এলো উড়ে। ছুটে গিয়ে রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে এলেন। ধোঁয়া হয়ে গেল চারিদিক, কুয়াশায় ঢেকে গেল। লীলায়িত ভঙ্গিতে হংস উড়ে চলল, রাজপুত্র পিছু পিছু ছুটেছেন।

নাচে নাচে পালা এগিয়ে চলেছে। আর বাজনা—সে কী অপরূপ বাজনা! কথা দিয়ে কতটুকু আর অনুভূতি জাগানো যায়। সে হল নিতান্তই সীমানার ঘেরে বাঁধা। বাজনা পাত্র-পাত্রীর মধুময় মনখানি মেলে ধরে দর্শকের সামনে; হল-ভরা মানুষ কাঁদে, হাসে, স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়।

তার পরে আবার পর্দা উঠল। দ্বিতীয় দৃশ্য। ঘন অরণ্য—প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পিছন দিকে লতাপাতা জঙ্গল-আগাছার ভিতরে লেক। ধীর বাতাসে লেকের জলে অল্প অল্প ঢেউ দিয়েছে। জঙ্গলের কোন অলক্ষ্য অংশ থেকে হংসীরা সাঁতরে আসছে—একের পিছনে এক। সগর্ব গ্রীবাভঙ্গিতে হংসীদল মন্থর ভাবে ভেসে ভেসে জলকেলি করছে। রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে বনজঙ্গল ভেঙে শিকারে এসে দাঁড়াল। তীর ছুঁড়বে কি—দেখেই তাজ্জব। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল; বনভূমি আঁধার হয়ে আসছে। হংসীর দল জল থেকে উঠছে। ডাঙায় উঠে আর হংসী নয়, হয়ে গেল এক লাবণ্যবতী মেয়ে। নাচছে তারা, আনন্দ করছে।

সেই ভাঙা দুর্গের ভিতর শয়তান থাকে—নীল পোষাক, নীল চেহারা, বড় বড় পাখনা। বেরিয়ে এসে সে শ্যাওলা-ধরা এক দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। মিশে গেছে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে। যত বজ্জাতি ঐ শয়তানের—মায়ামন্ত্রে মেয়েগুলোকে সে হংসী করে দিয়েছে।

এক রাজহংসী এলো সকলের পরে। জল থেকে উঠে এলো ডাঙায়। তার আশ্চর্য রূপ আর নয়ন-ভুলানো নাচ দেখে রাজপুত্র পাগল। রাজপুত্র বলে কি—আপনি, আমি, এবং যত লোক বসে আছি—সবাই। পার্টে নেমেছে গোলোবকিনা, নাম-করা ব্যালেরিনা—পাগল না হয়ে উপায় আছে! নাম-করা আরো সব আছে—তারাও এই পার্টে নামে। একজন হচ্ছে মায়া—সে আমাদের ভারতে এসেছিল।

নাচছে কন্যা ও সখিবৃন্দ—রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে দেখছে। নিজেই শেষটা

ভিড়ে গেল নাচের মধ্যে। হংসকন্যা ও রাজপুত্র যুগলে নাচছে। প্রেমের কত ছলাকলা। রাজপুত্র বলল, ওই মেয়ে ছাড়া কোনদিন কাউকে সে ভালবাসেনি—ভালবাসবে না কাউকে আর এ-জীবনে। দেয়ালের সঙ্গে পাখনা মিলিয়ে দেয়ালের গায়ে লেপটে থেকে শয়তান চেয়ে চেয়ে সমস্ত দেখছে। ক্রূর দৃষ্টি থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে যেন। চলছে নাচ—নাচের পর নাচ। সারারাত্রি ধরে এই নাচের উৎসব। ভোর হয়ে এলো, আকাশে অরুণ-আভা। মেয়েগুলো চক্ষের পলকে অমনি যেন হাওয়ায় মিশে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর হংসী। দেখতে পাচ্ছি, হংসীর দল লেকের জলে ভেসে ভেসে অদৃশ্য আস্তানায় চলেছে। একের পর এক অদৃশ্য হয়ে গেল—শুধু অরণ্য আর লেকের জল। আর আধ-অন্ধকারে বিশীর্ণ ভয়াল দুর্গ।

পরের দৃশ্যে রাজবাড়ির এক প্রকাণ্ড হল। রূপকথার রাজবাড়ির যেমনটি হতে হয়। কনে-পছন্দর উৎসব। তা-বড় তা-বড় অতিথিরা আসছে—কত দেশের মানুষ, কত বিচিত্র সাজসজ্জা। ক্লাউনেরা এসে জুটেছে—মেয়ে ক্লাউন, পুরুষ ক্লাউন। নেচে নেচে তারা অতিথিদের স্ফূর্তি দিচ্ছে। কনেরা আসছে এইবার একটি-দুটি করে—এদের ভিতর থেকে রাজপুত্র পছন্দ করবে। নাচছে কনেরা—স্পেনের নাচ, হাঙ্গেরির নাচ, ইরানের নাচ, পোলিশ নাচ। কনেরা নিজ নিজ দেশের নাচ দেখাচ্ছে। রাজপুত্র মুখ বাঁকাচ্ছে, কাউকে পছন্দ নয়। রাজা, রাণী ও অতিথিরা ম্রিয়মান—এত বড় আয়োজন পণ্ড হয়ে যায় বুঝি।

হয়েছে—কনে পছন্দ হয়েছে এবার। এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, অবিকল সেই হংসকন্যা। রাজপুত্র হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো। চারিদিকে উল্লাস, নাচে নাচে ছয়লাপ। মেয়েটা কিন্তু ছদ্মবেশিনী। শয়তানের মেয়ে—বাপের হুকুমে হংসকন্যার মূর্তি ধরে এসেছে। রাজপুত্রের সঙ্গে নাচছে—অপূর্ব নাচ, হাততালি পড়ছে বারংবার চতুর্দিকে। শয়তান-কন্যার পার্ট ও গোলোবকিনা নিয়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল, সেই আসল হংসকন্যা। শোকাহত মূর্তি। মুখের কথা নয়, কিন্তু আকুল দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বলছে—তুমি যে বলেছিলে, আর কাউকে ভালবাসবে না জীবনে। সেই কন্যা মুহূর্তে রাজহংসী রূপ ধরে দূরে দূরে ভেসে চলে গেল।

শেষ দৃশ্য। অন্ধকার অরণ্য, মেঘভরা আকাশ। দেয়া ডাকছে কড়কড় আওয়াজে। হংসকন্যা মারা গেছে—শোকব্যাকুল তার সখীরা। কান্নার নাচ—নাচের মধ্যে সখীরা যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। রাজপুত্র ছুটে এলো।

লড়াই শয়তানের সঙ্গে—শয়তান ও তার দলবল মারা গেল। বেঁচে উঠল হংসকন্যা। দয়িতের সঙ্গে চির-মিলন; তারই সঙ্গে বিমোহন নাচ। প্রেম ও জীবন অবিনাশী, শয়তান হারবেই শেষ অবধি, ধ্বংস হয়ে যাবে।—পালার মর্মকথা এই।

বেরিয়ে এসে দেখি, একটা। নাকে-মুখে লাঙ গুঁজে এখনই ছুটব হাসপাতালে। দেশের মানুষ একজন—এক বঙ্গবাসী নিদারুণ রোগে পীড়িত হয়ে পড়ে আছেন। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি। এক বছরের উপর আছেন, দেশে হৃদ্দমুদ্দ দেখে শেষটা এইখানে পাড়ি দিয়েছেন।

হাসপাতাল জায়গা—মিছিল করে যাওয়া চলে না, সাকুল্যে চার জন। অনেকটা পথ ঘুরে একটা খালি মতন জায়গায় গাড়ি থামল। প্যাচপেচে বৃষ্টি—এই সময়টা মস্কোর যা গতিক। গাড়ি থামিয়ে দোভাষি সরে পড়ল কোন দিকে। আর জনহীন পথের উপর মোটরের গর্ভে আমরা বসে আছি তো আছিই। চুরি ডাকাতির কাজে এসেছি যেন, চর হয়ে আগে-ভাগে সুলুকসন্ধান নিতে গেল।

ফিরে এসে দোভাষি গাড়ি এগিয়ে নিতে বলে। গলি ছাড়িয়েই বড় রাস্তা, এবং হাসপাতালের সদর দরজা। যথারীতি ওভারকোট খুলছি। তাতেই রেহাই নয়—জুতো খুলে হাসপাতালের রবারের জুতো পরতে হল। হাতের ফোলিওব্যাগ কেড়ে নিল এক টানে, পরনের কোট-পাৎলুন দয়া করে ছাড়তে বলল না, তার উপরে সাদা আলখেল্লা চড়িয়ে আগা-পাস্তলা ঢেকে দিল। অপারেশনের সময় ডাক্তারে যে বস্ত্র পরে। এই আজব সজ্জায় সাজিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে উপরে নিয়ে চলল। মতলব বুঝলেন তো—রোগ-বীজাণু যদি এসে ধরে, সে ওদেরই জুতো-আলখেল্লায় লেপটে গিয়ে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যাবে, বাইরে বেরুবার পথ পাবে না।

রুগ্ন বিশীর্ণ মুখে মিষ্টি হাসি—পাঁচুগোপাল তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসলেন। ভিন্ন ঘর থেকে আর এক বাঙালি রোগি এসে বসে আছেন—মুঙ্গেরের দিকে বাড়ি। এবং কি আশ্চর্য—অধমের লেখা পড়ে পরিচয়ের জন্য এসেছেন তিনি। আর আছেন দক্ষিণ-ভারতের এক তরুণী। আমরা এদিকে চার এবং ওঁরা তিন—হাসপাতালের ঘরে দিব্যি এক ভারতীয় বৈঠক শুরু হল।

অলক্ষ্যে চোখ ইসারা ইত্যাদি হয়েছে কিনা বলতে পারিনে—নার্স মেয়েটি চা বানিয়ে আনল, তৎসহ ফল ও কেক বিস্কুটের বিপুল সম্ভার। আরে মশায়,

রোগী দেখতে এসেছি, মেয়ে দেখতে এলেও তো এদ্দুর করে না। পাঁচুগোপাল না-না—করেন। এমন কিছু নয়—আমাদের জন্য যা সব আসে, তাই থেকে অতি-সামান্য এই দিয়ে দিয়েছে।

ওরে বাবা, এই নাকি পথ্যের যৎসামান্য নমুনা! রোগি না রাক্ষস, কি ভেবে নিয়েছে কে জানে! আর দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিক। তকতকে ঘর, ঝকঝকে আসবাবপত্তোর—মায় রোগির মনোরঞ্জনের জন্য ঘরে ঘরে একটা করে টেলিভিশন। সর্বক্ষণের জন্য নার্স মোতায়েন আছে—হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না—আগে থাকতেই দরকার জুগিয়ে যাচ্ছে। ঐ নিরীশ্বর দেশের হাস-পাতালের ঘরে বসে মন আমার হঠাৎ গাঁয়ের হরিতলায় উড়ে চলে গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন, দু-খানি বাহুর মতো দু-দিকে অতিকায় দুই শাখা বিস্তার করে বহু প্রাচীন বট-অশ্বথ। আহা, গাছ বলি কেন—গাছ কখনো নন—জাগ্রত গ্রামদেবতা, গ্রাম রক্ষা করছেন চিরকাল ধরে। ছোট্ট বয়স থেকে কত কি চেয়ে আসছি ঠাকুরের কাছে—আমি ভুলে গেছি, ঠাকু-রেরও খেয়াল নেই নিশ্চয়। সেই হরিতলায় মনে মনে মাথা খুঁড়ে আজ বলছি, থাকগে—এদ্দিন ধরে যা-সব চেয়েছি, জোগান দিয়ে উঠতে পারলে না তো! কাজ নেই সে সবের। নিদেনপক্ষে একটা অনুগ্রহ করো—খুব এক আচ্ছা অসুখে ফেলে দাও আজকালের মধ্যে। যে অসুখ দু-চার বছরে না সারে। তবে এইখানে এনে তুলবে, এনে জামাই-আদরে রাখবে···

পাঁচুগোপালও অকস্মাৎ আমার প্রসঙ্গ তুললেন: আপনি মস্কোয় এসেছেন খবর পেলাম, হাসপাতালে আমাদের কাছে আসছেন—তখন থেকেই আপনার গাঁয়ের কথা মনে আসছে। আপনি অবশ্য জানেন না—

খুব জানি আজ্ঞে। জেনে-শুনে বোকা সাজতে হল। একেবারে বোবা হয়ে ছিলাম সেই তখন—

ঘোরতর ইংরেজ- আমল তখন। আমার এক ভাইপো স্বদেশি করত। পাঁচুগোপাল ফেরারি, ভাইপোর বন্ধু-পরিচয়ে আমাদের গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন তিনি। ভারি দুর্গম জায়গা, রেল-লাইন থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল। খুদ যমরাজেরও সেখানে নিশানা পাওয়ার কথা নয়, ইংরেজের সি. আই. ডি. কি করতে পারে? পাঁচুগোপাল থাকতেন বাইরের একখানা খোড়ো-ঘরে—সমস্তটা দিন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে কাটাতেন। গাঁয়ের লোক কেউ কেউ জেনেছিল, কলকাতার এক ভদ্রলোক এসে অসুখ হয়ে পড়েছেন। কি অসুখ তা কেউ জানে না, ডাক্তার-কবিরাজের আনাগোনা নেই, ঠিক-দুপুরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ির মেয়েরা সুড়ুৎ করে ঘরের ভিতর ভাত দিয়ে আসেন।

মাস্টারি করি—ক-দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আমিও শুনলাম অসুস্থ মানুষটির কথা। তার পর চোখাচোখি হয়ে গেল এক রাত্রিবেলা। রাত্রি গভীর হলে রোগটা বোধ করি সাময়িকভাবে আরোগ্য হয়ে যেত—বিলের ধারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, কখনো কখনো গ্রামান্তরে চলে যেতেন। ভোর হবার আগে ফিরে আসতেন আবার। সেই বেরুবার মুখে দেখা হল একদিন। শ্রীরামপুর অঞ্চলে আগে দেখেছি আমি তাঁকে। কিন্তু আমি চিনতে পারলাম না, অমন অবস্থায় চিনতে গেলে চলে না। অজানা অচেনা মানুষের বেলা যেমন করি—অবহেলায় ঘাড় ফিরিয়ে সরে এলাম।

আমার লেখা চীনের বই দিলাম পাঁচুগোপালকে—শুয়ে শুয়ে চীনে বিচরণ করুন। আবার আসব, যাওয়ার আগে নিশ্চয় দেখা হবে—বারম্বার বলে বিদায় নিয়ে এলাম। ভুয়ো প্রতিশ্রুতি, তিনিও বুঝেছিলেন বোধহয়। জেনে-বুঝে একটু হাসলেন।

হোটেলে এসে সুখবর মিলল। আকাশ সাফ হয়েছে। পিছনের ওঁরা কাবুলে ও তাসখন্দে এই ক'দিন বন্দী হয়ে ছিলেন—কাল উড়বেন। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাচ্ছেন, তাতে আর ভুল নেই। অতএব মস্কো-বিহার আপাতত ইতি। সকলে একত্র হলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। যাবেন কোন দিকে, এবারে ভাবতে লাগুন। নিমন্ত্রণ এসেছে তাজিকিস্তান থেকে। বাসিন্দারা মুসলমান। জারের তাঁবেদারিতে বোখরার আমির মধ্য-এশিয়ার তামাম অঞ্চল জুড়ে রাজত্ব করতেন। বিপ্লবের গুঁতোয় পালিয়ে গিয়ে আমির সাহেব ঐ তল্লাটে ভর করলেন শেষটা। বহুত লড়ালড়ি। ঝামেলা চুকবুকে ১৯২৯ অব্দের ১৬ অক্টোবর নতুন রাষ্ট্রতন্ত্র পুরোপুরি চালু হল ওখানে। এবারে পঁচিশ বছর পুরছে—রজত-জয়ন্তী উৎসব। উৎসব দেখতে ভারতীয়দের ডেকেছেন ওরা।

দলের কেউ কেউ নাক সিঁটকাচ্ছেন। বদ্ধি জায়গা—এই সেদিন অবধি অশিক্ষা আর গোঁড়ামি নিয়ে সকলের পিছনে পড়ে ছিল। তা ছাড়া কষ্ট করে এত দূর এসে পত্রপাঠ ঘরমুখো হতে যাই কেন? পামিরের পায়ের গোড়ায় তাজিকিস্তান। দক্ষিণে আফগানিস্তান; এবং পূর্ব-দক্ষিণে সরু একটুকু ফালি পার হয়ে কাশ্মীর ও পশ্চিম-পাকিস্তান। একেবারে আলাদা রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রাচীন তাজিক এখনো আফগান-এলাকায় তীর্থ করতে যান। অতএব বলছেন ওঁরা মিছা নয়—প্রায় তো বাড়ির উঠোনই। তার চেয়ে চলুন সোচি—কৃষ্ণসাগরের উপরে প্রমোদনগরী। ইউরোপের ঐ

প্রান্তটি চষে বেড়াইগে চলুন।

আমরা না-না করে উঠি, এবং দলে ভারী আমরাই। যাঁরা সোবিয়েতে আসেন, ভাল ভাল কয়েকটা জায়গা ঘুরে উত্তম আহারাদি করে ফিরে চলে যান। কপাল ক্রমে দুর্গম তল্লাটের দাওয়াত এসেছে তো এ মওকা ছেড়ে দেব না। দুর্গম আর বলি কেন, মজা করে আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াব। সে ছিল বছর ত্রিশ আগেও বটে, পলায়িত আমির বহাল-তবিয়তে তাই অতদিন টিকে থাকতে পেরেছিলেন। ব্যবস্থা করুন মশাইরা, আমরা যাব —আলাদা দল হয়ে যাব আমার। এ আর কি বলছেন—শীতের মরশুম না হলে সাইবেরিয়া মুখেই তো ধাওয়া করতাম।

তবু পাকাপাকি হবে না সকলের না পৌঁছোনো পর্যন্ত। ওঁরা কবুল জবাব দিয়ে বসে আছেন, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে পারবেন না। হুকুম করব আমরা, যথাসম্ভব তামিল করে যাবেন।

যাই হোক সন্ধ্যাটা কেন বরবাদ যায়, সিনেমায় চলুন। সিনেমার নামে কেউ গা করিনে, ও-বস্তু আমাদের অলিগলিতে। তার চেয়ে শীতের দেশে খাটের উপর কম্বল জড়িয়ে পা দোলানো মন্দ হবে না। আজ্ঞে না—হামেশা যা দেখেন সে বস্তু নয়, থ্রি ডাইমেনসন ছবি। আপনারা দেখে থাকেন চ্যাপটা ছবি, পর্দার গায়ে লেপটে থাকে। এ ছবি রীতিমতো গায়ে-গতরে আছে। মানুষ হবে, জ্যান্ত মানুষের থিয়েটারই দেখছেন যেন। মেরু-অঞ্চল ও আজব সাজপোশাকের মানুষদের নিয়ে এক গল্প—রঙে রঙে চমৎকার। পর্দার উপরে নয়, পর্দা ছেড়ে মানুষগুলো যেন বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকার হলের মধ্যে, মনে হচ্ছে, আপনার গা ফুঁড়ে আমার কোল ঘেঁষে তাদের অবাধ নিঃশব্দ চলাচল। বল খেলছে, গুলি করছে—মাথা কাত করি, এই রেঃ—আমারই ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি! তিন দিক দিয়ে তিনটে যন্ত্রে একসঙ্গে ছবির প্রক্ষেপ—পর্দার ঠিক সামনাসামনি বসেছেন তো খুব ভাল দেখবেন; এপাশ ওপাশ থেকে কিছু বেয়াড়া লাগবে। মোটের উপর এই জেনেবুঝে এলাম, আগামী দিনের ছবি এই। পর্দার উপরে উপরে লেপটে-যাওয়া ছবি আর ভাল লাগবে না। সেকালের বোবা ছবি এখন যেমন দূর-ছাই করি। বিমল রায়কে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনেমা-ডিরেক্টর সেই তিনিই, পরের দিন এই মস্কো শহরেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—তাঁকে বললাম আমার ধারণা।

॥ দশ ॥

সৌরাষ্ট্রের এক শহরের মেয়র—শান্তি শাম। সকালবেলা শাম মশায়

আমার ঘরে ফোন করেছেন, ভারতীয় সিনেমা-দল নানা তল্লাট ঘুরে মস্কোয় ফিরেছেন কাল রাত্রে। ব্রেকফাস্ট সেরে দেখা করতে যাই চলুন। জানাজানি না হয়, দু-জনে টুক করে বেরিয়ে পড়ব। সিনেমা-দলটার সেক্রেটারি শামের জানাশোনা লোক, তিনিই খবর জানিয়েছেন। আবার হয়তো আজ রাত্রেই চলে যাবেন ওঁরা, দেশের দিকে পাড়ি জমাবেন। ওঁদের অনেককে আমি জানি। শামের কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছা—আমার সঙ্গে সেজন্যে দল জোটাচ্ছেন।

সোবিয়েতস্কায়ায় এসে উঠেছেন ওঁরা। সদ্য বানানো অতি-আধুনিক হোটেল, একেবারে ভিন্ন পাড়ায়। ফোনে খবরটা অতএব যাচাই করে নেওয়া যাক। ডায়াল ঘুরিয়ে অচিরে সাড়া মিলে গেল। কিন্তু ঘর জানিনে, কোথায় দিতে বলি? ফোনের এ-প্রান্তে আমি বলছি ইংরেজি, ও-প্রান্তে হুড়হুড় করে রুশ বলছে। ইংরেজি জানে না বোঝা যাচ্ছে—উপায় কি এখন বলে দিন। আমার রুশ-ভাষার ঝুলি ঝেড়ে বার কয়েক 'ইণ্ডিস্কি ডেলিগাৎসি' ইত্যাদি বলা গেল, কাজে আসে না। বলেই চলেছে ওদিকে, তার মধ্যে কমা-সেমিকোলন নেই। ফোন ছেড়ে দিয়ে তখন বাঁচি।

গিয়েই পড়ি অতএব, দেখা পেলে ফিরে আসব। একটা মোটরগাড়ি চাই —ডোকসের যে মেয়েটি খবরদারি করেন, কমরেড জুলিয়া—তাঁকে বললাম গাড়ির কথা। ফিসফিস করে কথাটা বলেছি কি না বলেছি—উঃ মশায়, কত সেয়ানা আমাদের ভারতের লোক, 'চাচা' ডাকলেই ওঁরা 'কাস্তে হারিয়েছে' বুঝে ফেলে দেন। গাড়ির কথা বলে ঘরে ফিরবার ঐটুকু পথের মধ্যেই ধরাধরি হচ্ছে—'আমিও যাব, শুধু এই একলা আমি' 'আমায় নেবেন, একজন বাড়তিতে কি আর হবে।'—ফিরে গিয়ে তখন দুটো গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলি। যাত্রার সময় সেই দুটো গাড়িতে দেখি, গুড়ের ভাঁড়ের মতো মানুষ বোঝাই হয়েছে। ললনাদেরই ভিড় বেশি, সিনেমা-স্টার সম্পর্কে তাঁরা অধিক ওয়াকিবহাল।

হোটেলে ঢুকলাম। ঝকমকে বাড়ি, মেজেয় পা পিছলানোর গতিক। মেট্রন জিজ্ঞাসার চোখে তাকাচ্ছে। হাত-মুখ ঘুরিয়ে আমার দু গণ্ডা রুশ-বাক্যের ঝুলি ঝেড়ে বুঝাবার চেষ্টা করছি—কত দূর কি বুঝল খোদায় মালুম। হেন কালে দেখি, হৃষীকেশ মুখুজ্জে আজকের প্রখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টর এদিক পানে আসছে। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক ধরছেন—বম্বে সিনেমা রাজ্যে হৃষী কেও-কেটা ব্যক্তি। বিমল রায়ের ডান হাত, ছবির সম্পাদনায় ভারি নাম। একদা ইস্কুল-মাস্টারি করতাম, হৃষী তখন আমার কাছে পড়েছে। এবং পরমাশ্চর্য ব্যাপার, বড় হয়ে ও সিনেমা-লাইনে গিয়েও এখনো অতিশয় খাতির

করে। মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে, নইলে এমন হয় না। বলতে পারেন, সেই ইস্কুল-মাস্টারই যদি আমি থাকতাম এবং তৎসত্ত্বেও চিনে ফেলত, পরীক্ষাটি পুরোপুরি হত তা হলে।

হৃষীকেশ আমায় দেখে মেজের উপর গড হয়ে প্রণাম করল। ঐ মেজের উপর প্রথম এই মানুষের মাথা ঠেকল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গীরা, দেখতে পেলাম, ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছেন। কদর বেড়ে গেল নির্ঘাৎ তাঁদের কাছে। লেখক জেনে বসেছিলেন—অর্থাৎ কাজকর্ম নেই, কি করবে, কলম পিশে টাকাটা-সিকেটা রোজগার করে। কিন্তু সিনেমার মানুষ পদধূলি নিচ্ছে, তবে তো লোকটা লেখকের উপরেও আরো কিছু।

হৃষীকেশ বলে আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছি। মেট্রোপোলে আছেন খবর নিয়েছি। সেবারে পিকিন থেকে আমার বশে চিঠি দিয়েছিলেন; তাসখন্দে পৌঁছেই আমি তার শোধ নিলাম কলকাতায় আপনাকে লিখে। চিঠি পাননি নিশ্চয়, পাওয়ার কথাও নয়। কেমন করে বুঝব, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে এই মুলুকে রওনা হয়ে পড়েছেন।

আর অসুবিধা নেই, হৃষীকেশ লিফটে নিয়ে তুলল। বিমল রায় স্নানঘরে। সলিল চৌধুরী একটা ক্যামেরা নিয়ে গভীর মনোযোগে কলকব্জা পরখ করছে। কোন বিদ্যা ছাড়াছাড়ি নেই সলিলের কাছে। গান গায়, বাজনা বাজায়, সুর দেয়, গান লেখে; আবার দু-বিঘা জমির গল্প সংলাপ লিখেছে। এবার বুঝি ক্যামেরা নিয়ে পড়ল, ওটুকু আর বাকি থাকবে কেন?

হঠাৎ দেশের মানুষ দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে। আজকের দিনটাও ওদের থেকে যেতে হল, কাল সন্ধ্যায় বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। সুরকার অনিল বিশ্বাস আছেন, খুব জানাশোনা তাঁর সঙ্গে—আমার গল্পের এক ছবিতে সেই সময়টা সুর দিচ্ছিলেন। সকলে চলে যাবে, অনিল বিশ্বাস থেকে যাচ্ছেন আপাতত। রাশিয়ার গান-বাজনায় তাঁকে পেয়ে বসেছে, এ বস্তু খানিকটা রপ্ত না করে নড়বেন না। আর থাকবেন খাজা আহমেদ আব্বাস, সিনেমা-দলের নেতা তিনি এসেছেন।

সাজসজ্জা সমাপন করে বিমল রায় এসে পড়লেন হেনকালে। অনেক দিনের বন্ধু—তখন এত বড় হন নি। গুণপনা বলতে গেলে খোশামুদির মতো শোনাবে—আপনারা চোখ টেপাটেপি করবেন। এসব মানুষকে ভাল বলতে গেলেও বিপদ আছে। অতএব থাক পুরানো কথা। কিন্তু মস্কোয় এসে একটা খবর শুনলাম—যতগুলো বক্তৃতা করেছেন, সমস্ত বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়

বলব আমি, ভিন্নদেশ থেকে যে-কেউ আসে সবাই মাতৃভাষায় বলে—লালা-যুক্ত ভাঙা ইংরেজিতে নয়। দোভাষি জোটাতে পার ভালই, নয়তো কিছুই বলব না, মুখ বুজে চুপ করে থাকব। সোবিয়েত দেশে বাংলা দোভাষি পাওয়া যায়, দিনকে-দিন কমে আসছে, হিন্দি-উর্দুর উপর জোর দিচ্ছে। সবুর, সবুর —এসব পরে শোনাব। সমস্ত শুনবেন—এমন কোন দায়া নেই যে মুখ চেয়ে চেপেচুপে বলতে হবে। মোটের উপর বিমল রায়ের জন্য ওরা সর্বক্ষণের বাংলা দোভাষি মোতায়েন রেখেছেন; বিদেশে তিনি মাতৃভাষার ইজ্জত ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

ডিরেক্টর রায়কে কাছে পেয়ে সকাতরে দরবার জানাই। আজ্ঞে না, গল্প গছানোর দরবার নয়—বললাম, কলম ছোঁব না আর, ঘেন্না হয়ে গেছে। সিনেমার ছবিতে পার্ট দিতে হবে আমায়। সবাই যে কন্দর্পকান্তি নায়ক হবে তার মানে নেই—দূত, গ্রাম্য পথিক, মৃত চাষী—এসবেও মানুষ লাগে তো আপনাদের।

বিমল রায় বলেন, হল কি বলুন তো?

সবিস্তারে বললাম তাসখন্দের সেই কাহিনী। জনারণ্য দেখে বড্ড খুশী হয়েছিল—ভারত থেকে তা-বড় তা-বড় সাংস্কৃতিক দিকপাল এসেছেন, তাঁদেরই গুণগ্রাহী ভক্তদল বুঝি। ও হরি, খুঁজে বেড়াচ্ছে নার্গিসকে। অতএব গল্প-লেখক রূপে পর্দার বহির্দেশে আর নয়, পর্দার উপরিভাগে যৎকিঞ্চিৎ ঠাঁই চাই।

এমন আক্ষেপোক্তি—কিন্তু বিমল রায় তেমন যে আমল দিলেন, মনে হল না। বললেন, ফিরবার পথে বম্বে হয়ে যাবেন। আমার বাড়িতে থাকবেন, সেই সময় বিচার-বিবেচনা হবে।

বটেই তো। ফিরবার সময় কাবুল হয়ে নামব গিয়ে দিল্লীতে। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। বোম্বে অতএব পথের উপরেই যখন পড়ছে সেখানে নেমে পড়তে অসুবিধা কিসের?

হৃষীকেশ গল্প করছে: তাসখন্দের ব্যাপার ঐ তো দেখলেন—আর কোন্ এক শহরের হোটেলে তাদের একেবার আটক করে ফেলেছিল। গেটের মুখে হাজার মানুষ—সেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়বে হেন বীর পুরুষ কে? সিনেমা-হাউসেও এমনি কাণ্ড। অফুরন্ত কিউ সর্বক্ষণ। ছবি দেখানো একবার সারা হল তো নতুন লোক ঢুকিয়ে আবার তক্ষুণি গোড়া থেকে দেখানো শুরু হয়ে গেল। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। কিউয়ের মাথা থেকে খানিকটা হলে ঢুকে গেল। লেজের অংশ পড়ে রইল। তার পিছনে ক্রমাগত নতুন লোক

এসে এসে জুড়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ছবির এমন চাহিদা। লোকে যেন ক্ষেপে গেছে। একমাস চলবার কথা, সে ছবি একাদিক্রমে ছ-মাস চালিয়েও তুলে দেওয়া মুশকিল হবে। সব প্রোগ্রাম উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিসনে রাতের পর রাত ভারতীয় ছবি—নইলে মানুষ ছাড়ে না। তিন দিন ধরে গোটা সিনেমা-দল বন্দী হয়ে রইলেন হোটেলের ভিতর। একটা জায়গায় এমনধারা পড়ে থাকলে চলবে কেমন করে? অবশেষে অনেক মারপ্যাঁচ করে পিছন দরজা দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করা হল।

গল্পেরও সময়ও নেই, মাটিং আছে কোথায়, বেরিয়ে পড়বেন। বিমল রায় বলেন, নিচে চলুন খাবার ঘরে। সকলের সঙ্গে দেখা হবে, চলুন।

এসেছেন অনেকেই। রাজকাপুর, নার্গিস, নিরূপা রায়, দেব আনন্দ, বলরাজ সাহানি, রাধু কর্মকার—আরও সব আছে, সঠিক মনে করতে পারছিনে। ওঁরা হাত তুললেন, আমিও পালটা হাত তুলে নমস্কারের দায় সেরে সোজা চলে আসি আব্বাসের কাছে। আলাপ ছিল না, কিন্তু ও-মানুষের সঙ্গে আলাপ জমাতে দেড় সেকেণ্ডও লাগে না: যতই হোক, স্বজাতি আমার—লেখক। সিনেমা নিয়ে অধিক মাত্রায় পড়েছেন বটে, তা বলে লেখার অভ্যাস একেবারে ছাড়েন নি। লেখক মানুষ হাজির থাকতে অন্য কাউকে মনে ধরবে কেন?

আব্বাসও ভারি বিপন্ন। অনেক রুবল জমে গেছে। তাই বলছেন, বিষম বড়লোক হয়ে গেছি এখানে এসে। পুরানো লেখার দরুন পাচ্ছি, নতুন লিখে আর রেডিও-য় বলেও রোজগার করছি। রুবল দেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এখানে খরচ করে যেতে হবে। রুবলের দরকার থাকে তো বলুন, দিয়ে কিছু ভারমুক্ত হই।

বিপদটা শুরু হল যেদিন মস্কোয় পা দিয়েছেন ঠিক তার পরের দিন থেকে। রাত্রিবেলা পৌঁচেছেন, সকালের কাগজে নাম-ধাম সহ খবর বেরিয়েছে। অনতিপরেই টেলিফোন এলো, হ্যাঁ মশায়, আপনিই কি লেখক আব্বাস?

আজ্ঞে হাঁ, লেখাটেখার অভ্যাস আছে বটে।

অমুক নামের একটা গল্প আপনিই তো লিখেছিলেন?

না—

এমনও হতে পারে, অনুবাদের সময় গল্পের নাম পালটানো হয়েছে। গল্পের ঘটনা হল এই—

ফোনের মুখে গল্পের কাঠামো বলে গেল। আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, লেখা আমারই।

বিকেলবেলা এই ধরুন চারটে থেকে সাড়ে-চারটে অনুগ্রহ করে আপনি হোটেলে থাকবেন।

যথাসময়ে তারা এসে ন'শ রুবল অর্থাৎ হাজার খানেক টাকা দিল। বছর তিন-চার আগে গল্পটার রুশ অনুবাদ একটা কাগজে বেরিয়েছিল ; আব্বাসের হিসাবে দক্ষিণাটা লেখা ছিল। ঋণের বোঝা টানছিল এত দিন, অবশেষে শোধ করে দিয়ে বাঁচল।

তা দক্ষিণার কথা যখন উঠল, তবে শুনুন। ঐ সামান্য সময়ে অত ছুটো-ছুটির ফাঁকে ফাঁকে অধমও কিঞ্চিৎ রোজগার করেছে—সাত-আট শ'র মতো দাঁড়াবে। কিছু লেখা ছেড়ে এসেছিলাম—সেগুলো ছাপা হচ্ছে এখন, দক্ষিণা হিসাবে জমছে। আবার যদি কখনো যাই, এদেশের মতন ফাঁকা পকেটে ঘুরব না অনুমান করি। ঐ যে বললাম—বিষম রুজি-রোজগার ওদেশে লেখকের। আব্বাসের সঙ্গে পরে অনেকবার দেখা হয়েছে। সিনেমা-দল কবে চলে গেছে, তার পরেও জমিয়ে রয়েছেন। সে যে কী খাতির, বর্ণনা পড়ে প্রত্যয় হবে না। হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘর দিয়েছে তাঁকে, বিরাট মোটরগাড়ি। সেকালের জার-জারিনার কথা শুনেছি, প্রায় সেই মেজাজে সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়ান।

একদিন দুঃখ করলেন, কত ভাষায় বই ছাপা হল। আপনাদের বাংলা ভাষায় আমার কোন বই নেই।

কেন থাকবে না ? একটা বই অন্তত জানি—এডিশানও হয়েছে বইটার।

আব্বাস অবাক হলেন, বলেন কি ?

আপনি জানেন না ?

জানাতে যাবে কোন বোকারাম ? কিঞ্চিৎ ভাগ চেয়ে বসি যদি ? দুনিয়ার কত দেশই তো দেখলাম ! কিন্তু ডেকে ধরে লেখার দক্ষিণা দিয়ে যায়, এই সোবিয়েত দেশের মতন আর দেখি নি।

ভারতীয় দুটো ছবি চলছে—আওয়ারা এবং দো-বিঘা-জমিন। এ দেশে যা দেখছেন তাই—খানিকটা সংক্ষেপ করে নিয়েছে শুধু। এবং পাত্রপাত্রীর মুখ থেকে হিন্দী ছেঁটে ফেলে রুশভাষা বসিয়েছে। ভারি কায়দায় পালটেছে কিন্তু— গানের সুর হিন্দীতে যা শোনেন অবিকল তাই ; গানের কথাও এমন বেছে নিয়েছে, দূর থেকে ভাববেন হিন্দি গানই শুনছি। সেই ভুলই করে-ছিলাম আমরা কাস্পিয়ান সাগর-কূলে বাকু শহরে। উঁহু, আজকে নয়— আর একদিন সে গল্প। আমাদের দোভাষি ইরা—সুন্দরী তরুণী, ভারি চালাক

পড়াশুনোও আছে—তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ছবিটা ভাল ঐ দুয়ের মধ্যে ?

ইরা জবাব দেয়, দো-বিঘা-জমিন এক আশ্চর্য সৃষ্টি, গৌরব করবারই মতো। কিন্তু—

ঢোক গিলে বলে, কিন্তু আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো, আওয়ারাই বেশি পছন্দ আমার। চার বার দেখেছি—আরও দেখবার বাসনা আছে।

হেতুটা কি ?

উদ্দাম বেপরোয়া যৌবনের ছবি—

এমনি সর্বত্র। কাগজে দো-বিঘা-জমিন নিয়ে হৈ-হৈ করছে, এমনটি আর হয় না। লোকে উন্মাদ কিন্তু আওয়ারার নামে। ঠিক যেমনটা এদেশে দেখে থাকে। কোন একটা ছবির আওয়ারার শতেক নিন্দা-করে চুপিচুপি টিকিট কেটে ঢোকে আবার সেই ছবিই দেখতে। হীরেন মুখুজ্জে মশায় রুচি-বান বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁর পরিচয় আপনাদের কি দেব। সদুঃখে তিনি বললেন, এত বড় প্রগতিশীল দেশেও এই ?

আমি বললাম, দুনিয়া জুড়ে মানুষের মনের গড়ন মোটামুটি একই—এখানে এসে সেইটে আর একবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল, এখন বুঝতে পারছি। চীনেও গিয়েছে ঐ ছবি দুটো, সেখানেও হুল্লোড়। বীরেন্দ্রনাথ সরকার মশায় চীনের দলে ছিলেন, তাঁর কাছে সেখানকার গতিক জিজ্ঞাসা করলাম। চীনের মাতামাতিটা দো-বিঘা-জমিন নিয়েই বেশি, আওয়ারা তেমন নয়। এবারে যেমন মালুম হচ্ছে। ভূমিসংস্কার চীনে অল্প দিন হয়েছে, সমস্যাগুলো টাটকা রয়েছে মানুষের মনে। দো-বিঘা-জমিনের মধ্যে চীনেরা নিজেদের ব্যাপারই খানিকটা দেখতে পায়। কিন্তু সোবিয়েতের ভূমি-সমস্যা চুকেবুকে গেছে তিরিশ বছরের উপর। আজকে যারা সিনেমা দেখছে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তারা মানুষ। দো-বিঘা-জমিনের আবেদন বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কোন পুরানো কালের ইতিহাস—মনের উপর আঁচড় কাটে না।

ওদের থিয়েটারে বিস্তর পালা দেখেছি, সিনেমার ছবিও দেখেছি কিছু-কিছু। শিশুদের একটা পালায় যৎকিঞ্চিৎ নীতিবাক্য—ঐটে বাদে বাকি অত-গুলোর ভিতরে মহদাদর্শ তিল পরিমাণ হাতড়ে পাবেন না। মিষ্টি মধুর রোমান্স; রাজরাজড়ার কাহিনী—যাদের ওরা অনেক দিন উৎখাত করে দিয়েছে। অথবা পরী-দৈত্য-দানবের রূপকথা। ঐ রকম নাটক আমি লিখলে প্রগতিবিহীন বলে এ দেশের লেখক-সমাজে অচিরে আমার হুঁকো বন্ধ হবে।

ব্যাপার বুঝতে পারছেন? আমাদের যা-কিছু বৃহৎ সমস্যা, অনেক দিন আগেই ওখানে তার নিরসন হয়ে গেছে। দু-দশটি প্রাচীন মানুষ ছাড়া হাল আমলের কেউ সে সব বোঝে না। আমাদের সমস্যা ও বেদনা অনেকখানি অবান্তর ও অবাস্তব তাদের কাছে। ভাবনাহীন চিত্তে তারা নেচে-কুঁদে হল্লোড় করে বেড়ায়।

সোবিয়েতস্কায়া থেকে ফিরে এসে দেখি, সেজেগুজে সকলে তৈরি। বিল্ডিং একজিবিশনে যাওয়া হচ্ছে।

মস্কো শহরে খুশি মতম বাড়ি সরায়, পুবমুখো বাড়ি ঘুরিয়ে উত্তরমুখো করে দেয়। আবার মতলব হল তো ময়দানব লাগিয়ে রাতারাতি আকাশ-ছোঁয়া ইমারত তুলে ফেলল। চারতলা এক বাড়ি, তাতে আটচল্লিশটা ফ্লাট, ফ্লাটে চারটে করে ঘর—এমনি বাড়ি হয়ে যাচ্ছে একমাসের মধ্যে—ময়দানবের কাণ্ড ছাড়া কি বলবেন তাকে? বাড়ি তোলা কিছুই নয়, অতি সহজ ব্যাপার। জায়গা পছন্দ করে ভিত খুঁড়ে ফেলুন; রেলের পাটি বসিয়ে দিন ভিতরে গর্তের চারিদিকে। পাটির উপরে ক্রেন এনে ফেলুন একটা কি দুটো—বাড়ির আয়তন বুঝে। ক্রেন অতি-অবশ্য চাই। আলাদা ধরনের ক্রেন—পাটির উপরে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। ক্রেনের বন্দোবস্ত হল তো এবারে যেতে হবে একবার ফ্যাক্টরিতে। নক্সার মাপ মিলিয়ে বাছাই করে ফ্যাক্টরি থেকে দেয়াল কিনুন, ছাত কিনুন, ভিতে বসবার জন্য কংক্রিটের চাঁই কিনুন।—মালপত্র কিনে গাড়ি বোঝাই করে এনে ফেলুন ভিতরে জায়গায়। আর হাঙ্গামা নেই—যা করবার এখন ক্রেনই করছে। কংক্রিটের চাঁই বসিয়ে ভিতের গর্ত ভরাট করে দিল; দেয়ালগুলো যেখানকার যেটা খাড়া করে বসাল; দেয়ালের খাঁজে ছাত লাগিয়ে দিল। দেয়ালে ছাতে ভিতের কংক্রিটে জোড়ার মুখে মুখে আংটা বেরিয়ে আছে—ঐ সব আংটায় ইস্ক্রুপ বসিয়ে আচ্ছা করে এঁটে দিন এবার। পলস্তারা করে ঢেকে দিন জোড়ার মুখগুলো। পছন্দমত রং করে নিন। ব্যস, হয়ে গেল বাড়ি। দুটো তলার দেয়াল একেবারে একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। দেয়ালের মাঝে মাঝে দরজা-জানলা বসানো। জলের পাইপ ও বিদ্যুতের তার গিয়েছে দেয়ালের ভিতর দিয়ে। মোটামুটি অলঙ্করণও হয়ে আছে। নিখুঁত পরিমাপে সমস্ত বানানো—জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র খাপে খাপে বসিয়ে জুড়ে দেবার ব্যাপার। সাউণ্ড-প্রুফ করবার ব্যবস্থা রয়েছে—ছাতের উপরে কিম্বা দেয়ালের বাইরে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বেধে যাক না, ঘরে শুয়ে নিরুপদ্রবে পা দোলানোর ব্যাঘাত ঘটবে না। মস্কোর এপাড়া-ওপাড়া সর্বত্র বাড়ি বানাচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত দিন দেখেছি,

অশ্রান্ত উদ্যমে ক্রেন কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ির কাজে ক্রেন এত খাটায় কেন, মনে কৌতূহল ছিল। বিল্ডিং-একজিবিশনে এসে পদ্ধতিটা এবারে মাথায় ঢুকল।

বারোঘেসে একজিবিশন, নিজস্ব ঘর বাড়ি। এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, কম সময়ে কম খরচে মজবুত বাড়ি বানানোর কত কি পদ্ধতি আছে। প্রিফ্যাবরিকেটেড পদ্ধতিতে পাইকারি হারে অংশগুলো তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেক বাড়ির ব্যাপারে আলাদা আলাদা বানাবার গরজ নেই। এ যেন হল, রান্নাঘরে তালাচাবি এঁটে হোটেলের রান্না কিনে এনে খাওয়া। খরচ কম, হাঙ্গামাও বাঁচে। তা-ও প্রশ্ন তুলেছিলেন : একঘেয়ে হয়ে যাবে মশাই, বাড়িতে বাড়িতে বৈচিত্র্য থাকবে না। কেন থাকবে না? নানান মাপের দেয়াল, নানান মাপের ছাত—মাথা খাটিয়ে নক্সা বানিয়ে ঐ সবের রদবদল ও রকমফের করে সাজান, উপরের কারুকর্ম ও সাজগোজ আলাদা করুন—দেখবেন ইমারতের ভিন্ন চেহারা।

শুধু আমরাই নই, ঘুরে ঘুরে কত লোকে দেখছে। বাড়ি বানানো নিয়েও এত আগ্রহ, অথচ শহরের উপর এক কাঠার একটি বাড়িও কারও নিজস্ব নয়। একজিবিশনের লোকগুলো পণ করে লেগেছে, আনাড়িদের এক লহমায় স্থাপত্য বিদ্যায় পণ্ডিত করে তুলবে। গলা ফাটিয়ে বোঝাচ্ছে। তা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খানিকটা পণ্ডিত হয়ে উঠলাম বই কি। সাত-আট তলা অবধি এই প্রিফ্যাবরিকেটেড পদ্ধতিতে বানানো চলে, তার উপরে হলে আলাদা রীতি। এমনি সাত-আট তলা শেষ করতে লাগবে বড় জোর ছ-মাস। কারখানার বাতিল যেসব ধাতু, তাই দেদার লাগছে কংক্রিটের কাজে। আচ্ছা, দোতলা অবধি তো এক দেয়ালে চালাচ্ছ—মেরামতের সময় কি হবে? দুটো তলাই তো ভেঙে ফেলতে হবে তখন? কোন বাড়ি আজ অবধি মেরামতের দরকার হয়নি। কত দিনে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। তখন ভাবনা করা যাবে। সে দিনের অনেক—অনেক বাকি।

ঘরে ঘরে মডেল সাজিয়ে রেখেছে। দেখাচ্ছে যত্ন করে। বাড়ির কোন অংশের জন্য দেশের বাইরে যেতে হয় না। ককেশাস ও উরাল পর্বত থেকে মার্বেল আর রকমারি পাথর আসছে। কাচের উপরেই বা কত রকম নক্সা! মস্কো শহরটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে, বৃহৎ প্লান রয়েছে তার। প্লানমাফিক ঘড়ি-ঘড়ি কাজ চলছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা বিশেষভাবে বাড়ানো হচ্ছে। সে দিকটায় ফ্যাক্টরি নেই—পাহাড়। বাতাস অতএব নির্মল। নতুন য়ুনিভার্সিটি বাড়ি ঐ অঞ্চলে। মস্কো এত বড় হয়ে পড়ছে, জল-সরবরাহের সমস্যা

দেখা দিতে পারে। সোজা খাল কেটে তাই মস্কো-নদীর সঙ্গে ভনের যোগা-যোগ করা হয়েছে। জলের প্রাচুর্য হল, নির্মলতা বাড়ল, ব্যাপার-বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ সুবিধা হয়ে গেল। এক ঢিলে তিন পাখি। মেট্রো তো দেখলেন সেদিন—তার আরো দুটো লাইন বাড়ছে। একটা ঐ য়ুনিভার্সিটির নতুন অঞ্চলে, আর একটা কৃষি-প্রদর্শনীর দিকে। আট-শ বছর আগে রাজপুত্র য়ুরি ডোলগোরুকি ওকগাছের গুঁড়ির দেয়ালে ঘিরে মস্কো শহর বসিয়ে-ছিলেন—বছরের পর বছর শহর কী অপরূপ হয়ে উঠছে দেখুন। বিপ্লবের ঠিক আগেও শহরের পনের আনা জুড়ে ছিল একতলা-দোতলা কাঠের বাড়ি। কমতে কমতে এখন সেগুলো গণনার মধ্যে এসে গেছে। নতুন এক বড় রাস্তা হচ্ছে য়ুনিভার্সিটি থেকে ক্রেমলিন অবধি, দু-পাশের দুটো পুলে নদী পার হবে—মাঝখানে ঠিক কূলের উপরে স্টেডিয়াম।

কত ভাবছে বাড়ি তৈরির কায়দাকানুন নিয়ে, কত খাটছে। তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। লড়াইয়ে শহরকে শহর তছনছ করেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি বানিয়ে মানুষের জায়গা দিতে হবে। কত কম খরচে ও কত কম সময়ে মজবুত ইমারত বানানো যায়—বাস্তুকারের দল একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। ভিতের তলার জল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাতালের দিকে চালান করে মাটি পাথরের মতো জমিয়ে তুলছে—তারই উপর ইমারত। জোর হাওয়া উঠলে বাড়ির মাথা কাঁপে অনেক সময়। তিরিশ-বত্রিশ তলায় যারা থাকে, ভয়ে বুক কাঁপে তাদের। কিন্তু মস্কোর আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর ঝাঁকুনি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেও নগণ্য পরিমাণে ধরা যায়।

অভাবিত ভাগ্য। হঠাৎ দেখতে পেলাম পলিতকেশ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি—মাথার সামনে টাক, গলায় ক্রশ ঝুলানো—কি রকম চোখে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। হাত বাড়াতে যাচ্ছেন—একটু দ্বিধাগ্রস্ত। চিনতে পেরেছি, ছবি দেখেছি ওঁর বইয়ে—হিউয়েট জনসন, ডীন অব ক্যান্টারবেরি। সোবিয়েত ও চীন ঘুরে তার উপরে বই লিখছেন—ধর্মজ্ঞ পাদরি মশায়ের কাণ্ড দেখুন, কম্যুনিস্ট দেশকে ব্যাপান্ত না করে প্রশংসা করেছেন। বুড়ো মানুষটির নাম হয়ে গেছে তাই লাল-ডীন। সকালে যখন সোবিয়েতস্কায়ায় গিয়েছিলাম, হৃষীকেশ বলেছিল আমায় বটে, লাল-ডীন মশায় মস্কোয় আছেন—এই হোটেলেই। অতএব সন্দেহ কি বা। শেকহ্যাণ্ড করে বললাম: ভারত থেকে আসছি আমি।

উনিও সেই আন্দাজ করেছেন, আলাপনে উৎসুক সেই জন্য। উঃ, রঙে ভগবান এমন মেরে রেখেছেন যে, সাহেবি পোশাকেও কারো চোখ ফাঁকি

ওরা যায় না।

বাঙালি লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি। সোবিয়েত ও চীন নিয়ে লেখা আপনার বই দুটো পড়েছি আমি। চীনের উপর আমিও বই লিখেছি, রাশিয়ার উপরেও লিখবার বাসনা।

এক নেশার মানুষ পেয়ে পেয়ে লাল-ডীন মজে গেলেন—আমার চীনের বই মন দিয়ে পড়েছ তো? বড় যত্ন করে লেখা।

বললাম—রীতিমতো ওজন বাড়িয়েই বললাম—জানি যে পড়া ধরতে আসবেন না।—প্রত্যেকটা লাইন পড়েছি। মুখস্থও বলতে পারি অনেক জায়গা।

ডীন বললেন, তোমাদের বাংলা খুব উঁচু সাহিত্য। বইটার বাংলায় অনুবাদ হয়, আমার ইচ্ছা।

তার জন্যে কি, সে ঠিক হয়ে যাবে।

বলছি মুখের কথা। বললে যদি খুশি হন, আপত্তি কিসের? আর বেশি বললে ব্যবসাদারির মতো শোনাবে। অনেকেই এসে ডীন মশায়কে ঘিরে ধরেছেন ইতিমধ্যে।

ভারতে চলুন আপনি।

ভিসার গোলমাল হবে হয়তো।

কে বলল? ভারত-সরকারের তরফ থেকে কিছু বলবার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। তা হলেও আপনার মতন মানুষ ভারতে যাবেন—এতে বাধা আসবে মনে করিনে। ভারতের মানুষ সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করি, বয়স কত হল আপনার?

এবারে একাশিতে পড়ব। জীবনের সবে শুরু—কি বলো হে?

হাসছি। ক্যামেরার লোকেরা এসে ওদিকে চুপিসারে মনের খুশিতে ফোটো তুলে যাচ্ছে। একজনকে দেখিয়ে অনুযোগের সুরে ডীন বলেন, যেখানে যাব সেইখানে আছেন ঐ ভদ্রলোক। সর্বত্র তাড়া করে বেড়ান ফোটো তোলার জন্যে।

হেসে বললাম, শোনাচ্ছেন কাকে? কীটস্য কীট আমাদেরও ঐ দশা। 'বাপ' 'বাপ' বলে কোন দিন এদেশ থেকে ছুটে পালাব ওঁদের ঐ ফোটো তোলার উৎপাতে।

বিল্ডিং-এক্জিবিশন থেকে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকেলটা আজ ঘরে কাটালাম। দাশগুপ্ত এলেন। দেশে যাচ্ছেন, স্ফূর্তিতে ডগমগ। তাঁর জায়গায় নর এসে পৌঁচচ্ছেন দু-এক দিনের মধ্যে। ধরের ভাইয়ের সঙ্গে

আমার চেনা ; কলকাতা থেকেই ধরের মস্কো আসার খবর শুনে এসেছি। ধরের অন্য দাশগুপ্ত পথ চেয়ে আছেন। আর পাঁচটা দিন কাটাতে পারলে যে হয়! পাঁচদিন পরে গৃহস্থালির যাবতীয় লটবহর জাহাজে রওনা করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চারা আকাশে উড়বেন। এতদিন আছেন, অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন এখনকার মানুষজনের সঙ্গে। ঘরোয়া খাঁটি খবর পাওয়া যাবে, সেই জন্যে বলে দিয়েছিলাম—যাওয়ার আগে একদিন সময় করে আসতে। এসেছেন তাই তিনি আজ। নিচু টেবিলের ধারে চা ইত্যাদি সহ জমিয়ে বসেছি।

হেনকালে পল এসে উপস্থিত। ডাকতে এসেছে: কনসার্ট ও লোকনৃত্য আছে সন্ধ্যার পর—তৈরি হয়ে নাও। এ কি কথা শুনি আজ পল—তোমার দেশে নাকি কৌমার্যের উপরে ট্যাক্স? নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিয়ে না করলে ট্যাক্স দিতে হয়—মেয়েপুরুষ বাছবিচার নেই? মেয়েরা গুণতিতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, ইচ্ছে করলেও সবাই বর জোটাতে পারবে না। লড়াইয়ে দেশের জোয়ান-যুবা কচু-কাটা গেছে, সে ক্ষতি সামলে ওঠেনি এখনো। তবু কিন্তু মেয়েদেরও ব্যাচিলর-ট্যাক্স থেকে রেহাই নেই। বর পাবে না, তার উপরে আবার ট্যাক্স দিয়ে মরবে। এটা অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়।

পল বলে, ঠিক তাই। কিন্তু কেউ কিছু মনে করে না। ব্যাচিলর ট্যাক্সের সমস্ত টাকা আলাদা করা থাকে—লড়াইয়ে বাপ-মা মরে যে সব শিশু অনাথ হয়েছে, তাদের কল্যাণে খরচ হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে ঐ সব অনাথদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য। দেখে যাবেন এমনি একটা-দুটো প্রতিষ্ঠান। ঐ সব শিশুদের জন্য জাত ধরে আমাদের বড় মমতা, বড় বেশি উদ্বেগ। মেয়েরা হল মায়ের জাত—তাদের তো আরও বেশি। মেয়েদের উপর ট্যাক্স অন্যায় বলে ঠেকলেও কেউ তারা কোনদিন আপত্তি তোলে নি।

ট্যাক্স ধরে দিল আপনার উপর—ক্ষেত্র বিশেষে মার্জনাও আছে। ধরুন আপনি ছাত্র, অথবা গবেষণা করেন কোন এক বিষয়ে—স্ত্রী-ঘটিত ঝামেলা এ সময়টা হিতকর হবে না। কিম্বা ধরুন রোগে ভুগছেন। প্রমাণ দেখিয়ে ট্যাক্স মকুব করে আসুন। দায়িত্ব আপনাদের উপর।

বিয়ে তো করলেন দায় বলে একেবারে চুকল না। বিয়েই শুধু নয়, বাচ্চা হওয়া চাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে। নয় তো আবার ট্যাক্স। এই ট্যাক্সও অবশ্য মাফ হতে পারে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেন যদি। পল বলে, উঃ—কম ট্যাক্স দিয়েছি! আমি দিয়েছি—আর ও-তরফে আমার স্ত্রীও

দিয়েছে। আরে মশায়, বয়স হলেই তো হয় না—যাকে জীবন-সঙ্গিনী করব, তাকে দেখেশুনে একটু বাজিয়ে নিতে হবে না? স্ত্রীরও তেমনি—স্বামী দেখেশুনে নিতে দু-চার বছর সময় লাগবেই। কিন্তু আইন সবুর মানবে না, দিয়ে যাও ট্যাক্স ততদিন। বিয়ে হয়েছে আমাদের বছর তিনেক, গত বছর একটি ছেলেও হয়েছে। ব্যস, বাঁচোয়া। স্ত্রীর বরঞ্চ এইবার নতুন পাওনার পথ খুলে গেল। কপালে থাকে তো বড়লোক।

পল চলে গেছে তৈরি হবার জন্য আর একবার তাগিদ দিয়ে। দাশগুপ্তর কাছে ঐ নতুন পাওনার পদ্ধতিটা সবিস্তারে শুনছি। এক বাচ্চা জন্মানোর পরে এ সব বাবদে কখনও আর ট্যাক্স দিতে হবে না স্বামী স্ত্রী কোন তরফের। স্ত্রীর এর পর থেকে রোজগারের মওকা। দ্বিতীয় বাচ্চা হল, তৃতীয় বাচ্চা হল। তার পরেরটা যেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সরকার থেকে মাসিক পঁচাত্তর রুবল বরাদ্দ, তা ছাড়া থোক কিছু। কেমন দেখুন বিনা চাকরির মাইনে। চতুর্থ থেকে সপ্তম চলল এই ভাবে—প্রত্যেক বাচ্চার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নগদও পেয়ে যাচ্ছেন, এবং তার পরিমাণ বাড়ছে সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। অষ্টম সন্তানের জন্ম থেকে মাস-মাইনে পঁচাত্তরের জায়গায় একশ রুবল। এগারো অবধি চলল এই রেট। বারো সন্তানের মা হতে পারলেন তো খাতি-রের আর অবধি নেই। হয়ে গেলেন বীর-মাতা। থোক রুবলও এত পেয়ে-ছেন যে, স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে বাকী জীবন কাটাতে পারবেন।

বাদুড়বাগানে আমার নিরঞ্জন-দা থাকেন—এই গল্প শুনে তো লাফিয়ে উঠলেন: উঃ, তোমার বৌদিকে ছা-বাচ্চা সহ পাঠাতে পার ওদেশে? দেখ না চেষ্টা করে। তাই বটে! দাদার উপর ষষ্ঠীর বিষম দয়া—নানা বয়স ও আয়তনের তেরোটি ছেলে-মেয়ে। আপাতত এই, ভবিষ্যতের আরও আশা রাখেন। সন্তানসংখ্যা নিরঞ্জন-দা'র নিজেরই গুণতে ভুল হয়ে যায়।

অর্থাৎ সোবিয়েতের ওরা মানুষ চাচ্ছে—আরো বিস্তর মানুষ। মানুষ হল লক্ষ্মী—ভাল ভাল মানুষে দেশ ভরে যাক। মরু আর স্তেপভূমিতে সোনার ফসলের বন্যা বহাচ্ছে, ধরণী-গর্ভের সুগুপ্ত ভাণ্ডার লুঠ করে এনে সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে, নিশ্চেতন তুষারময় উত্তর-মেরু অঞ্চল অবধি প্রাণের জোয়ার—কোন্ কাজে লাগবে এত সমৃদ্ধি, কারা ভোগ করবে? বীর সন্তান প্রসব করো মা-জননীরা!

তবু যত তাড়াতাড়ি চায়, জনবৃদ্ধি ঘটছে কই তেমন? কানীন সন্তানও সরকার স্বীকার করে নেয়—পয়সা বাচ্চা থেকেই মায়ের বৃত্তি। অবশ্য এ জাতীয় সন্তান জন্মে অল্পই। মেয়েগুলোর ঘর বাঁধবার বড় লোভ—সব

মেশেই। উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করে না।

গল্পে গল্পে আটটা বেজে গেছে। দাশগুপ্তর খেয়াল নেই; আমারও নেই। ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর দেখা হবে না মস্কো শহরে, কপালে থাকলে দেশে গিয়ে হতে পারবে। কনসার্টে যাব—লাউঞ্জে গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—সকলে বেরিয়ে পড়েছেন। আমাদের পিছনের দল অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছেন। গল্পে মত্ত ছিলাম, দেখা হল না তাঁদের সঙ্গে। তাঁরাও কনসার্টে গেছেন।

কি করা যায়? আরও একজনের কি গতিকে যাওয়া হয় নি। বেরিয়ে পড়লাম উভয়ে পায়দলে। আপনারা বলেন, বেরুতে দেয় না যন্ত্রতন্ত্র—পুলিশ ওৎ পেতে থাকে। দেখুন, এই টহল মেরে বেড়াচ্ছি—কেবা কার খোঁজ রাখে? হোটেলের নাম-ছাপা চিঠির কাগজ পকেটে নিয়েছি—পথ হারালে মুখের কথা কেউ বুঝবে না, তখন এই জিনিসটা বের করে ঠিকানার হদিস নেবো। আছি বটে ক'দিন এখানে, কিন্তু অবিরত মোটরে চলাচলের দরুন পথঘাটের তেমন আন্দাজ হয়নি।

শহরের সরগরম অঞ্চলটায় হোটেল আমাদের। ঠিক সামনেই থিয়েটার-স্কোয়ার। স্কোয়ারের পশ্চিম দিয়ে চললাম মেট্রো-স্টেশনের পাশ দিয়ে। সতর্ক-ভাবে ঘরবাড়ি ঠাহর করে করে এগুচ্ছি—এই সমস্ত চিহ্ন ধরে ফিরে আসব। কনকনে ঠাণ্ডা। ফুরফুরে বরফ পড়ছে সুরলোকের পুষ্পবৃষ্টির মতন—বরফগুঁড়ি জামায় পড়ে, মুখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। পথে বিস্তর লোক-চলাচল। সেই কথাই বলতে বলতে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য কি দেখুন মশাই, একটা রোগাপটকা লোক দেখতে পান কোনদিকে কোথাও? উত্তম সাজগোজ—মেয়ে-পুরুষ সকলের অঙ্গে ওভারকোট, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। সকালে যখন কাজে যাচ্ছিল, কারো কারো মলিন পোশাক দেখেছি, কিন্তু এখনকার সাজপোশাকে উজ্জ্বল সাচ্ছল্য ঠিকরে পড়ছে যেন। সাহস কি রকম গো—বাচ্চাদের অবধি এই বরফগুঁড়ির মধ্যে নিয়ে বেরিয়েছে। হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে—যে-সময়টা বন্ধ কামরার ভিতর লেপে-কম্বলে চাপা দিয়ে রাখবার কথা।

বাঁ-দিকে ক্রেমলিন, মিনারের মাথায় রক্তভারকা। বাঁয়ে ঘুরে রেড-স্কোয়ারে এসে পড়লাম। ক্রেমলিনের প্রায় লাগোয়া বিপ্লব-মিউজিয়াম, উল্টো দিকে লেনিন-মিউজিয়াম। লেনিন মিউজিয়ামের কিনার ঘেঁসে যাচ্ছি। একটা রাস্তা পার হয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ফুটপাতে এসে পড়লাম। কাচের জানলায় জানলায় দাম-সাঁটা হরেক জিনিস—লুব্ধ পাথিকজন দাঁড়িয়ে দেখছে।

ওপারে লেনিন মুসোলিয়াম—দরজায় দু-পাশে দুই সৈন্যের নিশ্চল প্রহরা। পাহারা বদল দেখবার জন্য যথারীতি মানুষের ভিড়। মুসোলিয়ামের দু-দিকে ক্রেমলিনের দুই মিনারের দুটি রক্ততারকা। আরও খানিক এগিয়ে বধ্যভূমি ও বেসিল ক্যাথিড্রাল পার হয়ে পথ নিচু হয়ে নেমে গেছে। এই পথ ধরে পায়ে পায়ে চললাম অনেক দূর অবধি।

দেখে বেড়াচ্ছি শুধু আমরাই নয়। আমাদেরও দেখছে। এক তরুণী হুড়দাড় করে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল। সঙ্গী বললেন, নজর রাখুন ফিরে আসবে এখুনি আবার। স্পষ্টাস্পষ্টি তাকানো অভদ্রতা—চুরি করে আড়চোখে এক বার দেখে নিয়েছে। ভাল করে মুখোমুখি দেখবার জন্য আবার ফিরবে, দেখতে পাবেন। ঠিক তাই। সেই মেয়েই সামনের দিক দিয়ে এসে পিছনে চলে গেল। এমন ব্যস্ত, তাকিয়েও দেখল না একটুকু—ভাবখানা এই প্রকার, আপনারা দেখলে হয়তো এমনি বুঝে যাবেন। কিন্তু আমরা জানি, দেখবেই সে কায়দা করে। না দেখে উপায় নেই 'কালো জগতের আলো' এই ব্যক্তি-দ্বয়কে। আজ্ঞে হ্যাঁ, কালোর বড় কদর ওদেশে। কালোর মতো কালো হলে রঙের দেমাকে ভূতলে পা পড়বার কথা নয়। সে গল্প আজকে পথের মাঝখানে নয়, আর একদিন।

॥ এগার ॥

এতদিন ইতি-উতি দেখে বেড়িয়েছি। পুরো দল এসে গেছে, পরশু-তরশুর মধ্যে লম্বা পাড়ি। প্লেনের তোড়জোড়, এবং এ-জায়গায় ও-জায়গায় মান্য অতিথিদের পদার্পণ-বারতা বাতলাবার জন্য আজ আর কাল দুটো দিন হাতে-রাখা যাক। তরশু নয়, পরশু দিনই আমরা মস্কো ছাড়ছি।

অতএব কারা কোন দিকে যাচ্ছেন, সেটা আজ পাকাপাকি হবে। দক্ষিণে মধ্য-এশিয়ার দিকে যাচ্ছেন কারা, এবং পশ্চিমে ইউরোপীয় তল্লাটেই বা যাচ্ছেন ক'জন? দলসুদ্ধ আমাদের ভোকসে টেনে নিয়ে চলল। ভোকসের প্রেসিডেন্ট মশায় চীনে গেছেন তাঁদের বার্ষিক উৎসব দেখতে (এই উৎসব বাবদেই আমি চীনে গিয়েছিলাম দু-বছর আগে)। প্রফেসর ইয়াকোভলেভ—মাথায় চকচকে টাক, কথায় কথায় রসিকতা—আপাতত সভাপতির কাজ চালাচ্ছেন।

মুখপাতে ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি বচন ছাড়ছেন আমাদের তাক করে। ইণ্ডিয়া থেকে দলের পর দল ডেলিগেশন আসছেন—লোকে তাই কি বলাবলি করে জান, এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের মরশুম। তোমার দেশের নতুন প্রাণের আবেগ—এতদূর থেকেও আমরা তার স্পন্দন পাচ্ছি। আমার দেশের মানুষ

নতুন ভারতকে ভাল করে বুঝতে চায়—ভারত সম্পর্কে উৎসাহ শতগুণ হয়েছে আগের দিনের তুলনায়। তোমাদের বই পড়ছে লোকে প্রচুর, একাল-সেকালের বিস্তর বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে। আরও বেশি বই ভাল ভাল বই চাচ্ছি অনুবাদের জন্য। কিন্তু বুঝসমঝের সবচেয়ে ভাল উপায় হল মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় ; তাতেই মানুষকে ঠিকমতো বোঝা যায়। সম্প্রতি সিনেমা-দল এসে গেলেন . ছবির মধ্য দিয়ে ভারতের জীবন-পরিচয় কিছুকিছু পেলাম। এমনি নানানতরো উপায়ে চেনাজানা করতে চাই মানুষের সঙ্গে—বিশেষ করে ভারতের মানুষের সঙ্গে। নানা রকম বৃত্তি ও মতবাদের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দল হয়ে এসেছ—এদেশ-ওদেশের সৌহার্দের ভিত্তিভূমি হলে তোমরা। আমাদের প্রীতির সম্পর্ক, শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় নয়, এমনি নানান বেসরকারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও গড়ে তুলতে হবে।...বিভিন্ন জাতি ও মানুষের মধ্যে সকলের আগে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোল— এই হল লেনিনের কথা। আমাদের স্বার্থ আছে ভাইসব. এমনি এমনি দাওয়াত করিনি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস লোকচর্চা যে যা জান. বলতে হবে আমাদের কাছে। মুখে মুখে শুনে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়ে পূর্ণতর হবে আমাদের শিক্ষা। কৃষি ও শিল্প নিয়ে ভারত ও সোবিয়েতে অশেষ চেষ্টা চলছে। দুটো দেশের ভূমি-প্রকৃতি সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ একেবারে আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষ্যে কিছুমাত্র তফাত নেই—মানুষকে সর্বসম্পদে ও সর্বাঙ্গীণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রপাগাণ্ডার কারণে নয়—জনশিক্ষার জন্যই জ্ঞানীগুণীদের এমনি আসা-যাওয়ার প্রয়োজন।

এবারে পরিচয় হচ্ছে. যাঁরা যারা এখানে হাজির আছেন তাঁদের সকলের মধ্যে। দোভাষি হয়ে খেদমত করে বেড়ায়—এরা আবার কি, মাইনে-খাওয়া আধা-পরিচারক—মনে মনে এমনি ধরনের অবজ্ঞা ছিল ছেলেমেয়েগুলোর সম্পর্কে। পরিচয় পেয়ে তাজ্জব হচ্ছি। পেশাদার অবশ্য কয়েকটি—কিন্তু বেশির ভাগই ভাল স্কলার, কেউ কেউ গাঁটের খরচা করে এসেছে বিদেশির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সেদেশের হালচাল বুঝবে, দুনিয়ার যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন নেবে বলে। সকলের বেশি অবাক হলাম জুলিয়ার পরিচয়ে। থিয়ে-ভাজা শুকনো চেহারা, ইংরেজিটা বড্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলে—এই দোভাষিণীকে আমল দিতাম না আমরা কেউ। এখন জানা যাচ্ছে ভোকসের প্রতিনিধি সে-ই। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিশেষ একটা বিভাগ আছে জুলিয়া তার প্রধান কর্মকর্ত্রী। দরকার-বেদরকার সমস্ত কিছু জুলিয়াকে জানিয়ে তবে ব্যবস্থা হয়। অন্যদের কাছে এতদিন যত কিছু কাজের কথা বলেছি,

জেনে বুঝে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তারা জুলিয়ার কাছেই।

কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, ঠিক করে ফেলুন এবারে। এখনই। এত বড় দেশ বেড়ানোর পক্ষে সময় হাতে আছে অত্যন্ত কম। টুরিস্টদের মতন কতকগুলো জায়গায় শুধুমাত্র নজর বুলিয়ে যেতে চাইনে, যথাসম্ভব জানতে বুঝতে চাই। যার মুখে যেমন এলো, বলে ফেললাম নানান জায়গার কথা। তা বেশ তো, বাধা কিছুই নেই—কিন্তু কি ভাবে কোনখানে যাওয়া হবে, কোথায় কত দিন লাগবে, হাতে যা সময় আছে তাতে কুলোবে কিনা—আমাদের ক'জন ওদের ক'জন একত্র বসে ঠিক করে ফেলবেন আজকের দিনের মধ্যেই।

আপাতত দুটো দল হয়ে তো বেরিয়ে পড়ি। ওসব চিন্তা হল ফিরে এসে, যখন আবার মস্কোয় একত্র হব তার পরে। তাজিকিস্তানে কে কে যাচ্ছেন বলুন। নিতান্তই দুয়োরের পাশের জায়গা—ভারত থেকে জোরে ঢিল ছুড়ে দিলে হিন্দুকুশের মাথা টপকে পামিরে টুক করে পড়বে। এই সেদিন অবধি পিছিয়ে পড়া দেশ—এক মাইলও রেললাইন ছিল না, পাহাড় জঙ্গল আর মরুভূমি। তাড়া খেয়ে বোখারার আমির এ হেন দুর্গম জায়গায় এসে আশ্রয় নিলেন। আফগানিস্তানের একেবারে লাগোয়া—আমির ঘাঁটি বানালেন তো ইংরেজ এবং মতলববাজ আরও কেউ কেউ টাকাকড়ি ও লড়াইয়ের সরঞ্জাম পাঠাতে লাগল আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে। আমির অনেক বছর চেপে ছিলেন। এখন গিয়ে সেই দেশে নতুন জীবন দেখবেন। যেতে কষ্ট হবে কিন্তু —অনেকক্ষণ উড়বেন, অনেক সময় লাগবে। যাবেন?

আমাদের মধ্যে নির্ভেজাল ভদ্রলোকেরা আছেন. তাঁরা মুখ বাঁকালেন: দূর, মাথা খারাপ না হলে কেউ ঐ পোড়ারমুখো দেশে যায়! কৃষ্ণসাগর-কূলে মনোহর স্বাস্থ্যবাস সোচি, শস্যশ্যামল ইউক্রেন, আরও কত সব ভাল ভাল জায়গা—কত আরাম ও আনন্দ!

ভোকস বলেন, তথাস্তু।

আর আমরা ইতর-ভাবাপন্ন যতগুলি আছি, প্রস্তাব শোনা থেকেই লাফালাফি করছি। দলে আমরা অনেক ভারি। রাশিয়ার যাঁরা আসেন, ভাল ভাল কাঁটা জায়গা দেখে তাঁরা ফিরে যান। এসব অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা হয় না। নরনারী ছিল প্রায়-নিরক্ষর, মানবাত্মা সমাজ ও ধর্মের গোঁড়ামিতে নিজিত—. হঠাৎ সে দেশে কত আলো আর আনন্দ! ভাগ্যক্রমে সুযোগ এসেছে তো নিশ্চয় যাব আমরা। ব্যবস্থা করুন।

ভোকস বললেন, তথাস্তু।

ভারি খুশি হলেন ওঁরা। যেহেতু ওঁদের আহ্বানে এসেছি, ওঁরাই আমা-

দের গার্জেন। তাজিকিস্তানের নিমন্ত্রণ কাজেই ওঁদের মারফতে এসেছে। এখন যদি তাদের লিখতে হত, না মশায়, তোমাদের ধাপধাড়া জায়গায় কেউ যেতে চাচ্ছে না—লজ্জার তবে অন্ত থাকত না। উল্লাস ভরে ভোকসের কর্তা বললেন, দুটো প্লেনের ব্যবস্থা হবে তোমাদের এই বড় দলের জন্য।

তারপরে সামাল করে দিচ্ছেন : সোবিয়েতে ঘোরাঘুরি করে সব-কিছুতেই যে খুশি হবে, এমন কথা বলি না। ত্রুটি-গ্লানি বহুত আছে। যেমনটি হওয়া উচিত, এখনো তা হয়ে ওঠে নি। এই মস্কোতেই দেখবে সেকেলে জীর্ণ কত কাঠের বাড়ি। বিপুল বেগে শহর-সংস্কারের কাজ চলছে, তা-ও এক নজরে মালুম হবে তোমাদের। আট-শ বছর ধরে যে শহর গড়ে উঠেছে, পঁচিশ-ত্রিশ বছরে সে বস্তু পুরোপুরি পালটে যায় কেমন করে? তার উপরে সাংঘাতিক লড়াই গেল। মস্কো শহরের তেমন-কিছু ক্ষতি হয় নি অবশ্য, লড়াইয়ের ডামা-ডোলের মধ্যেও পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর-নির্মাণের কাজ চলেছে। সে যাই হোক, জারের আমলের কাঠের বাড়ির জন্য আমাদের সোশ্যালিস্ট রাজ্য দায়ী হতে পারেনা। সংস্কার অতি-দ্রুত বটে, তবু যথেষ্ট নয়। আরও—আরও ত্বরা করতে হবে। ফুলের মতন হাজার হাজার যুবা লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে, সকল বিভাগের পাকাপোক্ত কর্মীরা সৈন্য হয়ে ফ্রণ্টে চলে গেল, কাজ তা বলে থেমে থাকে নি একটা দিনও। ছেলেরা গেল তো মেয়েরাই এগিয়ে এসে সকল দায় কাঁধে তুলে নিল। তার জের এখনো চলছে। তাজিকিস্তানে যাচ্ছ তো—একটা দেশকে কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেওয়া যায়, দেখতে পাবে সেখানে। তাজিকিস্তান দেখলে কতক বুঝবে।

কৃষি-প্রদর্শনী। কী বস্তু, চোখে না দেখে আন্দাজ হবে না। উত্তরমুখো ধাওয়া করেছি। দিব্যি ফাঁকা-ফাঁকা। শহর বলব না আর এখন, শহরতলি। হোটেল থেকে মাইল ছয়েক। অগণ্য গাড়ি আনাগোনা করছে—মোটরকার, মোটরবাস, ট্রলিবাস। কাতারে কাতারে মানুষ। ঐ একটা জায়গা নিরিখ করেই যাচ্ছে সকলে। চাষবাসের তো ব্যাপারে—এত মানুষ তবে কি মজা দেখতে চলেছে? তা-ও মাংনা নয়, তিন রুবল করে দক্ষিণা। নগদ দক্ষিণা। নগদ দক্ষিণা দিয়ে প্রতিদিন লাখের বেশি মানুষ দেখতে যায়। বুঝুন। সোবিয়েত দেশের এমুড়ো-ওমুড়ো থেকে মস্কোয় এসে ভিড় করে প্রদর্শনী দেখবার মনন নিয়ে। শুধু সোবিয়েত কেন—ভুবনের নানা অঞ্চল থেকে। আমরা এই ভারতের দল যেমন চলেছি।

. প্রদর্শনী বলতে একটা কি দুটো কিম্বা আট-দশটা বাড়ি ভেবে বসে আছেন

নাকি ? বিশাল এক উদ্যান-নগরী। মস্তবড় ফটকে ঢুকে পড়ে আর দিশা করতে পারবেন না। নিবিড় অরণ্য ছিল জায়গাটায়, তার থেকে অনেকগুলো বুড় বড় পাইনগাছ রেখে দিয়েছে। এখন চওড়া রাস্তা, পার্ক. লেক, ফোয়ারা, ফুলবাগান, ফলবাগান, লতাগুল্ম, মহীরূহ, ঘর-বাড়ি ও বিচিত্র মণ্ডপমালা এ-দিকে-ওদিকে। কী যে নেই, সেই ক'টি বস্তুর নাম বলে দেওয়া বরঞ্চ সোজা।

ইস্পাতের এক যুগলমূর্তি সামনে—এক তরুণ কর্মিক আর এক তরুণী কৃষাণী। পাখনার মতন হাত মেলেছে তারা আকাশে, তরুণের হাতে হাতুড়ি, তরুণীর হাতে কাস্তে। সোবিয়েতে নগর ও গ্রামের সমন্বয় ঘটাচ্ছে, শিল্প ও কৃষির মিলন হচ্ছে—যুগল-মূর্তি তার প্রতীক। প্যারিতে অখিল-বিশ্ব শিল্প-মেলা (১৯৩৭) বসে, সেই সময় এটা বানিয়েছিল।

দুটো বড় বড় ফোয়ারা—একটার নাম 'মানুষের মৈত্রী'। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র—সেই ষোল দেশের মানুষের ষোলটা সোনার বরণ মূর্তি ফোয়ারার চারিদিকে ঘেরা। লক্ষ লক্ষ ধারায় তারা স্নান করছে। আর এক ফোয়ারার নাম 'পাথরের ফুল'। উজবেকিস্তানের প্রাচীন রূপকথা—তারই নামে এই ফোয়ারা। সেই রূপকথা নিয়ে অপেরা হয়েছে. বলশই থিয়েটারে দেখলাম একদিন।

চওড়া স্কোয়ার, ফুলে ফ.লে আচ্ছন্ন। আরো অনেক ফোয়ারা—ফ্র-ফুর করে ঝরছে অবিরাম। পাশ দিয়ে এগিয়ে চলুন। কত মানুষ যাচ্ছে পাশাপাশি—পুরুষ-মেয়ে বুড়ো-শিশু সাদা-কালো—রকমারি চেহারা, বিচিত্র সাজপোশাক! দুটো মণ্ডপ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে—মুখ্যমণ্ডপ আর যন্ত্রমণ্ডপ। একটার সোনালি মাথা, অন্যটার মাথা কাচের। মুখ্যমণ্ডপ হল গোটা কৃষি-প্রদর্শনীর ভূমিকা। অক্টোবর-হলে ঢুকলেন—অগ্নিবর্ণ দেয়াল, বিপ্লবের আগুনের মধ্যে নব-রুশের জন্ম সেইটে মনে করিয়ে দেয়। আসুন এবারে কনস্টিট্যুশান-হলে। উজ্জ্বল আলোয় বিভাসিত—বিপ্লবের পরে জন-গণ বিপুল অধিকার লাভ করল, ঘরময় সেই আনন্দ ঝলমল করছে। পাশের হলগুলোয় দেখুন এবার—ধাপে ধাপে জাতির অগ্রগমন—আটত্রিশ বছর আগে সমাজতন্ত্র চালু হল, ঘুণ-ধরা রাষ্ট্র-কাঠামো চুরমার করে অর্থনৈতিক নতুন বিধান গড়ে তুলল, সেই ইতিহাস ছেঁকে তুলে ধরেছে লোকজনের সামনে।

ইতিহাসই শুধু নয়—বাইরে আসুন, ভূরিপরিমাণ উৎপাদনের আন্দাজ নিন ঘুরে ঘুরে। ভবিষ্যতের আরও বিপুলতর পরিকল্পনা। মা বসুন্ধরার কাছে এতকাল ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে জুত হল না—দামাল সন্তানেরা জোর-জবরদস্তি করছে এবারে: পেট ভরে না, তবে আরো দিবিনে কেন আমাদের—আরো

আরো চাই। ম্যালথসের আতঙ্ক এরা অমূলক প্রমাণ করেছে। ম্যালথস হিসাব করে দেখালেন, পঁচিশ বছরে কোন দেশের জনসংখ্যা যদি দুনো হয়ে যায়, খাদ্য-উৎপাদন সেই বিশেষ অবস্থায় কিছুতেই দুনো হতে পারবে না। অতএব উপবাস ও দারিদ্র্য অনিবার্য, যদি না জন্মনিয়ন্ত্রণ কর। এরা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে অন্য রকম। পঁচিশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দুনো নয়, চারগুণ হয়েছে।

রুশ-মণ্ডপে ঢুকেছি। অনেকগুলো ঘর-বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ নিয়ে এক এক মণ্ডপ। মানুষের ছবি দেয়াল-ভরা—যারা ফসল ফলাচ্ছে, শিল্পকর্ম করছে। পৃষ্ঠপট সোনার রঙের। মানুষই হল সোনা—রাষ্ট্রের সর্বোত্তম সম্পদ। নানা রকম সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছে, পণ্ডিতজনেরা টুকে টুকে নিচ্ছেন—কোন ফসল কি পরিমাণ ফলল তার হিসাব। রুশ গণতন্ত্রের মধ্যে নিরক্ষর একজনও নেই। কাচের আবরণের মধ্যে দিগব্যাপ্ত গমের ক্ষেত। সত্যিকার জলন্ত গম সামনের খানিকটা জায়গায়, পিছন দিকটা ছবি—সত্যিকার ফসল আর ছবির ফসলে আশ্চর্য রকম মিলিয়ে দিয়েছে। লাল রঙের বাঁধাকপি দেখলাম। আর রাক্ষুসে আয়তনের আলু। সূর্যমুখী ফুলের দেদার চাষ হচ্ছে—শোভার জন্য শুধু নয়, বীজ থেকে তেল আদায় করে।

পশুপালনের ঘরেও অমনি অনেকটা জায়গা কাচে ঘেরা। তার মধ্যে সুবিস্তীর্ণ ঘাসের জমি—ছবির পশুরা চরে বেড়াচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে গরু-ভেড়া ছাগল-শূকর হাঁস-মুরগির ছবি। টিনের দুধ ও পনীর থেকে শুরু করে জুতো ব্যাগ-কার্পেট ও মাংসের তৈরি নানা খাদ্যদ্রব্য টেবিলে সাজানো।

উজবেকিস্তানের মণ্ডপে ঢুকে পড়ে অবাক—ঘর না তুলার ক্ষেত? দেয়ালের প্লাস্টারেও যেন থোপা-থোপা সাদা তুলা সাজিয়ে রেখেছে। উজবেকিস্তানের কথা তো জানেন—মরু ও স্তেপভূমি। অগণ্য খাল কেটে আর বাঁধ বেঁধে দেশময় জলসেচের ব্যবস্থা করে ফেলেছে—মরুভূমি সবুজ ফসলে হাসছে এখন। তুলার ফসল সব চেয়ে বেশি। একদিককার দেয়ালে সারবন্দি বড় বড় ছবি। কোন মহাজন এঁরা—চেহারায় তো চিনতে পারিনে। কৃষক-বীর—চাষে খুব দড়, ক্ষেতে বিপুল ফসল ফলিয়েছেন। বীরবৃন্দের উপর মহাবীরেরা আছেন—বড় বড় যৌথখামারের যাঁরা অধিনায়ক ছিলেন। মার্বেলপাথরের মূর্তি, বিস্তর মেডেল ও সম্মান-চিহ্ন বুকের উপর। তুলার ঘর থেকে চলুন রেশমের ঘরে। বাঁশ জন্মাচ্ছে খুব, আস্ত এক বাঁশঝাড় পুঁতে নমুনা দেখাচ্ছে। আগে বলত আখের চাষ ওখানে সম্ভব নয়। কিন্তু মিচুরিন ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের যে দেশে ঘাঁটি, কোন গাছের সাধ্য নেই গোঁ ধরে থাকার। যাকে

যেখানে খুশি নিয়ে বসাবে—প্রসন্ন হয়ে ডালপাতা মেলতে হবে, ফুলফল ফলাতে হবে। অতএব আখ ফলছে ১৯৪৭ অব্দ থেকে। আখে, চিনি নয়,রম-মদ বানায়। চিনি তৈরি হয় সুগার-বীট থেকে, তার চাষ প্রচুর। সেরাকুলের জন্য বিখ্যাত এই তল্লাট। এক রকম পাতলা কোমল চামড়া। কালো রঙের টুপি ও পোশাক বানায় সেরাকুল দিয়ে।

জর্জিয়া মণ্ডপ। রকমারি ফলের জন্য জর্জিয়ার নাম। আর মদের জন্য। সিনেমা-ছবির মতো পর পর সাজিয়ে দিয়েছে—আগে দেশটার কেমন হাল ছিল, আর এখন কি অবস্থা। সেকালের পতিত জলাজমি ফলে শস্যে মানুষের আনন্দে ঐশ্বর্যে অভিনব রূপ নিয়েছে।

ছোট-বড় সকল অঞ্চলের নামে নামে এমনি সব মণ্ডপ। প্রতিটি মণ্ডপ সেই অঞ্চলের বিশেষ শিল্পরীতিতে সাজানো। প্রদর্শনীর ফল-উৎপাদন বিভাগে চলে যান এইবার। গিয়ে মজাটা দেখুন। রকমারি ফল। মিচুরিন ও লাইসেঙ্কোর হাতের জাদু। বৈজ্ঞানিক মিচুরিন প্রকৃতির উপর বিষম এক হাত নিয়েছেন, দুনিয়ার মানুষ সে খবর জানেন। গাছপালার চরিত্র অবধি বদল হয়ে যাচ্ছে। এক আবহাওয়ার গাছ শক্তি জুটিয়ে নিয়েছে অন্যত্র গিয়ে বেঁচে থাকবার। ফলে নতুন স্বাদ আসছে। ধরুন, আমড়া হবে মিষ্টিফল, এবং পেঁপে হবে টক। কিম্বা আমে-কাঁঠালে মিশল করে এক রকম ফল, যার মধ্যে আমের মিষ্টতা কাঁঠালের গন্ধ। হেসে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই—বলুন না মিচুরিনের দলবলকে চেষ্টা করে দেখতে। চুলের মুঠি ধরে খেলাচ্ছেন ওঁরা প্রকৃতিকে। উৎকৃষ্ট পিয়ার-ফল, সুগন্ধ ও ওজনে ভারী, উষ্ণ অঞ্চলে ফলত—সে গাছকে এমন হিমসহন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গম ফলছে এখন সকল অঞ্চলে, এবং প্রায় সর্বঋতুতে। সব চেয়ে মজা লাগল লতানো আপেলগাছ ও চেরিগাছ দেখে। মহীরূহ হয়ে দাপটে বিরাজ করতেন—কি হাল করেছে দেখুন, একেবারে লালিত লবঙ্গলতা।

বিস্তর মানুষ ফল তরকারি নিয়ে বেরুচ্ছে। বাজার আছে নাকি এর ভিতরে? বাজারই বটে। প্রদর্শনীর যাবতীয় ফল-তরকারি তিন দিন পরে বিক্রি করে দেয়, নতুন এনে সাজিয়ে রাখে। আর ক'দিন পরে নবেম্বর পড়লে প্রদর্শনী বন্ধ। বন্ধ থাকবে কয়েক মাস—বরফে চতুর্দিক ঢেকে থাকবে। টাটকা ফলপাকড়ও দুর্লভ সেই সময়টা।

একটি মেয়ে আলাপ জমিয়েছে প্রফেসর গুপ্তের সঙ্গে। বড্ড হাসে। বয়স কম, মিষ্টি হাসি মাখিয়ে দেয় প্রতি কথায়, ভারি সুন্দর লাগে। গুপ্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন : খুব নামকরা লোক। মেয়েটি বলে,

আমি কিন্তু একেবারে অনামি। নাম লিউবা। অর্থাৎ লভ—ভালবাসা।

লভ নামটা বেমানান নয় তোমার—

চোখ বড় বড় করে লিউবা বলে, "বলেন কি। ভালবাসায় পড়ে যাবেন না সত্যি সত্যি। খেটে খেতে হয় আমায়, প্রদর্শনী দেখিয়ে বুঝিয়ে বেড়াতে হয়। ঝামেলায় পড়লে তো মুশকিল।

খিলখিল করে হাসল তরুণী। জড়তা নেই, নির্ঝরের মতো। হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চলল আমাদের সঙ্গে। ঘরোয়া সাদামাঠা কথা। প্রদর্শনীর সম্বন্ধে যা দু-একটা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দেয়।

ওদিকে আটক করেছে একদল বাচ্চা আমাদের। দোষ বাচ্চাদের নয়, মায়েরা লেলিয়ে দিচ্ছেন—ঐ যাচ্ছে সবাই, পাকড়ো—। ছুটোছুটি করে এলো তারা, কাছে এসেই কিন্তু লজ্জা। কচি কচি হাত লজ্জা ভরে একটুখানি বাড়িয়ে ধরে। শেকহ্যাণ্ড করো, অন্ততপক্ষে ছুঁয়ে দাও একটু। শিশু লাইব্রেরি দেখবার সময় বলেছিল : সব দেশের মানুষ এক, সব মানুষ আপন—ছেলেদের এইটে ভাল করে শেখাই আমরা। মায়েরাও তাই শেখান, এই তো দেখতে পাচ্ছি।

পল চেঁচাচ্ছে ওদিকে, হল কি তোমাদের? চায়ের পিপাসা পেয়েছে, চলো। খেয়ে এসে তারপরে যন্ত্রমণ্ডপ দেখা যাবে। অন্য-কিছু দেখার সময় হবে না আর।

আর্তকণ্ঠে আমরা বলি, বন্দী করেছে এই দেখ। এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

বিস্তর কষ্টে ফাঁক কাটিয়ে হন-হন করে বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে নিয়ে তুলল। চলেছে তো চলেইছে। কোথায় নিয়ে যায় রে বাপু চা খাওয়াতে? কেউ বলে হোটেল মেট্রোপোলে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে—চা খাইয়ে আবার পাঠাবে। লেকের ধারে ধারে গাছপালার ছায়ার মধ্যে রেস্তোরায় নিয়ে তুলল—ও হরি, প্রদর্শনীরই রেস্তোরা, এলাকার ভিতরে। কত বড় জায়গা নিয়ে প্রদর্শনী বানিয়েছে, ঘোরাঘুরিতে ভাল করে মালুম পাই।

রেস্তোরায় যাওয়া মাত্র খাবার মেলে না—অর্ডার মতন গরমাগরম বানিয়ে দেয়, বিস্তর সময় লাগে। খেয়ে এসে দেখি মণ্ডপগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজন বড় বেশি নেই, নির্জনতার থমথমে ভাব। শুধু মাত্র যন্ত্রমণ্ডপটা খুলে রেখে জনকয়েক অপেক্ষা করছেন আমাদের দেখানোর জন্য। কাচের গম্বুজ—ভিতরে ঢুকে আয়তনের আন্দাজ পাই, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এত বড় কাচের ঘর মস্কো শহরে আর নেই। ট্রাক্টর চাষের নানান যন্ত্র, নানা

জাতীয় প্লেনের নক্সা ও নমুনা, অসংখ্য বৈদ্যুতিক কলকব্জা—এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে এক রকম নমো-নমো করে দেখতেও ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

হোটেলে ফিরে দেখি, বিনয় রায় এসেছেন। অন্যায় হয়ে গেছে, বিনয় রায়ের কথা বলিনি এদ্দিন আপনাদের। মস্কোয় পৌঁছে সেই সন্ধ্যাবেলাই তাঁর বাসায় খোঁজ নিয়ে ফোন করেছি। বাসায় পাত্তা মিলল না তো রেডিওয়। মস্কো রেডিও-র বাংলাবিভাগ—বাংলা কথাবার্তা ও বাংলাগান শোনেন যেখান থেকে—বিনয় তার কর্তা। আর তিনজন আছেন ঐ বিভাগে—বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী, গুজরাটের মেয়ে তিনি, এবং রুশ তরুণী ভাল্যা ইগোরিবোভা ও রুশীয় যুবা বরিস কাপুস্কিন। রেডিও-অফিসেও বিনয় ছিলেন না সেদিন। আজকে নিজে এসেছেন খবর নিতে। চুপচাপ এক জায়গায় বসা ওঁর কোষ্ঠিতে নেই, এসে অবধি চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছেন এঘর-ওঘর উপর-নিচে।

বিনয়কে জানেন আপনারাও। আই. পি. টি. এ. নিয়ে মেতে ছিলেন এক সময়ে, তার সেক্রেটারি—উঁহু, কিছুই বলা হল না—ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্ব। বছর কয়েক এখন মস্কোর পাকাপাকি আস্তানা নিয়েছেন। ভারতের মানুষ পেলে স্ফূর্তির অবধি থাকে না, সর্ব উপায়ে খেদমত করেন। আর বাঙালি হলে তো কথাই নেই, একবেলা বিনয়ের বাড়ি মাছের ঝোল ভাত বাধা। এবং গুজরাটিদেরও তাই—মাছ খান না বলে তাঁদের ডাল-ভাত। দুতরফের সম্পর্কই অতিঘনিষ্ঠ—আমরা জয়া দেবীর শ্বশুরবাড়ির লোক, গুজরাটিরা বিনয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক।

বিনয়কে দরকার, তাঁর কাছ থেকে সোবিয়েত দেশের ভিতরের কথা শুনব। যেমন দাশগুপ্তকে পেয়ে গিয়েছিলাম।

এরকম ছটফট করলে হবে না কিন্তু। ফিরে আসি তাজিকিস্তান থেকে, একদিন ঠাণ্ডা হয়ে বসে সমস্ত কথার জবাব দিতে হবে ভাই।

হাঁ হাঁ—

একবার হাঁ বলে সুখ হয় না, দু-বার বলা বিনয়ের রীতি। দুটো-একটা কথার পরেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাজের অন্ত নেই। রেডিওর অতবড় দায়িত্ব, তার উপর য়্যুনিভার্সিটিতে পাঁচ বছরের পুরো কোর্স নিয়ে পড়াশুনো করছেন। ফাঁক কাটিয়ে এর মধ্যে ঘোরাঘুরিও আছে।

দেশে-ঘরে যাবেন না?

হাঁ হাঁ, দেশ যাব বই কি! দেশ ছাড়ব কার ভয়ে? তবে পাকাপাকি

থাকা যাবে না। এখানে ধরুন আমি আর আমার স্ত্রী দু-জনে মিলে—

আঙুলের কর গুণে হিসাব করছেন। দু-জনের মাইনে এবং লেখা ও অনুবাদের দক্ষিণা নিয়ে মাসে পাঁচ হাজার রুবলের মতো দাঁড়িয়ে যায়। হেসে বললেন, দেশে ফিরে গেলে আপনারা পঞ্চাশ টাকাও তো দিতে চাইবেন না।

॥ বারো ॥

২০ অক্টোবর বুধবার। সকালবেলা উঠে কাচের জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার, কুন্দফুলের বৃষ্টি হচ্ছে মস্কোয়। ঘরে কি থাকা যায়? তাড়াতাড়ি পোশাক এঁটে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে ঘড়াং করে ভারী ফটকটা খুলে একেবারে রাস্তায়। ছাতের তলে দাঁড়িয়ে সুখ হল না—বাইরে, ফুটপাতের বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে থিয়েটার-স্কোয়ারের কাছ বরাবর চলে এলাম। সর্বদেহের মধ্যে মুখের ইঞ্চি চারেক জায়গা তো আলগা—হিমে এমন কনকন করছে যে ক্ষণে ক্ষণে হাত চাপা দিতে হয় মুখের উপর। জমে গিয়ে পার্কের ঐ স্ট্যাচুর মতন পাথর হয়ে না যাই। আরে, স্ট্যাচুই বা গেল কোথায়—গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ গাদা দিয়ে রেখেছে যেন ওখানটায়! পথে পার্কে সর্বত্র রাতারাতি যেন বস্তা বস্তা ময়দা ঢেলে সাদা করে দিয়েছে। গাছের গুঁড়ির খানিক খানিক কালো বেরিয়ে পড়েছে—ডালপাতা সমস্ত সাদা। এমন জিনিস একলা দেখে সুখ হয় না—ঢুকে পড়লাম আবার হোটেলে। মনে মনে শঙ্কা, দুর্যোগ দেখে আজকের বেরুনো বাতিল করে না দেয়। ব্রেকফাস্ট-টেবিলে অবিরত তাগাদা দিচ্ছি: কই গো, কখন বেরুচ্ছি আজ? বাইরে বড় মজা। তাড়াতাড়ি করো।

পর্দা সরিয়ে দিয়ে কাচের জানলায় বসে বসে চিঠি লিখছি। দেশের জন্য মন কেমন করে উঠল, আপন-মানুষদের কথা মনে পড়ছে—আহা, এমন ছবি দেখলে না তোমরা। পুরাণে পুষ্পবৃষ্টির কথা পড়ি, তাই দেখ ঐ চোখের উপরে।

প্রোগ্রাম বিলকুল বাতিল নয়—শুধুমাত্র এক জায়গায় যাব, লেনিন-লাইব্রেরি। তা ঐ এক জায়গা দেখেই স্বচ্ছন্দে একটা মাস কাবার করা যায়। মস্কো-শহরের কেন্দ্রে আঠারোতলা প্রাসাদের বনেদি লাইব্রেরি এটা। যত্রতত্র লাইব্রেরি এদেশে—তুষারে ঢাকা মেরুর দেশে লাইব্রেরি, পৃথিবীর ছাত পামিরের উপরেও লাইব্রেরি। আবার আছে অসংখ্য চলতি লাইব্রেরি—রাখালেরা এদেশ-সেদেশ গরু-ভেড়া চরায়, সৈন্যরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘোরে, তাঁবুর লাইব্রেরিগুলো চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। পেশাখোর লোকের ভাত

জুটুক না জুটুক নেশার বস্তু চাই-ই, এদের সেই ব্যাপার। মরার পরে কফিনের ভিতর খানকতক বই ঢুকিয়ে দেয় না কেন তাই ভাবি।

লেনিন লাইব্রেরির পাশ দিয়ে কত দিন বেরিয়ে গেছি, আজকে তার চত্বরে এসে নামলাম। চারতলা বাড়ি সামনে থেকে মালুম হয়, ভিতর দিকে নিচু ছাতের আঠারো তলা বানিয়েছে বই রাখবার প্রয়োজনে। লেনিনের বিশাল মূর্তি সামনে। ঘরে ঢুকলাম। এবং যেমন হয়ে আসছে, চীফ-সেক্রেটারি হাঁ-হাঁ করে এসে পড়লেন: আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক। ডিরেক্টরমশায় একটা কনফারেন্সে আটকা পড়ে গেছেন, এসে পড়বেন এখনই। সেক্রেটারির ডানহাত কাটা, লড়াইয়ে হস্তদান করে এসেছেন। বাঁ-হাতে শেকহ্যাণ্ড চলছে।

সোবিয়েতের মধ্যে সকলের সেরা লাইব্রেরি—দুনিয়ার যে সব বড় বড় লাইব্রেরি আছে, তার একটি। সকাল ন-টা থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা। পড়াশুনা করবেন তো ঝটপট একটা কার্ড করে ফেলুন। এক বছর চলবে, তার পরে কার্ড বদলে নেবেন। গবেষক কিম্বা লেখক হন তো বই বাড়ি নিতে দেবে, অন্যথা এখানেই বসে পড়ুন যতক্ষণ আপনার খুশি। গবেষকদের ভারি খাতির। এরই মধ্যে নিরিবিলি ব্যবস্থা আছে, বিশেষ রকম সুযোগ-সুবিধা তাঁদের জন্য। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলাম সেদিকে। চলতে ফিরতে সঙ্কোচ হয়, গা ছমছম করে। সুঁচ পড়লেও বুঝি শব্দ পাওয়া যাবে। বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে কাগজের উপর, তারই যৎসামান্য খশখশানি।

চার-শ বছর আগে ওদের বই ছাপা শুরু—সমস্ত ছাপা বইয়ের সংগ্রহ এখানে, একখানিও বাদ নেই। বই ছাপা হলেই তিন কপি করে পাঠানোর নিয়ম; অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে কেনে। চাহিদা বুঝে কোন কোন বইয়ের আড়াই-শ কপিও কিনেছে। জায়গার অকুলান না হলে আরও বেশি কিনত। বিদেশি বইও বিস্তর কেনে। বছর বছর বই বেড়ে যাচ্ছে—জায়গা বাঁচাবার এক কায়দা বের করেছে—মাইক্রোফিলম। পুরো পৃষ্ঠার ফোটো নেওয়া আধ-ইঞ্চি জায়গার মধ্যে। সাদা চোখে কিছুই বুঝবেন না—রেণু পরিমাণ কতক-গুলো ফুটকি। যন্ত্রে ফেলে অবাধে পড়ে যান—সাধারণ বইয়ের চেয়েও মোটা হরফ দেখাবে। একটা দুষ্প্রাপ্য বই কিছুতে সংগ্রহ হচ্ছে না, দু-চার দিনের জন্য চেয়েচিন্তে এনে মাইক্রোফিলম তুলে যার বই তাকে দিয়ে দিন। অথবা যে বইয়ের একটা কপি জোগাড় হয়েছে, ফিলম তুলে তার সংখ্যা বাড়িয়ে নিন। ষাট হাজার মাইক্রোফিলম তুলেছে এখন অবধি। কাজ বন্ধ নেই, রোজই তুলছে। আমাদের ভারতীয় দল দেখে তড়িঘড়ি একটা ভারতীয় বই-য়ের মাইক্রোফিলম যন্ত্রে ফেলে পড়তে লাগল। ভাগ্যবশে সেটা বাংলা বই—

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত 'সমালোচনা-সাহিত্য'। ভারি স্ফূর্তি লাগল নানান এলাকার ভারতীয় ভাইদের সামনে বাংলা বইয়ের খাতির দেখাল বলে। স্ফূর্তির চোটে ঐ লাইব্রেরিতে বসেই দু-ছত্র চিঠি লিখে ফেললাম ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। চিঠি তখনই ডাকে ফেললাম।

আমাকে আপনাকে ইচ্ছামত বই বাড়ি নিতে দেবে না, কিন্তু অন্য লাইব্রেরিতে দেদার ধার দিচ্ছে। বই মস্কোর বাইরে চলে যাচ্ছে—সেই মধ্যপ্রাচ্য অবধি। সেদিকে দিব্যি দরাজ ব্যবস্থা। তা হলে দেখুন, লেনিন-লাইব্রেরির বই মস্কোয় বসে পড়া যায় ; আবার পড়ছে দেশের অতি-দূর-প্রান্তে বসেও। বাইরের অনেক লাইব্রেরির বইয়ের হিসাব রাখে এরা, তাদের ক্যাটালগ বানায়, নানা বিষয়ে সাহায্য করে। ভারতীয় বইয়ের খবরাখবর নেওয়া ও ক্যাটালগ বানানোর ভার অধ্যাপক বগদানভের উপর।

আগে রাশিয়ার মধ্যে পিটার্সবার্গ লাইব্রেরি সকলের সেরা ছিল, লেনিন লাইব্রেরি দ্বিতীয়। বিপ্লবের পর রাজধানী মস্কোয় চলে এলো, সেই থেকে লাইব্রেরি পুরোপুরি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ মিউজিয়াম অনেক পুরানো (১৭৫৩ অব্দে প্রতিষ্ঠা)। এক-শ বছর আগে একজন রুশীয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখে উচ্ছসিত বর্ণনা দেন। তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উপদেশ নিয়ে তাদেরই পথ ধরে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪২ অব্দে আশি বছর বয়স হল : উৎসবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর নিজে অভিনন্দন জানালেন। বইয়ের দিক দিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আজকে কিন্তু পিছনে পড়ে গেছে ; লেনিন-লাইব্রেরির বেশি সচ্ছলতা। দুই কোটি পাঁচ লক্ষ পাণ্ডুলিপি জোগাড় করেছে ; বেশির ভাগ রুশীয়, বিদেশিও আছে কিছু কিছু। এগারো শতকের পাণ্ডুলিপি দেখলাম, আশি বছর আগেকার সংগ্রহ। মোটমাট একশ-ষাটটি ভাষার বই এখানে।

ক্যাটালগ হাতড়াচ্ছি। ভারতীয় বইয়ের তালিকায় চোখ বুলিয়ে গেলাম। বাংলাই বেশি, শ-দুয়ের কাছাকাছি। সবই প্রায়ই সেকালের। মাইকেল-বঙ্কিম আছেন, তার এদিকে বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ খানকয়েক আছে, মূল-বাংলা দেখতে পেলাম না। আধুনিক বইও অতি সামান্য। (এখানে না থাক, গর্কি-ইনস্টিট্যুট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে আছেন।)

প্লিনির লেখা বই আছে, ১৪৬৯ অব্দে ইতালিতে ছাপা। টমাস মুরের বিরাটবপু বই 'উটোপিয়া' (১৫১৮)। কোপার্নিকাসের বইয়ের প্রথম সংস্করণ (১৫৪৩)। ভগবদ্‌গীতার মস্কো সংস্করণ (১৭৮৯)। নলদময়ন্তীর মস্কো সংস্করণ

(১৮৪৫)। রামায়ণ মহাভারতের পুরোপুরি অনুবাদ। রুশ-পরিব্রাজক আলফান্সি বিকিতিন পনের শতকে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর লেখা ভ্রমণ-কথা দেখলাম। উনিশ শতকে ছাপা তারিফি রকমের এলবাম দেখে মজা লাগল—শিল্পীর নাম সালতিকোপট (Saltykopt), —মলাটে বাংলার মন্দির, ভিতরে খাসা খাসা ছবি এদেশের।

আঠারো-তলা ভাণ্ডারের অন্ধিসন্ধি থেকে বই এনে রিডিংরুমগুলোয় পৌঁছে দিচ্ছে। দেখছি অবাক হয়ে। অনেকগুলো লিফট ওঠানামা করছে এতলা-ওতলার বই বোঝাই হয়ে। ছাতের নিচে ঘর-দালানের ভিতরে ছোট রেল-লাইন পাতা, ছোট ছোট গাড়ি, লিফটে নামানো বই বোঝাই করছে গাড়ির ভিতর বিদ্যুতের ইঞ্জিনে গড়গড় করে নিয়ে চলল। অবিরত এই কাণ্ড চলছে। পাঠক ফরমায়েস করল, ঠিক তার পনের মিনিটের মধ্যে বই এসে হাজির হবে। কি কায়দায় হচ্ছে, হঠাৎ মাথায় আসে না।

উপরের ব্যালকনি থেকে তাকাচ্ছি একটা রিডিংরুমের ভিতরে। নিঃশব্দে কদাচিৎ জুতোর অতি মৃদু আওয়াজ। কেতাব সরবরাহ করে বেড়াচ্ছে লাই-ব্রেরির লোক। মহা ব্যস্ত। নানান বয়সের মানুষ সারি সারি মগ্ন হয়ে পড়ছে। পলিতকেশ বুড়ো থেকে তরুণী ছাত্রী। উজ্জ্বল আলো। সন্তর্পণে পা ফেলছি আমরা, শব্দ উঠে ধ্যান বিচলিত না হয় ওদের!

বেরিয়ে এসে—আমাদের গাড়ি কোথায় গো?—কালো রঙের গাড়ি বিলকুল সাদা। ইঞ্চি দুয়েক পুরু বরফ ছাতের উপরে। স্টার্ট বন্ধ হয়নি, সেই তখন থেকেই চলছে—গাড়ির ভিতরে কোমল উষ্ণতা। বাইরে এমন কাণ্ড চলছে, কিন্তু গাড়ি কিম্বা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লে শীত বুঝতে পারবেন না।

॥ তেরো ॥

রাত থাকতে উঠে পড়েছি। মস্কো ছাড়ছি আজ. তাজিকিস্তান যাব। দূরের পথ—কথা হয়েছিল, রাত আড়াইটেয় বেরুনো হবে হোটেল থেকে। সকাল সকাল তাই শুয়েছি। যদি কিছু ঘুমানো যায়। ঘুমিয়েও পড়েছি। রাত একটায় শুনি, দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে কে। বিষম রাগ হল। কার খেয়ে খেয়েছি, এই রাত্রে হানা দেয় কে? লুঙ্গি পরে খাঁটি স্বদেশি মতে শুয়ে পড়ি, এ-অবস্থায় বেরুই বা কেমন করে? দোর ওদিকে ভেঙে ফেলার গতিক। তাড়াতাড়ি ঐ লুঙ্গিরই উপরে ওভারকোট চাপিয়ে অ্যান্টি-চেম্বার পার হয়ে গর্জন করে উঠি: কে বট হে তুমি?

আরে মশায়, ঘুমোন, মনের সুখে বসে ঘুম দিন। প্লেন রাত্রে ছাড়বে না।

সাতটায় ব্রেকফাস্ট, পোশাক-টোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়ে খানাঘরে যাবেন। ওখান থেকেই রওনা।

আমাদেরই একজন। ভারতের মানুষ—দোর খুলতে তবে বাধা নেই। এই শোনাতে রাত দুপুরে ডেকে তুললেন মশায়? ঘুম আর হল না তার পরে, ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। স্নান বিনে বাঁচিনে আমি। তাসখন্দ হয়ে যাব—সেই হোটেলে নিয়ে তুলবে তো। স্নানের ভারি মুশকিল। কাজটা অতএব সেরে যাই এখান থেকে। পাঁচটা তখন, অন্ধকার আছে। গরম জল কলে আসে সাড়ে-ছটার আগে নয়। বয়ে গেল, ঠাণ্ডা জলই সই। তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি জামাটামা পরে নেওয়া গেল। সময় আছে তো চিঠি লিখে ফেলা যাক খান কয়েক। দূরের পাল্লায় পাড়ি—শুধু তাজিকিস্তান নয়, ঐ উপলক্ষে তামাম মধ্য-এশিয়ার আকাশে চক্কোর দিয়ে বেড়াব। ডাঙার মানুষ পাখনা মেলছি—ভবিতব্যের কথা বলা যায় না, হয়তো বা এই শেষ চিঠি লেখা।

ব্রেকফাস্ট সারা করে বসেই আছি। কখন রওনা হব গো? দুটো প্লেন ভাড়া করেছে আমাদের জন্য। আবহাওয়া খারাপ বলে দেরি হচ্ছে, ভাল রিপোর্ট পেলে তবে ছাড়বে। সেইসময় এরোড্রোম থেকে হোটেলে ফোন করবে। এই এক নিয়ম, দুর্ঘটনার তিলেক সম্ভাবনা থাকতে নড়বে না। তাই দু-চার বছরেও একটা প্লেন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় না। রেল দুর্ঘটনাও হয় না। রাস্তা দুর্ঘটনা দুটো-চারটে ঘটে—যার দোষে ঘটে, বিষম শাস্তি পেতে হয় সেই লোকটাকে। গাড়ি চালায় এরা অতি সতর্ক হয়ে।

অবশেষে খবর হল। চলেছি এরোড্রোমে। সে তো কম পথ নয়! পল উঠেছে আমাদের গাড়িতে। রাস্তার দু-পাশে সারবন্দি গাছ। একটা পাতা নেই, শুধু গুঁড়ি আর ডাল। কালো কটকট করছে। আগুনে পুড়ে গেছে যেন, দগ্ধ অঙ্গার খাড়া দাঁড়িয়ে গাছের মূর্তিতে। শীতকাল আসছে, কাল এক চোট বরফ পড়ে গেল। বরফ পড়ার আগেই গাছপালা সর্বরিক্ত হয়েছে। গ্রীষ্মকাল এলে পত্রশ্যামল হবে আবার।

গির্জা দেখতে পাচ্ছি ডান হাতে, রাস্তার অল্প একটু দূরে। সেকেলে বাড়ি কিন্তু ঝকমক করছে। কি গো, গির্জায় যায় এখনো মানুষ?

পল বলে, ফিরে এসে কোন এক রবিবার যেও গির্জায়। নিজের চোখে দেখো। আমাদের মুখের কথা মানবে কেন?

তাই গিয়েছিলাম। বেশি ভিড় না হলেও লোক নিতান্ত কম আসে না। সাড়ে পনের আনাই বুড়োবুড়ি। সব দেশেরই গতিক ঐ। হাল আমলের

ক'টা তরুণ-তরুণী আমাদের মন্দিরে পূজোয় গিয়ে বসে? গির্জার ঘন্টা বাজানো মানা। ধর্মচর্চা ব্যক্তিগত ব্যাপার—যার যেমন খুশি উপাসনা করবে। কিম্বা করবেই না মোটে। ঘন্টা বাজিয়ে লোক ডাকাডাকি করবে এবং সাধারণের শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটাবে—এটা হতে দেবে না।

খেলার মাঠ। স্কী করবার মাঠ—আর দিন কতক পরে বরফে ঢেকে যাবে, মজা জমবে তখন এখানে। আরও অনেক দূর গিয়ে নতুন য়্যুনিভার্সিটি-অঞ্চল ছাড়িয়ে শহরের বাইরে এসে পড়লাম। রাস্তা এই আকাশমুখো উঠছে, এই পাতালমুখো নামছে। লেনিন-পাহাড় বলে অঞ্চলটাকে—এমন চৌরস করে ফেলেছে যে পাহাড় বলে ধরা মুশকিল। ঘরবাড়ি, দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সব সেকেলে। কাঠের তৈরি। টালি দিয়ে ছাওয়া। কাঠের বাড়ি বানাত শীত ঠেকানোর জন্য—খুব বেশি ঠাণ্ডাতেও কাঠের ঘর খানিকটা গরম থাকে। এখন সব বাড়িতে তাপের বন্দোবস্ত—কাঠের বাড়ি চুরমার করে দৈত্যসম কংক্রিটের বাড়ি বানাচ্ছে। একটা কোলখোজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ফসলে ভরা মাঠের পর মাঠ, ঘাসে ঢাকা গোচারণভূমি, দূর প্রান্তে চাষীদের ঘর বাড়ি। অরণ্যভূমে এসে পড়লাম এবারে—রাস্তার দুধারে বার্চ-এলম-পাইন জাতীয় গাছ। দু-দিকে অনেক দূর অবধি উঁচু-নিচু পতিত জমি—খানিক জঙ্গল, খানিকটা বা ফাঁকা। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র এমনি অরণ্য ছিল, এখন এই নমুনা রয়ে গেছে।

এরোড্রোমে এসে সুখবর পেলাম। প্লেন যাচ্ছে তাসখন্দ হয়ে নয়—খানিকটা দক্ষিণে ঘুরে আমাদের নতুন নতুন জায়গা দেখানোর জন্য। অস্ট্রাখান গিয়ে নামব। সেখান থেকে কাস্পিয়ান-সাগরের কিনার ধরে চলতে চলতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাকু শহরে রাত্রিবাস আজকে। সকালবেলা চা-টা খেয়ে পাড়ি দেওয়া যাবে কাস্পিয়ান সাগর। তারপর আরলহ্রদের দক্ষিণের পথে সমরখন্দের উপর দিয়ে উৎসবের দেশে পৌঁছে যাব—দুশানবে, তাজিকিস্তানের রাজধানী।

ছুটো প্লেন, আমরা দ্বিতীয়ের যাত্রী। আকাশে উঠে যেতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে ভুবন অন্ধকার। সাত হাজার ফুট উঠে গিয়েছি—সাত হাজার ফুটের উঁচু আসনে আরামসে চেপে খাতা খুলে টুকে যাচ্ছি। খোপ থেকে হঠাৎ পাইলট বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বাক্স ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বকবক করছে, দোভাষি ব্যাখ্যা করে দিল, যাবতীয় পথঘাট আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। শেষকালে প্রশ্ন: কিছু জিজ্ঞাসা করবে তোমরা?

অস্ট্রাখান জানেন তো? জায়গাটা না জানুন, টুপি নিশ্চয় দেখেছেন—

অস্ট্রাখানের টুপি। এর পরে এই অধীনের মাথায় মাঝে মাঝে ঐ টুপি দেখতে পাবেন, উপহার পেয়েছিলাম। ভল্গা এসে কাস্পিয়ানে পড়ল, মোহনার উপর শহরটা। মাছ ধরার এমন জায়গা পোবিয়েতে তো নেই-ই—গোটা দুনিয়ার মধ্যেও বেশি পাবেন না। ফলেরও বড় বাজার—রকমারি ফল ফলে এই তল্লাটে। শহরের ভিতর দিয়ে অনেক খাল চলে গেছে। চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া, বন্যার জলে শহর যাতে ডুবিয়ে না দেয়।

বেলা ডুবে আসে। অস্ট্রাখানের এরোড্রোমে নেমে আজ বড় ভাল লাগল। তেপান্তরের মাঠ, মাঠের ওধারে সূর্য ডুবছে। চেহারাটা অবিকল আমার বাংলা দেশের মতো। মস্কোর মতন হাড়-কাঁপানো শীত নয়, ঝিরঝিরে হাওয়া। এরোড্রোমে নতুন-বানানো ঘরবাড়ি উঠেছে—আরও অনেক উঠছে। শহর বেশ খানিকটা দূর এখান থেকে। ভারতীয়দের পুরানো আড্ডা; সেকালে বণিকেরা দলে দলে এসে ব্যাপার-বাণিজ্য করত, তাঁতি-ছুতোর এসে কাজকর্ম করত। শহরে তাদের তৈরি ঘরবাড়ি আছে এখন। ১৮১২ অব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশরা যখন জীবন-মরণ লড়াই করছে, বিশ হাজার রুবল চাঁদা দিয়েছিল এই শহরের ভারতীয়েরা। পরবর্তী কালে এসে সে সম্পর্ক হারিয়ে গেল।

চা খেতে নিয়ে যাচ্ছে, তা-ও মাইল দেড়েক হাঁটা-পথ। দেশের মতন নিশিন্দার গাছ পথের দু-ধারে। প্রকাণ্ড কুকুর, নাদুসনুদুস বিড়াল কয়েকটা। এই কার্তিকে দেশেরই মতন অল্প অল্প শীত করছে। সন্ধ্যা হল তো চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল। দলছাড়া হয়ে ফাঁকা মাঠের এক দিকে একা একা আমি ঘুরে বেড়াই। আর্যদের আদিভূমি ইলাবৃতবর্ষ—ভলগা যেখানটায় কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

প্লেনে উঠতে গিয়ে বলছি, একটু মাটি তুলে নিই পকেটে ভরে। দেশে গিয়ে দেখাব, আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের মাটি।

এক বন্ধু টিপ্পনি কাটলেন, বাঙালি আপনারা সত্যি সত্যি আর্য যদি হন।

সুপ্রাচীন আর্যভূমির উদ্দেশ্যে নমস্কার করে আবার আকাশে উঠছি।

ঝিকিমিকি কত তারা-ফুল মাটির গায়ে। তেলের খনির আলো, শহরের আলো। তারই উপর দিয়ে প্রকাণ্ড এই জটায়ু পাখি ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করছে কোথায় তার বিশাল পাখা নিয়ে একটুখানি ঠাঁই পেতে পারে। কতক্ষণ ধরে কতবার ঘুরল, এদিক সেদিক কত চক্কোর দিল। তারপর নেমে পড়ল।

সন্ধ্যারাত্রে বাকুর সঙ্গে দেখা হল। উঁহু, হয়নি এখনো। শহর বিশ

মাইল এরোড্রোম থেকে। ওরা বলল বিশ মাইল, চলতে চলতে আমাদের তো মনে হল অনেক বেশি। প্লেন থামতে না থামতে জানলা দিয়ে দেখছি কী শোরগোল পড়ে গেছে! জোরালো আলো চতুর্দিকে, সিনেমাস্টুডিও-র যে ধরনের আলো দেখতে পান। দিনমান করে ফেলেছে। মোভি ও ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে তৈরি। কত দলে কত দিক দিয়ে যে ছবি তুলল, তার অবধি নেই। সে পর্ব চুকল তো। কত রকমে ভালবাসা দেখাবে, যেন ওরা ভেবে পাচ্ছে না। সম্প্রতি ভারতের সিনেমা-ছবি দেখানো হয়েছে, দেখে বিমুগ্ধ হয়েছে, সেই কথা বারবার উঠছে। তার পরে পরস্পরেরই সঙ্গে আলাপনের কী মর্মান্তিক মনোরম প্রয়াস! দোভাষি নেই তো কি হল, মুখের হাসি আছে—দুটো করে হাত আছে, কোলের মধ্যে টেনে নিতে বাধা কি! প্রাচ্য দেশে এসে পড়েছি—মাপ দেখতে হবে না. অভ্যর্থনার রকম দেখেই মালুম হয়। হৈ-হৈ করে লাফিয়ে পড়ে পালোয়ানেরা বুক তুলে ধরছে। হাড় তেমন মজবুত না হলে মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। এক গায়ক—নাম মিএাজী—চলেছে আমাদের গাড়িতে। মানুষটা আধপাগল, কিন্তু ভারি দরের শিল্পী। সবাই স্ফূর্তিবাজ, কিন্তু মিএাজী দেখতে পাচ্ছি সকলের সেরা। গাড়ির অতটুকু গহ্বরে অত স্ফূর্তি আটক রাখা দায়—আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। গান গেয়ে উঠছে—সেটা ভালই, সুর বুঝতে ভাষা লাগে না। সুরও খানিকটা আমাদের দেশ-ঘেঁষা—অথবা এ তল্লাটেরই সুর চলে এসেছে আমাদের দেশে। কথাও দু-চারটে চেনা চেনা লাগছে। আজারবাইজান দেশ—ভাষাটা আজারবাইজানি, তুর্কির সমগোত্র, ফারসির দিব্যি আমেজ পাওয়া যায়। মোটরের রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানান দেশের স্টেশন ধরছে; দিল্লী স্টেশন ধরে লাইন খানেক হিন্দি গান শুনিয়ে দিল একবার। দু-পাঁচটা ইংরেজি কথা জানা আছে—সেই সম্বলে বোঝাবার প্রয়াস পাচ্ছে, কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা।

তেলের শহর! যেদিকে তাকাই তেলের কুয়া। গাড়ি চলেছে কুয়ার কিনার ঘেঁসে—কখনো বা পাইপ-লাইনের উপর দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের রাত—কিন্তু বুঝবার জো নেই, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল চারিদিক। সভ্যতা ও রাষ্ট্র-শক্তির প্রাণকেন্দ্র আজ পেট্রোল, যার অপর নাম তরল-সোনা। ধরণীর গূঢ় গর্ভ থেকে সেই সোনা হাজার হাজার ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। বারো-ভূতে লুটে খেত, ইদানীং আর একটি ফোঁটারও অপচয় নেই। মাটির নিচে নল বসিয়ে দূর-দূরান্তরে তেল নিয়ে যাচ্ছে। মোটর একটুখানি থামল খনির এক কর্মিক-পাড়ার মধ্যে দিয়ে। আপনি আমি অমনধারা ঘরবাড়িতে থাকতে

পাই নে মশায়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল মিএাজী। কাস্পিয়ান-সাগরের কূলে কূলে যাব। সকালবেলা চলে যাচ্ছি, কম সময়ের মধ্যে যতখানি দেখে নেওয়া যায়। শহরের পূব দিকে কাস্পিয়ান সাগর। একেবারে জল ঘেঁসে রাস্তা। রাস্তার আলো জলে ছায়া ফেলেছে, তা-ও নজরে আসছে। নৌকো বেঁধে আছে সারি সারি, চলাচল করছেও দশ-বিশটা এদিক-ওদিক। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া দিচ্ছে, গাড়ির কাচ খুলে হাওয়ায় আমি নিশ্বাস নিচ্ছি। উঃ কত কি উপভোগ হল আমার এই জীবনে!

আরে, কাণ্ড! কে গেয়ে উঠল কোন দিক থেকে—'আওয়ারা হো!' কূলে বাঁধা ঐসব নৌকোর কোন একটি থেকে হয়তো। 'আওয়ারা' ছবি চলেছিল কিছুকাল ধরে, গান এখন মানুষের মুখে মুখে। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মধ্য-এশিয়ার বিশাল হ্রদপ্রান্তে রাত্রিবেলা পরিচিত লাইনগুলি হঠাৎ শুনতে পেলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কিনা বলুন।

বহু প্রাচীন এক দুর্গ আছে বাকুতে, আরবি পদ্ধতির কারুকর্ম। বছর পঞ্চাশ আগে একটা হিন্দু-মন্দিরের নিশানাও নাকি ছিল। আর আছে পুরানো রাজপ্রসাদ—বাকুখান সরাই। ভিতরে মসজিদ। ভাঙাচোরা দেয়ালের গায়ে সাগরের জল ছল-ছল করে। ভাঙা দেয়ালের আড়ালে মাছের নৌকো সামলে রাখবার বড্ড জুত হয়েছে।

যেখানে নিয়ে তুলল সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। একেবারে কাস্পিয়ান-সাগরের উপরে। চার বাঙালি আমাদের এক ঘরে দিয়েছে। মস্কোয় এখন বরফ পড়ছে, আর এ জায়গা দস্তুরমতো গরম। এই অক্টোবরে কলকাতায় যেমনটা। গরম পোশাক গায়ে সইছে না, কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। একটা রাত্রি কাটিয়ে যাব; সকালেই আবার রওনা—বাক্স-পেটরা সব প্লেনে পড়ে আছে। হাতে-মুখে জল দিয়ে একটু শীতল হব, তারও ফুরসত দেয় না। খাওয়ার তাড়া। তোমাদের জন্য হল-ভরা মানুষ হাত গুটিয়ে বসে আছে। খানাপিনা শেষ করে সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হাত-পা ধুয়ো; কেউ মানা করতে যাবে না।

বিরাট ব্যাঙ্কুয়েট-হল, অগণ্য অতিথি। ঘরের নক্সা ছবি আসবাবপত্রে সেকেলে খানদানি। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাত থেকে। পশ্চিমের জানলাগুলো খোলা—আকাশের তারা ও কাস্পিয়ান-সাগরের জলতরঙ্গ দেখা যায়। হু-হু করে জোলো হাওয়া ঢুকে আলো দুলিয়ে দিচ্ছে এক-একবার।

মুসলমানি আতিথ্যের কথা শোনা ছিল। সে যে কী বস্তু, হাড়ে হাড়ে

আজ টের পেলাম। আমার পাঠককুল তো নয়ই, অতিবড় শত্রুও যেন হেন আতিথ্যের পাল্লায় না পড়ে। ঘড়ি দেখে ঠিক আটটায় টেবিলে বসেছি। ভোজ শুরু হল। খিদমতগারেরা পদের পর পদ এনে দুড়দাড় করে পাতে ঢালছে—যার যা খুশি ঢেলে গেলেই হল। সাহেবি ভোজের দস্তুর—জিনিস এনে এনে সামনে ধরে, অতিথিরা উদরের চাহিদামতো তুলে নেয়। এদের অত ধৈর্য নেই। দেওয়া-থোওয়া করতে এসেছে তো ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে; আপনার খাওয়ার কাজ—তীরবেগে হাত চালিয়ে যান। এক হাতে না কুলোয় তো দু-হাতে। রেওয়াজ হল, যা পাতে পড়বে খেতেই হবে আপনাকে; নয়তো গৃহস্থের অপমান করা হল। কী বিদঘুটে রেওয়াজ ভেবে দেখুন। গোটা হিমালয়ই উপড়ে এনে যদি ভোজের পাতে রাখে, পলকে লোপাট করতে হবে। পারবেন?

বেশ খানিকক্ষণ ঝড় বইয়ে দিয়ে, হঠাৎ দেখা যায় খিদমতগার-বাহিনী অন্তর্হিত হয়েছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ইতি পড়ে গেল রে বাবা! খুদ সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—আজকের আসরে সভাপতি ইনি—বক্তৃতায় উঠলেন। ওঁদের নিজস্ব ভাষায় বলছেন, দোভাষি মানেও বুঝিয়ে দিচ্ছে—বিস্তর ভাল ভাল কথা, কিন্তু কান পেতে নিতে যাচ্ছে কে? সর্বত্র এসব হয়ে থাকে। মন্ত্রীর ডান পাশে আছেন সকলের সেরা গাইয়ে বুলবুল। বক্তৃতার পরে তাঁর পালা। একটু স্টেজ মতন করেছে হলের একদিকে; ধীরে ধীরে তার উপরে গিয়ে আসন নিলেন। চেহারায় বুলবুল-পাখি নন আদপে। বয়স হয়েছে, মাথা-ভরা টাক—রং অবশ্য ফর্সা, সেটা ওদেশের আপামর-সাধারণের। কী অপরূপ যে গাইলেন। কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো এক কোঁটা কচি মেয়ের গলায়। বারম্বার ফরমাশ আসে, আরো আরো—। গাইলেন তারপরে ওখান-কার অপেরার নাম-করা গায়িকা আখনাদোয়া ফেরেঞ্জি। আশ্চর্য কণ্ঠে আর একটি মেয়ে পর পর দুটো গান গাইলেন, মেয়েটির নাম সাধা খাদিযোভা। গাইলেন মিএয়াজী এবং আরও জন তিনেক—তাঁদের নাম টুকে আনিনি।

দুনিয়ার মানুষ যখন তেলের মহিমা জানত না, সুরার জন্য এই বাকুর নামডাক ছিল। সে খ্যাতি এখনো। আসবার পথে মস্ত বড় চোলাই কারখানা দেখে এলাম। সাকিরা ঐ তো একের পর এক গিয়ে বসছে স্টেজে—ঐ কাস্পিয়ান-সাগরের মতোই অতল কালো সুর্মা-আঁকা চোখ, পাকা আপেলের মতো টুকটুকে অধর, ডালিমের কোয়ার মতন ঝিকঝিকে দাঁতগুলি। নানান চেহারার তারযন্ত্র তাদের হাতে, কয়েকটার নাম শুনুন—তার (সারেঙ্গি), কেমেনকা (সরোদ) কাবাল (তম্বুরিন)। গাইছে গজল, গাইছে রুবেইয়াৎ।

ওমর খৈয়ামের বইয়ের ছবি থেকে মেয়ে কটি যেন উঠে এসে স্টেজে বসল।

বক্তৃতা হল, গান-বাজনা হয়ে গেল—খাওয়া যাক এবারে? ওরে বাবা, সুরের রেশ না মেলাতে সেই খিদমতগারের দল হুড়মুড় করে আবার এসে ঢোকে। ভূতপ্রেতের ইট-পাটকেল ছোঁড়ার গল্প শুনেছেন—দেখতে দেখতে সামনের পাত্রে নানা খাদ্য স্তূপাকার হয়ে উঠল তেমনি। সমস্ত নতুন নতুন পদ, আগের কোনটাই এর মধ্যে আসেনি। যেন এক ভোজ সেরেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভোজে বসে গেলাম। এ ভোজের শেষ ভাগেও বক্তৃতা ও গীতবাদ্য। এবং পুনশ্চ এক নতুন পর্ব। কী কাণ্ড, ভোজের পরে ভোজ—অনন্ত কাল চালাবে নাকি? এখানকার পথঘাট এবং মানুষগুলোর গতিক জানা থাকলে জায়গা ছেড়ে এক্ষুণি দৌড় দিতাম।

আমাদের মিএাজীরও একটু বক্তৃতা: তোমাদের গঙ্গায় স্নান করব, দিল্লি-বোম্বাই ঘুরব, বাল্যকাল থেকে আমার সাধ, আজকে এই রাত্রিবেলা তোমাদের সঙ্গে বসে সেই সাধ মিটে গেল। আধ-পাগলা মিএাজী কেমন কাব্য করে বলছে একবার শুনুন। আর বললেন আজারবাইজানের সবচেয়ে বড় লেখক সোলেমান রুস্তম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছেন তিনি তর্জমায়। মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, শতকণ্ঠে তারিফ করতে লাগলেন। ভারতের সকল লেখক অমনি ভাবে সর্বমানুষকে বড় হবার প্রেরণা জোগান, এই তাঁর প্রার্থনা।

আমার দফা শেষ ঐ বক্তৃতার ফলে। কুমতলব চাগাল একজনের মাথায়—চোখ ঠেরে বলে দিয়েছে, লেখক একটি এখানেও আছে; ঠাকুরেরই খাস-এলাকার মানুষ। আমি এত সব জানিনে, ঘাড় গুঁজে নিজ মনে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে আছি—শুধুমাত্র মুখ-বিবরে সম্ভব নয়, অন্য কোন কৌশল আছে কিনা খাদ্য পাচার করবার?—হেন কালে দু-দিক দিয়ে বিশাল দুই রোস্ট-মুরগি পাতে এসে পড়ল। আমার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই নারী—লেখক বুঝতে পেরে এবারে তাঁরা সমাদরে প্রবৃত্ত হলেন। রাম্বা-শ্যাম্বা লোক নন তাঁরা—একজন সুপ্রীম-সোবিয়েতের মেম্বর, অপরজন এখানকার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। তা সে যা-ই হোন, গদগদ হবার কিছু নেই। চেহারা সুন্দরই বলতে হবে, নাক-মুখ খাসা, কিন্তু রীতিমত তাগড়া জোয়ান। দু-জনেই। লম্বায় আমাদের সাধারণ মাপের দেড়া তো হবেনই, চওড়াতে পাকা দেড় হাত যে সবেন। আমি রোগা-পটকা নই, গতর দেখে হিংসাই তো করেন আপনারা—কিন্তু এই দুই বস্তুর মাঝখানে আমায় মাছি-পিঁপড়ের সামিল দেখাচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, টেবিলের ধারে খাবার এসে পড়লে পরিবেশনের লোককে এঁরা দিতে দিচ্ছেন না, কেড়ে নিয়ে দুজনে পাল্লা দিয়ে পাতের উপর চালেন। ইংরেজি জানেন

না—ঠাঁসেঠোসে খেতে বলেন, আর হাসেন মিটিমিটি। আমার কপালে ঘাম দিচ্ছে—ভোজের সুবিধা করতে পারছিনে বলে এতক্ষণ লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল, এবারে আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে। সমাদরের আবেশে দু-দিক দিয়ে এই দু-জন আরও কিঞ্চিৎ যদি চেপে আসেন, স্যাণ্ডউইচের ভিতরকার পুরের দশা হবে আমার।

রাত পৌনে-তিনটেয় বিরিয়ানি এলো। গন্ধ ভুরভুর করছে। তখন আমরা মরীয়া—কেটে কুচি-কুচি করে ফেল, এক কণিকা আর দাঁত কাটতে পারব না। হুল্লোড় করে অগত্যা স্বাস্থ্যপান চলল এদেশের ওদেশের। মন্ত্রীমশায় ইতি করতে উঠলেন: ভারি ভাল লাগছে। আড্ডা ভাঙবার ইচ্ছে ছিল না মোটে—কিন্তু প্লেনে সারাদিন তোমাদের ধকল গেছে, ভোরে আবার চলে যাচ্ছ, সকাল সকাল তাই শেষ করে দিলাম। যাও, বিশ্রাম করো গে।

আটটায় সময় বসেছি, আর ভোজ চুকিয়ে রাত তিনটেয় ঘরে ফিরলাম। ভোরে যাবার তাড়া, সেই জন্য সকাল সকাল ছেড়ে দিয়েছে, নইলে বোধহয় অষ্টপ্রহর অবিশ্রাম এই করাল ভোজ চালাত। শুতে গিয়ে এক ভাবনা, পশমি প্যান্ট পরে গরমে ঘুম হবে না তো। খেয়াল করে লুঙি কি পায়জামা একটা যদি প্লেন থেকে নিয়ে আসতাম। কি করি, কি করি? বিছানার চাদর তুলে লুঙির মতো পরে নিলাম—আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ের গতিক। ঠিক তখনই শুয়ে পড়তে মন যায় না। কাস্পিয়ান সাগর-কূলে তারা-ভরা আকাশের নিচে জীবনের পরম রাত্রি। একটিমাত্র রাত্রি এই। বাইরের বারাণ্ডায় বসে কতক্ষণ ধরে সাগর দেখছি। শুধুমাত্র তেল নয়, নানা খনিজে ভরা অঞ্চল। গন্ধক জলের ঝরনা আছে, শুনেছি। সুরাখান পাহাড় থেকে যখন তখন দাউ-দাউ করে অগ্নিস্তম্ভ ওঠে আকাশমুখো। মাটি ফুঁড়ে আগুন ওঠে আরও নানান জায়গায়; বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ছড়িয়ে যায়। আদিকাল থেকে এমনি হয়ে আসছে। ভয়-সম্ভ্রম আসে কি না বলুন দেখি আগুনের উপর, পূজো করতে মন যায় কি না? জরথুস্ত্র এই তল্লাটে জন্মেছিলেন, অগ্নিপূজার বিধান দিলেন যিনি। কেন দিলেন, আজকে মালুম হচ্ছে। আপনি বলছেন, মাটির নিচের গ্যাস বেরুবার সময় আগুন ধরে গিয়ে এই সব হয়। বুদ্ধি-বিচার করে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সেকালের কর্তাদের বলতে গেলে বুঝতেন ঠেলা—অবিশ্বাসী নাস্তিক বলে ঠেঙানি খেতে হত।…কাস্তের মতন চাঁদ উঠছে সাগরের প্রান্তে, জল ঝিলমিল করছে। আচ্ছা, কাস্পিয়ান সাগরের নাম নাকি কাশ্যপ মুনি থেকে? এদিকে চলাফেরা ছিল তাঁদের?

ট্রাম চলতে শুরু করেছে রাত থাকতেই। কুয়াশার রহস্য-গুণ্ঠন খুলে সাগর আস্তে আস্তে মুখ খুলছে। চারিদিক স্পষ্ট হল। এ কোন জায়গায় এসে আছি! যে দিকে তাকাই, তেলের কুয়া! জাহাজের মাস্তুলের মতো পাম্পের মাথা উঁচু হয়ে আছে।

দিনের আলোয় সরকারি পাড়াটা একবার চক্কোর দিয়ে এরোড্রোমে ছুটলাম। মিলিটারি গাড়ির খুব চলাচল, পলকে পলকে চোখে পড়ছে। অঞ্চলটা নিয়ে অতিসতর্ক এরা। ট্রাফিক-পুলিশ নেই, তবু দুর্ঘটনা হয় না, মানুষজন নিয়ম মেনে চলে। ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। মস্কোতেও দেখেছি এমনি এক-আধখানা। ক্রমশ আদি-শহরে এসে পড়লাম। উঁচু-নিচু পথ। দেয়াল-ঘেরা নিচু ঘরবাড়ি। মসজিদ এদিকে সেদিকে। কাবুলেও অবিকল এমনি-ধারা দেখে এসেছি। তারপরে আর্মেনিয়ান পাড়ায় এসে পড়লাম। শহর আর নয়, গ্রামই বলুন এবারে। তেলের খনি ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে পিছনে। পাইপে পাইপে জাল বুনে গেছে। মাটির নিচের পাইপ তবু তো দেখা যাচ্ছে না।

কত বড় তৈলক্ষেত্র, আকাশে উঠে আরও ভাল রকম মালুম হল। দিগব্যাপ্ত পোড়া জমি, জল জমে আছে এখানে ওখানে, খাল চলে গেছে, মাঝে মাঝে পিচ-দেওয়া বিসর্পিল কালো রাস্তা। তারপর কাস্পিয়ান-সাগরের উপর এলাম। প্লেন নিচু হয়ে উড়ছে। জলের মধ্য থেকে তেলের পাম্প মাথা খাড়া করে উঠেছে, নিস্তরঙ্গ নীল জল নিচে। ডাঙা থেকে সাতচল্লিশ মাইল অবধি গেছে এমনি—জলের তলে কুয়া খুঁড়ে তেল আদায় করছে। প্লেন উপরে উঠছে। এবার উঁচুতে—অনেক উঁচুতে। আর জল দেখা যায় না, মেঘদল নিচে। মেঘ নয়, আকাশ ভরে পেঁজা-তুলো ছড়ানো।

কাস্পিয়ান-সাগর পূর্ব-দক্ষিণে কোণাকুনি পাড়ি দিয়ে অনেক মরু ও স্তেপ-ভূমি পার হয়ে ঠিক দুপুরে হাঁপাতে হাঁপাতে অস্কাবাদে নেমে পড়লাম। তুর্কেমেনিস্তানের রাজধানী। বাইশ-শ বছর আগে পার্থিয়ানরা নিশা নগরী গড়েছিল—সেই নগরী ভেঙে-চুরে পড়ে আছে অনতিদূরে। ফাঁকা মাঠের এদিকে-সেদিকে শ্যামল সতেজ গাছপালা, মসজিদ আর বেঁটেখাটো ঘরবাড়ির মধ্যে একটা-দুটো দৈত্যাকার অট্টালিকা—এই হল জায়গাটা। বর্ষার মেঘের মতো ঘননীল কোপেতদাগ পাহাড় একটা দিক ঘিরে রয়েছে। পাহাড়টুকু পার হলে পারশ্য। একেবারে সীমান্তের উপরে শহর।

আধঘণ্টাটাক এখানে থেকে জলটল খেয়ে আবার উড়বার কথা। অথচ

বসেই আছি। লোকগুলো ফুসফুস গুজগুজ করছে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটছে এদিক ওদিক, ফোন করছে। বসেই আছি আমরা। অবশেষে ডাকল, রেস্তোঁরায় চলুন। খেয়ে নিন ভাল করে। তারপর শহরে যাবেন। আজকে আর প্লেন ছাড়বে না।

ব্যাপার কি হে? দোষ নাকি আমাদেরই—বাকু থেকে দেরি করে বেরু-লাম কেন? আরও খানিক পরে গাঢ় কুয়াশা নামবে, সূর্য ঢেকে যাবে পাহা-ড়ের আড়ালে। পাহাড় পেরুতে ভরসা করছে না এখন; সকালবেলা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পাহাড় ভারি মজার এখানে—নতুন পাহাড় জন্মাচ্ছেন, পুরো-নোরা বেড়ে চলেছেন এখনও। ঐ যে কোপেতদাগ, উনিও বড় হচ্ছেন বছর বছর; ফুলে উঠছেন। আগ্নেয়গিরি হয়ে ফুঁসে উঠবেন কবে। পাঁচ বছর আগে এই অক্টোবর মাসেই বিরাট ভূমিকম্প হয়েছিল এখানে। একটা বাড়ি আস্ত ছিল না, নতুন করে শহর গড়তে হচ্ছে। মেয়র সেই ভয়ানক দিনের গল্প করতে করতে এরোড্রোমের হাতার ভিতরে রেস্তোঁরায় নিয়ে চললেন।

হয়েছে ভাল। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, মধ্য-এশিয়ার দেশগুলো একটু দেখব। পাকেচক্রে প্রোগ্রামের বাড়তি দেশও অনেক দেখা হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার মধ্যে সকলের পিছনে পড়ে ছিল এই অঞ্চল। উনিশ-শ পঁচিশ সালের হিসাবে পাচ্ছি, সারা দেশের মধ্যে পঁচিশটা মেয়ে একটু-আধটু লিখতে পড়তে পারে। মেয়ে কেনাবেচা ছিল এই সেদিন অবধি। মোটা পণ দিয়ে বউ ঘরে আনলাম—সে বউয়ের মরণ-বাঁচনের ষোলআনা হকদার আমি পুরুষ-মানুষ। মরুছানে তুলো আর গমের অল্পসল্প চাষ। স্তেপভূমিতে ভেড়া-ছাগল চরানো। তাঁতের কাজের খুব নাম—গালিচা ও কার্পেট বোনে হাতের তাঁতে। এমনি করে অন্ন ও শীত-গ্রীষ্মের বস্ত্র হয়ে গেল—আবার কি? নুনের অভাব নেই, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নুনের পাহাড় এই রাজ্যে। গন্ধকও প্রচুর। এবং পারাসীসে। মরুদেশে কালো রঙের এক রকম বালু পাওয়া যায়। আর জোড়া-কুঁজওয়ালা উট দেখতে পাচ্ছেন ঐ পথে-ঘাটে—

ছোট্ট এরোড্রোম, সামান্য রেস্তোঁরা। হালকা রকমের চায়ের ব্যবস্থা ছিল আমাদের জন্যে, গতিক বুঝে আয়োজনটা ভারী করতে হল। তাই কিছু সময় নিয়েছে। হাতি-ঘোড়া কিছু নয়—রুটি-মাখন, আধ-শুকনো আঙুর আপেল—এবং খরমুজা। আমাদের দেশের খরমুজ আর কি, মরুঅঞ্চলে জন্মানোর দরুন চেহারাটা অধিক নিরেশ। বড় বড় ফালি কেটে বারকোশে করে এনেছে। ও বস্তু কে খেতে যাচ্ছে, পাতের কোল থেকে সবাই ফিরিয়ে দেয়। মেয়রমশাই অনুনয়-বিনয় করছেন: একটুখানি চেখেই দেখুন না। পুরো ফালি না খেবেন

তো কেটে নিন। সন্তর্পণে একটু জিভে ঠেকাতে, বলব কি মশায়, মাখনের মতো গলে আপনা-আপনি নেমে গেল বস্তুটা। যেমন সুবাস তেমনি স্বাদ। আরও দাও, আরও দাও—রব উঠল টেবিলের সর্বপ্রান্ত থেকে। মেয়রমশায় মুচকি মুচকি হাসেন। খরমুজা ফল ভুবনের বিস্তর জায়গায় ফলে, কিন্তু এখানকার মতো নয়। এখান থেকে এই ফল ভিস্তির মশক চাপা দিয়ে হিমালয়ের অন্ধি-সন্ধি ঘুরিয়ে লাহোরের মোগল-দরবারে পৌঁছে দেওয়া হত, নিদারুণ গ্রীষ্মে বাদশাহেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এর পর ও তল্লাটে যত ঘুরেছি—খানাটেবিলে বসে সকলের আগে খোঁজ করি: খরমুজা কই মশায়, সেইটে নিয়ে আসুন।

সেই যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোন করছিল, হোটেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। অবেলায় নতুন করে সেখানে রান্নাবান্না চাপিয়েছে। জলযোগ অন্তে শহরে চললাম। ধুলোমাটি-ভরা রাস্তা দিয়ে চলেছি—দূর কম নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে উটের পিঠে চড়ে যাচ্ছে অনেকে, গাধা চড়েও যাচ্ছে। ধু ধু করছে মাঠ—মরুভূমিও বলতে পারেন। শহরের কাছাকাছি এসে গাছপালা পাচ্ছি। পিচ-দেওয়া চওড়া রাস্তা। ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। বেশির ভাগ বাড়ির দেখছি মাটির দেয়াল, ছাতও মাটির। বাড়ির চারদিক ঘিরে পাঁচিল থাকবে অতিঅবশ্য। থাকতেই হবে। বাড়ি তৈরি হয় নি, সেখানেও জমির চতুর্দিকে আগেভাগে পাঁচিল দিয়ে রেখেছে। গোটা অঞ্চল জুড়ে মুসলমানধর্মীয়েরা থাকেন। বিশাল মসজিদ একটা, কারুকার্য-খচিত বৃহৎ গম্বুজ—কিন্তু নিচের অংশটা ভেঙেচুরে ইট গাদা হয়ে আছে। কসাড় জঙ্গল ভিতরে, লোহার শিকের ভারী দরজায় কুলুপ আঁটা—কেউ কোন দিন ঢোকে বলে তো মনে হয় না। মসজিদের পাশে জাতীয় মিউজিয়াম। খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে আসব এখানে, অনেক বস্তু দেখবার আছে।

মেয়রের কাছে গল্প শুনছি। ষষ্ঠ শতকের ইতিহাসে প্রথম এদেশের নাম পাচ্ছেন। আরবরা জয় করল; আদি সংস্কৃতি বিলকুল নষ্ট হয়ে গেল তাদের কবলে পড়ে। পার্থিয়ানদের শহর নিশা ধ্বংস করল মঙ্গোলিয়ানরা। কি অবস্থায় ছিলাম, আজকের চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। বিপ্লবের আগে শতকরা ৭ জন লিখতে পড়তে পারত। এখন কি পুরুষ কি মেয়ে একটি নিরক্ষর নেই। গোর্কি য়্যুনিভার্সিটি আর অগণ্য ইস্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে। ম্যালেরিয়া-প্লেগে গোটা মধ্য-এশিয়া উৎখাত হয়ে যাচ্ছিল, এ সব রোগ ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়েছে এখন। সিল্ক, কাপড় ও নানান রাসায়-

নিক দ্রব্য তৈরি হয় ; বড় বড় মিল-ফ্যাক্টরি হয়েছে। তুলার চাষ বেশি। মেষ-পালনও খুব হয়। হাজার হাজার অস্ট্রাখান-ভেড়া প্রতি যৌথখামারে। আর কার্পেটের তো আদি জায়গা—কার্পেটের কথা আলাদা করে বলতে হবে না। কারাকুম মরুর মাঝখান দিয়ে খাল কাটা হচ্ছে ; দিন-রাত যন্ত্রপাতি খাটছে। খাল কেটে আমুদরিয়ার জল নিয়ে আসবে।

ভূমিকম্পের কথা উঠল। এখনো গা কাঁপে সেই দৃশ্য মনে উঠলে। একটা বাড়ি ছিল না শহরে, কত লোক মরেছিল গোণা-গুণতি নেই। খবর যখন চারি দিকে চাউর হল—বলব কি মশায়, বাকু তিবলিসি তাসখন্দ সর্বত্র হৈ-হৈ পড়ে গেল। খাবার, অষুধ ও রকমারি জিনিসপত্র আসতে লাগল সকল অঞ্চল থেকে। সাহায্য বয়ে নিয়ে এরোপ্লেনে এত আসছে যে আকাশ দেখা যায় না। বুঝলাম, আমাদের তুর্কমেনিয়ার দুঃখ গোটা সোবিয়েত দেশ ভাগ করে নিয়েছে। সোবিয়েতের কেন্দ্র-সরকার একশ মিলিয়ন রুবল মঞ্জুর করলেন। নতুন বাড়ি বানোনোর সাজসরঞ্জাম ভারে ভারে এসে পড়েছে। কেন্দ্র-সরকার এখনও প্রতি বছর পঞ্চাশ মিলিয়ন রুবল দিচ্ছেন। কিন্তু লোকের অভাবে কাজকর্ম তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। এবারে এমন ঘরবাড়ি হচ্ছে, ভূমিকম্পে যা ভাঙতে পারবে না। এই নতুন পদ্ধতি সকলে জানে না। শিখিয়ে পড়িয়ে লোক তৈরি করে নিতে হচ্ছে।

কালকের বিপাকে আমরা সেয়ানা হয়ে গেছি, মালপত্র প্লেনে নেই, সমস্ত এসে গেছে হোটেলে। লাঞ্চ শেষ হতে ঘোর হয়ে এলো। বেরুনো যাক, এর মধ্যে যত কিছু দেখে নেওয়া যায়। লেনিনের পার্ক। লেনিনের অতিকায় মূর্তি পার্কের মাঝখানে। জায়গাটা গালিচার জন্য বিখ্যাত বলে মূর্তির পদতলে পাথরের উপর গালিচার নানান রকমের নক্সা। যত ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, সবাই এক ঠাঁই হয়েছে এখন। আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল, সম্বর্ধনা জানায় রুশ ভাষায়। আমরা ঘুরছি, তাদেরও এক দঙ্গল ঘুরছে পিছু পিছু। মিউজিয়াম যাবে এখান থেকে, গাড়িতে উঠেছি—গাড়ি ঘিরে তারা উল্লাস করছে, পথ ছেড়ে দিতে চায় না।

শহরটা দ্রুত এক পাক দিয়ে এসে পড়লাম মিউজিয়ামে। মেয়েরা লাল পোশাক বড় ভালবাসে ; লাল কাপড়ের টুকরো মাথায় বাঁধে গামছার মতন। এই হল জাতীয় সাজ। এখন রাত্রিবেলাও লাল পোষাকে গোটা কয়েক মেয়ে পিছন দিককার বাগানে গল্পগুজব করছে, হাসছে খিলখিল করে। মিউজিয়ামে হরেক রকম গালিচা দেখাল, জাঁক করে দেখবার বস্তু বটে। কার্ল মার্কস লেনিন ও স্থানীয় অনেকের ছবি তুলেছে গালিচায়। পুরো এক

একটা ঘটনা তুলে ফেলেছে—পটে-আঁকা ছবিতেও এমন নিখুঁত হয় না। নক্সা বোনে মেয়েরাই বেশির ভাগ।—কী ভাবে কোন পদ্ধতিতে বোনে, তা-হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের অরণ্যে বাঘ ইত্যাদি জন্তুজানোয়ার, বিস্তর মরা জীবজন্তু সাজিয়ে রেখেছে একদিকে।

অপেরায় ছুটলাম। পায়োনিয়র-বাচ্চারা পথে এগিয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। হাততালি দিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। ছুটে গিয়ে কোথা থেকে এক-গাদা ফুল নিয়ে এলো। ফুলের তোড়া হাতে হাতে গুঁজে দেয়। অপেরা-হলে রোমান্টিক নাটক—নিছক প্রেমের গল্প। সোবিয়েতে যত পালা দেখলাম, বেশির ভাগ এমনি। ছেলেটার নাম তাহের, মেয়ে জোহরা। জোহরার বাপ মন্ত্রী, তাহেরের বাপ রাজা। অত্যাচারী রাজা।—ক্রীতদা-সদের নির্মম ভাবে খাটায়। তাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াল—প্রিয়তমাকে পেতে বাধা ঘটল সেই কারণে। বিস্তর হুটোপুটির পর মিলন অবশেষে।

[ডায়েরি]

আজ আটাশে অক্টোবর, শুক্রবার। অক্সাবাদ শহরের হোটেলে আটাশ নম্বর ঘরে রাত্রি এগারোটায় এই অবধি লিখলাম। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। রোজ রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ইতি করছি আজ। জীবনে আর কখনো আসব এখানে? লেখা থাক, রাতের চেহারাটা দু-চোখ ভরে দেখে নিই। ঘরের সামনে একটু ব্যালকনি, আপেলগাছ ঝুঁকে পড়েছে। একটা ডাল ধরে দাঁড়ালাম সেখানে। এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি, কী রকম শহর রে বাবা! ছুটোছাটা দুটি একটি মানুষ চলাচল করছে। কালো ওভার-কোট গায়ে একটা মেয়ে ও এক পুরুষ হাত ধরাধরি করে চলেছে, গলে গলে পড়ছে দেখ দুটিতে। আমার টেবিলের উপর ফুলের তোড়া—অপেরা থেকে নিয়ে এসেছি। সুবাসে মন ভরে গেল…

॥ চৌদ্দ ॥

ভোরবেলা আবার পাখা মেলেছি। মরু আর পাহাড়—ঈশ্বর, দুনিয়ার এত জায়গা জুড়ে গেরুয়া বালি বিছিয়ে রেখেছ! উঠতে উঠতে তেরো হাজার ফুট উপরে তখন। তাকিয়ে আছি নিচের দিকে। হঠাৎ চোখ জুড়িয়ে যায়। দু-কূলপ্লাবিনী নদী—স্নিগ্ধশ্যাম গালচে বিছানো নদীর এপারে-ওপারে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ সিঁড়ি উঠে গেছে—লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে ফেলে শিখরে উঠে যাচ্ছেন হাতের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়ে। তুষার-গিরির বেড়া-ঘেরা ফসলের রাজ্যে পৌঁছে গেছি। মানুষের রাজ্যে।

ভূমির মানুষ প্রীতির বাহু বাড়িয়ে আকাশমুখো চেয়ে আছেন। কত মানুষ এসে জুটেছেন এরোড্রোমে! পুরুষেরা তো আছেনই—আর এই মুসলমানি দেশে সেদিন অবধি ঘোড়ার পুচ্ছলোমে-বোনা কড়া বোরখায় যাঁদের চন্দ্রমুখ ঢাকা থাকত বোরখা ছুঁড়ে দিয়ে তাঁরাও চলে এসেছেন কত জনে! মস্কোয় ফুলের কঞ্জুষপনা—নেতা ও নারীদের শুধু ফুল দিয়ে খাতির। এখানে জনে জনের হাতে ভারী ওজনের তোড়া দিয়ে ফুরাতে পারে না; এক গাদা বাড়তি থেকে যায়। সেগুলো তখন আমরা দখল করে নিয়ে ওদের উপহার দিই। পরের ধনে পোদ্দারি। ফুল দিয়েই শেষ নয়—সে উপহার হাতে ছুঁতে না ছুঁতে, দেখি, বুকের মধ্যে লুফে নিয়েছেন। একই সোবিয়েত দেশের মধ্যে ঘুরছি বটে—বুঝতে পারলাম, এ এক ভিন্ন এলাকা। নিখুঁত ভদ্রতাসঙ্গত শেকহ্যাণ্ডের ধার ধারেন না এই মশায়েরা, বীরবিক্রমে বুকে চেপে ধরেন। ম্যালেরিয়াজর্জর পিলে-সর্বস্ব কেউ নেই ভাগ্যিস আমাদের মধ্যে; ভালবাসার দারুণ চাপ তবে তো পটাশ করে পিলে ফাটবার কথা। যেদিকে তাকাই, শুনতে পাচ্ছি—'সালাম' 'সালাম'। ঐ 'সালাম' শুনে আরও মনে হয়, দেশভুঁইয়ে ফিরে এসেছি। তা স্বদেশ আর কত দূরই বা। ক'টা পাহাড় পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান; তার পরে পাকিস্তানের উপর দিয়ে সাঁ করে ভারত-এলাকায় ঢুকে পড়তে পারি।

তুরসুন-জাদে মির্জা—তাজিক দেশের সেরা কবি। তিনি সকলের আগে দাঁড়িয়েছেন। আশপাশে বিস্তর হোমরাচোমরা ব্যক্তি। কবিবরের সঙ্গে পিকিন শহরে সেবার আলাপ হয়েছিল। ছোটখাট একটু বক্তৃতা ছাড়লেন—অভ্যর্থনার প্রথম মুখে যেমন রেওয়াজ। তাজিক ভাষা আর ফারসির মধ্যে তফাত সামান্য; বুঝতে বেশি আটকায় না। বললেন, ফেরদৌসি-সাদি-হাফেজের ভূমিতে পা দিয়েছেন মশায়রা—আমরা জানি, পূর্বঅঞ্চলের বাংলা দেশ অবধি আমাদের দেশের এই সব কবির সমাদর। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ ও ইকবালের লেখা থেকে এ দেশে আমরাও তেমনি আনন্দ ও প্রেরণা ছেঁকে নিই···

আর এই এক ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটা ঘোরানো। মস্কো থেকে তিন ঘণ্টার ফারাক এই জায়গায়। সোবিয়েত দেশটা কত বড় বুঝে দেখুন তবে, কত অঞ্চল জুড়ে আমরা চক্কোর দিচ্ছি। কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে আলাতন হয়ে গেলাম। মস্কোয় বরফ পড়ছে, আর এখানে দুপুর বেলাটা রীতিমত আইঢাই করতে হয়। রাত্রে অবশ্য ঠাণ্ডা পড়ে—বেশ ঠাণ্ডা, মরুদেশের যা দস্তুর।

তাজিকিস্তান অনেক পরে—১৯২৯ অব্দে সোবিয়েত গণতন্ত্রে মাথা ঢুকাল।

আজ ১৯৫৪-র রজত-জয়ন্তী। জোরদার উৎসব—দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ গিয়েছে। নানান চেহারায় ও নানান পোশাকে মিলে শহরের পথে পথে বিস্তর্ণী খেলে যাচ্ছে। একাশি বৎসর বয়সের তরুণ ভীনকে জানেন আপনারা —মস্কোর বিল্ডিং-একজিবিশনে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—মজ্জবে তিনিও চলে এসেছেন। তুরসুন বক্তৃতায় সেই সমস্ত বলেন—ধ্বংস থেকে ঐশ্বর্যে এসেছি আমরা, মৃত্যু থেকে আনন্দে। ভুবনের তাবৎ বন্ধুদের ডেকে ডেকে জাঁক করে আজ দেখাব।

তাই বটে! আনন্দ সাগরতরঙ্গের মতো উচ্ছলিত চতুর্দিকে। এরোড্রোম থেকে শহরে যাচ্ছি। যে দিকে তাকাই—নিশান উড়ছে, ছবি সাজিয়ে দিয়েছে। দোকানপাট ঘরবাড়ি দেয়াল দেখবার জো নেই—পতাকায় পতাকায় ঢেকে গেছে। তাজিকিস্তান-গণতন্ত্রের আলাদা পতাকা। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র—ভিন্ন পতাকা সকলেরই। মার্চ করছে একেবারে বালখিল্য একদল পায়োনিয়র। এদের চেয়ে একটু বড় আর একদল মার্চ করছে পিছন দিকে। তারও পিছনে মার্চ করছে—তারা আর একটু বড়। এমনি চলল। কালকের মহোৎসবে মিছিল হবে, শহর ভরে তার তোড়জোড়।

খাসা শহর। ছবির মতো। তুষারধবল হিসার পর্বতমালা ঘিরে ধরেছে—পর্বতের পদতলে ওয়েসিসের মধ্যে একটি যেন সাজানো বাগান। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা লেনিন স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—পপলার-উইলো-থুজা-এলম নানান গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ রাজপথ। পথের দু-পাশে বড় বড় গাছ—আবার ঠিক মাঝখানেও গাছের তিন-চার সার। এদিকে ওদিকে পিচের রাস্তা। ফুলের বাগান এখানে ওখানে! বাড়িগুলো পাহারাদারের মতো বুক চিতিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে নয়—খানিকটা পিছনে সরে। মানুষের আরাম-আনন্দের নীড় এক একটি। রাস্তাঘাট ঘরদুয়োর খেয়ালখুশি মাফিক নয়, রীতিমতো হিসাবপত্র করে বুদ্ধি খাটিয়ে বানানো।

অথচ কী ছিল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও। নগণ্য এক আধা-শহর—দিউশাম্বে। নিচু-ছাত নিচু-দরজা মানুষ নামক পশুর ইতস্তত-ছড়ানো বাসগুহা। বাহনের মধ্যে গাধা ও খচ্চর—মালপত্র ও মানুষ পিঠে নিয়ে বেড়াচ্ছে ধুলোভরা রাস্তায়। রেলরাস্তা আড়াই-শ মাইলের এদিকে নয়। শহরের পাশেই কুষ্ঠরোগীর আস্তানা—কুষ্ঠীরা অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। গোঁড়া মোল্লাদের কড়া শাসনে সন্ত্রস্ত ইতর-ভদ্র সর্বজন। বনেদি বে মশায়-দের বাড়ি অহোরাত্রি জুয়ার হুল্লোড়। আর হামেশাই দেখতে পেতেন, সৈন্যরা একজন দু-জনের হাত-পা বেঁধে কোতল করতে নিয়ে যাচ্ছে।

বাজারটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, লোকে দেখে দুটো-চারটে পয়সা দেয়, সৈন্যদের উপরি রোজগার সেটা। এই ছিল সেদিনের চেহারা।

আমাদের মোটরগুলো সারবন্দি ঢুকে পড়ল যাদুলি কোন হোটেলে নয়, মস্ত বড় এক বাগিচার ভিতরে। কত রকমের ফুল ও ফল, গণে পারবেন না। মাঝখানে বাংলো প্যাটার্নের দুটো বাড়ি। অনেকগুলো ঘর—ছিমছাম সজানো গোছানো। নতুন করে রং দিয়েছে—হয়তো বা আমরা আসছি বলেই—রং এখনো কাঁচা। দলটা দু-ভাগ হয়ে সেই দু-বাড়ির ঘরে ঘরে আমরা ঠাঁই নিলাম।

একটি মেয়ের উপর আমাদের খবরদারির ভার। তার নিচে অন্যেরা সব। মেয়েটি ভালো, সুশ্রী প্রসন্ন মুখ। আলস্য নেই, মুখের কথা মুখে থাকতে ষোল জন আমাদের খেদমত করে বেড়াচ্ছে। নতুন জায়গায় পয়লা দিন নানান রকমের ফাই-ফরমাস—খেটে তবু তৃপ্তি হয় না মেয়েটার। এক খাটনি খেটে এসে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। কারো আর-কিছু হুকুম? পলকের মধ্যে সেটা সেরে ফেলে আবার এসে দাঁড়ায়। বলো আরো কিছু। খাটনির এই হ্যাংলাপনা দেখে কষ্টও হয় মনে মনে। কিন্তু মুশকিল হল, একদম ইংরেজি জানে না, এক কথা বললে অন্য রকম বোঝে। বাথরুম কোন দিকে গো? বিছানার চাদর পালটে দিল এসে তাড়াতাড়ি। জুতোর বুরুশ দিতে বলো কাউকে—দৌড়ে এক কাপ কফি বানিয়ে আনল। এমনি গতিক। তখন সেই আদিম পদ্ধতির শরণ নিতে হল—মুখের কথা নয়, চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে ঠারেঠোরে বলা।

চায়ে চলে আসুন তাড়াতাড়ি—। পৌঁছুতে দেরি হয়েছে, একটা রাত অস্কাবাদে আটক থাকতে হল। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন বসে গেছে, এক চোক চা মুখে দিয়ে ছুটতে হবে এখনই।

টেবিলে থরে থরে চায়ের আয়োজন—বড় ভয়ানক চা দেখতে পাচ্ছি। মৎস্য-মাংসের রকমারি তরকারিও চায়ের অন্তর্গত। তাহলে এর পর লাঞ্চে কি ব্যাপার হবে—হিসার পর্বতমালার এক একখানা চূড়া তুলে এনে টেবিলে স্থাপনা করবে না কি? যাই হোক সে পরের ভাবনা। টেবিলেই আমাদের হাতে হাতে চিঠি দিল—সুপ্রীম সোবিয়েতের কর্তারা দাওয়াত পাঠিয়েছেন। নোটবুক দিল, ফাইল দিল—অধিবেশনের কাজকর্ম টুকে আনতে চান যদি।

তাজিক অপেরা ও ব্যালে হল। বাড়িটা আনকোরা নতুন। মস্ত বড় উঠান—মাঝখানে অনেকগুলো ফোয়ারায় উঁচু হয়ে জল পড়ছে; ফুলগাছ ও

লতাগুল্মে সাজানো অবিকল মস্কো স্কোয়ারের মতন। নামও দিয়েছে মস্কো স্কোয়ার। অধিবেশন বসে গেছে ব্যালে হলের মধ্যে। সাজিয়েছে খুব। অগুন্তি গাড়ি একদিকে, আর এক দিকে মানুষ। পুলিশ ও মিলিটারি ঘোরা-ফেরা করছে। সসম্ভ্রমে তারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে উঠে নিচু হয়ে—আবার কিছু উঁচুতে উঠে ঢুকলাম। ভিতরে আরও আহা মরি সজ্জা। উঁচু প্লাটফরম পতাকা দিয়ে সাজানো। লম্বা-আঁশ মিশরীয় তুলার বিস্তর ফলন এখানে—সেই তুলা এঁকে দিয়েছে, ধান ফলে বলে ধানের শীষ এঁকেছে, ফল-পাকড়ের দেশ, সেজন্য তারও ছবি। আর ফুলের পাহাড়—প্লাটফরম কাঠের না লোহার না পাথরের বোঝবার জো নেই, শুধুই ফুল। সামনের সারিতে চারজন সভাপতি—রমণী হলেন তার একটি। পিছনে অপর নেতৃবৃন্দ। বক্তৃতার জায়গা আরও আগে—বক্তারা এক এক করে মাইকের কাছে এগিয়ে এসে বক্তৃতা পড়ছেন। চায়ের গেলাস ঘন ঘন বদলে দিয়ে যাচ্ছে বক্তার পাশে। বক্তা চুমুক মেরে গলা ঠিক করে নিচ্ছেন, আর পড়ছেন।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতে বিষম হাততালি। কাজকর্ম বন্ধ, হাততালি আর থামে না। মোভি ও অসংখ্য ক্যামেরা নানান দিকে। জোরালো বাতি জ্বলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে—সেই আলোয় কত বার কত রকমে যে ছবি নিচ্ছে তার অবধি নেই। এক ক্যামেরাম্যানের ডান-হাত কাটা—বাঁহাতে অবলীলাক্রমে টকাটক ছবি তুলে যাচ্ছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কারো কারো সেকেলে সাজসজ্জা, মাথায় ফুল-কাটা চৌকো টুপি। মেয়েরা আছেন, তবে মস্কোর মতন সংখ্যাধিক্য নয়। আগে একেবারেই তো হারেমবর্তিনী ছিলেন, প্রতাপ কিছু কম তাই পুরুষের চেয়ে। কিন্তু হাওয়া যে রকম, এ সুখ পুরুষের বেশি দিন আর থাকছে না। বক্তৃতার পর বক্তৃতা—তাজিকি ভাষায় বলছে, দু-চার কথা যে না বুঝছি এমন নয়। নানা কৃতিত্বের কাহিনী। অপর গণতন্ত্রের মুরুব্বিরা উপহারের পর উপহার এনে ঢালছেন, আর ইনিয়ে বিনিয়ে বাহবা দিচ্ছেন তাজিকিদের।

আজও এক ঘুমের রাত থাকতে উঠেছি। তার উপরে বক্তৃতার ধকলে মাথা ধরেছে, বলতে পারছি না। হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের তো স্পষ্টাস্পষ্টি জ্বর নাড়িতে, তিনি আসতে পারেন নি, ঘরে শুয়ে আছেন। ফাঁক বুঝে ক'জন আমরা সরে পড়লাম।

ঐ নির্দয় চা-সেবনের পরে লাঞ্চের আর তাগত নেই। ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়েছি। রেডিও-য় রীলে করছে—শুয়ে শুয়ে অধিবেশনের বক্তৃতা ও

হাততালি শুনছি। চোখ বুঝেছি, দেখি, মেয়েটি এক সময় রেডিও-র জোর খুব কমিয়ে দিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছি, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছি। সকলে ফিরে আসতে ঘুম ভাঙল। কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তবে বুঝুন।

হীরেন মুখুজ্জে মশায়কে ডাক্তার দেখে গেছে। নিউমোনিয়ার অবস্থা। পেনিসিলিন দিয়ে নার্স মোতায়েন করে গেছে। জোরজার করে আমাদের সান্ধ্য-ভোজে নিয়ে বসাল, হাত এড়ানো গেল না। রীতরক্ষার মতো হবে বাপু। আয়োজন তোমাদেরই বটে, কিন্তু পাকযন্ত্র নিজের। বিদেশ-বিভুঁয়ে যন্ত্রটা বিকল হতে দিচ্ছিনে। রাগ করলে নাচার।

খাওয়ার পরে আবার সেই অপেরা-হলে। কনসার্টের আসর। সারাদিন তা-বড় তা-বড় মানুষ ভারী ভারী আলোচনা করলেন, রাত্রির ফুরফুরে হাওয়ায় এখন সেখানে নাচ আর গান। একালের নাচগান তো আছেই—কিন্তু আজকের বিশেষ আয়োজন, বিদেশি অতিথিদের পুরানো কিছু দেখানো। পাহাড়ের উপত্যকায় আর মরুভূমির ওয়েসিসে নরনারী চিরকাল ধরে যে সব গান গায়, যে সমস্ত নাচ নাচে। এক বয়সে আমারও বাতিক ছিল—গাঁয়ে গাঁয়ে আসল বাংলাদেশকে খুঁজে ফিরেছি। কত পট-কাঁথা, কাঠের কাজ, ইটের কাজ, মাটির কাজ—কত কত লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর। অমৃতে একদিন চুমুক দিয়েছিলাম, অন্তরাত্মাকে হাজার পেষণেও মেরে ফেলতে পারিনি তাই। যাকগে যাকগে—নিজের কথা দশ কাহন করে বলছি, বেজার হচ্ছেন আপনারা।

পুরানো রীতির সাজ-পোশাক, সঙ্গতের মধ্যে শিঙা বাজাচ্ছে ঘন ঘন। একটা মেয়ে রুবাইয়াৎ গাইল—আহা মরি, কী মিষ্টি গলা! নানা চেহারার তারের বাজনা বাজাচ্ছে—পরশু রাতে বাকুর আসরে যেমন হয়েছিল। গানের পর করতালি আর থামে না। মধ্য-এশিয়ার নানান দেশে এই ক'দিন অনেক আসরে তো বসলাম। নাচগানের ব্যাপারে আধুনিকতার চেয়ে পুরানো ধারাই মানুষকে বেশি মাতোয়ারা করে; শ্রোতায় আর শিল্পীতে ফারাক থাকে না।

অনেক রাত্রি অবধি কনসার্ট চলল। পাঁচ-শ পুরুষ ও মেয়ে নামল কয়েকটা গানে নাচে—পাকা-দাড়ি বুড়ো মানুষ থেকে চঞ্চলা তরুণী কিশোরী। কেউ এরা পেশাদার নয়, জয়ন্তী-উৎসব ব্যাপারে নানান অঞ্চল থেকে এসেছে। আর একদল ঝিকমিকে মেয়ে, লিখতে লিখতে, এই আমার চোখের সামনে ঘুরছে যেন। মাথায় লাল টুপি, ছুটো করে লম্বা বিনুনি, সবুজ কাঁচুলি, সবুজ পায়জামা, সাদা সেমিজ—এই সাজে নাচগান করল একটি পালা—'আপেলগাছে ফুল ধরেছে'। পালার শেষে বুকের উপর বাঁ-হাত রেখে

তনুলতা বাঁকিয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করে, নাচতে নাচতে তারপর আড়াল হয়ে যায়। ভারি মিষ্টি ভঙ্গিটা।

বিরাম-সময়ে বিরাট জলযোগ—আঙুর, বেদানা, আপেল গাদা গাদা দিচ্ছে। [কনসার্ট অন্তে ঘরে বসে নিশিরাত্রে সারাদিনের ব্যাপার টুকে রাখছি। আমার টেবিলেই বা কত ফল! কলম ছুঁড়ে ফেলে এই হাত দিয়ে মধুরতর ক্রিয়া-সম্পাদনের লোভ হচ্ছে এক একবার।] শিল্পীরা স্টেজ থেকে নেমে এসে শেকহ্যাণ্ড করছে ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে। একজন শ্যামবর্ণের মানুষ—রঙে চেহারায় অবিকল ভারতীয়—প্রধান মন্ত্রী এখানকার। ময়লা রঙের মেয়েও অনেক দেখছি। ঘন কালো চুল—ভারতীয় বলে ভুল হয়ে যায়।

মফস্বলের মানুষ বিস্তর এসে জমেছে শহরে। বাস ভরতি হয়ে আসছে, পথের মধ্যে অনেকবার দেখেছি। কনসার্ট-হলেও অনেকে তারা। তাজিকদের পুরানো সাজে এসেছে কেউ কেউ—অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতো। পাহাড়ের ঠিক ওপারে আফগানিস্তান। বিনা পাশপোর্টে এখনো কিছু যাতায়াত চলে। দু-জাতের মধ্যে বড্ড মিল সেইজন্য।

২৪ অক্টোবর, রবিবার। মজা বেশ জমেছে। যোলজন আমরা এই বাড়িতে—একটা মাত্র পায়খানা। গোসলখানাও একটা। স্নান প্রক্রিয়াটা এরা বিলাসের সামিল মনে করে, মরুঅঞ্চলে জলের অপব্যয় বরদাস্ত করে না—একটা গোসলখানার অতএব মানে বোঝা যায়। কিন্তু প্রাতঃকালীন ভার-মুক্তিটাও বাহুল্য ব্যাপার এদের কাছে? মাসল উৎসব আজকে। রকমারি মিছিল বেরুবে—বিস্তর দিন ধরে যার তোড়জোড় চলছে। সকাল সকাল গিয়ে অতএব জায়গা নেওয়ার দরকার, নয়তো মুশকিল হতে পারে—কাল থেকে এই সব শোনাচ্ছে। বাথরুমের সামনে লাইন দিয়েছে তাই শেষরাত্রি থেকে। ধীরেন সেন মশায়ের অসীম অধ্যবসায়—রাত তিনটেয় উঠে পড়েছেন; উঠে স্নানাদির কাজ সেরে আবার লেপমুড়ি দিলেন। আমাদেরও বুদ্ধি দিচ্ছেন: উঠে পড়ুন—অন্য কেউ টের না পেতে সেরে আসুন নিরিবিলি।

চোখ মেলে তাকাচ্ছি—ঘুম ছাড়ে না চোখের পাতা থেকে। বাড়িসুদ্ধ নিশুতি হয়ে যাবার পরেও অনেক রাত্রি লেখাপড়া করেছি। শুয়ে শুয়ে বলছি, কাল থেকে এক কাজ করুন না ডক্টর সেন—শোবার সময়টা যাবতীয় প্রাতঃক্রিয়া সেরেসুরে একবারে লেপমুড়ি দেবেন, মাঝরাতে আর উঠাউঠি করতে হবে না।

আরও খানিক এপাশ-ওপাশ করে গতিক বুঝে উঠে পড়লাম। অনেক রাত

তখনো। অন্য ঘরেও সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যে—একে দুয়ে বেরুচ্ছেন। এক-ছুটে রাও গিয়ে গোসলখানার দরজা এঁটে দিলেন আমার আগে। তারপরে আর সাড়াশব্দ নেই—ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভদ্রলোক? তেল-টেল মেখে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—পশমের পোশাক গায়ে রাখা চলে না এই অবস্থায়, হি-হি করে কাঁপছি। দরজায় টোকা দিলাম তো 'ইয়েস' বলে ভিতরে তেমনি চুপচাপ। কি করি, চেয়ার টেনে এনে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। ভাগ্যবশে ঠিক পরের জায়গাটা পেয়েছি, ছেড়ে যাওয়া চলে না। কিউ দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে দাঁড়াল। এ-ও ধীরেন সেন মশায়ের কীর্তি, পরে শোনা গেল; রাতে ওঁঠার বুদ্ধিটা ডাইনে-বাঁয়ে তিনি অবাধ বিতরণ করেছেন। ফলে সবাই সকলকে মারবার তালে ব্যস্ত। রাতে শুয়েও সোয়াস্তি নেই, হায় ভগবান!

পরের দিন আরও সঙ্গিন অবস্থা। তিন প্রহর রাতে উঠেও দেখি, আমার আগে আট জন। যা হবার হোক, রেগে-মেগে আবার বিছানায় পড়লাম। ঘুম ভাঙল, তখন দিব্যি সকাল। বাথরুমে এসে দেখি, একেবারে ফাঁকা। আরাম করে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করা গেল। তাড়ায় পড়ে রাতের মধ্যে অন্য সবাই সারা করে গিয়েছেন।

যাকগে, আজকের কথায় আসি আবার। কোন রকমে হাঙ্গামা চুকিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল। লাইনবন্দি ছ-খানা গাড়ি আমাদের নিয়ে চলছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আমাদের গাড়ি দেখলে শশব্যস্তে সকলে পথ ছেড়ে দেয়। রাস্তার লাল আলো লহমার মধ্যে সবুজ হয়ে যায় আমরা দাঁড়াতে না দাঁড়াতে। পিছন থেকে একটু আওয়াজ দিলে আগের গাড়ি ত্রস্ত ভাবে পাশে চলে যায়। ব্যাপার কি গো? প্রশ্ন করে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। বলে, শহরের মানুষ তোমাদের জেনে ফেলেছে; বিদেশি বলে খাতির।

সারা তাজিকিস্তান আজকে বুঝি পথে বেরিয়ে পড়েছে। বাচ্চারাও বাদ নেই। চলেছে ফুল নিয়ে আর নিশান উড়িয়ে। সে নিশান আয়তনে ছোট—লাল কাপড়ের উপর সোনালি বুনানি। দলছাড়া হয়ে পড়েছে কেউ কেউ, ছুটোছুটি করে দলে ভিড়ে যায় আবার। যত এগোচ্ছি, মিছিলের দল সামনে পড়ে মোটরের পথ আটকাচ্ছে। প্রতি দলের সঙ্গে নানা রকমের লেখা—তুলোর দেশ বলে মোটা তুলোর হরপে লেখা বেশির ভাগ।

এক বিশাল মাঠের ধারে এসে নামলাম। এর নাম রেড-স্কোয়ার—মস্কোর দেখাদেখি। এইখানে জাতীয় উৎসব। সামনের খানিকটা জায়গা পাকা

কনক্রিট, বাকি সব মাটি। বিস্তর দল জমায়েত হয়েছে, আরও সব জমছে। মাঠের সুদূর প্রান্তে মানুষ আর মোটর-ট্রাকে ভরে গেল।

দেরি হলে জায়গা মিলবে না—নিতান্তই ভয়-দেখানো কথা, তাড়াতাড়ি যাতে সকলে বেরিয়ে পড়ি। পয়লা সারিটা পুরোপুরি খালি রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। শ্রীযুত দাগে হায়দরাবাদের মানুষ, পার্লামেন্টের মেম্বার। মাথায় বিরাট পাগড়ি বাঁধা শুরু করছেন ক'দিন থেকে। সাধারণ লোকের একটা ঝাপসা মতন ধারণা, ভারত হল সন্ন্যাসী-ফকির ও রাজা-মহারাজার দেশ। পাগড়ির দরুণ অতএব সমস্ত ক্যামেরার নজর তাঁর দিকে। আমরাও ডাকছি তাঁকে 'মহারাজ' বলে।

সারা মাঠে নানান দলে সৈন্য সাজানো। কম্যাণ্ডার চিৎকার করে উঠলেন। মাঠ জুড়ে সৈন্যদের মুখে মুখে তার প্রতিধ্বনি—ঠিক আছি, তৈরি আছি আমরা সকলে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা, নেতারা সেই সময় মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। মঞ্চটা সদ্য বানিয়েছে। দু-জন ঘোড়সওয়ার হুকুম নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দূর প্রান্তে চলল। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। বিপুল উল্লাস সৈন্যদের মধ্যে।

জাতীয় সঙ্গীত। মাঠের যে যেখানে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে।

মার্চ শুরু। তার আগে বিদেশি প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে চীফ-কম্যাণ্ডার পঁচিশ বছরের কাহিনী শোনাচ্ছে। কেমন ছিল, আর কি পেয়েছে এখন। বন্দুকধারী এক দল বন্দুক উচিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল; পিছনে ড্রামের দল। পাইলট ও প্যারাট্রুপ। বন্দুকধারী আবার এক দল। ট্যাঙ্ক। ঘোড়সওয়ার। মোটর-বাহিনী। বিমানধ্বংসী কামান। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান। দলের পর দল চলেছে, আওয়াজে আকাশ বিদীর্ণ হবার জোগাড়।

বেলুন উড়িয়ে দিল; জয়ন্তী-উৎসবের কথা লেখা বেলুনে। আকাশ-ভরা উড়ন্ত বেলুনই শুধু। ব্যাণ্ডের দল সাদা পোশাকে মিছিল করে বেরিয়ে গেল।

প্রধান মন্ত্রী ছোট্ট একটু বক্তৃতায় সৈন্যদের অভিনন্দন জানালেন।

আবার মিছিল। ট্রাইসাইকেলে করে বাচ্চারা যাচ্ছে—সাদা পোশাক মাথায় তাজিকা টুপি; সাদা নিশান বাঁধা সাইকেলের মাথায়।

ট্রাক পর পর ষোলখানা। ষোলটা গণতন্ত্র নিয়ে সোবিয়েত দেশ, প্রত্যেকে আলাদা ট্রাক নিয়ে আসছে—আলাদা পোশাকের মানুষ, আলাদা নিশান। শিশুরা টপাটপ নেমে পড়ছে ট্রাক থেকে, ফুল ও নিশান নিয়ে একছুটে মঞ্চের উপর উঠে নেতাদের হাতে দিয়ে আসে।

এর পিছনে আরও ট্রাক আসছে। একটার উপর মেয়েরা কসরতের

ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাস্থ্যে ফুটিফাটা হয়ে পড়বে, এমনি মালুম হয়। ঘোড়ায় চড়ে একদল মেয়ে নিশান দোলাতে দোলাতে গেল। এলো তারপর পুরুষ খেলোয়াড়রা। তলোয়ার খেলতে খেলতে একদল চলে গেল।

মস্ত বড় জলের ট্যাঙ্ক বয়ে নিয়ে চলছে ট্রাকে। সাঁতারুরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তার ভিতরে, জল ছিটকে আসছে। ডালপালায় ঢাকা মেটে রঙের গাড়ি চলল এক সারি—লড়াইয়ের সময় যে কায়দায় গাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র ঢেকেচুকে নিয়ে বেড়ায়।

খেলোয়াড় মেয়েরা—লাল ও গোলাপি ইউনিফর্ম—কাগজের ফুল দোলাতে দোলাতে চলে গেল। কালো ও সবুজ ইউনিফর্মের এক দল। নেভিব্লু ও কালো ইউনিফর্মের আর এক দল। এর পরের দল আগাগোড়া সাদা ইউনিফর্মের।

মল্লযুদ্ধের মহড়া দিতে দিতে ছেলেরা যাচ্ছে। ভার-উত্তোলন দেখাচ্ছে। নানান কৃষিবস্তু হাতে নিয়ে যৌথখামারের ছেলেমেয়েরা চলেছে—রঙিন পোশাকের ভারি বাহার, হেন রঙ নেই যা অঙ্গে ধারণ করেনি। সাইকেলের দল চলেছে। কালো রঙের পোশাকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী, কারিগরি ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী—প্রতি দলের সঙ্গে আলাদা ব্যাণ্ডপার্টি। অনাথ ছেলেমেয়েদের মিছিল—হাতে নিয়েছে নেতাদের ছবি আর নিশান। মিডল ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা : ছেলেদের মাথা কামানো। ফুটফুটে পায়োনিয়ার-দল ফুল নিয়েছে—সত্যিকার ফুল।

জাহাজ-এরোপ্লেন তৈরি হচ্ছে—তারই সব নমুনা ট্রাকের উপর। ছেলে-মেয়ে মিলিতভাবে কাস্তে-হাতুড়ি ধরে আছে। তুলা, গম ও ধানের শীষ তাদের অন্য হাতে।

মাঠের দূর-প্রান্তে লোকারণ্য। মিছিল ধরে এগিয়ে এসে দলের পর দল আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এত যাচ্ছে, তবু কমে না পিছনের জমায়েত। বরঞ্চ বেলার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপেফুলে উঠছে। চড়া রোদ, টেঁকা যায় না, অস্থির হয়ে উঠেছি।

প্রাচীন তাজিকি সাজসজ্জায় একদল নাচতে নাচতে বাজাতে বাজাতে চলে গেল। অসম্ভব রকমের বড় কার্পাসফল বানিয়েছে—পুষ্পসজ্জিতা তরুণী মেয়ে সেই ফলের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। আরও একটা ফল—তার ভিতরে নিশান দোলাচ্ছে এক জোড়া বাচ্চা মেয়ে। লোকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সব অতিকায় কার্পাসফল। খুব হাততালি পড়ছে। শিশুর দল শান্তির পায়রা নিয়ে—সকল দেশের মধ্যে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি আসুক,

গলা ফাটিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে ; কাগজের শ্বেত পায়রা উঁচু করে তুলে ধরেছে। হঠাৎ জীবন্ত পায়রার ঝাঁক উড়িয়ে দিল, উড়তে উড়তে আকাশ-প্রান্তে মেলাল।

গ্রামাঞ্চল থেকে বিস্তর এসেছে, তারা মিছিলে নামল এইবার। চেহারায় সাজসজ্জায় গ্রাম্যতা বোঝা যায়। কোলের বাচ্চা নিয়ে মায়েরা অবধি এসেছেন। গমের শীষ, কাঁচা-ধানের গুচ্ছ, ডাল-পাতা সমেত তুলো শিশুরা নিয়ে চলেছে। আর বিস্তর ফুল—আমাদের অপরাজিতা ফুলের মতন অমনি নীল দেখতে।

ভিনদেশি দলও এসেছে, দেখছি। চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি রকমারি পতাকা নিয়ে নিজ-নিজ ভাষায় শ্লোগান দিচ্ছে—দুনিয়ার সব মানুষ আমরা এক। জর্জিয়ার নাচ—সানাই তম্বুরিন আর শিঙায় মিলে সঙ্গত করছে। থিয়েটারের নানান সজ্জায় সেজে চলেছে অভিনেতৃদল। সার্কাসের দল খেলা দেখাতে দেখাতে আসছে। সিংহ অবধি নিয়ে এসেছে ট্রাকের উপরে—সিংহের খাঁচায় ঢুকে হরেক খেলা খেলছে।

যৌথখামারের দল এর পরে। ফসলে বোঝাই ট্রাকের সারি গোণাগুনতি নেই। এক লেনিন-কোলখোজই দেড়-শ গাড়ি এনে ফেলেছে। কারা কি রকম ফসল ফলাচ্ছে তারই কিছু নমুনা। গাড়িতে গাড়িতে প্রতিজ্ঞাপত্র ঝোলানো—উৎপাদনের আরও কত বাড়াবে, নেতা ও দেশের মানুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চের নেতারা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তারাও পালটা হাত নাড়ছে।

যৌথখামারেরা গেল তো ফ্যাক্টরি। দুটো করে ট্রাক পাশাপাশি জুড়ে ফ্যাক্টরির মালপত্র দেখাচ্ছে। সিমেন্ট, মোটরের কলকব্জা, সিল্ক, সূতি-কাপড় আরও কত কি! তাদের পিছনে ফুলের গয়নায় সর্বাঙ্গ মুড়ে গাঁয়ের মেয়েরা রকমারি গ্রাম-নৃত্য দেখাচ্ছে।...

দুপুর গড়িয়ে গেছে। জনসমুদ্র উল্লাসে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে যেন। যা গতিক, সমস্ত দিন ধরে চালাবে। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে মাথার উপরে।

দোভাষি যেন ঐশীপ্রেরিত হয়ে এসে বলল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—উঠবে নাকি এবার?

মিছিল সারা হতে প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর খানাপিনা। নানান অঞ্চলের আমরা সব গিয়ে জুটেছি, আর এখনকার তা-বড় তা-বড় মাতব্বরেরা। তাড়িয়েতুড়িয়ে বিরাট এক হলের ভিতর নিয়ে সবাইকে পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে দিল। হলটা সবে আগের বছর গেঁথে শেষ করেছে, এদিকে-ওদিকে আরও

এখনো দালানকোঠা উঠছে, নাম দিয়েছে সংস্কৃতি-ভবন। ভোজের আসরে বেশ মতলব খাটিয়ে চারিয়ে বসিয়েছে। এই ধরুন—আমি ভারতীয়, আমার পাশে এক রুশপুঙ্গব, তার পাশে কাজাক, তার পাশে ইংরেজ, তার পাশে তাজিক, তার পাশে জর্মন—এমনিধারা চলল। আলাদা চেহারা—ভাষা পোশাক আদবকায়দা সমস্ত আলাদা—অথচ একটি ছাতের নিচে টেবিলের এক পাত্রের খাবার এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে কেটে নিয়ে দিব্যি মুখবিবরে চালান করছেন। এবং মনে মনে অনুভব করছেন, ভুবন নামক একটুকু ছোট্ট জায়গার বাসিন্দা আমরা সকলে।

এক প্রান্তে যথারীতি স্টেজ বানিয়েছে। হাতে ও মুখে ভোজ খাচ্ছেন; আর নাচ-গান-বাজনা চলছে, তারও মজা নিচ্ছেন চোখ দিয়ে কান দিয়ে। একএকখানা কসরত অন্তে শিল্পী নেমে আসছেন ঘুরে ঘুরে খানিকটা আলাপ পরিচয় করে হঠাৎ বসে পড়ছেন কোন এক ভাগ্যবানের পাশে। অপর এক দল ইতিমধ্যে লেগে গিয়েছে স্টেজের উপরে। এ-ও ঐ দিনমানের মিছিলের মতো, স্ফূর্তির আর শেষ হতে চায় না। গান দিয়ে শুরু—'আমার দেশের মানুষ'। তিরিশটা মেয়ে এক সঙ্গে গাইছে আর বাজাচ্ছে। মাথায় মুকুট, হাতে তারের যন্ত্র 'রুবাব'।

আলবেনিয়ার লোকনৃত্য। তুলাচাষীদের গান ও নাচ, নাচছে তিনটি মেয়ে—ভাল ঘরের মেয়ে, হাবেভাবে মালুম। হাসছে আর দাঁতের সোনা ঝিকমিক করছে।

ইউক্রেনের লোকনৃত্য: নাচের ভিতর মাঝে মাঝে হৈ-হৈ করে উঠছে। একটা গান গুঁজে দিল এর ফাঁকে—'আমার দেশ আমার মানুষ—হোক না যতই হীন—ভালবাসি, ভালবাসি'। তাজিকিস্তানের এক বুড়া কবি চারণের ঢঙে নিজের এক কবিতা পড়লেন। উঠলেন তারপর উজবেকিস্তানের কবি—তাঁর কবিতা হল 'তুলাচাষীদের প্রতি'। তাজিক নাচ এবারে—সুখের নৃত্য নাচছে একটি মাত্র মেয়ে, বাজনা শুধুমাত্র তম্বুরিন। অবিকল ভারতীয় মুদ্রা দেখাচ্ছে হাতের ভঙ্গিতে। কিরঘিজ লোক-সঙ্গীত—বড় বগিথালার সাইজের গোলাকার মুখ নর্তকীর, চোখ আছে কিম্বা নেই, খাঁটি তিব্বতী চেহারা।

স্টেজে কিঞ্চিৎ বিরাম দিয়ে শ্রোতাদের ডাক করেছে এবারে। দলের নেতা তেজা সিংকে রঙিন আলখেল্লা, চৌকো টুপি ও লাল স্কার্ট সাজাল। এবং সিংজীর নিজস্ব কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুলের বিনুনি ও হাতের লোহা তো আছেই। অপরূপ দেখাচ্ছে। তারিফ করছি সকলে। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকেও, সেটা ঠাহর করিনি। ভারে ভারে নিয়ে আসছে ঐ

সব বস্ত্র—সকলকে পরাবে। কেমন, হাদিমন্ধরা করুন এবার সিংজীর সজ্জা নিয়ে। আপাদমস্তক পোশাক পরিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দুই গালে দুর্দান্ত দুই চুমু। আওয়াজে ভাববেন বোমা পড়ল বুঝি মুখে। তাজিকি উৎসবের জাতীয় পোশাক অতিথিদের আদর করে উপহার দিচ্ছে।

কাজাকিস্তানের এক মস্ত গুণী উঠলেন গান করতে। তাঁকেও এ পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। লম্বা সাদা দাড়ি; এক হাতে রুবাব। বড় বড় মেডেল-গাঁথা মালা দুলছে গলায়।

নৃত্য নানা রকমের। মেয়েটার হাতে একগাদা চুড়ি—পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতের ঐ চুড়ি বাজাচ্ছে নাচতে নাচতে। আর এক রকম নৃত্য হল—কাপাস বোনা, তুলো তোলা, চরকা কাটা, তাঁত বোনা। তাঁত বুনে কাপড় বানাল—স্ফূর্তিতে নাচিয়েগুলো পাগল, ওড়াচ্ছে নতুন কাপড়, গায়ে ওড়াচ্ছে ওড়নার মতো—কি করবে যেন ভেবে পায় না। নাচের সঙ্গে বাজনা বাজছে—ঠিক আমাদের ঢাকের বাজনা। যশোরের রাজঘাট গ্রামে এমনি ধরনের নাচ পেয়েছিলাম আমরা—তুলার নাচ নয়, ধানের। ধান রোয়া, ধান কাটা, ধান ঝাড়া, ধান তোলা এবং ধান ভানা—নবান্নের আমোদ-স্ফূর্তি তার পরে। সঙ্গে ঢাক বাজে। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে-বউরা সেই নৃত্য করেন। নাচ বলেন না তাঁরা—ব্রত।

থাক তুলনার কথা। রুশীয় গান ধরেছে ঐ শুনুন। তারপরে একটা কাজাক গান—গানের নাম 'বুলবুল'। তানকর্তব ছেড়ে দিয়ে এক একবার কোকিল ডেকে উঠছে গানের মাঝখানে। তম্বুরা বাজনার খেলা দেখাচ্ছেন এক ব্যক্তি—আমাদের জলতরঙ্গের মতো অনেকটা।

পরদিন ঘুরতে বেরিয়েছি। কোলখোজ অর্থাৎ যৌথখামারে যাব। দুপুরের খানাপিনা সেখানে—তার আগে শহরে একটা চক্কোর দিয়ে নিচ্ছি। কে বলবে, মাত্র পঁচিশটা বছর আগেও এখানে সাদামাঠা জনবিরল গ্রাম ছিল। মাটির কুঁড়েঘর—অজস্র নমুনা তার এখনো। পৌনে তিন-শ কিলোমিটার দূরে রেলস্টেশন, রাস্তাঘাট নেই। শহর বানানো ঠিক হয়ে গেল তো উট ঘোড়া গাধা খচ্চরের পিঠে অত দূর থেকে মালপত্র আসছে। সিমেন্ট নেই তো একটা পুরো ফ্যাক্টরি বসে গেল ঐ বাবদে। এখন সেটা মস্তবড় ফ্যাক্টরি—তাজিকিস্তানের তাবৎ সিমেন্টের সরবরাহ ওখান থেকে। ইটের ফ্যাক্টরি—ইট পোড়াবার সময় ছিল না গোড়ার দিকে, কাঁচা ইটের একতলা গেঁথেছিল। সে সব বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে এখন।

শহরের উত্তর ভাগে আমরা। দিউশাম্বে দরিয়া। এ-পারে ফাঁকা মাঠ অনেক। সোমবারে সোমবারে হাট বসত। ঘরবাড়ি বানিয়ে এখন মাঠ ভরতি করে ফেলেছে, রাস্তা বের করছে, ট্রলি-বাসের লাইন বসাচ্ছে। শহর অতিক্রুত বেড়ে চলেছে। আর দরিয়ার ওপারে দেখুন, দিগ্ব্যাপ্ত সবুজ ক্ষেত পাহাড়ের কোল অবধি চলে গেছে। বরফে-ঢাকা পাহাড়-চূড়া—ক্ষেতখামার

সেই অবধি ধাওয়া করেছে। রুক্ষ উলঙ্গ অসুর্বর পাহাড় গাছপালারা দখল করে ফেলছে। আপনাআপনি হচ্ছে না, নানান কায়দায় গাছ বসানো হচ্ছে পাথরের উপর। কত গবেষণা, কত অর্থব্যয়। এক লরি করে মাটি লেগেছে প্রতিটি গাছের গোড়ায়। তা সার্থক হয়েছে সকল চেষ্টা। জল দিয়ে আর গাছ বাঁচাতে হবে না, শিকড়ের জোরে নিজেরাই জল টেনে নেবে। আর কি! ক'বছরের মধ্যে কসাড় বন হয়ে যাবে এখানে।

ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল দেখতে দেখতে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরেই চষা-ক্ষেত। টালির ঘর—আমাদের রানীগঞ্জের টালির মতো অবিকল। ঢেউ-টিনের ঘর। খোড়োঘর—মটকার উপর মাটি লেপা। এই সব ভেঙে ফেলে বড় বড় ইমারত বসানো হচ্ছে। গরিব লোকও দেখছি পথে—মাথায় ময়লা টুপি, ময়লা চেহারা, গাধার পিঠে যাচ্ছে। টেক্সটাইল কর্মিকদের বসতিস্থান হবে এই তল্লাটে—নক্সা দেখাল। বড় বড় রাস্তা বেরুবে বিরাট কর্মকাণ্ড—ছোটখাট পরিকল্পনায় সুখ পায় না এরা যেন। তাজিক বিপ্লবীদের মনুমেন্ট—এখন এই জায়গায় আছে, সরিয়ে নিয়ে বড় পার্কে স্থাপনা হবে। সৌধ হবে সেই মনুমেন্ট ঘিরে।

নতুন পুলের উপর দিয়ে নদী পার হলাম। আগে এ সুবিধা ছিল না, বিস্তর ঝামেলা পারাপারে। সেকালের সেই ছবি দেখাল। পার হয়ে গিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠছি। অরণ্য শুরু হল। ঐ যা বললাম—কষ্ট করে আর্জানো এই সব গাছ—এখনো বড হয়ে ওঠেনি তেমন।

মোড় ঘুরে গাড়িগুলো সারবন্দি দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। খানিকটা নেমে গিয়ে লেক। খাড়া উঁচু পার ধরে উঠে জলের ধারে গেলাম। কোলখোজের জোয়ানপুরুষরা স্বেচ্ছায় কোদালি ধরে এই লেক বানিয়েছে। তখন যন্ত্রপাতির বেশি জোগাড় ছিল না—যা কিছু ছিল, খাটছিল অন্যান্য জরুরি কাজে। গাছে সাজানো চারিধার। নদী থেকে জল নিয়ে এসে লেক ভরতি করে। সাঁতারের চমৎকার ব্যবস্থা। সাঁতারু জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে—ঘাটের উপরে সেই মূর্তি। পাশে পাশে খাল চলেছে—কলকল করে লেকের বাড়তি জল উপচে পড়ছে খালে। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে দেখছি, একদিকে ধূ ধূ করছে পতিত জমি। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র পতিত ছিল এমনি। অনেক দূরে নদী-কূলে প্রাচীন এক গ্রামের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

লেক ছেড়ে নদীর দিকে এলাম। কূলে কূলে চলেছি। কোলখোজ—যৌথখামারের এলাকা। দশে মিলে কী কাণ্ড করা যায় দেখুন একবার নয়ন মেলে। সরকারি প্রতিষ্ঠান—চাষীদের নিজেদের ব্যাপার পুরোপুরি, সরকার পিছনে আছেন এই পর্যন্ত। জমি সরকারের—সেই বাবদে খাজনার চুক্তি আছে। যা ফসল উঠবে তার শতকরা তিন ভাগ। বেশি ফসল হলে বেশি, দেবেন, কম হলে কম, না হলে শূন্য।

পাথুরে পাকা রাস্তা দিয়ে মোটরে যাচ্ছি—ভুল হয়ে যায়, জাহাজে চেপে

যাচ্ছি যেন সবুজ রঙের সমুদ্রের উপর দিয়ে। যেদিকে তাকাই, কূল দেখি না। সবুজে ঢেউ দিয়েছে ঠিক সমুদ্র-তরঙ্গের মতো। গাড়ি থামাতে বলি, নেমে একটুখানি দাঁড়াব। লক্ষ্মীঠাকরুন ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলেছেন—চারিদিকে সীমাহীন এই শস্যপ্রান্তর দু-চোখ ভরে একবার দেখে নেবো।

আগে ছিল পতিত জলা-জায়গা। আর উষর পাহাড়। এখন দেখুন সমতল অঞ্চল ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপরেও থরে থরে সবুজ লেপে রয়েছে। সবুজও নয়, এমন তেজের ফসল যে রং কালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৯-এর আগে, যেমন এদেশে দেখে থাকেন, টুকরো টুকরো জমি চাষীদের—আ'ল-ঠেলাঠেলি, সীমানা-সরহদ্দ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা মামলামোকদ্দমা. ফসল গিয়ে ওঠে জমিদার-মহাজনের গোলায়, চাষীর সম্বল চোখের পানি।

১৯২৯ অব্দে যৌথখামার হল। হুঁঃ, খামার না আরো-কিছু—গুচ্চের মানুষের গুলতানি। বারোয়ারি কাজে গতর খাটায় নাকি? রাজবাড়ির সেই দুধপুকুর। প্রজাদের উপর হুকুম হয়েছে—এক ঘটি করে দুধ ঢেলে যাবে পুকুরে। সবাই ভাবছে অন্য সকলে দুধ দেবে—আমি এক ঘটি জল ঢেলে যাই চুপিচুপি। শেষটা দেখা, গেল, জলের পুকুর—একটি ফোঁটাও দুধ পড়েনি। এ-ও হবে তাই। কেউ খাটবে না। এতদিন তবু আধপেটা চলছিল, পুরোপুরি উপোস এবার থেকে। অনেক চেষ্টাচরিত্রের ফলে গোড়ায় মেম্বার হল একশ পঁচিশ ঘর। আজকে গুনতিতে আনা মুশকিল।

ট্রাক্টরের চাষ। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ট্রাক্টর চলে না বলে সেই তল্লাটে শুধু লাঙল। কাজের ইউনিট ভাগ করা। যে যত ইউনিট খাটবে, তার তেমনি মজুরি। মজুরি কতক নগদ পয়সায়, কতক ফসলে। দুধ মাখন এমনি দেবে না, দরকারমতো কিনে নেবে—কোলখোজ এগুলো মেম্বারদের কাছে বিনা মুনাফায় বিক্রি করে।

এক সঙ্গে ফসল ফলায়; তবু একটুকু নিজস্ব জমির উপর চাষীর বড় লোভ। তাই বুঝি এক ফালি করে জমি দিয়েছে বাড়ির লাগোয়া। সামান্য জায়গা, সওয়া বিঘের মতো—গায়ে খেটে চাষীরা সেখানে খুশিমতন তরি-তরকারি আর্জায়। একেবারে নিজস্ব বস্তু, বাড়তি হলে বিক্রিও করতে পারে। তা ছাড়া প্রতি পরিবারে একটা-দুটো গাইগরু ও কিছু ভেড়া-মুরগি পোষবার বিধি আছে।

খুচরো চাষী নেই আর এদিকে—কোন না-কোন যৌথখামারে ভিড়ে পড়েছে। ভবিষ্যতের কাজ হল. ছোট ছোট কোলখোজ জুড়ে গেঁথে একত্র করা। তাতে কাজের সুবিধা, উৎপাদনও বাড়বে। কেউ জায়গা বদল করল কিম্বা কোন মেয়ে বিয়ে করল—সে অবস্থায় তার কোলখোজও বদল হয়ে যায়। ছোটখাট মেশিন কোলখোজ কিনে ফেলে। ভারি ভারি মেশিন প্রায়ই কেনে না। সরকারি ডিপোয় আছে, সেখান থেকে ভাড়া নিয়ে কাজ চালায়। কম খরচ তাতে। সরকারেরও সুবিধা—এক মেশিন এখানে

পাঁচদিন ওখানে দশ দিন ভাড়া খাটিয়ে বারো মাস চালু রাখতে পারে। কোলখোজের হর্তাকর্তা হলেন বোর্ড। মেম্বাররা বোর্ড নির্বাচন করে। বোর্ডের মীমাংসা মনঃপূত হলে সাধারণ সভা ডাকা যায়। তাতেও সুবিধা না হলে স্থানীয় সোবিয়েত আছে।

আহারাদির আগে অতি-দ্রুত একটা চক্কোর মেরে নিচ্ছি। একজিবিশন-হল—যাবতীয় উৎপন্ন-দ্রব্য সাজানো, দেয়ালে কৃষক-বীরদের ছবি, বিবিধ নক্সা ও সংখ্যাতত্ত্ব। কনসার্ট-হল—জৌলুশে ঝিকমিক করছে, উঁচু বেদি একদিকে, নানাবিধ বাজনার সরঞ্জাম, দেয়াল-ভরা দেয়ালচিত্র ও সোবিয়েত নেতাদের ছবি। দোতলা ছোট্ট এক বাড়িতে লাইব্রেরি—উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছি। তাজিকিস্তানের বড় লেখক সদরউদ্দিন আইনি—ছবিটাও তাঁর তেমনি বড়। চেকভের ছবিও প্রকাণ্ড। আর ছবি আছে ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, রুদকি, গর্কি, পুশকিন ইত্যাদি অনেকের। লাইব্রেরি-বাড়ির পাশে টেনিস-লন। মাঠের ভিতরে পাকা-মেজের খুব লম্বা ঘরে ঘোড়ার আস্তাবল, গরুর গোয়াল। শাকআলুর মতো এক রকম জিনিস মেশিনে কুচ-কুচি করে জলে ভিজিয়ে খোসা তুলে ফেলছে। গরুর খাবার। তুলো শুকোতে দিয়েছে খোলা মাঠে। গাধা বাঁধা রয়েছে ওদিকে কয়েকটা।

পথের পাশে একটা মেডিকেল ইউনিট। ঢুকে পড়লাম। জন দুই-তিন নার্স মিলে চালায়—ডাক্তার আসেন সপ্তাহে তিনবার।…খর রৌদ্র, সূর্য ঠিক মাথার উপরে। আর নয়, আর দেরি চলবে না—বিষম ডাকাডাকি লাগিয়েছে: টেবিল সাজিয়ে বসে আছি, খেতে আসুন।

নেমন্তন্নে বসেছি। তন্দুরায় সেঁকা বড় বড় টার্কি। কশাইর দোকানে ছাল-ছাড়ানো ছাগল দেখেন, তেমনি বস্তু পাত্রে পাত্রে সাজানো। সবই কোলখোজের—বাইরের কিছু নয়। ছুরি দিয়ে একটু-আধটু কেটে নিয়ে আমরা গালে ফেলছি। ঘুরে ঘুরে ওরা তদ্বির-তদারক করছিল—হাসতে লাগল হি-হি করে। অর্থাৎ কাণ্ড দেখ হে আনাড়িগুলোর! আমাদের সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে শেষটা নিজেরাই লেগে পড়ল। সে কি ব্যাপার, না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। আমরা তো এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির টুকরো কেটে কেটে নিচ্ছিলাম, ঐ মশায়েরা ঠ্যাং ধরে আস্ত এক টার্কি মুখে তুলে কড়মড় করে হাড় চিবোচ্ছেন। স্তূপাকার আয়োজন লহমার মধ্যে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এর মধ্যে গান ধরে বসল একজন। মানে বুঝিয়ে দিল গানের, দেশপ্রেমের সঙ্গীত। কিন্তু আড়াল থেকে শুনলে মনে করতেন, ভর্ৎসনা করছে কে বুঝি কাকে। প্লেগ-বসন্তর মতো গানও সংক্রামক, দেখতে দেখতে সবগুলিকে গানে পেয়ে বসল। শেষটা শুধু—গানে আর সামাল মানে না—নাচ। যেমন দৈত্যাকার চেহারা, নাচও ঠিক সেই ধাঁচের। রক্ষা এই, এক তলার ঘর—পদদাপে ছাত ভেঙে পড়ার শঙ্কা নেই, বড় জোর মেজে বসে যেতে

পারে দু-এক হাত। ক'টি মেয়ে পরিবেশন করছেন, বেটাছেলেদের এই হুল্লোড় কাণ্ড দেখছেন তাঁরা। লুব্ধ চোখে দেখছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। থমকে দাঁড়াচ্ছেন কখনো বা আধ মিনিট, আবার পরিবেশন করছেন। তার পরে. ও হরি, পাত্রের বস্তু এর-ওর পাতে ঢেলে দিয়ে ঐ চামচে মাথার উপরে ধরেই নাচ শুরু করে দিলেন। উঃ, এমন কাণ্ড হতে পারে দুনিয়ার উপর! খাওয়া আর স্ফূর্তি—বাধাবন্ধন নেই। ঘরের প্রতিটি লোক ঠাট্টা-রসিকতা করছে। সকলের অলক্ষ্যে নিশ্বাস চেপে নিই আমি একটা। গ্রাম্য চাষীর এত খাওয়া, প্রাণখোলা এমন আনন্দ! ছোটবেলা থেকে চাষীর গায়ে বড় হয়েছি—কেউ দাদা, কেউ চাচা। বিশাল পামিরের পরপার থেকে আজকে রমজান মোল্লা নৈমদ্দি সরদার নকুল দাস—কত জনের কথা মনে আসছে। এমনি আহার আর আনন্দ চাই সকলের জন্য।

খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য বড় সাইজের একটা করে ডালিম দিল। দাঁড়াতে দেয় না, পাড়ায় নিয়ে বের করে তখনই। হাই ইস্কুল। হেডমাস্টার ও অনেক হোমরাচোমরা রাস্তা অবধি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। দশ বছরের কোর্স—পঞ্চম বর্ষ থেকে উঁচু ক্লাস, তখন ইংরেজি ফরাসি ইত্যাদি কোন একটা বাইরের ভাষাও শিখতে হয়। গোড়ায় মাতৃভাষা তাজিকি, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অল্পস্বল্প রুশভাষার পাঠ। হেডমাস্টার লাল কামিজের উপর বুকখোলা কোট চাপিয়েছেন। চটফটে মানুষটি—ক্লাস দেখাতে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন।

আমরা ক'জন দ্বিতীয় মানের বাচ্চাদের ঘরে ঢুকে পড়েছি। ক্লাস পড়াচ্ছেন একটি মেয়ে। পড়ানো আর কি—ছবি আঁকছেন হরেক রকম, ছবি নিয়ে বাচ্চাদের প্রশ্ন করছেন। কেমিষ্ট্রী. ফিজিক্স আর বায়োলজির ল্যাবরেটারি এক দিকটার কখানা ঘর জুড়ে। বাপরে বাপ! এই তো এক ইস্কুল, কিন্তু যন্ত্রপাতির কী সমারোহ!

দিগন্তব্যাপ্ত মাঠের ফসলের ভিতর চাষীদের দিব্যি গাঁ-ঘর। ছিমছাম বাড়িগুলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকছি। আপেলগাছ দরজার ধারে, ফল ফলে আছে। উঠানের প্রান্তে আঙ্গুরের মাচা। কাবুলে অপূর্ব গুপ্তর বাড়ি যেমন। গরু-ছাগল বাঁধা আছে ওদিকটার। উঠানের অর্ধেকখানি নিয়ে আলুর ক্ষেত। রাক্ষুসে সাইজের আলু—কয়েকটা তুলে ওঁরা আমাদের দেখালেন।

বাড়ির কর্তার নাম রহমৎ। দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। চার ছেলে, দুটো গাই, আট বকরি। অ্যাস্‌বেস্টোজের চাল, গরম না লাগে সেজন্য চালের নিচে কাঠের পাটাতন। তার নিচে নক্সাদার চাঁদোয়া টাঙিয়ে বাহার করছে। সামনের দিকে দুই কুঠুরি পাশাপাশি, পিছনে দরদালানের মতো টানা লম্বা ঘর। কয়েকটা বাড়িতে ঢুকলাম. সবই এক ধাঁচের। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বাতি, শীতের সময় ঘর গরম করবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। রেডিও, গ্রামোফোন। মেজেয় কার্পেট বিছানো। মনে রাখবেন, চাষীর বাড়ি

ঢুকেছেন। আঙুরের থোলো ঝুলানো দেয়ালে। কয়েক রকম তারের বাজনা —রহমৎ বলছেন, বাজনা শুনুন না একটু। রঙিন আলখেল্লার মতন পোশাক মেয়েদের, মাথায় ওড়না, কাঁধে-কাঁধ দিয়ে দাঁড়ালেন এসে কয়েকটি—অর্থাৎ ইঙ্গিত পেলেই লেগে পড়েন গীতবাদ্যে। এবং বুড়ো রহমতের যা গতিক, উনিও বোধহয় নৃত্য শুরু করে দেবেন নাতনীর বয়সি মেয়েগুলোর সঙ্গে। কিন্তু সময় কোথা বাজনা শুনবার? বেরিয়ে পড়ুন এখনই। বেশ খানিকটা দূরে লেনিন-কোলখোজ—সেইটে সেরে তবে বাসায় ফেরা।

রোদ পড়ে এসেছে, বেশ শীত ধরেছে এখন। ওধারে রান্নাঘর, তন্দুর সেঁকা-পোড়ার জন্যে। ঘুঁটে দিয়ে রেখেছে। বড় বড় লাল-লঙ্কা শুকোতে দিয়েছে। বাইরে প্রকাণ্ড এক তক্তাপোশ—আমরা আসব জেনেই বের করে দিয়েছে বোধহয়। আমাদের একজন কৃষিকর্মেও করিৎকর্মা—কোথায় নিজস্ব চাষবাস আছে নাকি তাঁর। গোটা কয়েক লঙ্কা চেয়ে নিলেন। বড় আকারের টম্যাটো ফলে আছে—পাঁচটা ছ'টায় সের দাঁড়াবে—তারও বীজ জোগাড় করলেন। মস্কোর বাজারেও ঘোরাঘুরি করেছেন তিনি বীজের জন্য। দেশে এসে এই সমস্ত ফলাবেন। বললাম, খাসা হবে। নাম দেবেন 'লেনিন-লঙ্কা' 'কার্ল মার্কস-টম্যাটো'—ঝুড়ি ঝুড়ি কিনবে লোকে।

অনেক পথ ছুটে লেনিন-কোলখোজে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে কোলখোজের এই অফিস অঞ্চলে অন্ধকার বোঝবার জো নেই, আলোয় আলোয় দিনমান। অপরূপ সাজানো বাগান। কোন ইন্দ্র-তুল্য ব্যক্তির প্রমোদশালায় এসে পড়েছি, মনে হয়। তাই বটে! হিসাব দিচ্ছে, কোন সনে কত মুনাফা পিটেছে। বেড়েই চলেছে। মেয়ে শ্রমিক-বীর একজনকে দেখলাম। নাম হালিমা। বারোটা মেডেল আর অর্ডার-অব লেনিন পেয়েছেন তুলো চাষের জন্য। সুপ্রীম সোবিয়েতের ডেপুটি। সগর্বে হালিমা আমাদের এটা-সেটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল। ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বাচ্চারা খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দিকে আহ্লাদ করে-কাবুলিওয়ালার ধরনে জোব্বা-পরা চাষীর দল—লম্বা দাড়ি, মাথা কামানো, পায়ে বুটজুতা। পাঠানের মতো দশাসই চেহারা। কোলখোজের নিজস্ব অনেক রকম মেশিন—এই রাত্রিবেলা মাঠের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে সেই সমস্ত চালিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ানক আওয়াজ, কানে তালা লেগে যায়। টেনেটুনে তারপর খাওয়াতে নিয়ে চলল, না খাইয়ে ছাড়বে না। সহসা বিষম দুঃসংবাদ। রেডিও-য় ভারতীয় খবর দিচ্ছে—আমাদেরই জন্য দিল্লি স্টেশন ধরেছে—রফি আহমেদ কিদোয়াই মারা গেছেন। আর একদিন, লিয়াকত আলির হত্যার খবর পেয়েছিলাম এমনি পথের উপর—কাশ্মীরের পথে বানিহাল-গিরিসঙ্কটের ভিতর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। কিছু ভাল লাগছে না।

পরের দিন। ওঁরা বেরুলেন, আমি ছুটি নিয়েছি এ বেলাটা। বিশাল এই বাগানবাড়িতে আছি—বাগানটা ঘুরে ঘুরে একটু দেখি। টাসের লোক

এসে আমার অভিমত চাইল তাজিকিস্তান ও এই জয়ন্তী-উৎসব সম্পর্কে। সোবিয়েতের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান টাসের নাম কে না জানেন? অতএব লিখতে হল দু-চার ছত্র। বিকালবেলা তাজিক-গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চা খাওয়াবেন, ওখানেও কথাগুলো বললে মন্দ হয় না। এক ঢিলে দুই পাখি— যা লিখেছি, ঐ আসরে আগে পড়ে টাসের লোকের কাছে দিয়ে দেব।

প্রেসিডেন্টের আয়োজন হলের ভিতরে। সোবিয়েতে প্রথম আজ আমি শাল-পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাঙালি পোশাকে হাজির হয়েছি। তাবৎ চীনদেশ এই পোশাকে ঘুরেছি, কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডার ভয়ে এখানে এতদিন হয়ে ওঠে নি। গোড়ায় যেমনধারা হয়ে থাকে—নতুন ব্যবস্থার গুণকীর্তন করছেন ওঁরা। জারের আমলে ছ'টা সিল্ক-ফ্যাক্টরিতে মোটমাট যত সিল্ক হত, এখন যে কোন একটি ফ্যাক্টরির উৎপাদন তাই। ইচ্ছে করলেই সোবিয়েত-সমবায় থেকে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এত সুখসম্পদ পাচ্ছি—আলাদা হতে যাব কেন? সব ক'টা গণতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে—এমন অভাবিত অতি-দ্রুত উন্নতি সেই জন্য। কোন প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে চাইনে আমরা। প্রয়োজন নেই। নিজেদের যা আছে, তাই তো ভোগ করবার লোক মেলে না।

এক কৌতূহল আমাদের মনে মনে। প্রেসিডেন্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও শুনতে পাই, মোল্লাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ—তাঁদের কড়া শাসনে বোরখা তুলে একটুকু বাইরে তাকাবার জো ছিল না মেয়েদের। পায়ে পায়ে বিধিনিষেধ। মোল্লারা ঠাণ্ডা হলেন কি করে?

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে যাই নি। আছেন তাঁরা এখনও—শুক্রবারে যে কোন মসজিদে যান, দেখতে পাবেন। কিন্তু রয়েছেন ঐ ধর্মীয় এলাকাটুকুর মধ্যেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই এই ধর্মীয় মানুষদের শিক্ষা ব্যাপারে পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্ব, জনহিতকর সকল কাজকর্ম সরকার নিজের কাঁধে নিয়েছেন। মোল্লারা এমনি ভাবে জনসাধারণ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ অত শত বোঝে না। যেখান থেকে উপকার পায়, সেইখানে তাদের যাতায়াত—সেখানে ভালবাসা। ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এখন—তোমার যেমন খুশি ধর্মচর্চা করো, একেবারে না করলেও রক্তচক্ষুর শাসানি নেই।

কবি তুরসুন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা করলেন: ১৯৪৭ অব্দে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যবশে স্বচক্ষে ভারত দেখেছি। ভারত সম্পর্কে বিস্তর কবিতা আছে আমার। দুই রকমের কবিতা—ভারতের পুরানো গাথা নিয়ে; এবং আমার ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কে। ভারতের প্রতি হৃদয়ভরা প্রীতি সেই থেকে। আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল; পার্বত্য নদীধারার মতো প্রখর। একা আমি নই, তাজিক দেশের হাজার হাজার মানুষ ভারতকে চেনে রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ প্রভৃতির লেখায়; বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে যাঁরা আসছেন তাঁদের নাচে-গানে। এমনি চেনা-জানার মধ্য দিয়ে আমাদের উভয় দেশ প্রীতির

বাঁধনে বাঁধা পড়ুক। আমরা চাই সূর্য-চন্দ্রের আলোর মতো সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করুক সমস্ত ভুবন—কোনখানে কেউ বাদ থাকবে না। আমাদের তাজিকদের মধ্যে একটা চলতি উপমা—আমার ও প্রিয়তমার প্রীতি দুই চোখের মতো, দু-চোখ পরস্পরকে দেখে না, কিন্তু দু-চোখ মিলে জগৎ দেখে।

'প্রত্যাবর্তন' নামে নিজের এক কবিতা আবৃত্তি করলেন তুরসুন। নাম লিখে একটা করে কবিতার বই দিলেন প্রতিজনকে। আমি দু-চার কথা বললাম। হীরেন মুখুজ্জে মশায় আশ্চর্য এক বক্তৃতা করলেন—'রাশিয়ার চিঠি'র জবান দিয়ে বক্তৃতা শুরু: এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। উৎসবের শেষ, তাজিকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছি কাল সকাল বেলা। অনেকেই বাজার ঘুরতে বেরুলেন। আমি ছুটেছি ফেরদৌসি-লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে একটা পাক না দিয়ে গেলে পাঠকেরা যে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

পুরো নাম তাজিক ন্যাশন্যাল ফেরদৌসি লাইব্রেরি। দশম-একাদশ শতকের খোরসান কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির নামে। খোরসান জায়গাটা এই তাজিক গণতন্ত্রের ভিতরে। লাইব্রেরির সামনে বাগান, অজস্র ফুল। প্রাচীন তাজিক পদ্ধতির বাড়ি—তাজিকি লেখক কবি শিল্পী ও জ্ঞানী-গুণীদের মূর্তিতে সাজানো। লাইব্রেরির ডিরেক্টর মেয়ে। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ অব্দে। প্রথমে একজিবিশন-হল। নানান পুঁথিপত্রে ঠাসা। আগে তাজিকিস্তানে একটা লাইব্রেরিও ছিল না। এখন অনেক। এটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

আর একটা খুব বড় হল—তার অপরূপ অলঙ্করণ। 'মাতৃভূমি' নামে দেয়াল-চিত্র—তাজিকিস্তানের নানা দৃশ্য দেয়ালে এঁকে রেখেছে। আঠারোর কম-বয়সি ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর এটা। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা থিসিস বানাচ্ছে এমনি আর একটা হলে। নিঃশব্দ—সূঁচ পড়ে গেলে তার শব্দ পাওয়া যাবে। সাধারণের পাঠাগার একটা—যারা কারখানার কর্মিক কিম্বা অফিসে কাজকর্ম করে, তারা এখানে এসে বসে। মোটমাট পাঁচটা পড়বার ঘর।

স্থানীয় ঐতিহাসিক বিভাগ। একটা বই দেখলাম—কিতাব মুদজান আল-বুলদান। আরব পরিব্রাজক ইয়াকুত-আল-বামাডির রচনা। যত দেশ তাঁর জানা ছিল, সমস্ত বর্ণানুক্রমিক সাজিয়েছেন। কেতাব-আল-ইবের—আরবের নামজাদা ঐতিহাসিক (চৌদ্দ শতক) ইবন খালদুনের রচনা, সময়ক্রম অনুসারে বিভিন্ন আরব-খলিফাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত। পনের শতকের বই তাজকি-রাত-উশ সুয়ারাও—শতাধিক কবির সম্পর্কে নানা বিবরণ। সাদীর বোস্তানের (সতের শতকের পাণ্ডুলিপি) ফোটগ্রাফিক কপি। হাজার বছর আগেকার রুদাকীর কবিতার পাণ্ডুলিপি, ষোল শতকের শাহনামার পাণ্ডুলিপি। পুরানো তাজিক ও উজবেকি পাণ্ডুলিপি—সমস্ত আরবি হরফে। এই আরবি হরফ তুলে দিয়ে এখন রুশীয় হরফ চালু হচ্ছে। বোম্বাইয়ে ছাপা বিস্তর ফারসি বই আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক বই দেখলাম। সাত তলা জুড়ে বই সাজানো। লেনিন-লাইব্রেরির মতোই নিচু ছাত বইয়ের ঘরগুলোয়।

প্রথম খণ্ড শেষ